ঢাকার ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়
প্রণীত।

—কলিকাতা—
১৬নং সাগর ধরের লেন হইতে
শ্রীযামিনীমোহন রায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩১৯ বঙ্গাব্দ

মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই ৩৷৹ টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। ঢাকা, কামারনগর, জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের বাসায় শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্তের নিকট।

২। ৩নং কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ম্যানেজার, কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্।

৩। ৬০নং রতনসরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীশশিমোহন সেন কবিরত্ন।

৪। সাহিত্য পরিষদ কার্য্যালয়, ঢাকা।

৫। ৫০।১ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা ও লায়াল ষ্ট্রীট ঢাকা, আশুতোষ লাইব্রেরী।

৬। ৬৭নং কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা ও লায়াল ষ্ট্রীট ঢাকা, ষ্টুডেন্ট্স্ লাইব্রেরী।

৭। ৫৪।৬ কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা ও ইসলামপুর ঢাকা, অতুল লাইব্রেরী।

৮। লায়াল ষ্ট্রীট, ঢাকা, পপুলার লাইব্রেরী।

৯। ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী।

১০। ৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স।

১১। ২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরী।

—কলিকাতা—

৩নং কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট,

দি কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ হালদার দ্বারা মুদ্রিত।

423a

পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব

৺ দুর্গামোহন রায় মহাশয়ের

ও

পুণ্যবতী মাতৃঠাকুরাণী

স্বর্গগতা

কামিনী দেবীর

পুণ্য নামে

ভক্তি সহকারে

তাঁহাদিগের অকৃতি দীন সন্তান কর্ত্তৃক

এই

গ্রন্থ খানা

উৎসর্গীকৃত হইল।

আহসান মঞ্জিল।
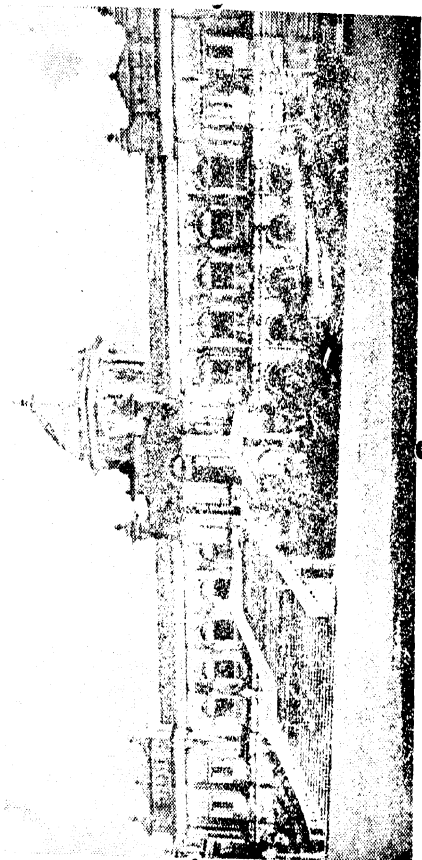
ভূমিকা।

—:*:—

জাতীয় জীবন সংশোধনের প্রধান উপায় দেশের ইতিহাস। স্বদেশ-প্রাণ কতিপয় মনস্বী সাহিত্যসেবী বঙ্গের অনেকানেক জেলার ইতিহাস লিখিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু ঢাকার একখানা বিস্তৃত ইতিহাস নাই। যে স্থান বহুপণ্ডিতমণ্ডলী ও বিবুধজনসেবিত হইয়া এক দিন ভারতের কু-মধ্য (O°. meridian) বলিয়া গণ্য হইত, যে স্থানের প্রতি ধূলিকণার সহিত অসংখ্য হিন্দুমোসলমান সাধক, পীর ও মহাপুরুষের প্রাচীনস্মৃতি বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, যে স্থান সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত বঙ্গের রাজধানী বলিয়া পরিগণিত ছিল, যে স্থানের ভাষার আদর্শে বঙ্গভাষা গঠিত হইয়াছে, তথাকার বিস্তৃত বিবরণ জানিবার জন্ত কাহার না ইচ্ছা হয়? বিশেষতঃ, ঢাকার বিস্তৃত একখানা ইতিহাস প্রকাশিত হয়, ঢাকা জেলার অধিবাসী সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই এরূপ ইচ্ছা হওয়া একান্তই স্বাভাবিক।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "টেভার্ণিয়ার তিন ক্রোশ দীর্ঘ যে ঢাকা নগরে তিনটী মাত্র পাকা বাড়ী দর্শন করিয়াছিলেন, সেখানকার ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজনীয়তাই বা কি এবং তথায় উপকরণই বা এমন কি আছে"? বলা বাহুল্য যে, এরূপ উক্তি নিতান্তই অসার এবং ভিত্তিহীন। টেভার্ণিয়ার আমির-উল-ওমরা নবাব সায়েস্তার্খাঁর প্রথম সুবাদারী প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ঢাকা নগরে পদার্পণ করেন। ১৬০৮ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার রাজধানী ঢাকা নগরীতে স্থানান্তরিত হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুবাদারগণ মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যু এবং প্রত্যন্ত প্রদেশের রাজন্তবর্গের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধকার্য্যে

ব্যাপৃত থাকায় রাজধানীর উৎকর্ষসাধনে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তখনও নবাব ইসলামখাঁর "প্রাচীন দুর্গ," সা সুজার আদেশে আবুল কাসেম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত "ছোটকাটরা", মীর মোরাদের "হুসনী দালান", "মকিমের কাটরা", "ইদগা", মহারাজ বল্লালের প্রস্তুত "ঢাকেশ্বরীর মন্দির" প্রভৃতি সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি, স্থাপত্যকৌশলে সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে মেসার্স সিয়ার-ম্যান বার্ড, ক্রিম্প, জন ফেণ্ডেল, জেমস গ্রেহাম প্রভৃতি মনস্বীগণ ঢাকার বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপাদি সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা গেল। "Respecting the city of Dacca we must observe, that it has had more than one period of decay. During the reign of the Emperor Aulumgeer, its splendour was at the height; and judging from the magnificence of many of the ruins, both in the heart of the present City and its environs, such as bridges, brick cause-ways, mosques, seraisgates, palaces, and gardens, most of them, least in the environs, now overgrown with wood, it must have vied in extent and riches with any of the great cities we know of in Bengal, not perhaps excepting Gour." বিশপ হিবার ঢাকা সহরকে মস্কোনগরীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। তিনি পুস্তাপ্রাসাদ সন্দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, "The architecture is precisely that of the Kremlin of Moscow of which city, indeed, I was repeatedly reminded in my progress through the town."

স্বাধীনতার পুণ্যপীঠ, বীরত্বের বেত্রস্থল, রামপাল, সাভার, মাধব-

পুর, ধামরাই, গান্ধারিয়া, শাইটহালিয়া, শৈলাট, দীঘলিরছিট, রাজাবাড়ী, সাতথামাইর, বর্শ্মিয়া, এগারসিন্ধু, একডালা, চৌরা, সোনারগাঁও, খিজিরপুর, কোণ্ডরসুন্দর, মোগড়াপাড়, শ্রীপুর, রঘুরামপুর, নপাড়া, রাজনগর প্রভৃতি স্থানের পুঞ্জীভূত কীর্ত্তিরাজির চিহ্ন ও বহুপ্রবাদ-বাক্য অতীতের গৌরব-মণ্ডিত পবিত্রস্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া আমাদিগকে ক্ষোভে ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে।

সুধু কিম্বদন্তী ও প্রবচনের উপরে ইতিহাসের ভিত্তি গ্রথিত করিতে যাওয়া নিতান্ত উপহসনীয় হইলেও উহা একেবারে উপেক্ষা করাও চলে না। তিমিরজলদাবৃত অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকারে পথহারা বিপন্ন পথিক যেমন তড়িত-রেখার ক্ষণিক আলোকে স্বীয় গন্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ প্রবাদের ক্ষীণ-বর্ত্তিকা হস্তে, অতি সন্তর্পণে, আমাদিগকে অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ঐতিহ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেশের বিলুপ্ত-প্রায় কীর্ত্তিকাহিনী সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে সমতট দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক বৌদ্ধ-পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ বঙ্গ-দেশের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট ও তাম্রলিপ্তিকে সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আসরফপুরের তাম্রশাসনে খড়্গ-বংশীয় নরপতিগণের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। খড়্গোদ্যম এই বংশের প্রথম রাজা। খড়্গোদ্যমের পুত্র জাতখড়্গ, জাত খড়্গের পুত্র দেবখড়্গ এবং দেবখড়্গের পুত্রের নাম রাজরাজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবখড়্গের মন্ত্রীর নাম ছিল পুরোদাস।

ইদিলপুরের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে বিক্রমপুরের একটি অভিনব রাজবংশের নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই বংশীয় প্রথম রাজার নাম সুবর্ণচন্দ্র। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র, ত্রৈলোক্যচন্দ্রের

পুত্র চন্দ্রদেব। তিব্বতের তারানাথ-কৃত মগধের রাজবংশের ইতিহাস হইতে জানা যায়, পূর্ব্বজনপদাধীশ্বর শ্রীচন্দ্রের সভায় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দের মধ্যভাগে বসুবন্ধু বিদ্যমান ছিলেন।

বেলাবর নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনে বিক্রমপুরাধিপতি বজ্রবর্ম্মা, জাত্রবর্ম্মা, শ্যামলবর্ম্মা ও ভোজবর্ম্মার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ম্মবংশীয় রাজা হরিবর্ম্মদেবের ৪২ বর্ষাঙ্কিত একখানি তাম্রশাসন অসম্পূর্ণাবস্থায় ফরিদ-পুর জেলার সামন্তসার গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জ্যোতিবর্ম্মা ও হরিবর্ম্মার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয় ভবদেব ভট্ট হরিবর্ম্মদেবের সচিব ছিলেন। ভবদেব ভট্টের অপর নাম বাল ভট্ট বা বালবলভীভুজঙ্গ, ইহার পিতার নাম গোবর্দ্ধন। ইনি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন। হরিবর্ম্মদেব অসাধারণ পরাক্রমশালী ছিলেন। দক্ষিণাপথাধীশ্বর দিগ্বিজয়ী চৈন ভূপতি রাজেন্দ্র চোল গৌড়, বঙ্গ, রাঢ় ও দন্তভুক্তিকা জয় করিতে এই সময়ে আগমন করেন। তিনি গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিলেও, হরিবর্ম্মদেবকে পরাজিত করিতে পারেন নাই।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ আদিশূরই বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নামক স্থানে বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। যজ্ঞ-সমাপনান্তে তিনি ব্রাহ্মণ-পঞ্চককে বাস করিবার জন্য যে পাঁচখানা গ্রাম প্রদান করেন, অদ্যাপি সে সমুদয় গ্রাম "পঞ্চসার," "পাঁচগাও" ইত্যাদি নাম লইয়া অতীতের সাক্ষী স্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে

সেনবংশীয় নরপতিগণের শাসনাধীনে বিক্রমপুর শিক্ষায়, সভ্যতায়, ও ধনৈশ্বর্য্যে ভারতের গৌরবের সামগ্রী ছিল। লঘুভারত পাঠে অবগত হওয়া যায়, মহারাজ লক্ষ্মণ সেন বিক্রমপুরেই ভূমিষ্ঠ হন।

পালবংশীয় যশোপাল, হরিশ্চন্দ্র, শিশুপাল প্রভৃতি রাজাগণ মাধবপুরে, সাভারে, এবং ভাওয়ালের উত্তর-পশ্চিমাংশে দীঘলিরছিট নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া এতদঞ্চল শাসন করিতেন। দীঘলিরছিট নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী শৈলাট গ্রামের দক্ষিণপার্শ্বে শিশুপালের পুষ্প-বাটিকা ছিল।

বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজবংশ রামপাল নগরে বহুকাল রাজত্ব করেন। রামপালের অধঃপতনের পর বঙ্গদেশের স্বাধীনতা ও ভাগ্যলক্ষ্মী চিরতরে অন্তর্হিত হয়। কেহ কেহ বলেন রামপাল সুপ্রাচীন সমতটেরই নামান্তর মাত্র। শেষ হিন্দু-নরপতি, মোসলমান সেনাপতি মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক নবদ্বীপ অধিকারের পর, সপরিবারে তথা হইতে পলায়ন করিয়া পৈত্রিক প্রাচীন রাজধানী রামপাল নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে রামপালে এবং সোনারগাঁয়ে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক নিরাপদে পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতে থাকেন। তদীয় বংশধরগণ শতাধিক বৎসর কাল পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুরাজগণের শাসন-প্রভাব অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মোসলমানগণের দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমে নবদ্বীপ-পতনের বহুকাল পরে পূর্ব্ববঙ্গ অধিকৃত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ বিজয়ের পর হইতেই বাঙ্গালার স্বাধীনতার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, বাঙ্গালীর দাসত্ব ও জাতীয় অধোগতি সম্পূর্ণরূপে আরম্ভ হয়।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রামপালের অধঃপতন সংঘটিত হইলে সোনারগাঁয়ের উন্নতি আরম্ভ হয়, এবং মোসলমানগণ-লিখিত ইতিহাসে উহা গৌরবের সহিত উল্লিখিত হইতে থাকে। জিয়াউদ্দিন বারণি সর্ব্বপ্রথম সোনারগাঁয়ের উল্লেখ করেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও সোনারগাঁয়ে হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দের প্রারম্ভ সময়েই সোনারগাঁয় মোসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতে থাকে এবং

সোনারগাঁ পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হয়। এই সময়েই সোনারগাঁয়ের উন্নতির একশেষ হয়। সোনারগাঁর অতি সূক্ষ্ম ও শুভ্র মসলিন-বস্ত্র সভ্যজগতের বিস্ময়ের উৎপাদন করিয়া সোনারগাঁকে সুপরিচিত করে। সোনারগাঁয়ের উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও চাউল ভারত-বর্ষের নানা স্থানের ন্যায় সিংহল, পেগু, চীন, যাবা, মলক্কস, সুমাত্রা প্রভৃতি দূরবর্ত্তী প্রদেশে এমন কি সুদূর ইউরোপে পর্য্যন্ত প্রেরিত হইত। বিদেশীয় পরিব্রাজকগণ সুদূর আরব ও ইউরোপ হইতে ভারতে উপনীত হইয়া, বহু ক্লেশ ও আয়াস সহ্য করিয়াও সোনারগাঁর সমৃদ্ধি-গৌরব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা স্পৃহনীয় বোধ করিতেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দে সমগ্র বঙ্গদেশ সোনারগাঁর আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। সোনারগাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গলা দিল্লীশ্বরের অধীনতা-পাশ ছিন্নকরতঃ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে এবং প্রায় দ্বিশতাব্দী পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতেই ঢাকার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দের শেষভাগে তথায় মোগল সম্রাটের সেনা-সন্নিবেশ সংস্থাপিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বাঙ্গলার রাজধানীতে পরিগণিত হয়। তৎকাল হইতে শতাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত ঢাকার গৌরব ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। ঢাকার শ্রীবৃদ্ধির সহিত সোনারগাঁর সৌভাগ্য অন্তর্হিত হয়। রাজধানী স্থাপনের পর হইতে ঢাকার রাজ-প্রাসাদ হইতে সমগ্র বঙ্গ-দেশ শাসিত হইত। ঢাকার সুদৃঢ় দুর্গ হইতে রণ-দুর্ম্মদ মোগল অনিকিনী বহির্গত হইয়া আসাম, বিহার, চট্টগ্রাম ও উড়িষ্যা প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করিত এবং প্রত্যন্ত প্রদেশের স্বাধীন রাজন্যবর্গকে

পরাজিত করিয়া দিল্লীশ্বরের শাসন-প্রভাব বিস্তার করিত। দিল্লীর সম্রাটের বংশধর ও প্রধান প্রধান আমীর ওমরাহগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শাসনকার্য্যে কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া ঢাকার সুবাদারী পদ লাভ করিতে পারিলে কৃতার্থম্মন্য হইতেন। দিল্লীশ্বরের প্রিয়তম পুত্র ও পৌত্রগণ ঢাকার শাসন-কর্তৃত্ব লাভ করা গৌরবজনক মনে করিতেন। ১৭১৭ খৃঃ অব্দে মুরসিদাবাদে রাজধানী নীত হওয়ার পর হইতেই ঢাকার সৌভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত হয়। এই সময়ে ঢাকায় নায়েব-নাজিমগণ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিতে থাকেন। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে পলাসীর রণাভিনয়ের পরে বঙ্গের ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটে। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে ক্লাইব নবাবদিগকে শাসন কার্য্য হইতে অপসৃত করিয়া পেন্সন প্রদান করেন। এই সময়ে ইহাদিগের নবাব উপাধি মাত্র থাকে; এই উপাধিও ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে উত্তরাধিকারী অভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর অধিকার হইলে হুজুরী ও নিজামত নামক দুই বিভাগ দ্বারা ঢাকা জেলা শাসিত হইতে থাকে। হুজুরী বিভাগের কার্য্য একজন দেওয়ান দ্বারা সম্পন্ন হইত। ইনি মুরসিদাবাদে অবস্থান করিয়া একজন ডেপুটী দ্বারা জেলার কার্য্য সম্পন্ন করাইতেন। রাজস্বসংক্রান্ত সমুদয় কার্য্যই ডেপুটীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। নিজামত বিভাগ দ্বারা ফৌজদারী ও আদালতের কার্য্য সম্পন্ন হইত। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে হুজুরী ও নিজামত এই উভয় বিভাগের তত্ত্বাবধান জন্য একজন রাজস্ব-পরিদর্শক নিযুক্ত হন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে ইহাকেই কালেক্টর উপাধি প্রদান করা হয়। ঐ সনে মহম্মদ রেজাখাঁর নিকট হইতে দেওয়ানী বিভাগের কার্য্য হস্তান্তরিত করিয়া ঢাকায় দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। কালেক্টর দেওয়ানী আদালতের সুপারি-

স্টেণ্ডেণ্ট হন। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে প্রাদেশিক মন্ত্রী-সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য নায়েব পদের সৃষ্টি হয়। মন্ত্রী-সভা দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে প্রাদেশিক মন্ত্রী-সভা উঠিয়া গিয়া কালেক্টরী ও দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে ঢাকার কালেক্টর "চিফ" নামে অভিহিত হইত।

এই সময়ে ঢাকা জেলার আয়তন ছিল ১৫৩৯৭ বর্গ মাইল। ক্রমে ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান ঢাকা কালেক্টরী হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। ১৮১১ খৃঃ অব্দে ফরিদপুর এবং ১৮১৭ খৃঃ অব্দে বাকরগঞ্জ ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা-দ্বয় ঢাকা বিভাগ হইতে পরিত্যক্ত হয় এবং ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরা জেলাকে ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে ত্রিপুরাও ঢাকা বিভাগ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ইংরেজ শাসন সময়ে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ও সিপাহী-বিদ্রোহ ব্যতীত এতদ্দেশে অন্য কোনও অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। ১৯০৫ সনে শাসন-সৌকর্য্যার্থে বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী সংস্থাপিত হয় কিন্তু সমগ্র বঙ্গ-ব্যাপী তুমুল আন্দোলনের ফলে সহৃদয় ভারত-সম্রাট ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়া বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত করিয়া দেন। ফলে ঢাকার প্রাদেশিক রাজধানী পুনরায় বিলুপ্ত হয়।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে এতদঞ্চলে যে বৌদ্ধধর্ম্ম আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার জের মিটে নাই। এই বিষয় যথা স্থানে আলোচিত হইবে। তৎকালে শত শত বৌদ্ধবিহার, চৈত্য ও সংঘারাম হইতে ভগবান অমিতাভের সাম্যসংস্থাপক নির্ব্বাণমুক্তির অমিয়বাণী প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত। আসরফপুরের তাম্রশাসন হইতে অবগত

হওয়া যায়, খড়্গবংশীয় রাজা দেবখড়্গের শাসন সময়ে আসরফপুরের অনতিদূরবর্ত্তী স্থানে "বুদ্ধমণ্ডপ" প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহারই সন্নিকটস্থিত "বিহার বিহারিকা চতুষ্টয়" একগণ্ডীভুক্ত করিয়া কুমার রাজরাজ ভট্টের আয়ুষ্কামনার্থে আচার্য্যবন্দ্যকে দশ দ্রোণাধিক নব পাটকভূমি প্রদান করা হইয়াছে। অপর শাসন ভূমি "রত্নত্রয়োদ্দেশ্যে" শালিবর্দ্দক-স্থিত আচার্য্য সংঘামিত্রের বিহারে প্রদত্ত হইয়াছে। পরমসৌগত পুরোদাস কর্ত্তৃক তাম্রফলক উৎকীর্ণ হইয়াছে।

ইদিলপুরের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন পাঠে জানা যায়, শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্র দেব পাদানুধ্যাত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান শ্রীচন্দ্র দেব কুশলী সতট পদ্মবাটি বিষয়ান্তর্গত কুমার তালকা মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী লেলিয়া গ্রাম দান করিয়াছেন।

বঙ্গ সাহিত্যে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রথিত-যশাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, বাজাসনের পার্শ্ববর্ত্তী নান্নার গ্রাম মুণ্ডিতশীর্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষুর বাসস্থান ছিল। মুণ্ডিত-মস্তক পুরুষকে এতদঞ্চলবাসী জনগণ এখনও "নাইন্নামুন্না" বা সুধুই "নাইন্না" এবং উক্ত রূপ স্ত্রীলোককে "নান্নীমুন্নী" বা সুধুই "নান্নী" বলিয়া থাকে। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে "নাণ্ডা মুণ্ডা" শব্দ অনেকস্থলেই দৃষ্ট হয়। আধুনিক চলিত ভাষায় "নাড়া মুড়া"। "নান্না" ও "নান্নী" শব্দ ঐ অপভ্রংশ "নাণ্ডা মুণ্ডা" শব্দের বিকৃতি। এই "নান্না" ও "নান্নী" হইতে নান্নার গ্রামের নামকরণ হওয়া অসম্ভব নহে। নান্নারও সুয়াপুরের সন্ধিস্থলে যে সমুদয় উচ্চ মৃৎস্তূপ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে এক সময়ে সুবৃহৎ বৌদ্ধবিহার অবস্থিত ছিল। এই বিহারের নাম ছিল 'বাজ্রাসন" বা "বজ্রাসন" বিহার। বিশাল প্রস্তর-স্তম্ভ-মালা-শোভিত যে হর্ম্ম্যরাজি একদা এই

বিহারের শোভা বর্দ্ধন করিত, এখনও মৃত্তিকা নিম্নে তাহার নিশ্চিত নিদর্শন রহিয়াছে"। এই বজ্রাসন বিহারেই পরমজ্ঞানী বৌদ্ধ মহা-তান্ত্রিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন।

মৌর্য্য-সম্রাট মহারাজ অশোক তদীয় বিপুল সাম্রাজ্য মধ্যে যে ৮৪ হাজার ধর্ম্মরাজিকা বা কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন, ধামরাই তাহারই একটি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। সপ্তদশ শতাব্দের দলিলাদিতেও ধামরাই "ধর্ম্মরাজি" বলিয়াই উল্লিখিত হইত। সুতরাং দেখা যায়, ধামরাই গ্রামের প্রাচীন নাম ধর্ম্মরাজি ই ছিল। ধর্ম্মরাজিয়া দলিলের নকল আমরা এই খণ্ডে সন্নিবেশিত করিয়াছি। ধামরাইর নিকটবর্ত্তী সম্ভার গ্রাম প্রাচীন সম্ভার প্রদেশের অতীত স্মৃতি সযত্নে রক্ষা করিতেছে।

সুয়াপুর গ্রামের একটী পাড়ার নাম ছিল "রাজার পাড়া"। এই স্থানের ভিটার নীচে ভূপ্রোথিত অট্টালিকার চিহ্ন আছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, "সুয়াপুরে শ্রীযুক্ত দেবীচরণ দাস মহাশয়দের দেড়শত বৎসরের প্রাচীন ইষ্টকালয় ভাঙ্গিয়া গেলে, উক্ত গৃহের ভিত খুড়িতে বহু নিম্নে একটী প্রাচীরের অগ্রভাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ প্রাচীর সমসূত্রে মৃত্তিকা খনন করিলেই পরিদৃষ্ট হয়, উহা একটা সুবৃহৎ পাড়ার সমুদয়টা জুড়িয়া আছে। ঐ স্থানের অনতি-দূরে "পীলখানা" ও "কোটবাড়ী" বলিয়া স্থান আছে। হিন্দু রাজত্ব সময়ে দুর্গকে "কোট" বা "গড়" বলিত। সুতরাং ঐ কোট বাড়ীতে প্রাচীনকালে কোনও দুর্গ অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। "রাজার পাড়ার" একটী পুষ্করিণী মধ্যে সম্প্রতি একটী সুবৃহৎ প্রস্তর স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে"।

মহারাজ বল্লালের বহু পূর্ব্ব হইতেই এতদ্দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের

চেষ্টা হইতেছিল। আমাদের বিবেচনায় বৌদ্ধধর্ম্মের স্থানে প্রথমতঃ শৈব মত প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিল। শিব ও বুদ্ধ উভয়েই মহাযোগী, বৌদ্ধ ও শৈব মতে প্রাণী বধ মহা পাপজনক। এজন্য সহজেই বৌদ্ধ মতের স্থলে শৈব মত পরিগৃহীত হইয়াছিল। এই সময়ে বৌদ্ধাচার্য্যগণ সাধারণ লোকদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্যই তান্ত্রিক মত প্রচলিত করিয়া ছিলেন। তন্ত্রোক্ত কোনও কোনও দেবী ভারতের বাহির হইতে ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছেন। কুব্জিকাতন্ত্র মতে তারা দেবীর পূজা ভারতের বাহির হইতেই ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রুদ্রযামলের মতে বশিষ্ঠদেব চীনে যাইয়া বুদ্ধদেবের উপদেশে তারাদেবীকে এদেশে আনয়ন করেন।

বৌদ্ধতান্ত্রিকতার চিহ্ন অদ্যাপি এই জেলার নানা স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ধামরাই, নায়ার, রঘুনাথপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বনদুর্গা পূজার প্রথা প্রচলিত আছে। বনদুর্গা বুড়াঠাকুরাণীরই নামান্তর মাত্র। বুড়াঠাকুরাণী বিক্রমপুর, পারজোয়ার, সোনারগাঁও অঞ্চলেও পূজোপচার পাইয়া থাকেন। তবে, বনদুর্গার পূজা ও বুড়াঠাকুরাণীর পূজায় একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দেবাধিষ্ঠিত প্রাচীন বটপর্কটী মূলে বনদুর্গার পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বুড়াঠাকুরাণী জনসাধারণের গৃহমধ্যে সদ্যরোপিত শেওড়া শাখা মূলে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। বুড়াঠাকুরাণীর পূজায় বলি প্রদত্ত হয় না। কিন্তু বনদুর্গা পূজায় অন্যান্য বলির সহিত শূকর বলির প্রথা এই জেলায় অনেকানেক স্থানে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। বনদুর্গা দুর্গার সন্তান। বনে জন্ম হইয়াছে বলিয়া এই নাম হইয়াছে। ধ্যানে ইনি দানবমাতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা। মাণিকগঞ্জের শিব যুগি জাতি দ্বারা পূজিত হইতেছে। যুগিগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণের পুরোহিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।

ঢাকা জেলার মধ্যে ভাওয়াল অঞ্চলেই সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। পালবংশের ধ্বংসের পরে ভাওয়ালের অন্তর্গত রাজাবাড়ী নামক স্থানে চণ্ডাল জাতীয় প্রতাপ ও প্রসন্ন নামক ভ্রাতৃদ্বয় সুন্দ উপসুন্দের ন্যায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মোগ্‌গী নাম্নী তাঁহাদের এক মহাপ্রতাপশালিনী ভগিনীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতাপ ও প্রসন্নরায়ের উৎপীড়নে ভাওয়াল জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগকে উহারা ভয়ানকরূপে নির্য্যাতন করিতেন। এতদঞ্চলে "খাইডা ডোস্কা" নামধেয় জনৈক রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার নাম নানাবিধ কিম্বদন্তীর সৃষ্টি করিয়া বেলাই বিলের সহিত একত্র গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। এতৎসম্পর্কীয় যে ভাটের গানটী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে ইনি কায়েৎ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু নাম-পর্য্যালোচনায় ইনি তিব্বত দেশীয় ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। "খাইডা ডোস্কা" কায়স্থ জাতির সহিত মিশিয়া যাইতেছিলেন, ভাট পরিচয়ে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

বিক্রমপুরে যে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাধিপত্য বিস্তৃত ছিল তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়নচঙের সমতট বর্ণনাপ্রসঙ্গে সমতট বৌদ্ধধর্ম্ম-প্লাবিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নগরের নিকটে অশোক-স্তূপ বিদ্যমান ছিল। বিক্রমপুরের ইতিহাসপ্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় সোপারঙ্গের গোসাই বাড়ীতে যে অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন, একমাত্র উহাই বিক্রমপুরের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্যের চিহ্ন বলিলে যথেষ্ট হইবে।

পীঠ সমূহের বিবরণ পাঠ করিলে অনুমিত হয় বৌদ্ধধর্ম্ম দূরীকরণ মানসেই হিন্দুগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ৫১টী স্থান ভৈরব ও শক্তি আরাধনার কেন্দ্রস্থল করেন। মহারাজ বল্লাল ভূপতি বৌদ্ধ-বিদ্বেষী

তান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিলেন। ঢাকেশ্বরী তাহারই স্থাপিত বলিয়া কথিত হয়। ঢাকেশ্বরীর মন্দিরটী পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত হইয়া অভিনব আকারে পরিণত হইলেও উহার পশ্চাদ্ভাগ প্রায় অবিকৃত রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে উহা বহু প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। এজন্যই এই মন্দিরটীর পশ্চাদ্ভাগের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

পূর্ব্ব বাঙ্গালায় মোসলমান শাসনের প্রারম্ভ কালে রামপালের সন্নিকটে জগন্নাথ বণিক নামে এক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। জগন্নাথ নানা সৎকার্য্যে ধনরাশির বিনিয়োগ করিয়াছিল। কথিত আছে, ইনি অষ্টোত্তরশত দেউল প্রতিষ্ঠা ও বহুসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বহুসংখ্যক দেউলের ভগ্নাবশেষ, ইষ্টকের স্তূপাকারে জোড়াদেউল, গানাম, সুখবাসপুর, দেওসার, সোনারঙ্গ, প্রভৃতি গ্রামে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দেউলগুলি বিপুলায়তন ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এক একটী দেউলের ভগ্নাবশেষ দ্বারা কোন কোন স্থানে ২।৩ বিঘা ভূমি, তৎচতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি অপেক্ষা ৮।৯ হাত উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছে। জোড়াদেউল গ্রামে এইরূপ দুইটী একস্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া উহা জোড়াদেউল নামে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। অধুনা এই সমুদয় দেউলের গঠনপ্রণালী ও নির্ম্মাণকৌশল জানিবার উপায় নাই। দেউলবাড়ী সমূহ খনন করিলে বহু পুরাতত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটিত হইতে পারে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

রামপালের সমৃদ্ধির সময়ে এস্থানে তাঁতী, শাখারী প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নিরূপিত ছিল। পানহাটা, (পানিহাটী), শাখারী দীঘি, পাইকপাড়া প্রভৃতি স্থান রামপাল নগরীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বল্লালচরিত পাঠে রামপালের অনতিদূরে দুর্গাবাড়ী নামক স্থানের অবস্থান অবগত হওয়া যায়। রামপালের

সন্নিকটবর্ত্তী দুর্গাবাড়ী গ্রামই যে বল্লাল চরিতোক্ত দুর্গাবাড়ী তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

মহারাজ আদিশূরানিত মুখ্য ব্রাহ্মণ-পঞ্চকের প্রথম অধ্যুষিত-স্থান বলিয়া একটী গ্রাম অদ্যাপি "পঞ্চসার" নামে খ্যাত আছে। রামপাল হইতে এই স্থান প্রায় ৩ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই স্থানে অবস্থান করিয়াই তাঁহারা আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ব্রতী হন।

ধলেশ্বরীনদী হইতে তালতলারখালে প্রবেশলাভ করিলে ফেগুনা-সারের মঠটী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই মঠ প্রায় দ্বিশতাধিক বৎসর যাবৎ ৺ শ্যামসুন্দর রায় কর্ত্তৃক তদীয় মাতৃ শ্মশানোপরি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফেগুনাসারের যে অংশে এই মঠটী অবস্থিত তাহা "শ্যাম রায়ের পাড়া" বলিয়া অভিহিত। মঠের পশ্চিমদিকস্থ দীর্ঘিকার উত্তরদিকে তদীয় প্রাচীর-বেষ্টিত দ্বিতল অট্টালিকা এবং সিংহদর-জার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। শ্যামরায় শ্রীহট্টের নবাবের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পরম ভক্তিমান ও অতিথিসেবক ছিলেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। শ্যামরায়ের মাতার প্রবর্ত্তিত চড়কপূজার গজারী গাছটী এখনও রহিয়াছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে ঐ স্থানে চড়ক পূজা ও মেলা হয়। অনতিদূরে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা এবং বিশাল বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহা লালা যশোবন্ত রায়ের বাড়ী বলিয়া কথিত হয়। লালা যশোবন্ত মহারাজা রাজবল্লভের সমসাময়িক।

বিক্রমপুরের মধ্যদিয়া যাহারা জল পথে তালতলারখাল বাহিয়া যাতায়াত করিয়াছেন, তাহারা অনেকেই দ্বিপাড়ার মঠটী সন্দর্শন করিয়াছেন। প্রায় দ্বিশত বৎসর অতীত হইল এই মঠটী স্থাপিত হইয়াছে। গত ১৮৯৭ সনের ভীষণ ভূমিকম্পে এই মঠের উর্দ্ধভাগ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান নন্দকুমার

মহারাজ রাজবল্লভের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ান নন্দকুমারের বাড়ীর উত্তরদিকে প্রকাণ্ড পরিখা এবং ঐ পরিখার সমসূত্রে পূর্ব্বপশ্চিমে দুইটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা এবং মধ্যস্থলে ইহার প্রাসাদতুল্য বাড়ী ও এই বাড়ীর দক্ষিণে অপর একটী বিশালায়তন জলাশয় বিদ্যমান আছে। দীঘি এবং ঐ পরিখার পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সিংহদরজা ছিল, এখনও ঐ সকল স্থানে সিংহদরজার ভিত্তির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এক্ষণে কেবল দুর্গামণ্ডপটী বিশালভগ্নস্তূপের মধ্যে অতীতের সাক্ষী স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উক্ত দীর্ঘিকাদ্বয়ের দক্ষিণ-পারে দেওয়ান নন্দকুমারের মাতৃশ্মশানোপরি একটী মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। নবাব মীরকাসিমের আদেশে তদীয় সেনাপতি আগাবাকর রাজনগর লুণ্ঠন করিয়া নন্দকুমারের বাড়ীও লুণ্ঠন করিয়াছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। দিপাড়ার ন্যায় দীর্ঘিকা-বহুল গ্রাম বিক্রমপুরে আর দ্বিতীয় নাই।

শ্রীনগর গ্রামে লালা কীর্ত্তিনারায়ণের অনেক কীর্ত্তিকলাপ বিদ্যমান আছে। শ্রীনগরের বর্ত্তমান জমীদারদিগের ঊর্দ্ধতম অষ্টমপুরুষ ৺ কৃষ্ণ-জীবন বসু পৈত্রিক বাসস্থান ইদিলপুর পরিত্যাগ করিয়া সপুরোহিত বেজগ্রামে আগমন করেন। বেজগাঁয়ে ৺ কৃষ্ণজীবন বসুর ভদ্রাসন অদ্যাপি "বসুর বাড়ী" বলিয়া খ্যাত। লালা কীর্ত্তিনারায়ণ কৃষ্ণজীবনের পৌত্র। কীর্ত্তিনারায়ণের সমুদয় সম্পত্তিই তদীয় কুলদেবতা অনন্তদেবের নামে ক্রীত। অনন্তদেবের বাসস্থান "বৈকুণ্ঠধাম" নামে অভিহিত হইত বলিয়া তিনি তদীয় অৰ্জ্জিত পরগণার নাম "বৈকুণ্ঠপুর" রাখিয়াছিলেন। তদবধি ইহারা বৈকুণ্ঠপুরের জমীদার বলিয়া খ্যাত। কীর্ত্তিনারায়ণের সৌভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বীয় গ্রাম "রায়েস নগরের" নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীনগর নামে উহা অভিহিত করেন। গ্রামের চতুর্দ্দিকে পরিখা এবং গ্রামের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ জলা-

শয়াদি খনন করিয়াছিলেন। এই জলাশয়গুলি মধ্যে একটী দ্বাদশ, শিবের ও অন্য একটী ৺ অনন্তদেবের নামে উৎসর্গ করিয়া ছিলেন। কীর্ত্তিনারায়ণ তদীয় বাড়ী প্রকাণ্ড ইষ্টকালয়ে পরিণত করেন। তন্মধ্যে একটী অট্টালিকা "সাহানিয়া" নামে খ্যাত। ইহার দৈর্ঘ্য ৫৭ হস্ত, প্রস্থ ৪১ হস্ত এবং উচ্চতা ২০ হস্ত হইবে। ভিতরের দেওয়ালে ও ছাদে নানাবিধ সুদৃশ্য কারুকার্য্য ছিল। এতদ্ব্যতীত "রংমহাল' ও "কমলাসন" নামে দুইটী সুরম্যহর্ম্ম্যের বিষয়ও অবগত হওয়া যায়।

তারপাশার "মহাশয় গণ" বিবিধ সাধু অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতিষ্ঠা ভাজন হইয়া সর্ব্বসাধারণের নিকটে "মহাশয়" এই সম্মান সূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাশয়গণের আবাসবাটী সুরম্য হর্ম্ম্য-রাজিতে পরিশোভিত ছিল। তাহাদিগের বাসভবন বহু খণ্ডে বিভক্ত ছিল। বাটীর চতুর্দ্দিকে এক সুপ্রশস্ত প্রাকার বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে বাটীস্থ পুরুষগণ ব্যতীত অপরের প্রবেশলাভ নিষিদ্ধ ছিল। মহাশয়গণের কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়া স্বপ্নের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছে। কালীপাড়ার পূর্ব্ব নাম ছিল কাওলীপাড়া বা কাপালিকপাড়া। বহু পূর্ব্বে ঐ স্থান কাপালিকগণের বাসস্থান ছিল বলিয়া উহা কাপালিকপাড়া নামে অভিহিত হইত। কালীপাড়ার জমিদারবংশের পূর্ব্বপুরুষ রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চাচরপাশা গ্রাম হইতে ঐ স্থানে বাস স্থাপন করিয়া উহাকে কালীপাড়া আখ্যা প্রদান করেন। এখানে জয়কালী নাম্নী এক মৃণ্ময়ী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালীপাড়া বহুদিন হইল পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

শ্যামসিদ্ধি গ্রামে একটী উচ্চ মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। বিক্রমপুরের মধ্যে অন্য কোথাও এত বড় মঠ আর নাই। এই মঠের কারুকার্য্য ও স্থাপত্যকৌশল অতি সুন্দর।
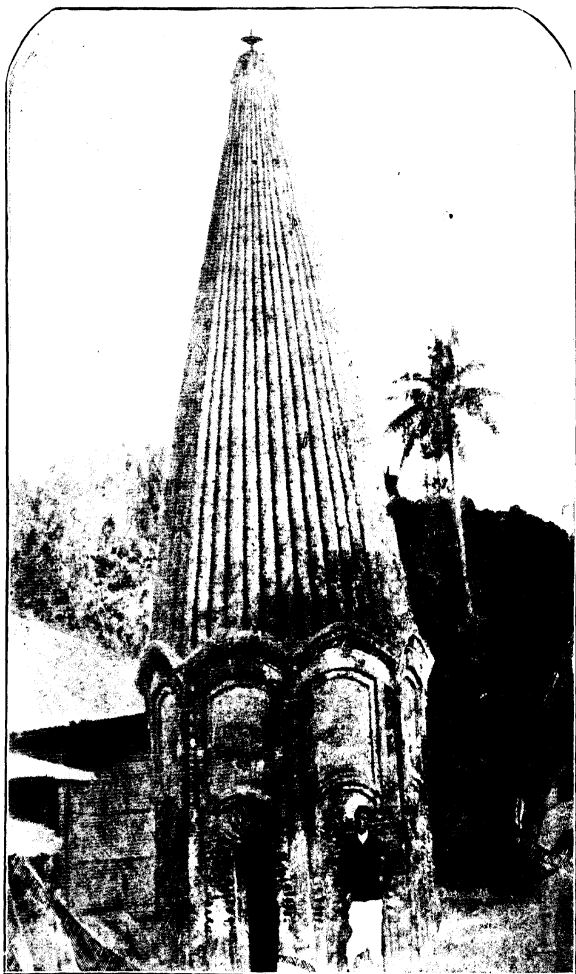
বেজগাঁয়ের সতী ঠাকুরাণীর মঠ।

আবিরপাড়ার মঠটী পঞ্চরত্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই মঠটীও অতি প্রাচীন। সাধারণ মঠ হইতে ইহার গঠনপ্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। কতিপয় বৎসর অতীত হইল প্রাকৃতিক বিপ্লবে মঠটী ভগ্ন এবং কতকাংশ মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে।

লৌহজঙ্গের পালচৌধুরীগণের নির্ম্মিত নবরত্ন ও একুশ রত্ন বিক্রমপুর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। ঐ সময়ে রাজনগর ও লৌহজঙ্গের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী বিদ্যমান ছিল; তাহা "নয়ানদী রথখলা" নামে অভিহিত হইত। পালচৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ নন্দরাম পালের রংপুরে তামাকের ব্যবসায় ছিল। তাহাতেই তিনি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। কথিত আছে, তদীয় পুত্র রামপালের নামে রংপুরে "রামচন্দ্রী" পাথর বলিয়া তামাক ওজনের একপ্রকার বাটখাড়া প্রচলিত হইয়াছিল। পালচৌধুরী-গণ যে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র, শ্রীধর চক্র ও ৺লক্ষ্মীগোবিন্দ বিগ্রহের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাহা নন্দরামপাল দৈব সংযোগে প্রাপ্ত হয়। লৌহজঙ্গের পালচৌধুরীগণের কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে।

ধাইদার মঠটীও অতি প্রাচীন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে মেজর রেণেল এই মঠের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। রেণেল এই স্থান হাটখোলা হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি ধাইদাকে দাগদিয়া বলিয়া লিখিয়াছেন।

কামারখাড়ার মঠ, চৌদ্দহাজারীর মঠ, টঙ্গীবাড়ীর মঠ, বেজগাঁয়ের সতীঠাকুরাণীর মঠ ও উল্লেখ যোগ্য।

হিঃ ১০৭২ সনের ১৮ই রবিয়লআউল মীরজুম্‌লা ঢাকা হইতে কুচবিহার অভিযানে প্রস্থান করিলে এহিতিসিম খাঁ অস্থায়ীভাবে সুবাদারের কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। মগদস্যুদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অধিকাংশ সময়ই খিজিরপুরে অবস্থান করিতেন

এজন্য বাদশাহের দেওয়ান রায় ভগবতী দাসের হস্তে রাজস্ব সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্যভার অর্পিত হয় এবং রাজকীয় জটিল বিষয়ের সুমীমাংসার ভার খাজা ভগবানদাস "সুজাইর" হস্তে ন্যস্ত ছিল। তৎকালে মহম্মদ মকিম রাজকীয় নৌবিভাগের দারোগা পদে সমাসীন ছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিস লিখিয়াছেন। এই সময়ে মহম্মদ মকিম ঢাকা নগরীতে যে একটী "কাটরা" নির্ম্মাণ করেন, তাহা অদ্যাপি "মকিমের কাটরা" নামে সুপ্রসিদ্ধ।

নবাব জাফর খাঁ (ইনি ইতিহাসে কাতরলব খাঁ ও মুরসিদকুলী খাঁ নামে প্রসিদ্ধ) ঢাকা নগরীতে একটী মসজিদ ও বাজার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত মসজিদটী জাফ্‌রী মসজীদ নামে খ্যাত। উহা ১৮২০ খৃঃ অব্দে মুর্শিদকুলীখাঁর উত্তরাধিকারী শুজনফার হুসেন খাঁর কন্যা হাজী বেগমের তত্ত্বাবধানে ছিল বলিয়া তারিখ-ই-নসরৎজঙ্গ-ই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

গড় কাশিমপুর হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থিত "জরুন" এবং "সুরাবাড়ী" নামক স্থানদ্বয়ে পালবংশীয় যশোপাল রাজার কীর্ত্তিকলাপের অনেক চিহ্ন বিদ্যমান আছে। কতিপয় বৎসর অতীত হইল জরুন গ্রামে মৃত্তিকাভ্যন্তরে একটি প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়; পরে মৃত্তিকা খনন করিলে ভূগর্ভস্থিত বহু অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ লোকলোচনের গোচরীভূত হইয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, এই স্থানে রাজা যশোপালের অন্যতর বাসভবন ছিল। সুরাবাড়ী গ্রামেও একটী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ভূগর্ভ মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত "বড়ইবাড়ী" গ্রামে যশোপালের বহু কীর্ত্তি চিহ্নাদি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থানটী তুরাগ নদীর অনতি উত্তরে সংস্থিত। একটী সমুন্নত মৃৎস্তূপের উপরে প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপের বহু নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

"জাঠালিয়া" এবং "বক্স রি" নামক স্থানদ্বয়ে ও প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহাও পালবংশীয় রাজগণের বিলুপ্তপ্রায় অতীত স্মৃতির সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে করি। "গাজীবাড়ী" গ্রাম "গাজীখালি" নদীতটে অবস্থিত। এই স্থানে যশোপালের অন্যতম আবাস স্থান ছিল। রাজবাটীর চতুর্দ্দিক সুপ্রশস্ত পরিখা বেষ্টিত। বাটীর দক্ষিণদিকে বহুদুর ব্যাপী বিল এবং অপর তিন দিকেই পরিখার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। পরিখার পার্শ্বে স্থানে স্থানে মৃৎপ্রাকারের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাজবাটীর পশ্চিমদিকস্থ পরিখা হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল পশ্চিম দিকে গাজীখালি নদী প্রবাহিত। গাজীখালির পশ্চিম তটদেশে মাধবচালা গ্রাম অবস্থিত। এই মাধবচালা গ্রামের দক্ষিণ দিকেই উপরোক্ত বিল বিস্তৃত রহিয়াছে।

বর্ত্তমান জাগীর বন্দরের কিঞ্চিৎ উত্তরাংশে ধলেশ্বরীর পশ্চিমতটসংস্থ "মেঘশিমুল" নামক স্থানে চাঁদগাজীর পিতা দেলওয়ার খাঁ নৌকাযোগে আগমন করিলে ঝড় বৃষ্টির লক্ষণ দেখিয়া একটী শিমুল গাছে তাঁহার নৌকা বন্ধন করেন। তাহাতেই ঐ স্থানের নাম "মেঘ শিমুলিয়া" হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় প্রবাদ প্রচলিত আছে। দেলওয়ার উহার নিকটে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া তথায় অবস্থান করেন। উহাকে সাধারণ লোকে রাজবাড়া বলিয়া থাকে। ধলেশ্বরীর তরঙ্গাঘাতে মেঘশিমুলিয়া ও রাজবাড়ী এই উভয় স্থানই ভগ্ন হইয়া পুনরায় নূতন চড়াতে পরিণত হইয়াছে।

মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বুতুনী একটী প্রাচীন গ্রাম। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ক্ষীরাই ও কান্তাবতী নদীর স্রোতোপ্রাবল্যে বুতুনী গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। পরে আবার বালুকাচড়ে পরিণত হয়। এই সময়ে কতিপয় ভদ্র বংশীয় মোসলমান এই স্থানে আসিয়া বাসস্থাপন

করেন। ইহাদিগের মধ্যে দানেশ খাঁ নামক একব্যক্তি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহার নামানুসারেই এই স্থান দানেস্তা নগর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অদ্যাপি বুতুনী গ্রামের দক্ষিণে গ্রামের সংলগ্ন যে একটী বড় হালট আছে উহা দানেস্তানগরের হালট বলিয়া কথিত হয়। ঐ সময়ে এখানে একটী বন্দর ছিল। মোসলমানগণ গ্রামের কেন্দ্রস্থল "সাহেবা আদম" বাগবাড়ী ও বর্ত্তমান চৌধুরী পাড়ায় বাস করিতেন। ইহাদের একটী পাকা মসজিদ ছিল, বর্ত্তমানে উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। অদ্যাপি ঐ মসজিদের ইষ্টকস্তূপ ভূগর্ভে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উহা মসজিদ ভিটী বলিয়া উক্ত হয় ঐ ভিটীতে যে একখণ্ড প্রস্তর আছে তাহা "গাজীর পাটা" বলিয়া পরিচিত। সন্নিকটে গাজীর দরগা ছিল। মৃত্তিকা খনন করিলে আজও এই স্থানে ইষ্টকরাশি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুতুনী গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটী বড় "কুম" ছিল। উহা ক্রমে ভরাট হইয়া প্রকাণ্ড গড়ে পরিণত হইয়াছে। এই গড় "ভূতের গড়" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কলাকোপা গ্রামে মহাত্মা দাতা খেলারামের বাসস্থান ছিল। খেলারামের নির্ম্মিত নবরত্ন ও দীর্ঘিকা এখনও বিদ্যমান আছে। এখানে ক্ষেপারাণীর আখড়া বলিয়া বাউল-সম্প্রদায়ের একটী আখড়া আছে। সাধুতা দ্বারা ক্ষেপারাণী বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল।

যন্ত্রাইল গ্রামে মাঘী সপ্তমীর দিন একটী মেলার অধিবেশন হয়। এখানে প্রতিবৎসর ১লা আশ্বিন তারিখে নদীগর্ভে যে নৌকায় বাইচ হইয়া থাকে তাহা দর্শন যোগ্য।

পাঠানকান্দির তারাবাড়ীর মঠ ও মসজিদ, জয় কৃষ্ণপুরের অভয়াচরণ বসুর মঠ, বাগমারার কৃষ্ণমোহন সাহার মঠ, যন্ত্রাইল জয়কৃষ্ণ ঘোষের

মঠ, নবাবগঞ্জের ব্রজসুন্দর বাবুর মঠ প্রসিদ্ধ। মামুদপুরের মঠ পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

পারজোয়ারের অন্তর্গত পূবদী গ্রামের ঝুলন প্রসিদ্ধ।

ভাওয়ালের অন্তর্গত রাজাবাড়ী নামক স্থানে, "চাড়াল রাজার" বাড়ীর অনতি দূরে অবস্থিত "মোগ্ গীর মঠ" টী প্রতাপ ও প্রসন্নের মহাপ্রতাপশালিনী সহোদরা মোগ্ গীর নাম সজীব রাখিয়াছে।

চৌরাগ্রামে গাজী বংশীয় পালোয়ান সাহ ও কায়েম সাহের সমাধি অদ্যাপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই শেষোক্ত সমাধির সন্নিকটে এখনও একটী ধ্বংসমুখে পতিত প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান আছে। মসজিদের এক মাইল পশ্চিম দিকে আর একটী প্রাচীর-বেষ্টিত সমাধি মন্দির আছে। লাক্ষ্যা নদীর সমীপবর্ত্তী বালি গাঁ নামক স্থানের সান্নিধ্যে মাতাব গাজীর পিতা বাহাদুর গাজীর নির্ম্মিত একটী সুন্দর মসজিদ বিদ্যমান ছিল। উহা ধ্বংসমুখে পতিত হওয়ায় তৎসংলগ্ন প্রস্তর ফলকখানা অতি যত্নে রক্ষিত হইতেছে।

ভাওয়ালের অন্তর্গত টেপীর বাড়ী নামক স্থানে একটী প্রাচীন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ ও প্রকাণ্ড একটী দীর্ঘিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেওয়া গ্রামে ও একটা ভগ্ন মঠ ও প্রাচীন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে।

গজারচালা নামক স্থানে অনেক ইষ্টকস্তূপ বিদ্যমান আছে, উহা এত উচ্চ যে দেখিলে একটী মঠের ন্যায় অনুমিত হয়।

সুবর্ণ গ্রামে বাস্তু ভূমির বাহুল্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পঞ্চমী ঘাটের উত্তর হইতে মহজুমপুর পর্য্যন্ত এবং মহেশ্বরদীর অনেকানেক স্থানে বাসোপযোগী পতিত বাস্তু ভূমি সমূহ দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে যে ঐ সকল স্থান পুরাকালে সমৃদ্ধিশালী বহু লোক-সমাকীর্ণ জনপদ ছিল। এই সকল পতিত স্থানের মধ্যে প্রায়ই দীঘি পুষ্করিণী

এবং মনুষ্য বসতির অন্যবিধ বহুতর চিহ্ন আজও দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের সঙ্গম স্থানের উত্তরাংশে, কোথাও কোথাও অনুচ্চ টীলা ও দৃষ্ট হয়।

সোনারগাঁয়ের অনেক স্থানে কোচদিগের খনিত দীর্ঘিকা দেখিতে পাওয়া যায়। বরাব নামক গ্রামের পূর্ব্বদিকে একটী সুবিস্তৃত জলাশয় রহিয়াছে, উহা কোচের খনিত বলিয়া কথিত।

আমিনপুর গ্রামের একটী বাড়ী "ক্রোড়ীবাড়ী" বলিয়া অভিহিত। বৈদ্যবংশীয় বলরামদাস নবাব সরকারে কোষাধ্যক্ষের কর্ম্ম করিয়া ক্রোড়ী উপাধি প্রাপ্ত হন। এ জন্য বলরামের অধ্যুষিত ভদ্রাসন "ক্রোড়ীবাড়ী" বলিয়া কথিত হয়। বলরামদাস মহারাজ বল্লালের সেনাপতি পশু দাসের অনন্তর বংশ্য।

কোর্ট অব ডিরেক্টরগণের অনুমত্যানুসারে সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর জেমস্ রেণেল গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদ প্রভৃতি নদ-নদীসমূহের জরীপ করিয়াছিলেন। উহার বিবরণ Rennell's Memoir নামক পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত পুস্তক হইতে বর্ত্তমানসময়ে বঙ্গদেশের নদনদীসমূহের প্রবাহ-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। তৎকালে ঢাকাজেলার নদনদী গুলির অবস্থান কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক। এতদুদ্দেশ্যে এস্থলে রেণেলের ডায়েরীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

বিস্তারের বিশালতা এবং স্রোতের প্রাবল্য নিবন্ধন বদরসন খালের মোহানা হইতে পদ্মানদী অতিক্রম করিতে রেণেলের ৮ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। পদ্মা পার হইয়া ঢাকায় পৌছিবার জন্য তাঁহাকে নলুয়ার খাল আশ্রয় করিতে হইয়াছিল। নলুয়া হইতে ঢাকা ২৮ মাইল উত্তর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। উক্ত খাল পথে হাটখোলা হইয়া তিনি দাগদিয়া

(ধাইদা) নামক স্থানে উপনীত হন। রেণেল ধাইদার "উচ্চ শ্বেতবর্ণ মঠ" টি সন্দর্শন করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ স্থান হইতেই তিনি মীরগঞ্জ (তালতলা) ও ইছামতী নদীতে উপনীত হন। তালতলায় পুলের নিম্ন দিয়া তাঁহার বজরা অনায়াসে বাহির হইয়া গিয়াছিল। মীরগঞ্জ হইতে ধলেশ্বরী নদী অতিক্রম করিয়া বুড়িগঙ্গার মুখে পৌছিতে তাহাকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই।

রাজাবাড়ীর ৫।৬ মাইল দক্ষিণে চণ্ডিপুর বা লড়িকুলের খাল আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। মেঘনাদ হইতে, লড়িকুল এবং রাজনগরের পথে, গঙ্গানগর বা চিকন্দীর নিকটে, পদ্মায় প্রবেশ লাভ করিবার উহাই একমাত্র সোজা পথ বলিয়া বিবেচিত হইত। চণ্ডীপুর হইতে চিকন্দী ১১ মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। পদ্মা ও মেঘনাদ এই উভয় নদী এতাদৃশ সান্নিধ্যে প্রবাহিত থাকা সত্বেও প্রায় ৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াই সম্মিলিত হইতে পারিয়াছিল। লড়িকুলের খালের জলরাশি পদ্মা হইতে মেঘনাদ অভিমুখে প্রবাহিত হইলেও মেঘনাদের উচ্ছ্বসিত স্রোতোপ্রাবল্যে চিকন্দীর খালের প্রবাহ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই; উহা বরাবর পূর্ব্ববাহিনীই ছিল। রাজাবাড়ীর সন্নিকটে, নদীগর্ভে, বহু দ্বীপ ও বালুকাময় চড়াভূমি বিদ্যমান ছিল। দ্বীপসমূহ গঠিত হওয়ায় পদ্মার আয়তন অপেক্ষাকৃত খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইলেও চণ্ডীপুরের সন্নিকটে নদীর প্রশস্ততা শীতকালেও ৭॥০ মাইল ছিল বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই চণ্ডীপুর হইতে মুলফৎগঞ্জ, লড়িকুল, জপসা, রাজনগর ও চিকন্দী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়াই তাঁহাকে গঙ্গানগরের খালে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। জপসার অভ্রভেদী মঠটী পদ্মা ও মেঘনাদ এই উভয় নদী হইতেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন।

বুড়িগঙ্গার প্রশস্ততা ২৫০ গজের অনধিক ছিল। এই নদীটিকে তিনি গঙ্গার পূর্ব্বতন শাখা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন D'Anvile ঢাকা নগরীকে গঙ্গার উত্তর তটে, জলঙ্গী নদীর মোহানা হইতে ৬৪ মাইল দূরে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তিনি বুড়িগঙ্গাকেই গঙ্গানদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন অনুমিত হয়।

সোনারগাঁয়ের ৭ মাইল দূরে মেঘনাদ তটে সংস্থিত নবাবদী গ্রামকে রেণেল নলদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "নলদী ও নরসিংদী এই উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী নদীটি সুপ্রশস্ত, খরস্রোতা এবং দ্বীপ বহুল; অনেক স্থানেই ইহার পরিসর ২৷৷৹ মাইলের উপর এই নদীর পশ্চিমতটদেশ হইতে প্রায় ১৮০ মাইল অন্তর সুলতানসিদ্ধির মঠ অবস্থিত (১)। ব্রহ্মপুত্রের এক প্রকাণ্ড শাখা নদী ১৮ মাইল দীর্ঘ এবং ৭ মাইলের অধিক প্রস্থ বিশিষ্ট একটী দ্বীপের সৃষ্টি করিয়া নরসিংদীর সন্নিকটে মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিমদিকস্থ প্রবাহই (২) চিলমারী ও গোয়ালপাড়া যাইবার সোজা পথ। নরসিংদীর অনতিদূরে আর একটি ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী মেঘনাদের সহিত সাম্মিলিত হইয়াছে। এই পয়ঃপ্রণালী দিয়া মেঘনাদ হইতে লাক্ষ্যা নদীতে অতি অল্প সময়ে যাওয়া যায়। নরসিংদীর ৮ মাইল উর্দ্ধে একটি সুবৃহৎ খাল দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই খাল আলিনিয়ার অনতিদূরে মেঘনাদে পতিত হইয়াছে।" (৩)

---

(১) সুলতান সিদ্ধির মঠ রেণেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু List of Ancient Monunents গ্রন্থে ইহার কোনও উল্লেখ নাই।

(২) রেণেল এই নদীকে ছোট ব্রহ্মপুত্র বা "পগুলা" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

(৩) Mr. Plaisted শ্রীহট্টস্থ নদনদী সমূহের জরিপ করিবার সময়ে ইহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

রেণেল দয়াগঞ্জের পুল ও নারান্দিয়ার খালের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। নারান্দিয়ার ইষ্টকনির্ম্মিত সেতু ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি দয়াগঞ্জ হইতে ডেমরা হইয়া বর্ম্মিয়ার খালে প্রবেশ করেন। বর্ম্মিয়ার খাল ব্রহ্মপুত্র হইতে নির্গত হইয়া শিমুলিয়ার নিকটে লাক্ষ্যা নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। এই খালটি অত্যন্ত কুটিলগতিতে প্রবাহিত, এবং ইহার তীরভূমি ভীষণ অরণ্যানিসঙ্কুল। বর্ম্মিয়ার ৪ মাইল উত্তর পূর্ব্ব দিকে বাইগনবাড়ী হইতে অপর একটি খাল আসিয়া উপরোক্ত খালটিতে প্রবেশলাভ করিয়াছে

ধলেশ্বরী এক্ষণে জাফরগঞ্জের ১০ মাইল দূরে যমুনা হইতে প্রবাহিত হইতেছে কিন্তু তৎকালে উহা গঙ্গার উত্তরদিকস্থ প্রবাহ হইতে বহির্গত হইয়া জাফরগঞ্জের পাদদেশ বিধৌত করিয়াই প্রবাহিত হইত এবং বহুবিধ ঝিলরাশির মধ্য দিয়া অঙ্গ মিশাইয়া ১০।১২ মাইল পথ অতিক্রম করতঃ পয়লাপুর ও সাপুরের নিকট দিয়া অগ্রসর হইয়াছিল।

রেণেল বলেন "হাজিগঞ্জের উত্তর সন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে গঙ্গার দুইটী ক্ষুদ্র শাখা নদীর সম্মিলনের ফলেই ইছামতী নদীর উদ্ভব হইয়াছে। ঠাকুরপুরের খাল ধলেশ্বরী হইতে বহির্গত হইয়া বুড়িগঙ্গা নদীতে পতিত হইয়াছে। এই খালটী বর্ষাকালেও ২॥ হস্তের অধিক গভীর নহে। এই খালটী এরূপ কুটীলগতিবিশিষ্ট ও অপ্রশস্ত যে, বৃহৎ তরণী সমূহ মোড় ঘুড়িতেও পারে না। ঠাকুরপুরের খাল বুড়িগঙ্গার গর্ভস্থিত অষ্টকোণ সমন্বিত দ্বীপের বীপরিত দিকে ও ঢাকা হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী ঠাকুরপুর গ্রামের সন্নিধ্যে, ধলেশ্বরীর সহিত বুড়িগঙ্গার সংযোগ সাধন করিয়াছে। ধলেশ্বরীর উচ্ছ্বসিত জলরাশি দ্বারাই ইহার পরিপুষ্টি হইত।"

"তুলসী খাল বা ইছামতীর পশ্চিম দিকস্থ প্রবাহটি ঠাকুরপুর গ্রামের ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ; এই খাল বাহিয়াই ঢাকা হইতে হাজিগঞ্জ

অভিমুখে যাতায়াত করিতে পারা যায়। অতি অপ্রশস্ত ও বক্রগতি সম্পন্ন হইলেও এই খালটী অত্যন্ত গভীর। ইহার দৈর্ঘ্য ৬ মাইল। ইছামতী আঁকিয়া বাঁকিয়া ধীর মন্থরগতিতে প্রবাহিত। ইছামতী হইতে দুইটী ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালীর উদ্ভব হইয়া সাপুরের কিঞ্চিৎ নিম্নে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই দুইটী খাল দিয়া কেবলমাত্র বর্ষাকালেই ডিঙ্গি নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। নবাবগঞ্জের নিকটস্থ ইছামতীর গভীরতা শীতকালে এক হস্তের অধিক নহে; কিন্তু সাবদীচড় অথবা মেগালার নিকটবর্ত্তী নদীটি গভীরতর। ঐ শাখা দুইটী গঙ্গার সান্নিধ্যে কির্দ্দপুর নামক স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে, এবং ইছামতীর প্রধান প্রবাহটি পাথর ঘাটার (১) সন্নিকটে ধলেশ্বরীর স্রোত মধ্যে বিলীন হইয়াছে।"

"সাপুরের (২) সন্নিকটে ধলেশ্বরী হইতে অপর একটী খাল উৎপন্ন হইয়া ইছামতীর সহিত ধলেশ্বরীর সংযোগ ঘটাইয়াছে। এই খাল বারমাসই নৌবাহন-যোগ্য। সাপুরের ৪৷৷০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে গাজীখালি নদীর উদ্ভব হইয়া বুড়িগঙ্গার সহিত ধলেশ্বরীর সংযোগ সাধন করিয়াছে। কুরুয়ার সন্নিকটে এই নদী আবার ধলেশ্বরী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। গাজীখালির কিঞ্চিৎ পশ্চিমে হীরা ও কমুই নদীদ্বয় ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে" (৩)।

"পয়লাপুরের ৭ মাইল উত্তর পশ্চিম দিকে, ঢাকা ও রাজসাহি বিভাগদ্বয়ের সীমান্ত স্থানে, গোয়ালপাড়া নামক স্থান অবস্থিত। এই স্থানেই আন্দিয়াদহ ও করতোয়াগঙ্গা মিলিত হইয়াছে"।

---

(১) পাথরঘাটার দুইটী মসজিদের বিষয় রেণেল উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) সাপুরের প্রাচীন মঠের বিষয় রেণেল উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) রেণেলের দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

"কান্তাবতী নদী আত্রেয়ীর সহিত মিলিত হইয়া ৫ মাইল পথ অতিক্রম করতঃ জাফরগঞ্জের সন্নিকটে বড় গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

"গ্রীষ্মকালে হাজিগঞ্জ হইতে জল পথে ঢাকায় যাতায়াত করিতে হইলে ৬৯ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। হাজিগঞ্জ হইতে মেগালার থাল বাহিয়া কির্দ্দপুরের সন্নিকটে ইছামতী নদীতে এবং তথা হইতে নবাবগঞ্জ ও চূড়ানের পথে তুলসীখাল বাহিয়া ধলেশ্বরী নদীতে প্রবেশ করিতে হয়। পরে ঠাকুরপুর ও ফতেলুর অতিক্রম করতঃ বুড়িগঙ্গা বাহিয়া ঢাকায় যাইতে হয়"। তৃতীয় অধ্যায়ে ইহাই আলোচিত হইয়াছে।

কোনও দেশের শিল্পকলার অনুশীলন কারলে দৃষ্ট হয় যে সেই শিল্পে সেই দেশের জাতীয় জীবন প্রতিফলিত হইয়াছে। ঢাকা শিল্পপ্রধান স্থান। বিভিন্ন শিল্পির একত্র সমাবেশ বঙ্গের অন্যত্র কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। হিন্দু শাসন সময়ে বিক্রমপুরের শিল্পাচার্য্যগণ একত্র বিমিশ্র বিভিন্নধাতব পদার্থের বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকটি ধাতু পৃথক করিয়া লইবার প্রণালী অবগত ছিলেন। মোগল শাসন সময়ে এই শিল্প বিক্রমপুর হইতে ঢাকার অন্যান্য স্থানেও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। অদ্যাপি উহা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

সূক্ষ্ম তাঁরের উপরে সুবর্ণ ও রৌপ্যের বিচিত্র মনোরম কারুকার্য্য করিবার এক অভিনব ও সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়া ঢাকা কামার নগরের শ্রীআনন্দহরি রায় দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এই নবাবিষ্কৃত প্রণালীটি এরূপ সহজ-সাধ্য যে, স্ত্রীলোকেও উহা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়।

সম্প্রতি বঙ্গের গবর্ণর মহানুভব শ্রীযুক্ত লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর ঢাকার স্বনামধন্য নবাব শ্রীযুক্ত খাজে সলিমুল্লা বাহাদুর জি, সি, আ , ই মহোদয়কে তদীয় দার্জ্জিলিঙ্গস্থ শৈলাবাস সুসজ্জিত করিবার মানসে

কাষ্ঠনির্ম্মিত দুইটী হস্তী তথায় প্রেরণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। গবর্ণমেণ্ট সমক্ষে ঢাকার শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিবার এই শুভ অবসর উপেক্ষা করা সহৃদয় নবাববাহাদুর সমীচীন জ্ঞান করিলেননা। অচিরে তিনি তদীয় ষ্টেটের সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতি শিল্পি নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করেন। অনুকূল বাবু ঢাকার অন্যতম শিল্পি-কুল-বরেণ্য ৺মুক্তারাম দাসের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাসকেই উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার হস্তে এই কার্য্যভার ন্যস্ত করেন। বয়সে নবীন হইলেও বিনোদের শিল্প নৈপুণ্যের খ্যাতি যথেষ্ট আছে। স্বীয় সহোদরার সাহায্যে বিনোদ তিন সপ্তাহ কাল মধ্যেই সেগুন কাষ্ঠ দ্বারা দুইটী সুবৃহৎ হস্তী নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়। হস্তী দুইটীর ওজন হইয়াছিল ৩ মণ। কাঠের মূল্য ও পারিশ্রমিক বাবদে ২৫০৲ টাকা বিনোদের প্রাপ্য হইয়াছে। হস্তী দুইটীর নির্ম্মাণ কৌশল এরূপ চমৎকার যে, উহা জীবিত বলিয়াই ভ্রম হয়। স্বয়ং গবর্ণর বাহাদুর ও নির্ম্মাতার শিল্পচাতুর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

এস্থলে সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত ভাটপাড়া নিবাসী অপর একটী রমণী-রত্নের বিষয় উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি। ইহার নাম শ্রীযুক্তা অক্ষয়কুমারী দেবী। ইনি কাগজের উপরে বহুবিধ শিল্পবিন্যাস করিতে সমর্থ। ইহার নির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্যাদি চিকাগো প্রদর্শনীতে প্রেরিত হইলে, তথাকার শিল্পাচার্য্যগণ এই বর্ষিয়সী মহিলার গুণপনার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন।

কতিপয় বৎসর অতীত হইল ঢাকার স্বর্গীয় নবাব বাহাদুরের অনুজ্ঞা ক্রমে "হুসনী দালান,"—"তাজমহল,"—"আসান মঞ্জিল"—প্রভৃতি সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি সুবর্ণ ও রৌপ্যের সূক্ষ্ম তার দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া আনন্দহরি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। আনন্দ-

হরির পিতা ৺লক্ষ্মণ রায়ই কাগজের পুতুল দ্বারা ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ জন্মাষ্ট-মীর বড় চৌকী সজ্জিত করিতে প্রথম আরম্ভ করেন। তৎপূর্ব্বে অপর কেহ এই অভিনব প্রথা অবলম্বন করে নাই। সুবর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্যে ঢাকা কামারনগরের ৺রাজবল্লভ রায় ও জরিয়াটুলীর গোবিন্দ কর্ম্ম-কার যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ঢাকার সুখলাল, চুনীলাল, পুরুষোত্তম ও মুন্নালাল প্রভৃতি শিল্পিগণ সেতার নির্ম্মাণ কার্য্যে সুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যেই বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাদের প্রস্তুত সেতার ও এস্রাজ ভারতের নানাস্থানে সাদরে নীত হইয়া থাকে।

উদ্দীপনা না পাইলে সুপ্ত উদ্ভাবনী শক্তি জাতীয় জীবনে পরিস্ফুট হইতে পারে না। সুধু যন্ত্রাদির উদ্ভাবনও সকল সময়ে ঈপ্সীত ফল প্রদানে অসমর্থ হইয়া থাকে। প্রচুর অর্থ শক্তির সাহায্যেই সকল দেশে শিল্পকলার উন্নতি সাধিত হইতেছে। রাজশক্তির বিশেষ আনুকূল্য ঘটিলে ঢাকার বিলুপ্ত শিল্পবাণিজ্যের পুনরভ্যুদয় এখনও সম্ভবপর হইতে পারে। আমাদের সহৃদয় রাজপুরুষগণ দেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে অধুনা যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হইতেছে।

ঢাকার ইতিহাস ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ভৌগোলিক বিবরণ, ভূতত্ত্ব, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও বন্দর, জমি ও জমা, প্রাচীন কীর্ত্তি, তীর্থস্থান ও পুণ্যস্থান, দেবালয় এবং ঐতিহাসিক স্থান প্রভৃতির বিবরণ প্রথম খণ্ডে লিখিত হইল। দ্বিতীয় খণ্ড হইতেই প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দু শাসন কাল হইতে বার-ভূঞার আমল পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় খণ্ডে মোগল ও ইংরেজ শাসন কালের ইতিহাস লিখিত হইবে। চতুর্থ খণ্ডে বিভিন্ন পরগণার বিবরণ, পল্লি বিবরণ এবং জমিদারদিগের বিষয় আলোচনা করিব।

পদে পদে স্বীয় অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়াও এতদুদ্দেশ্যে আমি

বহুকাল যাবৎ ঢাকার নানা স্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক ঐতিহ্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া আসিতেছি। ভূতপূর্ব্ব সুধা-সম্পাদক কবিবর শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, তোষিণী-সম্পাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র শাস্ত্রী, ঢাকাপ্রকাশের ভূতপূর্ব্ব সহ-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, স্বদেশ-প্রাণ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত এবং শ্রীমান দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ বন্ধুবর্গ ঢাকার একখানা ইতিহাস প্রণয়ন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। এই বিরাট ব্যাপারের গুরুত্ব অনুভব করিয়া আমি কিন্তু প্রথমতঃ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হই নাই; কিন্তু তাঁহাদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয় ঔৎসুক্য আমি কোনও মতে প্রত্যাখ্যান করিতে সক্ষম হইলাম না। ফলে ১৩০৮ সনের পৌষের ভারতীতে সর্ব্বপ্রথমে "ঢাকাও ঢাকেশ্বরী" প্রবন্ধের অবতারণা করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি। ঐ প্রবন্ধ দেখিয়া ঢাকার রেজিষ্ট্রেসন বিভাগের সুযোগ্য ইন্‌স্‌পেক্টর খান বাহাদুর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আওলাদ হোসেন এবং বঙ্গের অদ্বিতীয় চিন্তাশীল লেখক সাহিত্যাচার্য্য স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর সি, আই, ই প্রভৃতি মহোদয়গণ আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেন। পরে, ১৩০৯ সনে সুধা পত্রিকায় "ঢাকার প্রাচীন কাহিনী" শীর্ষক কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সমালোচনা ক্ষেত্রে "সাহিত্য," "ঢাকা গেজেট", "ইষ্ট", "ঢাকা প্রকাশ" প্রভৃতি পত্রিকায় ঐ সন্দর্ভগুলির সমালোচনা আমার নিকটে নিতান্ত উৎসাহের কারণ হইয়াছিল। ঢাকার ইতিহাস সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রবন্ধ "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন," "প্রতিভা" "জাহ্নবী," "সুপ্রভাত" "বিশ্ববার্ত্তা" প্রভৃতি পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। "ঢাকা প্রকাশ," "ঢাকা গেজেট," "শিক্ষা সমাচার" প্রভৃতি সাপ্তাহিক কাগজে কোনও কোনও প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া সম্পাদকগণ আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

পিতৃ বিয়োগের ফলে সংসারের গুরু ভার ভীষণ অশনি পাতের ন্যায় আমার মস্তকে পতিত হয়। কিয়ৎকাল পরে মাতৃপ্রতিম ধাত্রী মাতার বিয়োগ এবং পরম স্নেহশীল জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের পরলোক গমন এই দুইটী বিপৎ পাতে আমার হৃদয়-তন্ত্রী একেবারে ছিন্ন হইয়া যায়। এই সময়ে দারিদ্র্যের ভীষণ পীড়নে একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া সাহিত্য চর্চ্চায় একেবারে জলাঞ্জলী দিতে হয়। ইহার অব্যবহিত পরে বিক্রম-পুরের ইতিহাস-প্রণেতা সুলেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও আমার সোদর-প্রতিম প্রিয়সুহৃৎ শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার মহাশয়ের সহিত কলিকাতায় পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। ইহারা উভয়েই এই বিষয়ে পুনরায় হস্তক্ষেপ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকেন। তাঁহাদের সাদর আহ্বান আমি আর উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। সুতরাং ১৩১৭ সনের অগ্রহায়ণ মাস হইতেই আমার দশবর্ষ-ব্যাপি আরাধনার ফল পুস্তকাকারে একত্র গ্রথিত করিবার জন্য সচেষ্ট হই। এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের প্রবীণ ঐতিহাসিক আমার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের দৃষ্টান্ত আমার নিকটে তাড়িতবৎ কার্য্যকরী হইয়াছিল। বিবিধ বিপৎপাতের মধ্যেও জরাজীর্ণ দেহ লইয়া খুল্লতাত মহাশয় যেরূপ বিপুল উদ্যমে তদীয় "বারভূঞা" ও "ফরিদপুরের ইতিহাস" প্রণয়ন করিতেছিলেন, তাহা বাস্তবিকই যুবকেরও অনুকরণীয়। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে সাহিত্য চর্চ্চায় উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ প্রণয়ন কালে আমি তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। তিনি প্রায়ই বলিয়া থাকেন, "তুমি যেরূপ বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, তাহাতে উহা সম্পন্ন হইবার সময় পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবার প্রত্যাশা করি না; তবে অন্ততঃ উহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে,

দেখিয়া যাইতে পারিলেও অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারিব।" ভগবানের কৃপায় এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদে আজ তাঁহার স্নেহ-বারিসিঞ্চিত তরুর প্রথম স্তবকটি যে লোক লোচনের গোচরীভূত করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই আমার পরিশ্রমের সর্ব্বপ্রধান পুরস্কার বলিয়া মনে করি।

অন্নের সংস্থান জন্য চিরজীবন দাসত্ব করিয়া ইতিহাসের বন্ধুর পথে অগ্রসর হওয়া ত দূরের কথা, অবসর মতে সাহিত্য চর্চ্চায় মনোনিবেশ করাও যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু এই বিষয়ে আমি নিজকে কতকটা সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করি। বিক্রমপুর পশ্চিমপাড়া নিবাসী কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, দেবোপম-চরিত্র শ্রীযুক্ত বি, এম, চাটার্জ্জি মহোদয়ের আশ্রয়ে একটি বড় ষ্টেটের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াও ইতিহাস আলোচনার অনেকটা অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং তাঁহার প্রকাণ্ড পুস্তকাগার হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহার করিতে পাইয়াছি। বস্তুতঃ এই মহাত্মার অমায়িক ব্যবহার, উৎসাহ, এবং সাহায্য প্রাপ্তি না ঘটিলে আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে কথনও সক্ষম হইতাম কিনা সন্দেহ। ইহার স্নেহঋণ আমার পক্ষে অপরিশোধনীয়।

১৮০২ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনুমত্যানুসারে আপীল আদালত ও সার্কুট জজগণ কর্ত্তৃক এই জেলার প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহ সংগ্রহের চেষ্টা হইলে "East Indian Affair" নামক গ্রন্থে উক্ত জজদিগেররিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পরে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে কতিপয় ইংরেজ-বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে ঢাকার তদানীন্তন নায়েব নাজিম নবাব নসরৎজঙ্গ বাহাদুর পারস্য ভাষায় "তারিখ-ই-নসরৎজঙ্গ-ই" নামক গ্রন্থ রচনা করেন নসরৎজঙ্গের মৃত্যুর পরে তদীয় আরজবেগির পুত্র সৈয়দ আবদুল গণি

ওয়রফে হাম্মিদ মীর কর্ত্তৃক ১৮৪৩ খৃঃ অব্দের ঘটনাবলি ও তাহাতে সন্নিবেশিত হয়। এই গ্রন্থ ১৯০৭ খৃঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮২০ খৃঃ অব্দে Sir Charles D 'Oyles 'Antiquities of Dacca" নামে কতিপয় চিত্র সম্বলিত একখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে ডাক্তার টেইলারের "টপোগ্রাফি অব ঢাকা" নামক অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। উক্ত উভয় গ্রন্থই এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ঢাকার তদানীন্তন এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মি ক্লে "ঢাকার বিবরণী" প্রকাশ করেন। Hunter's Statistical Account of Bengal গ্রন্থের ৫ম ভলুমে ঢাকা বিভাগের বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ডাঃ ওয়াইজ, মিঃ ব্লকম্যান প্রভৃতি মনস্বীগণও এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণেলে অনেক সারগর্ভ নিবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। Notes on the Antiquities of Dacca, "Echoes from Old Dacca" Some Reminiscences of Old Dacca, Romance of an Eastern Capital, "তারিখ-ই-ঢাকা," Mr. Brenand's Report, Mr A. C. Sen's Report on the Agricultural Resources of Dacca District, History of the Cotton Manufacture of Dacca District, প্রভৃতি পুস্তকাদি প্রকাশিত হওয়ায় এই জেলার ইতিহাস চর্চ্চার পথ অনেকটা সুগম হইয়াছে।

১২৭৬ সনে পশ্চিম পাড়া নিবাসী স্বর্গীয় নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "ঢাকা জেলার ভূগোল ও ইতিহাস" নামে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৩১৬ সনে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় "ঢাকার বিবরণ" লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত পাচদোনা নিবাসী স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহোদয় কর্ত্তৃক ঢাকার প্রাচীন কাহিনী শীর্ষক কতিপয় সারগর্ভ প্রবন্ধ নব্য ভারতে প্রকাশিত হয়।

উপরোক্ত গ্রন্থকার ও লেখক দিগের নিকটে আমি ঋণ পাশে আবদ্ধ আছি। এতদ্ব্যতীত, ৺ অম্বিকাচরণ ঘোষ প্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাস" শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত "সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস," শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাস;" এবং "ভাওয়ালের বিবরণী" ও "মসনদ আলি ইতিহাস" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। পাটনা কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিভুক্ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, মহোদয় বিলাতের বোড-লিয়ান লাইব্রেরী হইতে ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিস কৃত "ফাতইয়া-ই-ইব্রিইয়া" নামক পারসী গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া উহার অনুবাদকার্য্য সমাধা করিয়াছেন। উক্ত অনুবাদের পাণ্ডুলিপি বন্ধুবর আমাকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে দেওয়ায় সায়েস্তাখাঁ ও মীরজুম্‌লার শাসন সময়ের অনেক অভিনব তথ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। এজন্য তাঁহার নিকটে আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। অন্যান্য যে যে গ্রন্থ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা যথা স্থানে এই গ্রন্থের পাদটীকায় উল্লেখ করিয়াছি।

আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান মনোরঞ্জন গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাশগুপ্ত, আমার সতীর্থ শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন, ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই পুস্তকের জন্য আলোক চিত্রাদি তুলিয়া দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন।

অপর পরমাত্মীয় শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, এই গ্রন্থের প্রায় আদ্যোপান্ত প্রুফ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; বলা বাহুল্য তাহার এবম্বিধ সাহায্য না পাইলে গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরও অনেক বিলম্ব ঘটিত।

মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইলে বালিয়াদির সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত কাজিম উদ্দিন সিদ্দিকী চৌধুরী, খান বাহাদুর শ্রীযুক্ত সৈয়দআওলাদ হোসেন, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুম-

দার প্রভৃতি মহাশয়গণ আমাকে অর্থ সাহায্য না করিলে এই গ্রন্থ লোক লোচনের গোচরীভূত করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। এই দীন লেখক উপরোক্ত মহাত্মা গণের নিকটে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিল। কমলা প্রেসের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত সেন মহাশয় এই গ্রন্থের উৎকর্ষতা সাধন বিষয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন।

এই পুস্তকের জন্য হেরেল্ড পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয় ৩ খানা, বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ৩ খানা, ঢাকারিভিউ ও সম্মিলনের অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম, এ, মহাশয় ১ খানা এবং প্রতিভা সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি, এল মহাশয় ১ খানা ব্লক আমাকে প্রদান করিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ, শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত তরণী-কান্ত সরস্বতী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রবিনোদ পাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাজমোহন সর-কার, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল বসু, শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরিহর আচার্য্য, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত পীযুষকিরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র রায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত রাধারমন ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল চন্দ, শ্রীযুক্ত তারকনাথ রায়, শ্রীযুক্ত আবদুল সামাদ, শ্রীযুক্ত আনিছ-উদ্দিন আহম্মদ, শ্রীযুক্ত সৈয়দএমদাদ আলী, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস, শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমলেন্দু

গুপ্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ বিবরণ সংগ্রহ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন সময়ে সুলেখক শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় এবং শ্রীযুক্ত মেঘনাথ সাহা প্রভৃতি মহাশয়গণ সাভার ও ভাওয়াল সম্বন্ধে কতিপয় প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। বলাবাহুল্য যে, তাহাদিগের লিখিত প্রবন্ধাদি হইতেও বিস্তর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আসরফপুর তাম্রশাসন সম্বন্ধে আমার সতীর্থ স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর এম, এ, মহাশয়ের পাঠ অনুসরণ করিয়াছি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম, এ, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম এ, ও শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম, এ, বি, এল প্রভৃতি মহোদয়গণের লিখিত প্রবন্ধাদি হইতে বেলাব লিপি অনুবাদ করিবার সময়ে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে এরূপ বিরাট ব্যাপার আমার ন্যায় অকৃতি লেখকের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব। কাজেই গ্রন্থ মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটী বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইবে। মুদ্রাকর প্রমাদ ও অনেক রহিয়া গেল। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ মধ্যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কেহ কোনও ভ্রম প্রদর্শন করিয়া দিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

এই গ্রন্থ ঢাকা সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাবলিভূক্ত করা হইল। ইতি।

'তপস', ছয় হাবেলী
উত্তরায়ণ সংক্রান্তি,
১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।

সূচী-পত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

প্রাচীন কীর্ত্তি ৩২৭—৩৬৬

লালবাগের কেল্লা ও বিবিপরির সমাধি; হাম্মাম ও দেওয়ানী-আম; ছোটকাটরা ও বিবি চম্পার সমাধি; চকমসজিদ; ঢাকার প্রাচীন দুর্গ ও নবাবীপ্রাসাদ; বড়কাটরা; লাডুবিবির প্রকোষ্ঠ; বেগম বাজারের মসজিদ; লালবাগ মসজিদ; সাতগুম্বজ মসজিদ; নারিন্দা বিনট বিবির মসজিদ; গির্দ্ধকেল্লার মসজিদ; পুস্তাপ্রাসাদ; নিমতলার কুঠী, বারদুয়ারি নৌবৎখানা; খানমৃধার মসজিদ; কাটরা পাকুরতলীর প্রাসাদ ও নৌবৎখানা; হাজি সাহাবাজের মসজিদ; চুড়িহাট্টার মসজিদ; গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের সমাধি; মগড়াপাড়ার নহবৎখানা ও তহবিল; গোয়ালদীর প্রাচীন মসজীদ; বাড়ীমখলস, বল্লালের প্রস্তরময় রথ; লস্করদীঘির শিবমন্দির; রাজাবাড়ীরমঠ; আদমসাহিদ মসজিদ; পাথরঘাটার মসজিদ; শ্রীনগরের বুরুজ; দুরদুরিয়ার দুর্গ; ইদ্রাকপুরের কেল্লা; আব্দুলাপুরেরপুল; তালতলারপুল; পানাম দুলালপুরের পুল; টঙ্গীরপুল; পাগলারপুল; চাপাতলীরপুল, প্রভৃতি।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

প্রসিদ্ধ দেবতা, দেবালয়, পুণ্যস্থান; দেবাধিষ্ঠিত স্থান; ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতি ৩৬৭—৪৩৮

ঢাকেশ্বরী; সিদ্ধেশ্বরী ও মালীবাগের আখরা; বুড়াশিব; নবাবপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ; বলরাম; মদনমোহন; রাজাবাবুর লক্ষ্মীনারায়ণ; ঠাঁঠারী বাজারের জয়কালী; মাধব চালার সিদ্ধিশক্তি; মিতারার দশভুজা; নান্নারের বনদুর্গা; ধামরাইর যশোমাধব; ধামরাইর আত্মাশক্তি; ধামরাইর বলদেব ও কানাই; ধামরাইর রাধানাথ; ধামরাইর বনদুর্গা;

ধামরাইর মদনোৎসব ; ধামরাইর বাসুদেব ; শিববাড়ীর অচল শিবলিঙ্গ ; খাবাসপুরের নিমাইচাঁদ ; বুতুনীর গোবিন্দ রায় ; বিরলিয়ার মা যশাই ; রঘুনাথপুরের বনদুর্গা ; রঘুনাথপুরের শ্মশানকালী ; কোণ্ডার মহাপ্রভুর আখড়া ও কালীবাড়ী ; শিকারী পাড়ার কালী ও গোপাল বিগ্রহ ; গোবিন্দপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ ; গোবিন্দপুরের রাজরাজেশ্বর ও রাধাবল্লভ ; কলাকোপার লক্ষ্মীনারায়ণ ; বর্দ্ধনপাড়ার রসরাজ বাউলের আখড়া ; কলাকোপার বলাই বাউলের আখড়া ; বাসতারার লক্ষ্মীনারায়ণ ; নান্নারের রক্ষাকালী ; পরশুরামতলা ; কথুনাথের দেবালয় ; চিনিশপুরের কালী ; বাবালোকনাথের আশ্রম ; চাচুর তলার কালীবাড়ী ; পাটাভোগের হরি বাড়ী ; হলদিয়ার কালী ; হাইরা মুন্সার কালী ; কলমার জয়কালী ; শ্রীনগরের ৺অনন্তদেব ; কোমরপুর বা ভাওয়ারের কালী ও দুর্গা ; পাইকপাড়ার বাসুদেব ; সেরাজবাদের সুধারামের আখড়া, তালতলার শিবলিঙ্গ ও আনন্দময়ী ; হুসনী দালান ; ইদগা ; কদমরসুল ; পাচপীরের দরগা ; পাগলা সাহেবের দরগা ; মহজুমপুরের মসজিদ ; পীর খন্দকার মহম্মদ ইউসুফের দরগা ; দমদমা দুর্গ ; সাহ আবদুল আলা বা পোক্বাই দেওয়ানের সমাধি ; পারিলের দরগা ; ধামরাইর পাচপীর ; কোণ্ডা খন্দকারের দরগা ; বাস্তার মাদারী ফকিরের আস্তানা ; মীরপুরের সা আলি সাহেবের দরগা ; আজিমপুরার মসজিদ ; হাসারার দরগা ; নানক-পান্থী মঠ ; আরমানি গির্জ্জা ; গ্রীক গির্জ্জা ; তেজগাঁর গির্জ্জা প্রভৃতি।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ঐতিহাসিক স্থান ৪৪০—৫২৫

আবদুল্লাপুর ; আস্তিবল ; আদমপুর ; আমিনপুর ; আড়াই হাজার ; ইদ্রাকপুর ; উদ্ধবগঞ্জ ; এগারসিন্দু ; একডালা ; কর্ত্তাভূ বা

কত্রাপুর ; কাজিকসবা ; কেদারপুর ; কোহিস্তান-ই-ঢাকা ও বিলায়তে ঢাকা ; কোণ্ডর সুন্দর ; খিজিরপুর ; গণকপাড়া ; গৌরীপাড়া ; গোয়ালপাড়া ; জাঙ্গালীয়া ; জিঞ্জিরা ; চৌরা ; ঠাকুর তলা ; ডবাক ; ডাকুরাই ; ডেমরা ; ঢাকা ; ত্রিবেনী ; তেজগাঁও ; তোটক (টোক) বা তুগমা ; দলৈর বাগ ; দিঘলীর ছিট , দুরদুরিয়া ; দেওয়ান বাগ ; ধাপা ; ধামরাই ; ধীরাশ্রম ; নলথীহাট ; নপাড়া ; নাগরী ; নাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাট ; নাজিরপুর ; ফতুল্লা ; ফতেজঙ্গপুর ; ফিরিঙ্গি বাজার ; বক্তারপুর ; বজ্রপুর ; বজ্রযোগিনী ; বন্দর ; বর্ম্মিয়া ; বাজাসন ; বেঙ্গালা ; ভাটি ; মগবাজার ; মগড়াপার ; মণিপুর ; মধ্যাদি ; মালখানগর ; মাছিমাবাদ ; মোয়াজ্জমাবাদ ; যাত্রাপুর ; রঘুরামপুর ; রণভাওয়াল ; রাজাবাড়ী ; রাণীঝি ; রামপাল ; রাজনগর , লক্ষ্মণখোলা ; লড়িকুল ; শৈলাট ; শাইট হালিয়া ; শ্রীপুর ; সমতট ; সাভার।

পরিশিষ্ট (ক)

পরিশিষ্ট (খ)

পরিশিষ্ট (গ)

ম্যাপ ও চিত্র সূচী।

ম্যাপ।

চিত্র।

ঢাকা জেলা
শ্রীযতীন্দ্র মোহন রায় প্রণীত
ঢাকার ইতিহাসের জন্য
শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত
স্কেল ১ ইঞ্চ — ৮ মাইল
ঢাকা
নারায়ণগঞ্জ
মানিকগঞ্জ
সাভার
শ্রীপুর
টঙ্গী
মীরপুর
পিয়ালো আরিচা
জিঞ্জিরা
রাজেন্দ্রপুর
কাপাসিয়া

অবস্থান— ঢাকাজেলা উত্তর নিরক্ষ ২৩°-১৪′ ও ২৪°-২০′ কলার মধ্যে এবং পূর্ব্বদ্রাঘিমা ৮৯°-৪৫′ ও ৯০°-৫৯′ কলার মধ্যে অবস্থিত। ঢাকা সহর উত্তর নিরক্ষ ২৩°-৪৩′-২০″ এবং পূর্ব্বদ্রাঘিমা ৯০°-২৬′-১০″ মধ্যে, ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থান হইতে '৮ মাইল উত্তরে এবং কলিকাতা হইতে ১৮৭ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

প্রাকৃতিক বিভাগ— ঢাকাজেলা সাধারণতঃ তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে বিভক্ত। ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদী উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া এই জেলাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। জেলার উত্তরাংশ পুনরায় লাক্ষ্যা নদী দ্বারা পশ্চিম এবং পূর্ব্ব এই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মেঘনাদ ও লাক্ষ্যা নদ নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান পূর্ব্ব ঢাকা; লাক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান পশ্চিম ঢাকা; এবং ধলেশ্বরী ও পদ্মা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান দক্ষিণ ঢাকা বলিয়া চিহ্নিত করা যাইতে পারে।

* **প্রাকৃতিক বিবরণ**—পশ্চিম ঢাকার অধিকাংশ স্থানই উচ্চ। রক্তিমাভ কঙ্করপরিপূর্ণ মৃত্তিকাই ইহার বিশেষত্ব। ঢাকানগরী হইতে মধুপুর পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭০ মাইল ও পশ্চিমে চামতারা হইতে পূর্ব্বে নান্দিনা পর্য্যন্ত প্রায় ৩০ মাইল প্রশস্ত ভূভাগ পশ্চিম ঢাকার অন্তর্গত। এই ভূভাগের স্থানে স্থানে অসংখ্য গণ্ডশৈলমালা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উহাদের উচ্চতা ২০ হইতে ৫০ ফিট পর্য্যন্ত হইবে। এই বিভাগের পশ্চিম এবং পশ্চিমোত্তর দিকেই এই গণ্ডশৈলসমূহের সংখ্যা ও উচ্চতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে নাতিক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণীতে

---

* Vide Clay's Report, Taylor's Topography of Dacca and Mr. A. C. Sen's Report.

পরিণত হইয়াছে। এই স্থানের মৃত্তিকার সহিত প্রচুর পরিমাণে লৌহের সংমিশ্রণ আছে। পার্ব্বত্য প্রদেশস্থ ভূখণ্ডের ন্যায় এই স্থানের নদীগুলির আয়তনও ক্ষুদ্র। সুতরাং অধিকাংশ ভূমিই অনুর্ব্বর। ফলে এতদঞ্চল গভীর অরণ্যানি-সঙ্কুল হইয়া নানাবিধ শ্বাপদ জন্তুর ক্রীড়া-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বঢাকার অধিকাংশ স্থানই জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইয়া যায়। এই ভূভাগের উত্তরাংশের, প্রধানতঃ, মেঘনাদ নদের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের মৃত্তিকা অতিশয় রক্তবর্ণ। পশ্চিমঢাকা হইতে এই স্থানের ভূমি অধিকতর উর্ব্বরা; সুতরাং অধিকাংশ স্থানেই কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। দক্ষিণ ঢাকার স্থান সমূহই এই জেলার মধ্যে উর্ব্বরতম। বর্ষার প্লাবনে পলিমাটী পড়িয়া মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। উত্তর ভূভাগস্থ পললময় মৃত্তিকাতে বালুকা এবং অভ্রের সংমিশ্রণ জন্য ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের চরামাটি পদ্মার চরামাটি অপেক্ষা লঘুতর ও শুষ্ক। বানার ও বংশী নদীর জলে চূণ মিশ্রিত আছে; কিন্তু চূণের অংশ পদ্মার সলিলরাশি মধ্যেই অধিকতর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উত্তর ভূভাগের মৃত্তিকায় লৌহের অংশ বেশী। কিন্তু দক্ষিণঢাকার মৃত্তিকামধ্যে চূণের পরিমাণ অধিক মাত্রায় বিদ্যমান থাকায় ব্রহ্মপুত্রের সলিল অপেক্ষা পদ্মার সলিল ঘোলা। দক্ষিণভূভাগস্থ কোন কোন স্থানের মৃত্তিকাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রণ থাকাতে উহা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ও কঠিন। এরূপ কৃষ্ণবর্ণ যে, উহা চূর্ণীকৃত করিয়া মসীর উপাদান স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে বলিয়া লিখিতে টেইলার সাহেব দ্বিধা বোধ করেন নাই।

প্রায় পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে সমুদয় বঙ্গদেশ সমুদ্র গর্ভে নিহিত ছিল বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া থাকেন। গঙ্গার ‘ব’দ্বীপে অদ্যাপি যে প্রণালীতে চর উদ্ভূত হইতেছে, পূর্ব্বেও সেই প্রকারেই এই

সমুদয় স্থান গঠিত হইয়াছে (১)। ভূমিকম্প নিবন্ধন গাঙ্গের 'ব'দ্বীপ জলগর্ভ হইতে প্রথম উত্থিত হয় বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করেন (২)।

সাধারণ বিভাগ— ঢাকা জেলাকে সাধারণতঃ প্রধান পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা :—(১) ভাওয়াল ; (২) সুবর্ণগ্রাম (সোনার গাঁও) ও মহেশ্বরদী ; (৩) বিক্রমপুর ; (৪) বাজু বা চন্দ্রপ্রতাপ, সুলতানপ্রতাপ ও সেলিমপ্রতাপ ; (৫) পারজোয়ার।

(১) ভাওয়াল—উত্তর সীমা ময়মনসিংহ জেলা (কাওরাইদের নদী); পূর্ব্বসীমা লাক্ষ্যা নদী, মহেশ্বরদী ও সোনারগাঁও; দক্ষিণ সীমা বুড়িগঙ্গা নদী; পশ্চিম সীমা তুরাগ নদী ও চন্দ্রপ্রতাপ। এই বিভাগের কোনও কোনও স্থান তুরাগ নদীর পশ্চিম ও পূর্ব্ব পারে অবস্থিত ; কিন্তু নৈসর্গিক বিভাগানুসারে ঐ সকল স্থান চন্দ্রপ্রতাপ ও সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। এই বিভাগের দক্ষিণাংশে ঢাকানগরী সংস্থাপিত।

মৃত্তিকার স্তর ও অন্যান্য নৈসর্গিক অবস্থা দৃষ্টে ভাওয়াল অতিশয় প্রাচীন স্থান বলিয়া অনুমিত হয়। ভাওয়ালের গভীর অরণ্যানী মধ্যে অনেক স্থানে প্রাচীন ভগ্নবাটিকা ও দীর্ঘিকা নয়ন গোচর হয়। ইহাতে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে এক সময়ে এই স্থান বহু সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিশোভিত ছিল। মৌর্য্য সম্রাট অশোকের সমসাময়িক কীর্ত্তির নিদর্শনও এখানে বর্ত্তমান আছে। এতৎসম্বন্ধে ২য় খণ্ডে বিস্তারিত আলোচিত হইবে।

---

(১) See Lyall's Principles of Geology Vol. 1.

(২) ললাটানলদাহেন বিলীনং হি জলং বহু।
স্থলীভূতা চ পৃথিবী শৈবানাং সুখকারিকা। ব্রহ্মখণ্ড—১২।৩

প্রবাদ আছে, কুরুক্ষেত্র সমরে ভদ্রপাল বা ভবপাল প্রদেশের রাজা, কুরুকুলপতি দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক ভীষণ রণরঙ্গে মত্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভাওয়ালকেই অনেকে ভদ্রপাল বা ভবপাল রাজ্য বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। ৺রামকমল সেন বিরচিত অভিধানের ভূমিকায় এই স্থানে মহাভারতোক্ত ভগদত্তের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া লিখিত আছে। তাঁহার মতে "ভগালয়" হইতেই ভাওয়াল নামের উৎপত্তি। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে "ভদ্র" প্রদেশের নাম পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে এই স্থান কামরূপ রাজ্যের (প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর) অন্তর্গত ছিল। মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা গ্রন্থে প্রকাশিত মানচিত্রে, সমুদয় পূর্ব্ব-বঙ্গ এবং পশ্চিমোত্তরে মিথিলা ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মগধ পর্য্যন্ত কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। যোগিনী-তন্ত্রে, নেপালের কাঞ্চনগিরি, ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম, করতোয়া অবধি দিক্কর বাসিনী পর্য্যন্ত; এবং উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া, পূর্ব্বে দিক্ষু নদী আর দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষ্যা নদীর সঙ্গম যাবৎ স্থান কামরূপের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (১)। প্রাচীনকালে কামরূপ রাজ্য উপবীথি, বীথি, উপপীঠ, পীঠ, সিদ্ধ-পীঠ, মহাপীঠ, ব্রহ্মপীঠ, বিষ্ণুপীঠ, ও রুদ্রপীঠ এই নবপীঠ বা খণ্ডে বিভক্ত ছিল (২)।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই স্থান বিভিন্ন পাল-রাজগণের শাসনাধীনে ছিল। শৈলাট ও দীঘলিরছিট গ্রামে এবং ভাওয়ালের অন্যান্য স্থানে পালরাজগণের শাসন কালের বিক্ষিপ্ত চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(১) যোগিনীতন্ত্র একাদশ পটল ১৬—১৮ শ্লোক।

(২) যোগিনীতন্ত্র একাদশ পটল ২৫ শ্লোক।

সৌমারপীঠ, রত্নপীঠ, কামপীঠ ও সুবর্ণপীঠ এই চারিভাগে কামরূপ রাজ্য বিভক্ত বলিয়াও উল্লিখিত আছে।

পাল-বংশীয় শিশুপালের রাজবাটীর বিস্তীর্ণ ও গভীর জলরাশিপূর্ণ পরিখা, তন্মধ্যবর্ত্তি ভগ্ন-ইষ্টকালয় সমূহ এবং পুষ্পবাটিকার শেষচিহ্ন আজিও অতীতস্মৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজাবাড়ী নামক স্থানে প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় নামক ভ্রাতৃদ্বয় সুন্দ উপসুন্দের ন্যায় এতদঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। ইহাদের অত্যাচারে ভাওয়াল জনহীন হইয়া পড়ে। মুগ্ গী নাম্নী তাহাদের এক প্রতাপশালিনী সহোদরার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদিগের রাজ্য সম্ভবতঃ কতিপয় গ্রাম মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জয়দেবপুরের উত্তরপূর্ব্ব দিকে ইহাদিগের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। লোকে উহা চণ্ডাল রাজার বাড়ী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস (১)। দুর-দুরিয়া গ্রামে সেন-বংশীয় রাজগণের একটী ক্ষুদ্র রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

ভাওয়ালের স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ, স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায়ের জীবিত কালে কাপাসীয়া গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী বড়-চালা নামক স্থানের গভীর অরণ্য মধ্যে সুবৃহৎ মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরের ইষ্টকাদি স্থানান্তরিত করিবার সময়ে ৪।৫ হাত মৃত্তিকার নিম্নে এক প্রস্তরনির্ম্মিত শিবলিঙ্গ ও এক খানা প্রস্তর-ফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। ঐ ফলকের এক পৃষ্ঠে বাসুদেব মূর্ত্তি ; অপর পৃষ্ঠে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি দশাবতারের মূর্ত্তি খোদিত। বৃজাপুর নামক স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে ঐপ্রকার একটি মন্দির পাওয়া গিয়াছে। ঐ মন্দিরাভ্যন্তরে দুইটি যজ্ঞকুণ্ড এবং তন্মধ্যে যজ্ঞীয় ভস্মের

---

(১) বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবসানে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী রাজাকে ঘৃণার চক্ষে চণ্ডাল বলিয়া অভিহিত করা অসম্ভব নহে।

রাজাবাড়ীতে প্রাপ্ত একখণ্ড প্রস্তর লিপি লণ্ডনের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এতৎসম্বন্ধে আমরা ২য় খণ্ডে আলোচনা করিব।

ন্যায় কতকগুলি ভস্ম পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহাতে অনুমিত হয় যে ভাওয়াল প্রদেশে অতি প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।

পালবংশীয় রাজগণের তিরোধানের পরে সুবিখ্যাত গাজীবংশ ভাওয়ালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। গাজীবংশীয় রাজন্যগণ লাক্ষ্যানদী তীরবর্ত্তী চৌরাগ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। গাজীদিগের সময়ে ভাওয়ালের রাজস্ব ৪৮৩০০৲ ছিল বলিয়া জানা যায়। চৌরাগ্রামের চতুর্দ্দিক প্রাকার-বেষ্টিত ছিল। ইহার অনতিদূরে গাজীদিগের রণতরী রাখিবার "কোষাখালী নামক খালের চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই।

১৬০৮ খৃঃ অব্দে ঢাকা নগরীতে মোগলের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলে, ঢাকা ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থান ভাওয়ালের তদানীন্তন ভূম্যধিকারী গাজীবংশীয়গণের হস্ত হইতে ছিন্ন করিয়া রাজধানীভুক্ত করা হয়। তৎপর হইতেই বর্ত্তমান ঢাকা নগরীর উত্তর ও পূর্ব্বাংশের কতক স্থান লইয়া সাহাউজিয়াল পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে। লোহাইদ, কীর্ত্তনীয়া, পীরজালি ও মীর্জ্জাপুর নামক স্থানে প্রচুর পরিমাণে লৌহের করকচ প্রাপ্ত হওয়া যায়। লৌহের করকচ উত্তোলন কালে অনেক সময় নানাবিধ যন্ত্রাদির ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মোগল শাসন সময়ে এতদঞ্চলে লৌহের খনির অস্তিত্ব থাকা অবগত হওয়া যায় (১)। গবর্ণমেণ্ট হইতে স্থানে স্থানে মৃত্তিকা খনন করিলে ভাওয়ালের অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে ভাওয়াল, সরকার বাজুহার অন্তর্গত

(১) See Gladwin's Translation of Ayni Akbari.

বলিয়া লিখিত আছে। তৎকালে এই বিভাগের রাজস্ব ছিল ১৯৩৫১৬০ দাম (১)।

ঈশ্বরপুর, একডালা, কমলাপুর, খিলগ্রাম, কদমা, কাপাসিয়া, কালীগঞ্জ, কামারজুরী, কীর্ত্তনীয়া, কুমুন, কেশরিতা, কেওয়া, গাছা, চান্দনা, চৌরা, জয়দেবপুর, টঙ্গী, ছাতিয়াইন, টেপীর বাড়ী, টোক, ডেমরা, তেজগাঁও, দুরদুরিয়া, দক্ষিণভাগ, দীঘলির ছিট, দেওরা, ধোর, নাগরী, পলাসোনা, পীরজালী, পুবাইল, বড়চালা, বক্তারপুর, ব্রাহ্মণগাও, ব্রাহ্মণকীর্ত্তি, বর্ম্মিয়া, বলধা, বাড়িয়া, বিলাসপুর, ভাদুল, মণিপুর, মারতা, মাধবচালা, মালীবাগ, মীর্জ্জাপুর, রাজেন্দ্রপুর, রাজাবাড়ী, লতিবপুর, লোহাইদ, শাইটহালিয়া, শৈলাট, শ্রীপুর, সাকোসার, সাতখামার, প্রভৃতি গ্রাম এই বিভাগের মধ্যে প্রসিদ্ধ। মীরপুর, বিরলিয়া, নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা, শ্যামপুর প্রভৃতি গ্রামও নৈসর্গিক বিভাগানুসারে ইহার অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে টঙ্গী নদীর উত্তর, জয়দেবপুরের দক্ষিণ, লাক্ষ্যানদীর পশ্চিম এবং তুরাগনদীর পূর্ব্ব এই চতুঃসীমার মধ্যেই অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাস।

(২) সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী—পশ্চিম সীমা লাক্ষ্যা, বানার ও লাঙ্গলবন্ধের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্র নদ; পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদ; দক্ষিণ সীমা মেঘনাদ ও ধলেশ্বরী নদীর কিয়দংশ (কলাগাছিয়ার ঠোঁটা পর্য্যন্ত); উত্তর সীমা সিংশ্রী নদী, নয়ানবাজার, রামপুরহাট, ও বেলাব নামক স্থানের উত্তরস্থ ব্রহ্মপুত্র নদ। এই বিভাগ, কলাগাছিয়া হইতে দক্ষিণে এগার-সিন্দু পর্য্যন্ত, দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৮ মাইল; এবং মুড়াপাড়া হইতে বারদীর পূর্ব্বস্থ মেঘনাদ পর্য্যন্ত প্রস্থে প্রায় ১০ মাইল। উত্তর দিকে, সা সাহেবের দরগা হইতে আইরল

(১) ৪০ দামে একটাকা।

খাঁ নদীর উৎপত্তিস্থল বেলাব নামক স্থানের পূর্ব্বস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত প্রস্থে প্রায় ২০ মাইল। প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম, স্বাভাবিক পরিখায় পরিবেষ্টিত ও শত্রুমণ্ডলী হইতে সুরক্ষিত। ব্রহ্মপুত্রের এক স্রোতঃ সোনারগাঁও পরগণাকে পূর্ব্ব সোনারগাঁও এবং পশ্চিম সোনারগাঁও এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পশ্চিম ভাগের অধিকাংশ ভূমি রক্তবর্ণ, কঙ্করময় ও উন্নত; পূর্ব্বাংশের মৃত্তিকা প্রায়শঃ বালুকাময়। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্যভাগ দিয়া তিনটী নদী প্রবাহিত থাকায় শস্যাদির প্রচুর উপকার সাধন করিতেছে।

"নিষাদ, রাক্ষস, উপবঙ্গ, ধীবর, রিষিক, নীলমুখ, কেরল, ওষ্ঠকর্ণ, কিরাত, কালোদর, বিবর্ণ, কুমার এবং স্বর্ণভূষিত জাতির অধ্যুষিত দেশের মধ্য দিয়া হ্লাদিনী বা ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত। স্বর্ণভূষিত জাতি, ঢাকার নিকটবর্ত্তী মোসলমান সময়ের পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী সহর সোনার গাঁ নামক স্থানের সমীপস্থ ব্রহ্মপুত্রের উভয়কূলস্থিত ভূভাগের আদিম অধিবাসী" (১)। কাহারও কাহারও মতে এই স্বর্ণভূষিত হইতেই সুবর্ণগ্রাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

জনশ্রুতি যে, মহারাজ দ্রুহ্যুর অনন্তরবংশ্য মহারাজ জয়ধ্বজের সময়ে এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর সুবর্ণ বর্ষিত হইয়াছিল বলিয়া ইহা সুবর্ণগ্রাম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে ইহা কিরাতাধিকৃত দেশ বলিয়া অভিহিত হইত (২)। সুবর্ণগ্রামে কিরাতব্যবসায়ী আদিম শূদ্রের

---

(১) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৫১ অধ্যায়।

See Asiatic Researches Vol. VIII. Page 331 & 332

(২) "তপ্তং কুণ্ডং সমারভ্য রামক্ষেত্রান্তকং শিবে।
কিরাতদেশো দেবেশি।..."

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে ভারতের পূর্ব্বদিক কিরাত-ভূমি বলিয়া লিখিত আছে।

আজিও অসদ্ভাব ঘটে নাই। ত্রিপুরার 'রাজমালা' গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে মহারাজ দ্রুহ্যু ব্রহ্মপুত্র-তীরস্থ ত্রিবেগ বা ত্রিবেণী নামক স্থানে রাজধানী সংস্থাপন পূর্ব্বক কিরাতদেশ জয় করিয়াছিলেন। সুবর্ণবৎ পদার্থের বর্ষণ অসম্ভব নহে। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখে বোম্বাই সহরে প্লাটিনম বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে চীন দেশে বালুকা বৃষ্টি এবং ১৮১০ খৃঃ অব্দে হাঙ্গেরীতে রক্তবৃষ্টির বিবরণ অবগত হওয়া যায়।

যোগিনী তন্ত্রে কামরূপ রাজ্যের যে সীমা নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহাতে অনুমিত হয় যে এক সময় এই ভূভাগ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল (১)। যোগিনীতন্ত্রোক্ত সুবর্ণপীঠকে কেহ কেহ সুবর্ণগ্রাম অঞ্চল বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়া থাকেন। সুবর্ণপীঠ হইতে সুবর্ণগ্রাম নাম হওয়া অসম্ভব নহে।

"মহেশ্বর নামা জনৈক বৈদ্যবংশোদ্ভব ব্যক্তি প্রাচীন সুবর্ণ গ্রামের ও তদ্‌বহিস্থ অনেক স্থান স্বনামে এক নম্বর ভুক্তে বন্দোবস্ত করেন, তাহাই ধীরে ধীরে মহেশ্বরদী নামে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের উভয় কূলেই এমন কি সহর সোনারগাঁর অনতিদূরেও কোনও কোনও প্রসিদ্ধগ্রাম তপ্পে মহেশ্বরদীর অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায়। বন্দোবস্ত সময়ে সুবর্ণ গ্রামের বহিস্থ অনেক অনেক স্থান, সুবিধামতে বন্দোবস্ত-কারকগণ, এক নম্বরভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ এগারসিন্ধুর উত্তরস্থ মেঘনাদের পূর্ব্ববর্ত্তী, লাক্ষ্যার পশ্চিমস্থ মহেশ্বরদী, উত্তরসাহাপুর, কাটারব, গোবিন্দপুর, রায়পুর, কাশীপুর, ভবাণীপুর, মহজুমপুর,

---

(১) "উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াতু পশ্চিমে।
তীর্থ শ্রেষ্ঠা দিক্ষু নদী পূর্ব্ব স্যাং গিরিকন্যকে॥
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি।
কামরূপ ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ॥" যোগিনী তন্ত্র

কামড়াপুর প্রভৃতি পরগণার বহিস্থ অংশ বাদে যাহা, তাহাই প্রাচীন সুবর্ণ গ্রাম” (১) কোনও কোনও লোকের বিশ্বাস যে, মোসলমানদিগের সাময়িক রাজধানী মোগড়াপার ও তৎসন্নিহিত কতটুকু ভূমির নামই সুবর্ণ গ্রাম। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সুবর্ণগ্রাম একটি বিস্তৃত সুবিখ্যাত প্রাচীন ভূখণ্ডের সাধারণ সংজ্ঞা। সোনারগাঁয়ের উত্তর অংশ মহেশ্বরদী নামে পরিচিত। ইহার কিয়দংশ ময়মনসিংহ জেলাতেও আছে। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের সঙ্গমস্থানে, উত্তরাংশে কোথাও কোথাও অনুচ্চ টিলা দৃষ্ট হয়। বেলাবর সন্নিকটে ২।৩টী লৌহ স্তপ আছে। প্রাচীন সুবর্ণগ্রামের পশ্চিম বিভাগ হইতে পূর্ব্ব বিভাগে বসতি ও উন্নতি অধিকতর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

যে সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ পশ্চিম ও পূর্ব্ব এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গৌড় ও সুবর্ণ গ্রাম রাজধানীদ্বয়ের অধীনে পৃথক ভাবে শাসিত হইত, সেই সময়ে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য লৌহিত্য নদের পূর্ব্ব দিকে বঙ্গদেশ এবং সেই বঙ্গে স্বর্ণগ্রাম প্রভৃতি অবস্থিত বলিয়া লিখিয়াছেন (২)। এজন্য কেহ কেহ বলেন যে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মপুত্রের সর্ব্ব পশ্চিমস্থ প্রবাহকেই বঙ্গের পশ্চিম সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎকালে লৌহিত্যের পূর্ব্বদিক বঙ্গ এবং পশ্চিমস্থ তাবৎ ভূভাগ গৌড় বলিয়া কথিত হইত। সম্ভবতঃ এই সময়েই ব্রহ্মপুত্র ঢাকার পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া আইরল বিল মধ্যে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল।

আবার বঙ্গের সীমা শক্তি সঙ্গম তন্ত্রের ৭ম পটলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

“রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদর্শকঃ॥”

---

(১) সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস—শ্রীস্বরূপ চন্দ্র রায় প্রণীত।
(২) “লৌহিত্যাৎ পূর্ব্বতঃ বঙ্গঃ। বঙ্গে স্বর্ণগ্রামাদয়ঃ।”

সুতরাং প্রকৃত বঙ্গ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব পারেই অবস্থিত; সেজন্যই এখনও বঙ্গ, বঙ্গজ ও বাঙ্গাল শব্দ পূর্ব্ববঙ্গের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তৎকালে পশ্চিম বঙ্গের বহুস্থান জলা ও অরণ্যসঙ্কুল ছিল।

ইউংলো কর্ত্তৃক চীনসম্রাট হুইতি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেশত্যাগী হওয়ায় তাহার অনুসন্ধানের জন্য মাহুয়ান পশ্চিম মহাসাগরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি যে সমুদয় জনপদে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার আভাস আমরা তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তিনি সোনা-উরকং (Sona-urh-kong) এবং পান-কো-লো (Pan ko-lo) রাজ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সোনা উরকং যে সোনারগাঁও এবং পান-কো-লো যে বঙ্গদেশ তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়।

মহাভারতের বনপর্ব্বের তীর্থ যাত্রা প্রকরণে লিখিত আছে পরশুরাম লৌহিত্য তীর্থের সৃষ্টি করেন। সম্ভবতঃ পরশুরাম প্রথম এই প্রদেশে একটি আর্য্য উপনিবেশ স্থাপন করেন। জনপ্রবাদ, পাণ্ডবগণ মেঘনাদের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের অবস্থা পরিজ্ঞানার্থ ভীমসেনকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি মেঘনাদের অপর পারে পদার্পণ করিয়াই, অপর ভ্রাতৃগণকে গালি দিতে লাগিলেন; ভীমের এবম্বিধ স্বভাব বৈলক্ষণ্য দৃষ্টে যুধিষ্ঠির তাহাকে ডাকিয়া পাঠান, তদবধি মেঘনাদের পূর্ব্বদিকস্থ প্রদেশ সমূহ পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ নামে খ্যাত হইয়াছে। ফল কথা আর্য্যগণ এই অঞ্চলে বহুকাল পরে আগমন করিয়াছিলেন (১)।

---

(১) যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব বনবাস কালে লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাট প্রভৃতি স্থানে আগমন করেন। পঞ্চমীঘাটে তাঁহারা যথায় স্নান ও তর্পণাদি করিয়াছিলেন, আজিও যাত্রীগণ আগমন পূর্ব্বক তত্তৎ স্থান দর্শন ও তথায় স্নান তর্পণাদি করিয়া থাকে। লাঙ্গলবন্ধের ন্যায় পঞ্চমীঘাটও পবিত্র তীর্থস্থান। ফলতঃ পঞ্চপাণ্ডবের সহিত যে পঞ্চমীঘাটের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

সুবর্ণগ্রামের অনেক স্থানের ভূমি রক্তবর্ণ। প্রবাদ এই যে, দেবাসুরের যুদ্ধকালে শোণিত পাত হেতু মৃত্তিকা লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দেবাসুরের যুদ্ধ ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের সহিত আর্য্যদিগের সংঘর্ষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বহুকাল ব্যাপি যুদ্ধের পরেই যে আর্য্যগণ এসকল প্রদেশে অধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হোয়েন্‌সাং ৬৩৮ খৃঃ অব্দে হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী কান্যকুব্জ নগরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইনি হর্ষবর্দ্ধনকে কাম্বোজ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগের সম্রাট পদে অভিষিক্ত দেখেন। তাহা হইলে সুবর্ণগ্রাম যে ঐ সময়ে হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মালবদেশের অন্তর্গত মন্দসোরনগরের নিকটে প্রাপ্ত প্রস্তরস্তম্ভ দ্বয়ে উৎকীর্ণ প্রশস্তিতে লিখিত আছে, মহারাজ যশোধর্ম্ম পূর্ব্বদিকে লৌহিত্য নদের উপকণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া "গহনতালবনাচ্ছাদিত মহেন্দ্রগিরির উপত্যকা" পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগ উপভোগ করিয়াছিলেন।

খড়্গবংশীয় প্রথম রাজা দেবখড়্গের এয়োদশ বর্ষে উৎকীর্ণ তাম্র-শাসনদ্বয় রায়পুরা থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। খড়্গোদ্যম এই বংশের প্রথম রাজা। খড়্গোদ্যমের পুত্র জাতখড়্গ ও জাত-খড়্গের পুত্র দেবখড়্গের নাম পাওয়া গিয়াছে। দেবখড়্গের পুত্রের নাম রাজ রাজ। পরমসৌগত পুরদাস কর্ত্তৃক জয়কর্ম্মান্ত বাসক হইতে উক্ত তাম্রশাসন-দ্বয় লিখিত হইয়াছে। দেবখড়্গের মাতার নাম ছিল প্রভাবতী। উদীর্ণ-খড়্গ নামধেয় রাজবংশীয় জনৈক ব্যক্তির নামও তাহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আসরফপুরের সন্নিহিত "বৌদ্ধমণ্ডপে" তৎকালে আচার্য্যবন্দ্য সংঘ-মিত্র নামক জনৈক সুবিখ্যাত পণ্ডিত বাস করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য সময়ে রায়পুরা, ধামগড়, পলাস প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ

সংঘারাম ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। এই তাম্রশাসনোক্ত পলশত, বর্শ্মি, তালপাটক, দত্তকটক প্রভৃতি গ্রাম আধুনিক পলাশ, বর্শ্মিয়া, তালপাড়া এবং দত্তপাও হওয়া অসম্ভব নহে।

এই অঞ্চল কোনও সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের, পরে বঙ্গেশ্বরের এবং মধ্যে মধ্যে ত্রিপুরাধিপের শাসনাধীন ছিল। যে সময়ে ভাওয়ালে পালবংশীয় নরপতিগণের প্রভাব বিস্তৃত হয়, তৎকালে ইহা তাহাদিগের অধীনেই ন্যস্ত ছিল। ভাওয়ালের বিবরণ পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে এক সময়ে সুবর্ণগ্রাম ভাওয়ালের অধীনেই শাসিত হইত। যোগিনী তন্ত্রে লিখিত আছে, পুরাকালে বিষুসিংহ নামক জনৈক প্রবল পরক্রান্ত ভূপতি স্বীয় ভুজবলে কামরূপ, সৌমার ও পঞ্চগৌড় অধিকার করিয়াছিলেন। যথা :—"একোহি জিতবান্ কামান্ সৌমারান্ গৌড়পঞ্চমান্।"

সেনবংশীয় নরপতিগণের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই এই স্থান তাহাদিগের ছত্রাধীন হইয়াছিল। মহারাজ বল্লালসেন (প্রথম) একডালায় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সেনবংশীয় রাজগণ মধ্যে কেহ কেহ একডালাতে বাস করিয়াই এতদঞ্চল শাসন করিতেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত সুবর্ণগ্রামে হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহারাজ দ্বিতীয় বল্লালসেন কোঙর সুন্দর নামক স্থানে তদীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কোঙরসুন্দরেই শেষ হিন্দু রাজধানী ছিল। দ্বিতীয় বল্লালের পতনের পর হইতেই সুবর্ণগ্রাম মোসলমান শাসনাধীনে আসে। পাঠান-ভূপতিগণ পূর্ব্ববঙ্গে তাহাদিগের অধিকার সুদৃঢ় করিবার জন্য এখানে রাজধানী সংস্থাপন করেন। পাঠান রাজগণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঈশাখাঁ মসনদআলি সুবর্ণগ্রামের আধিপত্য লাভ করেন। অতঃপর ইহা মোগল শাসনাধীন হইয়া পড়ে।

অর্জ্জুনদী, আটপাকিয়া, আঠারদিয়া, আমদিয়া, আড়াইহাজার, আদম-পুর, আমীনপুর, ইউসুফগঞ্জ, উত্তর সাহাপুর, উদ্ধবগঞ্জ, উচিতপুর, একদুয়ারিয়া, এগারসিন্ধু, কর্ণবোপ, কলাগাইছা, কাটারব, কামারগাঁও, কাউয়াদি, কাইকার টেক, কান্দাইল, কাচপুর, কাশীপুর, কুড়িপাড়া, কুল-চরিত্র, কেওটালা, কোণ্ডরসুন্দর, কুমুরা, কৃষ্ণপুরা, খন্দসারদী, খামারদী, খিদিরপুর, গয়েসপুর, গজারিয়া, গাবতলি, গোবিন্দপুর, গোতাসিয়া, গোয়ালদী, চরপাড়া-বাশ টেকী, চন্দ্রকীর্ত্তি, চাকদা, চাপাতলি, চারি-তালুক, চালাকচর, চাদপুর, চিনিসপুর, চৈতাব, চৌঘরিয়া, জয়রামপুর, জয়মঙ্গল, জাঙ্গালীয়া, জোকারদিয়া, ঝাউগাড়া, টাইটকা, ডাঙ্গা, ডৌ-কাদী, তোটক, ত্রিবেনী, দত্তপাড়া, দক্ষিনদাওড়া, দামোদরদী, দাবুরপুড়া, দেওয়ানবাগ, দোগাছিয়া,ধর্ম্মগঞ্জ, ধানুয়া, ধামগড়, ধুপতারা, নপাড়া, নর-সিংদী, নবীগঞ্জ, নন্দীপুর, নৈলাকোট, পরমেশ্বরদী, পলাস, পঞ্চমী ঘাট, পাঁচদোনা, পানাম, পারুলীয়া, পাঁচগাঁ, পাকরিয়া, পাঁচরুখী, পুটে, বরাব, বন্দর, বগাদী, ব্রাহ্মনদী, বারপাড়া, বানিয়াদী, বানেশ্বরদী, বালিয়াহানী, বিরামপুর, বেহাকৈর, বেলাব, বৈদ্যেরবাজার, বৈদ্যনাথের মঠখলা, ভাটপাড়া, মদনগঞ্জ, মহজমপুর, মদনপুর, মনোহরদী, মাছিমপুর, মাছিমাবাদ, মাথরা, মাধবপাশা, মাধবদী, মাত্রা, মাইলতা, মুড়াপাড়া, মুহলী, মুন্সীরাইল, মৈকুলী, মোগড়াপারা, রায়পুরা, রানীঝি, লক্ষণ-খোলা, লক্ষ্মীবর্দ্দি, লস্করদী, লাঙ্গলবন্ধ, লাকরশী, লালাটি, লাধুরচর, শানখলা, সম্মান্দী, সাতপাইকা, সাতিরপাড়া, সাতগাঁও, সাগরদী, সাদীপুর, সাপাদী, সাতভাইয়াপাড়া, সিদ্ধেশ্বরী, সুলতানসাহাদী, সৈকা-চর, সোল্লাপাড়া, সোনাকান্দা, হরিবপুর, হাইড়া, হামছাদী, হোসনাবাদ, প্রভৃতি গ্রাম এই বিভাগ মধ্যে অবস্থিত।

(৩) বিক্রমপুর—উত্তরে ধলেশ্বরীনদী, পূর্ব্ব সীমা মেঘনাদ,

পশ্চিম সীমা পদ্মা ও চন্দ্রপ্রতাপের কিয়দংশ এবং আরিয়ল বিলের অপর পারস্থ দোহার, গালিমপুর (উহা চন্দ্রপ্রতাপ ও বিক্রমপুরের সীমাঁন্তস্থানে অবস্থিত) প্রভৃতি স্থান ; দক্ষিণ সীমা ইদিলপুর। পদ্মানদী বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ-বিক্রমপুর এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে পদ্মার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া বিক্রমপুরের দক্ষিণভাগ ঢাকা জেলা হইতে পৃথক হইয়া যায়। ১৮৭১ খৃঃ অব্দের ১৭ই জুনের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনী অনুসারে ঐ সনের ১লা আগষ্ট হইতে রাজনগর, জপসা, কোয়রপুর, নড়িয়া, লোনসিংহ, কার্ত্তিকপুর, ফতেজঙ্গপুর, নগর, বিঝারী, পণ্ডিতসার, কেদারপুর, মুলফৎগঞ্জ, পালং, পোড়াগাছা, কুড়াশি, পারগাও প্রভৃতি ৪৫৮ খানা গ্রাম সহ দক্ষিণ বিক্রমপুর, বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্ভূক্ত হয়। এই গ্রামগুলি মুলফৎগঞ্জ থানার অধীন ছিল। ১৮৬৬ সালের পূর্ব্বেই মুলফৎগঞ্জ থানার শাসনসংক্রান্ত কার্য্য বাকরগঞ্জ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে ন্যস্ত করা হইলেও কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। অধিবাসীবৃন্দের তুমুল আন্দোলনের ফলে মুলফৎগঞ্জ সহ মাদারীপুর মহকুমা ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভূক্ত হয়। পদ্মার যে শাখা উত্তর বাহিনী হইয়া বহর, বালিগা, সুবচনী, তালতলা প্রভৃতি স্থান দিয়া ধলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, তাহা আবার উত্তর বিক্রমপুরকে পূর্ব্ব বিক্রমপুর ও পশ্চিম বিক্রমপুর এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে।

বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অনেকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ তৎসময়ে বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী পর্য্যন্তও এই স্থান সমতট নামে পরিচিত ছিল। মিঃ কানিংহাম হইতে আরম্ভ করিয়া ফার্গুসন, ওয়াটর্স প্রভৃতি অনেকেই সমতটের স্থান নির্ণয়ে মস্তিষ্ক পরিচালনা

করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত; কিন্তু ওয়াটার্সের মতই আমাদিগের নিকটে সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন উহা "ঢাকার দক্ষিণে এবং ফরিদপুর জেলার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত।"

প্রবাদ এই যে, উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্য রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক কিয়ৎকাল এখানে অবস্থিতি করেন বলিয়া এই স্থান বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু উজ্জয়িনীর প্রখ্যাতনামা মহারাজ বিক্রমাদিত্য যে কখনও এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দিগ্বিজয়প্রকাশ গ্রন্থে বঙ্গপরতাল বর্ণনে এক স্থলে লিখিত আছে, "বিক্রম ভূপ বাসত্বাৎ বিক্রমপুর মতো বিদুঃ"। বিপ্রকল্পলতিকা গ্রন্থে সেন বংশীয় বিক্রম সেনকেই বিক্রমপুরের স্থাপয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে,—

> "তদ্বংশে বিক্রম সেনো জাতঃ পরম ধার্ম্মিকঃ।
> কৃতবান বিক্রমপুরীং স্বনাম্নাভিহিতাং সুধীঃ॥"

বিক্রমসেন নামে গৌড়ের একজন রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কথাসরিৎসাগর, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনী ও তন্ত্রবিভূতি গ্রন্থে বিক্রমসেনের নাম দৃষ্ট হয়। সুতরাং বিক্রমসেন যে একটি কাল্পনিক নাম নহে, তাহা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীনে বঙ্গদেশের সমতট ও ডবাক রাজ্য গঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পরে সমতটের সামন্তগণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী একটী লৌহ স্তম্ভে চন্দ্র নামক একজন নৃপতি বঙ্গদেশে সমরে দলবদ্ধ বহুসংখ্যক শত্রুকে পরাভূত করিয়া ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইনি বিক্রমপুরাধিপ চন্দ্রদেব হইবেন। পদ্মপুরাণে গঙ্গাসাগর সঙ্গম প্রদেশে চন্দ্রবংশীয় সুষেন নামক এক রাজার নাম উক্ত হইয়াছে। ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত

চারিখানি তাম্রশাসনে ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব নামক তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে।

যশোবর্ম্মা মগধ দেশ জয় করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী বঙ্গরাজ্যে উপনীত হইলে বঙ্গেশ্বর তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহির, "বৃহৎসংহিতা" গ্রন্থের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের নবভাগের উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বদেশে সমতট, এবং অগ্নিকোণে বঙ্গ এবং উপবঙ্গের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হোয়েন সাং লিখিয়াছেন, "সমতট রাজ্য চক্রাকৃতি, তাহার বেষ্টন তিন সহস্র লি, ইহা সমুদ্রতীরবর্ত্তী। রাজধানীর বেষ্টন ২০ লি, ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বরা। জলবায়ু প্রতিকর, অপর্য্যাপ্ত শস্য জন্মে। অধিবাসিগণ খর্ব্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ, ও কষ্টসহিষ্ণু, রাজ্যে সত্যধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম্ম) ও অপধর্ম্ম উভয়ই প্রচলিত। ত্রিংশৎটি সংঘারামে প্রায় দুই সহস্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। রাজ্যে প্রায় একশত দেবমন্দির আছে। অসংখ্য উলঙ্গ নির্গ্রন্থ বাস করেন। নগরের নিকটে অশোকস্তূপ বর্ত্তমান আছে; পূর্ব্বকালে তথাগত তথায় সপ্তাহকাল শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। ইহার পার্শ্বে চারিজন বুদ্ধের উপবেশন স্থান দৃষ্ট হয়। স্তূপের নিকটস্থ সংঘারামে হরিৎ প্রস্তর নির্ম্মিত ৮ ফুট উচ্চ বুদ্ধ মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।" হোয়েনসাংএর বিবরণ হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী, মঠবাড়ী, বেজনীসার, কুমারভোগ, তেলিরবাগ, রামপুরা, সোনারং; সুবর্ণগ্রামের ধামগড়, বর্দ্দিয়া, পলাশ এবং বাজুর অন্তর্গত বাজাসন, ধুল্লা, নান্নার, দোহার, ফুলবাড়িয়া, দেবতারপটি, বজ্রাইল প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল। হুয়েন সাঙের অব্যবহিত পরে, বৌদ্ধ পর্য্যটক ইৎচিং সমতটরাজ্যে উপনীত হন। তৎকালে সমতটে "হো-লো-শেপো-তা" (Ho-lo-she-po-ta) নামক জনৈক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তিনি

বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইৎচিং কথিত রাজার প্রকৃত নাম কি তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কেহ বলেন, হর্ষভট, কেহ বলেন রাজভট, আবার কেহ কেহ উহা হর্ষবর্দ্ধনের নামান্তর বলিয়া অনুমান করেন।

সেন রাজগণের তাম্রশাসনে বিক্রমপুরকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বলা হইয়াছে। বিশ্বরূপ সেন পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গের বিক্রমপুর ভাগস্থিত পূর্ব্বে অঁঠপাগ গ্রাম জঙ্গাল ভূঃসীমা দক্ষিণে বারয়ীপাড়া গ্রাম ভূঃসীমা পশ্চিমে উঞ্চোকাপ্টী গ্রাম ভূঃসীমা উত্তরে বীরকাপ্টী জঙ্গাল সীমা এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন পোঞ্চোকাপ্টী গ্রাম মধ্যস্থিত ভূমি দান করিয়াছেন। কেশবসেন পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গের বিক্রমপুর ভাগস্থিত প্রশস্ত লতাটঘড়া ঘাটকে পূর্ব্বে সত্রকাখি গ্রাম সীমা দক্ষিণে শাঙ্করবসা গোবিন্দ-বসান্ত ভূঃসীমা পশ্চিমে পঙ্ককাপাগাদাহ্বয়সরগ্রামসীমা উত্তরে বাগু-লিঙ্কিগাতাত্তগুমানভূঃ সীমা ইহার মধ্যবর্ত্তী ভূমি তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে চণ্ডভণ্ড দিগকে শাসন করিবার জন্য ব্রহ্মোত্তর প্রদান করিয়াছেন। আদিশূর, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বিক্রম-পুরের গৌরব সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আধুনিক ইদিলপুরের অন্তর্গত নাগরকুণ্ডা, ধীপুর, লঙ্কাচুয়া, ফুলকষ্ঠি, প্রভৃতি গ্রাম তৎকালে বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল।

লাটাধিপতি রাষ্ট্রকুটবংশীয় কর্কসুবর্ণ বর্ষের ৭৩৪ শাকাঙ্কিত তাম্রশাসনে লিখিত আছে, তিনি বঙ্গাধিপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। মগধের সিংহাসন লইয়া গুপ্ত ও মৌখরী বংশের বিবাদে উভয় বংশ হীনবল হইয়া পড়িলে শূরবংশ বঙ্গে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব আরম্ভ করেন।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় নরপতিগণ বজ্রযোগিনীর উত্তর পূর্ব্বকোণে অবস্থিত রঘুরামপুর নামক স্থানে রাজধানী

স্থাপন পূর্ব্বক এতদঞ্চল শাসন করিতেন। পালবংশীয়গণ বিক্রমপুরে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি এই বিষয়ের জলন্ত নিদর্শন। শত শত বৌদ্ধবিহার, সঙ্ঘারাম ও চৈত্য হইতে বৌদ্ধদেবের অমৃত-নিঃস্যন্দিনী বাণীর প্রতিধ্বনি প্রত্যহ শ্রুত হইত। বর্ম্মবংশীয় জ্যোতিবর্ম্মা, হরিবর্ম্মা ও শ্যামল বর্ম্মার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরিবর্ম্মার ৪২ বর্ষাঙ্কিত একখানা তাম্রশাসন সামন্তসার গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। রাঘবেন্দ্র কবিশেখর রচিত ভবভূমিবার্ত্তাপাঠে জানা যায়, হরিবর্ম্মা দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া বিক্রমপুরে রাজ্য স্থাপন করেন।

বিক্রমপুরের জোড়াদেউল, রাউৎভোগ, সুয়াসপুর, দেওসার, সোনারং, চুড়াইন, কুমারভোগ, কুমরপুর, বজ্রযোগিণী, বেজিণীসার, তেলিরবাগ প্রভৃতি স্থানে দেউল বাড়ী ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু স্থানীয় কিম্বদন্তী অন্য প্রকার। সেন রাজগণের রাজধানী রামপাল ও তৎসন্নিহিত স্থান খনন করিলে বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক লুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতে পারে।

পালবংশীয় পরমসৌগত রাজা নারায়ণপাল তদীয় রাজত্বের সপ্তদশতম বর্ষের ৯ই বৈশাখ একখানা তাম্রশাসন দ্বারা তীরভুক্ত (ত্রিহুত) প্রদেশের অন্তর্গত মকুয়াতি গ্রাম পাশুপত আচার্য্যের শিষ্য শিবভট্টারককে প্রদান করেন। নারায়ণপালের মন্ত্রী ভট্টগুরবমিশ্র ইহার শ্লোক রচনা করেন। সমতটবাসী শুভদাসের পুত্র মদ্‌ঘদাস কর্ত্তৃক ইহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

অতঃপর সেনবংশীয় রাজগণ বিক্রমপুরের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। লঘুভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় মহারাজ লক্ষ্মণ সেন বিক্রমপুরেই ভূমিষ্ঠ হন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রামপাল নগরী

সেন-রাজগণের রাজধানী ছিল। সেন-রাজগণপ্রদত্ত তাম্র-শাসন গুলিতে "বিক্রমপুর" শব্দের পূর্ব্বে গৌরবব্যঞ্জক "শ্রী" এই শব্দের পুনঃপুনঃ উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; আরও একটি বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় যে, সমুদয় তাম্রশাসনগুলিই জয়স্কন্ধাবার বিক্রমপুর হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। জয়স্কন্ধাবার রাজধানীকেও বুঝাইতে পারে। যাহারা বলেন, বিক্রমপুরে সেনরাজগণের রাজধানী ছিল না, তাহাদিগকে জিজ্ঞাস্য এই যে, বিক্রমপুরে আগমন করিলেই কি সেনরাজগণের তাম্র-শাসনাদি প্রদান করিবার কথা মনে পড়িত?

রাজেন্দ্রচোল কর্ত্তৃক পালবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র পরাজিত হইলে বঙ্গে গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই সুযোগেই বর্ম্মবংশীয়গণ বিক্রমপুরে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভবভূমি-বার্ত্তায় লিখিত আছে, হরিবর্ম্মা একটি সুপ্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বর্ত্ম কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহা অবগত হওয়া যায় না।

প্রাচীন কালে ঢাকাই ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমা ছিল এবং ভারতের কোনও স্থানের পরিমাণ বা দূরত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইলে ঢাকার তুলনাতেই করা হইত। অর্থাৎ ঢাকা তৎকালে ভারতবর্ষীয় ভৌগোলিকদিগের কুমধ্য (O. Meridian) বলিয়া গণ্য ছিল। টলেমী মান্তিবলকে ভারতের পূর্ব্বসীমা বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়াছেন (১)।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কোনও অজ্ঞাত নামা গ্রীক্ বণিক আরব্য-

---

(১) "It is the Dhakka or old Ganges river, and seems to have been the limits of India, and the point from which measurements, and distances relating to Countries in India were frequently made", Mc. Crindles translation of Ptolemy.

সমুদ্রবহির্বাণিজ্য-বিবরণ নামক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই বিবরণ "পেরিপ্লুস অব দি এরিথ্রিয়ানসি" নামে ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বি-শতাব্দীতে টলেমী তাঁহার ভূবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত গ্রীক বণিকের বিবরণে ও টলেমীর গ্রন্থে কিরাদিয়া নামক প্রদেশের ও গাঙ্গী নামক বন্দরের উল্লেখ আছে। কিরাদিয়া সম্ভবতঃ কিরাত প্রদেশ; প্রাচীনকালে সুবর্ণগ্রামের কোনও কোনও স্থান কিরাত প্রদেশের অন্তর্গত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পেরিপ্লুস গ্রন্থে লিখিত আছে, "কিরাদিয়া প্রদেশে প্রচুর তেজপত্র উৎপন্ন হয়। উহা গঙ্গা বাহিয়া তাম্রলিপ্তিতে ও তথা হইতে ইউরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে। এই প্রদেশের সীমান্তভাগে প্রতিবৎসর একটি মেলা হয়। তথায় চীন দেশের লোক আসিয়া স্বদেশজ দ্রব্যের বিনিময়ে তেজপত্র লইয়া যায়"। মুন্সীগঞ্জের অনতিদূরে যথায় কার্ত্তিকবারুণীর মেলা বসিয়া থাকে উহাই টলেমীর লিখিত "গঙ্গারেজিয়া" বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন (১)। কিরাদিয়া প্রদেশের সহিত পাশাপাশি ভাবে "গঙ্গা-রেজিয়া"র উল্লেখ থাকায়, এবং চৈনিক বণিকগণের বাণিজ্য ব্যপদেশে ঐ মেলায় আগমন করিবার কথা উল্লিখিত হওয়ায়, উক্ত মত আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান সময়েও কার্ত্তিকবারুণীর মেলাতে বিস্তর তেজপত্র বিক্রীত হইয়া থাকে।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিক্রমপুরের হিন্দু স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। মোসলমানগণ কর্ত্তৃক গৌড় রাজ্য বিজিত হইলে সেনরাজগণ বহুকাল পর্য্যন্ত বিক্রমপুর ও সোনারগাঁয়ে আপনাদিগের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বল্লালের পতনের পরেই হিন্দু স্বাধীনতাসূর্য্য চিরকালতরে অস্তমিত হইয়া যায়।

(১) Vide History of the Cotton manufacture of Dacca District.

পাঠান রাজত্বের প্রারম্ভে বিক্রমপুরের শাসনকার্য্য কাজীদিগের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কাজীগণের নামানুসারেই "কাজীরগাঁও" এবং "কাজী কসবা" গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। পাঠান শাসন সময়েও পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগের প্রাধান্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীগণ স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে এক প্রকার স্বাধীনভাবেই থাকিতেন। উহারা "ভূঞা" নামে পরিচিত ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক বীরাগ্রগণ্য চাঁদরায় ও তদীয় সহোদর কেদার রায় মাতৃভূমির উদ্ধার কামনায় যে বীরব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। এক দিকে নরপিশাচ জল-দস্যু মগ ও পর্ত্তুগীজগণের ভীষণ আক্রমণ হইতে প্রপীড়িত পূর্ব্ববঙ্গ-বাসিজনগণকে রক্ষা করিবার জন্য বীর ভ্রাতৃদ্বয়ের সফল প্রয়াস, আবার অন্য দিকে মোগলকুলধুরন্ধর আকবরের প্রেরিত রণদুর্ম্মদ মোগল অনিকীনির পুনঃ পুনঃ গতিরোধের জন্য রণোত্তম বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। রায়মহাশয়দিগের সময়ে বিক্রমপুরের বিলুপ্ত গৌরবরশ্মি স্তিমিত প্রদীপের শিখার ন্যায় ক্ষণতরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়েই শ্রীপুর সমৃদ্ধি গৌরবে সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে শীর্ষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময়ে শ্রীপুরে একটী প্রসিদ্ধ পোতাশ্রয় ছিল। পর্ত্তুগীজগণও জলযুদ্ধেবিধ্বস্ত রণতরী সমূহের সংস্কারসাধন এখানেই সম্পন্ন করিতেন। শ্রীপুরের কর্ম্মকারগণ আগ্নেয়াস্ত্র প্রস্তুত করণেও সিদ্ধহস্ত ছিল। কেদারের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই মোগলের বিজয়বৈজয়ন্তী বিক্রমপুরে উড্ডীন হইয়াছিল।

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে বিক্রমপুর সরকার সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত বলিয়া লিখিত আছে। রাজস্ব ধার্য্য ছিল ৩৩৩৫০৫২ দাম। কতকগুলি লের সমষ্টিতে বিক্রমপুরের সৃষ্টি হইয়াছে।

আইড়ুল, আউটসাহী, আটপাড়া, আবদুল্লাপুরা, আমুদপুর, ইছাপুরা, কনকসার, কমলাঘাট, কউরহাট, কলমা, কাজিরগাঁও, কাটিয়াপাড়া, কাঠাদিয়া-সিমুলিয়া, কান্দনীসার, কামারখাড়া, কুচিয়ামোড়া, কুর্ম্মিরা, কুমারভোগ, কুকুটিয়া, কুমরপুর, কেওর, কেওটখালী, কৈচাল, কোলা, কোরহাটি, খিলপাড়া, খিদিরপাড়, গাউপাড়া, গাউদিয়া, গুনগাও, ঘাসিরপুকুরপাড়, চন্দনভোগ, চাচুরতলা, চারিআনি, চিত্রকোট, চূড়াইন, চৌদ্দহাজারী, জৈনসার, জোয়াররাজাদিয়া, টঙ্গীবাড়ী, তরতিয়া, তালতলা, তারপাশা, তাজপুর, তেলিরবাগ, তেয়টিয়া, দিঘলি, দিপাড়া, দেভোগ, দেউলভোগ, দোগাছি, ধরণ্ডি, ধলছত্র, ধাইদা, ধানকুনিয়া, ধীপুর, নয়না, নশঙ্কর, নাগরভোগ, নেত্রাবতী, নোয়াদ্দা, পশ্চিমপাড়া, পয়সাগাও, পঞ্চসার, পাত্রৈলদিয়া, পাইকপাড়া, পাঁচগাও, পুলাইল, পুরাপাড়া, ফেগুনাসার, ফুরসাইল, বহর, বজ্রযোগিনী, বটেশ্বর, বলাসিয়া, বয়রাগাদী, বারৈখালী, বাঘিয়া, বাসিরা, বাহেরক, বাসাইল, বালিগাঁও, বানরী, বাইনখাড়া, ব্রাহ্মগাঁও, বিদগাঁও, বেতকা, বেজগাঁও, বেলতলি, ভরাকর, ভবানীপুর, ভাটপাড়া, ভাগ্যকুল, মধ্যপাড়া, মালখানগর, মাইজগাঁও, মাইজপাড়া, মাকোহাটী, মালপদিয়া, মালদা, মূলচর, মেদেনী-মণ্ডল, যশোলং, রঘুরামপুর, রসুনিয়া, রাজখাড়া, রাউৎভোগ, রামপাল, রোয়দী, লস্করপুর, লৌহজঙ্গ, শ্রীনগর, শ্রীধরখোলা, শেখরনগর, শিমুলিয়া, শ্যামসিদ্ধি, ষোলঘর, সানিহাটি, সাতগাঁও, সাওগাও, সিংটিয়া, সিলিমপুর, সিয়ালদী, সুবচনী, সোহাগদল, সোণারং, হলদীয়া, হাসাইল, হাসাড়া, প্রভৃতি গ্রাম উত্তরবিক্রমপুর মধ্যে অবস্থিত।

(৪) বাজু বা চন্দ্রপ্রতাপ, সুলতানপ্রতাপ ও সেলিম-প্রতাপ—এই বিভাগের উত্তরসীমা ময়মনসিংহ জেলা; দক্ষিণসীমা পদ্মা; পশ্চিমসীমা যমুনা ও পূর্ব্বসীমা ভুরাগ, ভাওয়াল ও বিক্রমপুরের

কিয়দংশ। ধলেশ্বরীনদী এই বিভাগের দক্ষিণাংশ দিয়া উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের যে মাসে মাণিকগঞ্জ মহকুমা সংস্থাপিত হইলে, উহা ফরিদপুরের সামিল ছিল, এবং তৎকালে মাদারীপুরের কতক অংশ ও আটিয়া থানা ঢাকা জেলার অধীন ছিল। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে মাণিকগঞ্জ মহকুমা ও নবাবগঞ্জ থানার কতক অংশ ফরিদপুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঢাকা জেলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়; ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে আটিয়া থানা ঢাকা জেলা হইতে খারিজ হইয়া ময়মনসিংহ জেলায় পরিবর্ত্তিত হয়।

দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক গাজীবংশীয় চাঁদগাজীর নামানুসারে চাঁদপ্রতাপ পরগণার নামকরণ হয়। চাঁদগাজীর ভ্রাতা সেলিমের নামানুসারে সেলিমপ্রতাপ পরগণা এবং সুলতানের নামানুসারে সুলতানপ্রতাপ এবং কাসিমগাজী হইতে কাশিমপুর পরগণার নামকরণ হয় বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে এই সমুদয় পরগণা সরকার বাজুহায়ের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে; এবং এই পরগণাগুলির কর একত্র ধার্য্য হওয়াতে অনুমিত হয় যে উহা একই ভূম্যধিকারীর অধীন ছিল, পরে তিন ভ্রাতার নামানুসারে তিনটি বিভিন্ন পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে। রাজস্ব ধার্য্য ছিল ৪৬২৫৪৭৫ দাম। বিলাস-ব্যসনানুরক্ত গাজীবংশীয়গণের অধঃপতন সংসাধিত হইলে চাঁদগাজীর সেনাপতি সঞ্জয় হাজরার বংশধরগণ উহাদের জমিদারী হস্তগত করিয়া পরগণার জমিদার বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন (১)। বালিয়াদির সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশের পূর্ব্বপুরুষ হজরৎ সা কুতুবুদ্দিন সিদ্দিকী দিল্লীর বাদশাহের

(১) "বারভুঞা"—শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত।

নিকট হইতে পরগণা তালিপাবাদ, আমিনাবাদ ও চন্দ্রপ্রতাপ জায়গীর-স্বরূপ লাভ করেন।

বৃহৎসংহিতাতে লিখিত আছে, মৈত্র দৈবত নক্ষত্রে কেতু দ্বারা আধূমিক বা স্পৃষ্ট হইলে, পুণ্ড্র পতির এবং শ্রবণা কেতুদ্বারা ঐরূপ হইলে বঙ্গাধিপতির অধঃপতন সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে জানা যায় যে ঐ সময়ে বঙ্গরাজ্য একটি গণনীয় রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পৌরাণিক যুগে আধুনিক বঙ্গদেশ অঙ্গ, বঙ্গ, প্রবঙ্গ, উপবঙ্গ, ভার্গব, অন্তগিরি, বহির্গিরি, তঙ্গন, বরেন্দ্র, রাঢ়, সুহ্ম, প্রসুহ্ম, ভল্লুক, প্রবিজয়, কৌশিকী কচ্ছ, ব্রহ্মোত্তর, কর্ব্বট, উদয়গিরি, ভদ্র, গৌড়ক, জ্যোতিষ, কান্তার, প্রভৃতি বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তৎকালে বঙ্গ বলিতে আধুনিক ঢাকা জেলাই বুঝাইত।

কোন্ সময়ে বঙ্গদেশ বাঙ্গালা নামে পরিচিত হইয়া পড়ে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এক সময়ে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার জলস্রোতে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইত। তৎকালে উচ্চ আঁল বাঁধিয়া অধিবাসিগণ জলপ্লাবন হইতে স্বীয় বাসস্থান রক্ষা করিতে চেষ্টা করিত; তজ্জন্য বঙ্গ আঁল্ হইতেই বঙ্গাল বা বাঙ্গালা নাম হইয়াছে। যাহা হউক বাঙ্গালা নাম যে মোসলমান আগমনের পূর্ব্বেই উৎপত্তি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই; কারণ রাজেন্দ্রচোলের তিরু-মলয়ের শিলালিপিতে বঙ্গাল শব্দটি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মহারাজ কনিষ্কের সময়ে এতদঞ্চলে মহাযান মত প্রচলিত হয়। কনিষ্কের পুত্র হুবিষ্কের সময়ে বঙ্গদেশ তদীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। অতঃপর মিহিরকুল বঙ্গদেশ জয় করেন। আদিত্যসেনের সময়ে বঙ্গদেশ মগধসাম্রাজ্যভুক্ত হয়; যবদ্বীপবাসিগণ ও তিব্বতীয়গণ সময়ে সময়ে এতদঞ্চল আক্রমণ করিত বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে পালরাজগণ এতদঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। পালরাজগণের অধীনস্থ সামন্তরাজগণ ভৌমিক বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাহাদিগের অধিকৃত স্থান ভূম বলিয়া কথিত হইত। পাল রাজগণের সময় হইতেই বঙ্গে 'বারভূঞা' নাম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে রাজেন্দ্রচোল বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গোবিন্দচন্দ্র পরাজিত হয়। রাজেন্দ্রচোল গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিলেও বিক্রমপুরাধিপ হরিবর্ম্মাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই।

হরিশ্চন্দ্রমহিষী কর্ণাবতী ও ফুলেশ্বরীর নামানুসারেই কর্ণপাড়া ও ফুলবাড়িয়া নামক স্থানদ্বয়ের নামকরণ হইয়াছে। উদুনা ও পদুনা নাম্নী হরিশ্চন্দ্রের কন্যাদ্বয় গোবিন্দচন্দ্রের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। ধর্ম্মের জন্য তিনি স্বীয় পুত্রকেও বলি প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। স্বীয় রাজ্যে মধ্যে তিনি ৫০টী জলাশয় খনন করিয়াছিলেন, উহা এক্ষণেও সর্ব্বসাধারণের নিকটে "সাড়ে বার গণ্ডা" বলিয়া পরিচিত। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় সহোদরা রাজেশ্বরীর গর্ভসম্ভূত দামোদর মাতুলের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি এতদঞ্চলে দামুরাজা বলিয়া পরিচিত। রাজা দামোদর হইতে একাদশ অধস্তন রাজা শিবচন্দ্র নীলাচলে পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের পরে এই রাজবংশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িলে, উঁহারা সর্ব্বেশ্বরনগরী পরিত্যাগ করিয়া কোণ্ডা, গান্ধারিয়া, চান্দুলীয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে থাকেন।

ছাইলা কাসমা নামক স্থানে লম্বা প্রাচীরাকার উচ্চমঞ্চে চাদমারি অর্থাৎ সৈন্যদিগের তীরচালনা দ্বারা লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিবার স্থান ছিল। "চাইরাচৌমাথা" ও "মেরীখোলা" নামক স্থানে পালরাজগণের

প্রতিষ্ঠিত দুইটী বাজার ছিল। চারিটী বিস্তীর্ণ পথের সঙ্গমস্থলে বাজার অবস্থিত ছিল বলিয়া উহা "চাইরাচৌমাথা বাজার নামে অভিহিত হইত। কর্ণপাড়ায় একটী মাটির উচ্চমঞ্চ এখনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মঞ্চের তলস্থ ভূমির পরিমাণ প্রায় একবিঘা হইবে। উহার ভিত্তিও অর্দ্ধবিঘাপরিমিতস্থানব্যাপী। সাভারে হরিশ্চন্দ্র এবং তাহার কিয়ৎকাল পরে মাধবপুরে যশোপাল রাজত্ব করেন। গান্ধারপুরে রাবণরাজার বাড়ীর ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। ইনি রাজাহরিশ্চন্দ্রের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। সর্ব্বেশ্বর নগরের (সাভার) পূর্ব্বাংশে বলীমেহার নামক স্থানে হরিশ্চন্দ্রের পরিখাবেষ্টিত অন্তঃপুরের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত কর্ণপাড়া, কুমরাইল, রাজাসন, ফুলবাড়িয়া, রাজাঘাট, কোঠবাড়ী, সেনাপাড়া, প্রভৃতি স্থানে পালবংশীয় নৃপতিগণের কীর্ত্তি কলাপের বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যশোপাল কর্ত্তৃক ধামরাইএর মাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা যশোমাধব নামে সুপরিচিত। সুয়াপুর গ্রামের পূর্ব্বে, নান্নার গ্রামের পশ্চিমে বাজাসন নামক মৌজায় কৈকুড়িবিলের তীরে বহুকালের পতিত "ভিটা" ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। বাজাসন বজ্রাসন শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াও কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। এখানকার মৃত্তিকা খনন করিলে কোনপ্রকার বৌদ্ধ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে।

প্রবাদ এই যে "শক্তি সম্প্রদায়ী সুয়াপুর গ্রামবাসী জনগণের পূজিত পুষ্পাঞ্জলী জবা প্রভৃতি পুষ্প জলে ভাসিতে দেখিয়া বাজাসনবাসী লোকদিগের উক্ত পুষ্পদ্বারা দেবার্চ্চন করিতে ইচ্ছা হয়। উহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী ছিল। এই ঘটনার পরে তাহারা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া শাক্ত গুরুর শিষ্য হয়। নান্নারগ্রামে অদ্যাপি এক চণ্ডাল বাড়ীতে বনদুর্গার

নিকট বন্যবরাহ বলি প্রচলিত আছে। এই অঞ্চলের অনেকানেক স্থানেই বনদুর্গার নিকটে বরাহবলির প্রথা প্রবর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়।

পালবংশীয় নরপতিগণের অধঃপতনের পর এতদঞ্চল গাজীবংশীয়গণের হস্তগত হয়। মোসলমান শাসন সময়ের প্রারম্ভে এবং গাজীবংশীয়গণের প্রাধান্য লাভের পূর্ব্বে কাজীদিগের হস্তেই বিচারভার ন্যস্ত ছিল। কাজীগণ সাভার গ্রামে বাস করিতেন। কাজীগণের নামানুসারেই "কাজীর গাঙ্গ" নদীর নামকরণ হইয়াছে।

আগলা, আমতা, আটিগ্রাম. ইলিচপুর, উথুলি, উলাইল, কর্ণপাড়া, কলতা, কলাকোপা, কাঞ্চনপুর, কালিয়াকৈর, কাশিমপুর, কালিকাপুর, কিরঞ্জি, কুমরগঞ্জ, কুণ্ডড়া, কুমরাইল, কুণ্ডকহাটী, কৈলাল, কোঠবাড়ী, খলসী, গড়পাড়া, গালা গালিমপুর, গোবিন্দপুর, চান্দহর, চোরাইল, চৌহাট, ছনকা, জয়মণ্ডপ, জয়পুরা, জয়কৃষ্ণপুর, জাগির, জাফরগঞ্জ, ঝাউকান্দা, ঝিটকা, তরা, তুইতাল, তেতুলঝোড়া, তেওতা, দত্তগ্রাম, দাসরা, দাউদপুর, দেবতারপটি, দোহার, ধানকোড়া, ধামরাই, ধুল্লা, নবগ্রাম, নয়াবাড়ী, নটাখোলা, নবাবগঞ্জ, নারিশা, নালী, নান্নার, পারাগাঁও, পৈলা, ফিরিঙ্গিপাড়া, ফুলবাড়িয়া, বরাদিয়া, বর্দ্ধনপাড়া, বানিয়াজুরী, বালিশূর, বালিয়াটি, বায়রা, বান্দুরা, বুতুনী, বেতুলিয়া, মত্ত, মহাদেবপুর. মামুদপুর, মাধবপুর, মাহিয়ারী, মাণিকগঞ্জ, মাণিকনগর, মাসাইল, মিতরা, মুকসুদপুর, মৈনট, যন্ত্রাইল, যাদবপুর, রঘুনাথপুর, রাইপাড়া, রাজাসন, রাজারামপুর, রাজখারা, রূপসা, রোয়াইল, লক্ষ্মীকোল, লেছরাগঞ্জ, শিকারীপাড়া, শিবালয়, ষাটঘর, সরুপাই, সাতুরিয়া, সাভার, সানপুকুর, সিঙ্গৈর, সিয়ালোআর্চ্চা, সূয়াপুর, সুঙ্গর, সুরগঞ্জ, সেনাপাড়া, সোল্লা, হরিশকুল, হাটিপাড়া, হোসনাবাদ প্রভৃতি গ্রাম এই বিভাগের অন্তর্গত।

(৫) পারজোয়ার—এই স্থানটি দ্বীপাকার; উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা বুড়িগঙ্গা, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা ধলেশ্বরী। "জোয়ার" শব্দের অর্থ "অঞ্চল" এবং "পার" অর্থ "তট"; এজন্য ধলেশ্বরী (ইছামতী) ও বুড়িগঙ্গা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী এই দ্বীপাকার ভূখণ্ডের নাম "পারজোয়ার" হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা সমতটের অন্তর্গত ছিল। পারজোয়ারের মৃত্তিকাতে বালুকার অংশই অধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থানের পুষ্করিণী খনন করিলে তাহা শীঘ্রই ভরাট হইয়া যায়। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পারজোয়ার স্থানটি ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার চর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এখানকার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। পারজোয়ার স্থানটিকে ঢাকা সহরের দ্বারদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আটি, আলিতা, আড়াকুলা, আইস্তা, কলাতিয়া, কলসতা, কেরাণীগঞ্জ, কোণ্ডা, খাগাইল, জিঞ্জিরা, ঠাকুরপুর, তেঘরিয়া, দোলেশ্বর, ধীৎপুর, ধুলপুর, নয়ামাটি, নরুণ্ডি, নদিয়াপাড়া, নাজিরপুর, নোয়াদ্দা, পশ্চিমদী, পটকাযোড়, পাইনা, পানগ্রাম, পারাগাঁও, পাচলী, পূর্ব্বদী, বরিশুর, বনগ্রাম, বাছণ্ডী, বাঘৈর, বাসতা, ব্রাহ্মণকীর্ত্তা, বেঞ্জারা, বেলনাট, বোয়াইল, মদনমোহনপুর, মালঞ্চ, মান্দাইল, মীরেরবাগ, রোহিতপুর, লক্ষ্মীগঞ্জ, শ্রীধরপুর, শিয়ালী, শুভড্যা, শাক্তা, প্রভৃতি গ্রাম এই বিভাগের মধ্যে প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উষ্ণোৎস ও নদনদী।

(ক) উষ্ণোৎস।

মধুপুরের রক্তবর্ণ কঙ্কর পরিপূর্ণ মৃত্তিকাতে, ঢাকা নগরীর উত্তরে মীর্জ্জাপুর গ্রামে এবং বর্ম্মি ও পলাসের সন্নিকটে উষ্ণোৎস পরিলক্ষিত হয়।

(খ) নদনদী।

ঢাকা জেলা নদীমাতৃকস্থান; বহুসংখ্যক নদনদী এই জেলার বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নদনদী গুলির মধ্যে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনাদ, পদ্মা, কীর্ত্তিনাশা, যমুনা, ধলেশ্বরী, ইছামতী, লাক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা, ও বানার প্রধান। বংশী, তুরাগ, বালু, সিংসহ, এলামজানী, আলম, ভিকজথা, রামকৃষ্ণদী, ইলিসামারী, তুলসীখালী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী। এতদ্ব্যতীত সালদহ, লবনদহ ও গোয়ালিয়ার প্রভৃতি পার্ব্বত্যনদী মধুপুরজঙ্গলস্থিত কঠিন মৃত্তিকারাশি ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সাধারণতঃ যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, ও মেঘনাদ এই কয়টি প্রধান নদনদী হইতেই অন্যান্য সমুদয় স্রোতস্বতীর উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত চারিটি নদীর সহিত অপরাপর পয়োপ্রণালীগুলির সম্বন্ধ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(ক) এলামজানী (ধলেশ্বরীর উর্দ্ধতন নূতন প্রবাহ) হইতে উৎপন্ন—১। আলম নদী চৌহাট ঝিলে পতিত হইয়াছে।

১। যবুনা (ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ও পশ্চিমদিকস্থ প্রবাহ) হইতে উৎপন্ন—

ধলেশ্বরী হইতে—

১। গাজীখালী নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

২। সুঙ্গার নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

৩। বুড়িগঙ্গা নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

৪। বয়রাগাদী নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

(ক) তালতলা খাল তরতিয়া খালে পড়িয়াছে।

(৫) সিঙ্গড়া নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

(৬) মীরকাদিমের খাল সেরাজাবাদের নদীতে পড়িয়াছে।

(খ) ধলেশ্বরী (উর্দ্ধতন প্রাচীনপ্রবাহ) হইতে উৎপন্ন—

(১) ঘিয়র খাল ইছামতীতে পড়িয়াছে।

(২) তরানদী কালীগঙ্গাতে পড়িয়াছে।

(৩) ইছামতী নদী ধলেশ্বরীতে ,,

(ক) মহাদেবপুরের খাল কালীগঙ্গায় পড়িয়াছে।

(খ) তুলসীখালী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

(গ) গোয়ালখালী ,, ,,

(ঘ) কুচিয়ামোড়ার খাল ,, ,,

(ঙ) শ্রীনগরের খাল তরতিয়া খালে পড়িয়াছে।

২। ব্রহ্মপুত্র (প্রাচীন ও পূর্ব্বদিকস্থ প্রবাহ) হইতে উৎপন্ন—

১। বংশীনদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে

(বংশীনদী হইতে উৎপন্ন)

(ক) তুরাগনদী বুড়িগঙ্গায় পড়িয়াছে।

(তুরাগ হইতে উৎপন্ন)

(ক) টঙ্গীনদী লাক্ষ্যাতে পড়িয়াছে।

(টঙ্গীনদী হইতে উৎপন্ন)

(ক) বালুনদী লাক্ষ্যাতে পড়িয়াছে।

(বালুনদী হইতে উৎপন্ন)

(ক) দোলাইখাল বুড়িগঙ্গায় পড়িয়াছে।

(২) বানার (এই নদীর নিম্নপ্রবাহ লাক্ষ্যা নামে পরিচিত) নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

(৩) আরালিয়া খাল লাক্ষ্যায় পড়িয়াছে।

(৪) কাইঠাদী নদী ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে।

(৫) আড়িয়লখাঁ বা পাহাড়ী নদী মেঘনাদে পড়িয়াছে।

(৩) পদ্মানদী হইতে উৎপন্ন— (১) মৈনটখাল ইছামতীতে পড়িয়াছে।

(২) ইলিসামারী ,, ,,

(৩) তরতিয়া খাল ,, ,,

(৪) বহরের খাল ,, ,,

(৫) কীর্ত্তিনাশা পদ্মায় পড়িয়াছে।

(৪) মেঘনাদ হইতে উৎপন্ন— (১) সেরাজাবাদের নদী মেঘনাদে পড়িয়াছে।

(২) কাচিকাটা কীর্ত্তিনাশায় পড়িয়াছে।

মেঘনাদ হইতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী বহির্গত হইয়াছে; উহাদের নির্দ্দিষ্ট কোনও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

(৫) মধুপুরজঙ্গল হইতে উৎপন্ন—

১। সালদহ তুরাগ নদীতে পড়িয়াছে।

২। লবনদহ ,, ,, ,,

৩। গোয়ালিয়ার খাল ,, ,,

ব্রহ্মপুত্র—"১৮৪৭ খৃঃঅব্দে Lieutenant Henry Strachy এবং ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে Mr. Jodince মহাত্মাদ্বয় তিব্বৎদেশীয় "যার কিউ-সাংপো" কে ব্রহ্মপুত্রের মূলস্রোতঃ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই যার কিউসাংপো হিমালয়ের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে উপনীত হইয়া বঙ্কিম ভাবে গতি পরিবর্ত্তন করতঃ মিসমী জাতীর বাস পর্ব্বতের মধ্যদিয়া পরশুরাম কুণ্ডে পতিত হইয়াছে। তদনন্তর, ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত হইয়া সদিয়া, ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী প্রভৃতি আসামস্থ অনেক স্থান অতিক্রম করতঃ রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহ জেলার মধ্যদিয়া আসিয়া টোকচাঁদপুরের নিকট ঢাকা জেলার উত্তর সীমায় পড়িয়াছে; এবং তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে চারিমাইল পথ অতিক্রম করিয়া পুনরায় ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। অতঃপর ময়মনসিংহ জেলার মধ্যদিয়া কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া নারায়ণগঞ্জ মহকুমার উত্তর সীমা রক্ষা করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছে, এবং রায়পুরা থানার পূর্ব্বদিকে আসিয়া মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। টোকচাঁদপুর হইতে মেঘনাদ ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থান প্রায় ২৬ মাইল হইবে। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন ও পূর্ব্বদিকস্থ যে প্রবাহ ঢাকাজেলাস্থ টোক নামক স্থান স্পর্শ করিয়া ভৈরব বাজারের নিকটে মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, উহা এই জেলাকে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলা হইতে পৃথক করিয়াছে। কৈঠাদি হাটের নিকট,হইতে ইহার এক শাখা দক্ষিণ ভাগে প্রবাহিত হইয়া ১২ মাইল পথ অতিক্রম করতঃ বেলাব নামক স্থানের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে পুনরায় প্রধান প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের একস্রোতঃ মঠখোলা নামক স্থানে বানারের সহিত মিলিত হইয়া একডালার নিম্নে শীতললক্ষ্যা নাম ধারণ করিয়াছে। অপর একস্রোতঃ দক্ষিণমুখে সরল গতিতে সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত

নরসিংদী, পাচদোনা, মাধবদী, মনোহরদী, বালিয়াপাড়া, মহজুমপুর, পঞ্চমীঘাট, লাঙ্গলবন্ধ, কাইকারটেক হইয়া সোনারগাঁও পরগণার দক্ষিণে শীতললক্ষ্যার শেষ সীমায় মিলিত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, এই স্রোতঃ ও মেঘনাদ পুরাকালে একস্রোতঃই ছিল।

বেলাব হইতে এক শাখা আইরলখাঁ নামে প্রবাহিত হইয়া নরসিংহদীর সন্নিকটে মেঘনাদে মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের অনতিদূরে এই আইরলখাঁ হইতে উৎপন্ন হইয়া হাড়িধোয়া নামে এক ক্ষুদ্র শাখা নাগরদী, গুপ্তপাড়ার নিকটে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের এক স্রোতঃ সোনারগাঁ পরগণাকে স্বাভাবিক নিয়মে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের-প্রাচীন-খাত—প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র টোকচাঁদপুরের পূর্ব্বদিকে আসিয়া সোনারগাঁও—মহেশ্বরদী পরগণার মধ্যদিয়া ঢাকা জেলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তথা হইতে দক্ষিণ বাহিণী হইয়া সহর সোনারগাঁয়ের পশ্চিমদিক দিয়া প্রবাহিত হইত। এই প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র কলাগাছিয়ার সন্নিকটে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া মেঘনাদে পতিত হইত। এই নদী এখন মরা নদী বলিয়া অভিহিত হয়। ইহারই তীরে লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমী ঘাট অবস্থিত।

লৌহিত্য—রামায়ণে ব্রহ্মপুত্রের নাম পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু মহাভারতে এই নদীর নাম লৌহিত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে ব্রহ্মপুত্র নামই দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমানকরেন যে বিশ্বামিত্রবংশীয়গণের দশবিধ শাখার এক শাখার নামানুসারে ইহার নাম "লৌহিত্য" হইয়াছে।

কালিকাপুরাণের ৮৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে "লোহিত্যাং সরসো-জাতো লৌহিত্যাখ্যস্ততোঽভবৎ"। পরশুরাম নাকি পার্ব্বত্য পথদিয়া

ইহাকে ভারতে অবতারিতা করেন। বৌদ্ধদিগের মতে মঞ্জুঘোষ ব্রহ্মপুত্রকে সমতল ক্ষেত্রে আনয়ন করেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আছে, "কৈলাস শৈলের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে পিশঙ্গ নামক সুবৃহৎ পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে "লোহিত" নামে এক হেমশৃঙ্গশৈল অবস্থিত আছে। ইহার পাদদেশস্থ লোহিত নামক সরোবর হইতে পুণ্যতোয়া "লৌহিত্য নদ" প্রাদুর্ভূত হইয়াছে"।

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, পুণ্ড্রাজ্যের অধিবাসীগণ লোহিণীর জলপান করিয়া থাকে; কূর্ম্মপুরাণের "লোহিণী" লৌহিত্যেরই নামান্তর মাত্র বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।

Ptolemy বলেন যে গঙ্গার পূর্ব্বতন শাখার নাম ছিল "আন্তিবল" বা "আহ্লাদন"! হ্লাদিণী বা হ্রদন শব্দ নস্তর্থক। বিলফোর্ড বলেন (Asiatic Researches vol XIV P. 444). ব্রহ্মপুত্রের এক নাম হ্রদন (Hradana); ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত হ্লাদিণী নদীকেই সম্ভবতঃ তিনি Hradana বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন। মৎস্যপুরাণে ৫১ অধ্যায়ে হ্রদিনীর উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে

সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ইবন বেতুতা এই নদীকে Blue river বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক De Barros ব্রহ্মপুত্রের নাম দিয়াছেন Caor নদী।

লৌহিত্য সাগর :—অনেকানেক লেখকই লৌহিত্য সাগরের অবস্থান-সম্বন্ধে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে "মহাবল পরশুরাম লোহিত সরোবরের তীরে উঠিয়া কুঠারাঘাতে পথ প্রস্তুত করতঃ ব্রহ্মপুত্র নদকে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত করিলেন। অনন্তর জামদগ্ন্য কিয়দ্দূর পরে হেমশৃঙ্গ গিরি ভেদ করিয়া, কামরূপ পীঠের মধ্য দিয়া এই নদকে প্রবাহিত করিলেন।

স্বয়ং ব্রহ্মা, তাঁহার নাম রাখিলেন লোহিত। লোহিত সরোবর হইতে নিঃসৃতবলিয়া উহার আর একটি নাম লৌহিত্য। ব্রহ্মপুত্র নদ, জলরাশি দ্বারা সমস্ত কামরূপ পীঠ প্লাবিত ও সর্ব্বতীর্থ গোপন করিয়া দক্ষিণ সাগরের অভিমুখে চলিয়াছে"।

মহা প্রস্থান কালে অর্জ্জুন উদয়াচলের প্রান্তস্থিত লৌহিত্য সাগরে গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে, উদয়াচলের প্রান্ত সীমা কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল তাহা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যায় না।

কেহ কেহ অনুমান করেন ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীরবর্ত্তী ভূভাগ এই লৌহিত্য সাগর গর্ভে বিলীন ছিল। তাহা হইলে বলিতে হয়, বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলা সহ বঙ্গের অধিকাংশ স্থানই লৌহিত্য সাগরের কুক্ষিগত ছিল।

মেঘনাদ—মেঘনাদ নদ ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বসীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঢাকা জেলার পূর্ব্বোত্তর সীমায় ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলিত প্রবাহই মেঘনাদ নামে পরিচিত। মেঘনাদ অতঃপর ঢাকা জেলার পূর্ব্বসীমা রক্ষা করতঃ দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে। এই নদী দ্বারা ত্রিপুরা ও ঢাকা জেলার স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে। মেঘনাদের প্রবাহ ঢাকা জেলার দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে আসিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল হইতে পদ্মার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত মেঘনাদ প্রায় ৯০ মাইল দীর্ঘ। সাধারণতঃ কন্দর্পপুরের মোহানাই পূর্ব্বে পদ্মা ও মেঘনাদের সম্মিলন স্থান ছিল।

গাড়ো, কাছাড় এবং শ্রীহট্টের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীর সম্মিলনেই মেঘনাদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সম্মিলিত প্রবাহ শ্রীহট্ট, ও ময়মনসিংহজেলাস্থিত নিম্নভূমি ও ঝিল সমূহের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে মেঘনাদের উপরিভাগের উচ্চতার পার্থক্য অতি সামান্য মাত্র। এ জন্যই মেঘনাদের

ন্যায় এরূপ সুবিশাল নদের প্রবাহ অতি মন্থর; এবং প্রবাহও একটি মাত্র খাতমধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া বহুসংখ্যক শাখানদী ও নালার সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীহট্টস্থ ঝিলসমূহ হইতে আনীত উদ্ভিজ্জও জান্তব পদার্থের সংমিশ্রণ হেতু এই নদীর জল ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এবং অপেয়। কিন্তু এজন্যই মেঘনাদে মৎস্যাধিক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অন্য কোনও স্রোতস্বতীতেই মৎস্যের এরূপ প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয় না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মেঘনাদকে Cosmin বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (১)। মেগেস্থেনিস এই নদীর নাম দিয়াছেন "মেগোন" (২)।

পদ্মা—পদ্মানদী, পাবনা ও ফরিদপুর জেলার সীমারূপে আসিয়া ঢাকাজেলার পশ্চিম সীমায় যবুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। মুগিডাঙ্গার নিকট "ভেলবারিয়া" ফ্যাক্টরির উত্তর পশ্চিমাংশ স্পর্শকরিয়া গোয়ালন্দের নিকট যবুনার সহিত ইহার সম্মিলন ঘটিয়াছে। এই সংযোগ সাধারণতঃ "বাইশকোদালিয়ার মোহানা" নামে পরিচিত। বর্ষার সময়ে উহার জলস্রোতঃ এরূপ প্রবলভাবে দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইতে থাকে যে অতি বেগগামী আসামষ্টীমার পর্য্যন্ত উহা ভেদ করিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের এক রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ বৎসর ৬ খানা ফ্লাট সহ ষ্টীমার পদ্মা-যবুনা-সংযোগ ভেদ করিয়া উঠিতে না পারায় কতকদিন পর্য্যন্ত গোয়ালন্দে লঙ্গর করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। কর্ণেল গেষ্টন কর্ত্তৃক পরিমাপে তৎসময়ে গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মার প্রশস্ততা গ্রীষ্ম কালেও ১৬০০ গজ বলিয়া অবধারিত হয়।

---

(১) See Malte Brun's Geography vol III, Page 122.
(২) Asiatic Researches vol XIV.

যমুনার সহিত মিলিত হইয়া পদ্মা এই জেলার দক্ষিণ সীমা রক্ষা করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া জেলার পূর্ব্বদক্ষিণকোণে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং পদ্মা, মেঘনাদ ও ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত প্রবাহ দক্ষিণবাহিনী হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে।

পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ—পূর্ব্বে পদ্মানদী ফরিদপুর জেলার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার মেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত কন্দর্পপুরের সন্নিকটে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইত। এই প্রাচীন প্রবাহ এখন ময়নাকাটা ও আড়িয়লখাঁ নামে পরিচিত।

পদ্মার গতি পরিবর্ত্তন অতি বিচিত্র। উহার মধ্যে এমন সমুদয় চরের উদ্ভব হয় যে, কোন ষ্টিমার সপ্তাহকাল পূর্ব্বে যে স্থান অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তৎপরবর্ত্তি সপ্তাহে আর সে স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বে যে স্থান ক্ষীণতোয়া ছিল, উহাই আবার গভীর হইয়া পড়িয়াছে, পরিলক্ষিত হয়।

এই নদী কোনও সময়ে মধুমতি ও হরিণাঘাটার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য একটি প্রধান শাখা অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতে নদীয়া ও যশোহর জেলার নদীগুলি প্রায়ই বন্ধ হইয়াছে। নৌকাযোগে পূর্ব্বে এই সকল নদী বাহিয়া পশ্চিমবঙ্গে, এমন কি, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ সমূহেও যাতায়াত করিতে পারা যাইত এবং ষ্টিমার চলাচলেরও বাধা ছিল না। এখন মধুমতি ও হরিণাঘাটা অবলম্বনে সুন্দরবনের মধ্য অথবা নিম্ন দিয়া পশ্চিম বঙ্গে যাইতে হয়।

পদ্মা বা পদ্মাবতীর নাম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দৃষ্ট হয়। উহাতে পদ্মাবতী গঙ্গার শাখানদী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে! ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও দেবীভাগবতে ইহাকে স্বতন্ত্র নদী বলা হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৩১ অধ্যায়ে পদ্মা-গঙ্গা-সঙ্গম তীর্থস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

কোনও সময়ে পদ্মানদী কাহালগায়ের সন্নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, এবং অমৃতির নিকট উহা পুনরায় পৃথক হইয়া পড়ে। কৌশিকী নদীর জলস্রোত প্রবলবেগে আসিয়া গঙ্গার প্রবাহকে পদ্মার সলিলরাশির মধ্যদিয়া প্রবাহিত করায় ক্রমে পদ্মা প্রবল হইয়া উঠে। ফলে উহার উপরদিকস্থ প্রবাহটির বিলোপ সাধন হয় (১)।

আইন ই আকবরী এবং ডি বেরোসের মানচিত্রে পদ্মাকে বড়নদী বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে।

কীর্ত্তিনাশা—পদ্মার যে অংশ বিক্রমপুর ভেদ করিয়া মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে, উহার নাম কীর্ত্তিনাশা; প্রকৃত প্রস্তাবে পদ্মার গতি বিক্রমপুরের পশ্চিমদিক পরিত্যাগ করিয়া মরাপদ্মা নামে এবং প্রবলাংশ যাহা প্রায় শত বৎসর মধ্যে উদ্ভব হইয়া প্রাচীন কালীগঙ্গা নদীর বিলোপ সাধন করিয়াছে, উহাই কীর্ত্তিনাশা নামে পরিচিত।

মিঃ রেণেল ১৭৮০ খৃঃ অব্দে পূর্ব্ববঙ্গের যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, পদ্মানদী বিক্রমপুরের বহু পশ্চিমদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভুবনেশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। তখন "কার্ত্তিনাশা" বা "নয়াভাঙ্গনী" নামে কোনও নদীর অস্তিত্ব ছিল না। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগর ও ভদ্রেশ্বর গ্রামের মধ্যে একটি অপ্রশস্ত জলপ্রণালী মাত্র বিদ্যমান ছিল। উহা প্রাচীন কালীগঙ্গার শেষ চিহ্নমাত্র। শ্রীপুর, নওপাড়া, ফুলবাড়িয়া, মুলফৎগঞ্জ প্রভৃতি

(১) পুরাকালে গঙ্গার প্রধান প্রবাহ ভাগীরথীর সলিলরাশি ভেদ করিয়াই চলিয়াছিল। কিম্বদন্তি আছে, কোন দৈত্য গঙ্গাকে পদ্মার পথে ভুলাইয়া লইয়া যায়। আমাদের বিবেচনায় রূপকচ্ছলে পলিমাটিকেই দৈত্য বলিয়া এখানে কল্পনা করা হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ গ্রাম সমূহ কালীগঙ্গার তটে বিদ্যমান ছিল। পরে শত বৎসরের মধ্যে কীর্ত্তিনাশা নদীর উৎপত্তি হইয়া বিক্রমপুরের বক্ষদেশ ভেদ করিয়া এবং নয়াভাঙ্গনী নদী উদ্ভূত হইয়া ইদিলপুরের প্রান্তদেশ ধৌত করিয়া পদ্মা ও মেঘনাদ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়া যখন প্রবাহিত হইত, তখন উহার স্রোতবেগ প্রবল থাকায় পদ্মাকে বহু পশ্চিমে রাখিয়াছিল। পরে আবার যখন ব্রহ্মপুত্রের সহিত মেঘনাদের ততটা সম্বন্ধ রহিল না, এবং ব্রহ্মপুত্র যমুনার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইল, তখন পদ্মার বেগই প্রবল হইয়া ক্রমে পশ্চিম দিক পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার ফলস্বরূপই কীর্ত্তিনাশা ও নয়াভাঙ্গনী নদীর উদ্ভব।

১৭৮০ খৃঃ অব্দের মানচিত্রে কীর্ত্তিনাশার নাম পরিদৃষ্ট হয় না। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে মিঃ টেইলার, তদীয় "টপোগ্রাফি অব ঢাকা" পুস্তকে "কাথারিয়া" বা "কীর্ত্তিনাশা" নদীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। চাঁদ ও কেদার রায়ের এবং নওপাড়ার চৌধুরীদিগের কীর্ত্তিধ্বংশ করায় উহার নাম কীর্ত্তিনাশা হইয়াছে। পরে মহারাজ রাজবল্লভের কীর্ত্তিনিকেতন ভগ্নকরিয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। এই নদী প্রথমে "রথখোলা" পরে "ব্রহ্মবধিয়া," পরে "কাথারিয়া" এবং সর্ব্বশেষে "কীর্ত্তিনাশা" নামে পরিচিত হইয়াছে। এই নদী দ্বারা বিক্রমপুর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

ধলেশ্বরী—ধলেশ্বরী যমুনার একটি শাখানদী। বর্ত্তমান সময়ে এই নদী যমুনার শাখানদী বলিয়া পরিচিত হইলেও যমুনা হইতে এই নদী অনেক প্রাচীন। ধলেশ্বরী ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী সলিমাবাদ নামক স্থানের নিকট যমুনা হইতে বহির্গত হইয়াছে। এই স্থান

হইতে প্রথমতঃ দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয়, তৎপর কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাহিনী হইয়া কিঞ্চিৎ উত্তরদিকে গমন করিয়াছে; এবং পুনরায় দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে মাণিকগঞ্জ পর্য্যন্ত আগমন করিয়া ক্রমে সাভার পর্য্যন্ত পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হয়। সাভার হইতে ফুলবাড়িয়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে আসিয়া বুড়িগঙ্গার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থান হইতে ক্রমে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে রোহিতপুর, কুচিয়ামোড়া, পাথরঘাটা এবং রামকৃষ্ণদীর নিকট দিয়া গমন করতঃ পাইনার দক্ষিণে সিংদহ নামক ইহার একটি শাখা নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ঐ স্থান হইতে পশ্চিমদী, সরাইল, কোণ্ডা, প্রভৃতি স্থান দিয়া কতকদূর পর্য্যন্ত পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ভুইরার সন্নিহিত স্থান হইতে নারায়ণগঞ্জ এবং মদনগঞ্জ বন্দরদ্বয়ের দক্ষিণে লাক্ষ্যানদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিকে মেঘনাদ নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। লাক্ষ্যা, ধলেশ্বরী এবং মেঘনাদ এই তিনটি নদীর সঙ্গমস্থল অত্যন্ত ভয়ানক। এই স্থানকে "কলাগাছিয়া" বলে। মুন্সীগঞ্জ, ফিরিঙ্গী বাজার, রিকাবীবাজার, মিরকাদিম, আবদুল্লাপুর, তালতলা, ফুরশাইল, বয়রাগাদী প্রভৃতি গ্রাম ইহার দক্ষিণ তটে অবস্থিত।

যবুনার উৎপত্তির পূর্ব্বে ধলেশ্বরী, করতোয়া ও আত্রেয়ী এই নদীত্রয়ের সম্মিলিত প্রবাহ হুরাসাগরের সহিত মিলিত ছিল। যবুনার উৎপত্তির পর হইতে করতোয়ার সহিত ধলেশ্বরী নদীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমদক্ষিণকোণ হইতে যবুনার একটি শাখা আসিয়া ধলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়া উহাকে যবুনার একটি শাখা নদী রূপে পরিণত করিয়া ফেলে। আলমনদী খুলিয়া যাওয়ায় পাহাড়পুর এবং সাভারের মধ্যস্থিত ধলেশ্বরী নদী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে।

কালীগঙ্গা—পারাগায়ের সন্নিকটে ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া চারিগাঁয়ের নদীতে পড়িয়াছে। পারাগাঁও, মাতাবপুর, কোণ্ডা, মুষ্টিগ্রাম, ফতেপুর, কুমিল্লি প্রভৃতি গ্রাম ইহার তীরে অবস্থিত।

বিক্রমপুরে কালীগঙ্গা নামে একটি স্রোতস্বতীর ক্ষীণ রেখা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই উভয় নদী একই নদী বলিয়া পরিচিত ছিল। পরে, পদ্মার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ইহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

এক্ষণে মুলফৎগঞ্জ ও কোঁয়রপুরের সন্নিকটে শেষোক্ত কালীগঙ্গা নদীর চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

কালীগঙ্গা নদীতে যথেষ্ঠ পরিমাণে মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বানার ও লাক্ষ্যা বা শীতল লক্ষ্যা—এই নদীর উত্তরাংশ বানার বলিয়া পরিচিত। ইহা এগারসিন্ধু নামক স্থানের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে টোকের নিকট বানার নাম ধারণ করিয়া গমন করতঃ লাখপুরের নিকটে লাক্ষ্যা নাম ধারণ করিয়াছে। এই লাক্ষ্যা নদী পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের একটি স্বতন্ত্র শাখা নদী ছিল। কিন্তু আরালিয়া হইতে লাখপুর পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায়, একমাত্র বানারের প্রবাহই এই নদী দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে বানারের সম্প্রসারণ মাত্র করিয়া ফেলিয়াছে। লাখপুর হইতে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে ৫ মাইল পর্য্যন্ত আসিয়া একুটার সন্নিকটে দক্ষিণপশ্চিমবাহিনী হইয়াছে। এই স্থান হইতে লাক্ষ্যানদী পলাস, মুড়াপাড়া, হাজিগঞ্জ, নবীগঞ্জ প্রভৃতি স্থান দিয়া ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জের দক্ষিণে ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে! ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন ও পূর্ব্বদিকস্থ প্রবাহ শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে; কেবল মাত্র বর্ষাকালেই নৌবাহন যোগ্য থাকে। সুতরাং এক্ষণে বানার ও

লাক্ষ্যানদীই ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বদিকস্থ পয়ঃপ্রণালীর প্রধান প্রবাহ বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে।

লাক্ষ্যা নদীর তীরভূমি অতি উচ্চ ও বৃক্ষরাজিসমাচ্ছন্ন। ইহার জল অতি নির্ম্মল ও সুস্বাদু ; এজন্য এই স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতী শীতল-লক্ষ্যা নামে অভিহিত।

বর্ম্মি, কাপাসীয়া, লাখপুর, কালীগঞ্জ, রূপগঞ্জ, মুড়াপাড়া, ডেমরা, সিদ্ধিগঞ্জ, হাজিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, প্রভৃতি বন্দর লাক্ষ্যাতীরে অবস্থিত।

যোগিনীতন্ত্রে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের যে সীমা নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহাতে লাক্ষ্যানদীর উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বুড়িগঙ্গা—বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরীর একটি শাখানদী। সাভার থানার ৪ মাইল দক্ষিণে ফুলবাড়িয়ার নিকট ধলেশ্বরী হইতে বহির্গত হইয়া নারায়ণগঞ্জের ৪ মাইল পশ্চিমে ভুইরা নামক স্থানে ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। প্রথমতঃ এই নদী কিঞ্চিৎ দক্ষিণপূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হয়, তৎপর উত্তরপূর্ব্ববাহিনী হইয়া কেরাণীগঞ্জের নিকট হইতে শামপুর, মীরেরবাগ দিয়া ফতুল্লা পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে গমন করিয়াছে। ফতুল্লার নিকট হইতে ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ভবানীগঞ্জ দিয়া ভুইরা নামক স্থানে ধলেশ্বরীর সহিত পুনরায় মিলিত হইয়াছে। বুড়িগঙ্গা প্রায় ২৬ মাইল দীর্ঘ। এই নদী ২৬ মাইল দীর্ঘ ও প্রায় ৬ মাইল প্রস্থ ভূখণ্ডকে একটি দ্বীপাকারে পরিণত করিয়াছে। এই দ্বীপাকার ভূভাগই পারজোয়ার নামে অভিহিত। বুড়িগঙ্গা ক্রমে শুষ্ক হইয়া চড়া পড়িয়া যাইতেছে।

কালিকাপুরাণে এই নদীর নাম উক্ত হইয়াছে। লিখিত আছে, টিকশৈলে একটি সরোবর আছে, উহার মধ্যদেশ হইতে

শঙ্কর কর্ত্তৃক অবতারিতা, গঙ্গার ন্যায় ফলদায়িনী বৃদ্ধগঙ্গানদী উদ্ভূত হইয়াছে।

"অস্তি নাটক শৈলে তু সরো মানস সন্নিভম্।
যত্র সার্দ্ধং শৈল পুত্র্যা জল ক্রীড়াং সদা হরঃ॥

মধ্যভাগাৎ সৃতা যাতু শঙ্করেণাবতারিতা।
বৃদ্ধ গঙ্গাহ্বয়া সাতু গঙ্গৈব ফল দায়িনী"॥ কালিকাপুরাণ,
অশীতিতম অধ্যায় দ্বাদশ ও ষোড়শ সংখ্যক শ্লোক।

ঐ পুরাণেই লিখিত আছে, বৃদ্ধ গঙ্গার জলের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বিশ্বনাথ নামে শিবলিঙ্গ এবং মহাদেবী বিশ্বদেবী অবস্থিত। পূর্ব্বকালে জগৎ পতি মহাদেব, তথায় হয় গ্রীবকে বধ করেন।

"বৃদ্ধ গঙ্গা জলস্যান্ত স্তীরে ব্রহ্মসুতস্য বৈ।
বিশ্ব নাথোহরয়ো দেবঃ শিবলিঙ্গ সমন্বিতঃ॥

বিশ্বদেবী মহা দেবী যোনি মণ্ডল রূপিনী।
হয় গ্রীবেন যুযুধে তত্র দেবো জগৎ পতিঃ॥

হয় গ্রীবং যত্র হত্বা মণিকুটং পুরা গতম্"।

কালিকাপুরাণ অশীতিতম অধ্যায় ২৩—২৫ শ্লোক।

যবুনা (যমুনা বা যিনাই)—যবুনা ব্রহ্মপুত্রের নূতন প্রবাহ। এই প্রবাহ রঙ্গপুরের অন্তর্গত কালীগঞ্জ ও ভবানীগঞ্জের নিকটে ব্রহ্মপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া যিনাই বা যবুনা নাম ধারণ করতঃ ঢাকা জেলার পশ্চিমসীমায় পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পদ্মা ও যবুনার সঙ্গমস্থানের নাম বাইশকোদালিয়ার মোহানা। বর্ষার সময়ে এই মোহানা অতি ভীষণাকার ধারণ করে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর

শেষভাগে যবুনার উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু কালিকাপুরাণে এই নদীর উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তৎকালে ইহা দিব্যযমুনা নামে পরিচিত ছিল।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—

"প্রাগেব দিব্য যমুনাং সত্যক্ত্বা ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
পুনঃ পততি লৌহিত্যে গত্বা দ্বাদশ যোজনম্"। কালিকাপুরাণ
৮৩ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক।

কোনও সময়ে অতিবর্ষানিবন্ধন মাঠে জলপ্লাবন উপস্থিত হইলে জনৈক কৃষক পরিবারের দ্বাবিংশতটি লোক প্রত্যেকে এক এক খানা কোদালী সহ কৃষিক্ষেত্রে উপনীত হয়, এবং বপন কার্য্য অচিরে সম্পন্ন করিবার জন্য পদ্মা-যবুনাভিমুখস্থ ভূখণ্ড খনন পূর্ব্বক ক্ষেত্র হইতে জল নির্গমনের পথকরিয়া দেয়। বর্ষার পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যবুনার প্রবাহ ব্রহ্মপুত্রেরদিকে মন্থর গতিতে চলিয়া এই পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে দ্রুতবেগে পদ্মায় পতিত হইতে থাকে; এবং ২।৩ বৎসর মধ্যে এইরূপে পদ্মা-যবুনার সংযোগে বহুগ্রাম ও প্রান্তর স্বীয় কুক্ষিগত করতঃ অত্যন্ত প্রশস্ততা লাভ করে। বাইশকোদালে প্রথম উদ্ভব বলিয়া উহা "বাইশকোদালিয়া" নামে পরিচিত হইয়া উঠে।

১৭৮৭ খৃঃ অব্দের প্রবল বন্যায় ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ পরিবর্ত্তন হইলে তিস্তা নদী গঙ্গা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়। এই প্রবাহ যবুনার মধ্য দিয়া নূতন পথ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহাই ব্রহ্মপুত্র অথবা যবুনার প্রধান প্রবাহ।

তুরাগ—এই নদী ময়মনসিংহ জেলা হইতে আসিয়া দরিয়া-পুরের নিকটে ঢাকা জেলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তথা হইতে

পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর আসিয়া রাজাবাড়ী, বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে। শেনাতুল্লার সন্নিকটে মোড় ঘুড়িয়া প্রায় সরল ভাবে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে; এবং মৃজাপুর, কাশিমপুর, ধীতপুর, বিরলিয়া, উয়ালিয়া, বনগাঁও প্রভৃতি স্থান তীরে রাখিয়া মীরপুরের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

টঙ্গী নদী তুরাগের শাখা।

শালদহ, লবনদহ, গোয়ালিয়ার নদী মধুপুরের জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া তুরাগের সহিত মিলিত হইয়াছে।

বংশী—ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী; ময়মনসিংহ জেলা হইতে আসিয়া সাভারের সন্নিকটে ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

বালু—লাক্ষ্যার উপনদী; রূপগঞ্জ থানার দক্ষিণে ডেমরার নিকটে লাক্ষ্যাতে পতিত হইয়াছে।

ইছামতী—সাহেবগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া মদনগঞ্জের পূর্ব্বদিকে পুনরায় ধলেশ্বরীতে আসিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম ও দক্ষিণঢাকাস্থ নদীসমূহ মধ্যে ইছামতীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পূর্ব্বে এই নদী জাফরগঞ্জের দক্ষিণে হুরা সাগরের মোহানার বিপরীত দিকে নাথপুরের ফ্যাক্টরীর নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া মুন্সীগঞ্জের নিকটে যোগিনীঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধলেশ্বরীর প্রবল আক্রমণের ফলে এই নদীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

ধলেশ্বরী নদী ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ বলিয়া পরিগণিত হইলে সিঙ্গৈর ও সাভারের মধ্যবর্ত্তী গাজীখালিনদী, বংশীনদীর কতকাংশ, পাথরঘাটা ও রামকৃষ্ণদীর মধ্যস্থিত ইছামতী এবং বয়রাগাদী ও মুন্সীগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী ইছামতী নদী ধলেশ্বরীর সামিল হইয়া পড়ে।

বর্ত্তমান সময়ে এই প্রাচীন নদীটীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় ক্ষীণতোয়া হইয়া পড়িয়াছে। এই নদীর তীরে বহু সমৃদ্ধ জনপদ ও বাণিজ্যস্থান আছে। ইহার উভয় তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ শস্য সম্পদে ঢাকা জেলায় শীর্ষস্থানীয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতিশয় রমণীয়।

পুরাণাদিতে এই নদী ইক্ষুনদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার তীরভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু জন্মিত বলিয়াই ইহার নাম হইয়াছিল ইক্ষুনদী *। মেগেস্থেনিস ইহাকে অক্সিমাতিস (Oxymatis) এবং তিসিয়াস (Ctesias), হাইপোবারাস (Hypobarus) বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

এলাম জানী—যমুনার পশ্চিম দিকস্থ প্রবাহটী এলাম জানী নামে সুপরিচিত। এই নদী তাসরির নীল কুঠির পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া আসিয়া কেদারপুর গ্রামের মধ্য দিয়া তিল্লি গ্রামের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

মীরপুরের নদীতে স্থানে স্থানে ঝিনুক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সমস্ত ঝিনুকের অধিকাংশের মধ্যেই মুক্তার সূক্ষ্ম দানা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সময় সময় উৎকৃষ্ট মুক্তাও মীরপুরের নদীর ঝিনুকে পাওয়া গিয়াছে। এতদঞ্চলে মীরপুরের নদীর এই এক চমৎকার বিশেষত্ব রহিয়াছে।

আলম নদী—এলাম জানী হইতে উৎপন্ন হইয়া চৌহাট ঝিলে পড়িয়াছে। এই নদী প্রায় ২৮বৎসর যাবৎ উৎপন্ন হইয়াছে।

সুঙ্গার, সিংডা, তড়া, কাইঠাদীর নদী, সেরাজাবাদের নদী, কাচিকাটা, গাজীখালী, রামগঙ্গা, কালীগঙ্গা, নারায়ণীগঙ্গা, খোদাদাদপুরের

---

* "ইক্ষু লোহিত ইত্যেতা হিমবৎ পাদ নিঃসৃতাঃ"। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ

নদী,চিলাই, চারিগাঁনদী প্রভৃতি আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ঢাকা জেলার বক্ষদেশে উপবীতবৎ শোভা পাইতেছে। ঢাকা জেলার নদী সমূহ হইতে প্রায় ১৫০০০০৲ টাকা জল কর আদায় হইতে পারে বলিয়া হাণ্টার সাহেব অনুমান করেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

নদ নদীর গতি পরিবর্ত্তনে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় * ও তাহার কারণ নির্দ্দেশ এবং ব-দ্বীপের উৎপত্তি।

নদী প্রবাহের নিত্য পরিবর্ত্তন ঢাকা জেলার বিশেষত্ব। শত বৎসরের মধ্যে এতদঞ্চলে নদী কর্ত্তৃক এমন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে যে তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। স্থলভাগ জলে, জলভাগ স্থলে, এবং এক নদীর স্থানে অন্য আর একটী প্রাদুর্ভূত হইয়া পুরাতনকে সম্পূর্ণ নূতনে পরিণত করিয়াছে।

ফার্গুসন সাহেব বলেন, "ব-দ্বীপস্থ নদী সমূহ বক্র ভাবে বিকম্পিত হয়। প্রবাহিত জল রাশির পরিমাণ অনুসারে এই বিকম্পনের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফলে, নদীর এক পাড় উচ্চ ও সোজাসোজি ভাবে খাড়া হইয়া পড়ে এবং অপরপাড়ে ভাঙ্গনীর পললময় মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া সমতল ভূমিতে পরিণত হয়। নদী প্রবাহ ভাঙ্গনী পাড়ের তটভূমি ভেদ করিয়া অভিনব পথে বহির্গত হইবার জন্য সতত যত্নবান

---

* মেঃ বুকানন হ্যামিল্টন, ফার্গুসন, সেরউইল, এ, সি, সেন, একলি, মেজর রেণেল ও প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয়ের লিখিত বিবরণ ও প্রবন্ধাদি হইতে এই অংশ প্রণয়ন কালে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

হয়। তীরভূমি নদীগর্ভ হইতে নিম্ন হইলে তথায় নূতন নদীর উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী" (১)।

ইছামতী নদী (২)। পশ্চিম ঢাকার নদীসমূহ মধ্যে ইছামতীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। মিঃ এ, সি, সেনের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই নদী জাফরগঞ্জের দক্ষিণে হুরাসাগরের মোহানার বিপরীত দিকে নাথপুরের ফেক্টরীর নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া মুন্সীগঞ্জের সন্নিকটবর্ত্তী যোগিনীঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নদীর উৎপত্তি ও খাত আলোচনায় মেজর রেণেল, ডাক্তার টেইলার, কাপ্তান রেরউইল এবং হাণ্টার প্রভৃতি মনীষি বর্গ মধ্যে অনেকেই ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন।

ব্রহ্মপুত্রের সহিত এই নদীর সঙ্গম স্থলের অনতিদূরেই যে রামপাল নগরী অবস্থিত তদ্বিষয়ে কোনও মত দ্বৈধ নাই। ১৭৮০ খৃঃ অঃ হইতে ১৮৪০ খৃঃ অঃ মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ ধলেশ্বরী নদী দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় উহার স্রোতোবেগ এরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত ধলেশ্বরীই ব্রহ্মপুত্রের প্রধান খাত রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ফলে, পশ্চিম ঢাকার স্থান সমূহের বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। পাথরঘাটা হইতে রামকৃষ্ণদী এবং বয়রাগাদী হইতে মুন্সীগঞ্জ পর্য্যন্ত ইছামতীর নিম্নপ্রবাহ ধলেশ্বরী নদীর সামিল হইয়া পড়ে; কিন্তু ফিরিঙ্গিবাজার হইতে মেঘনাদ ও ধলেশ্বরীর বর্ত্তমান সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত নদীর অংশটী, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেও ইছামতী নামেই পরিচিত ছিল।

---

(১) See Mr Fergusson's paper J. G. S. XIX 1863 p. 321 & 330

(২) রেণেলের দ্বাদশ ও ষোড়শ সংখ্যক মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

রেণেলের দ্বাদশ
সংখ্যক মানচিত্র হইতে গৃহীত
ধামরাই
সাভার
বিরলিয়া
নাওরাহাট
মোলাপাড়া
তেজগাঁও
ডেমরা
নবাবগঞ্জ
সোনারগাঁও
কদমরসুল
নারায়নগঞ্জ
ফতুল্লা
ফিরিঙ্গিবাজার
মীরগঞ্জ
দক্ষিণচরগাঁও
বেঙ্গল আর্ট ষ্টুডিও।
কলিকাতা।
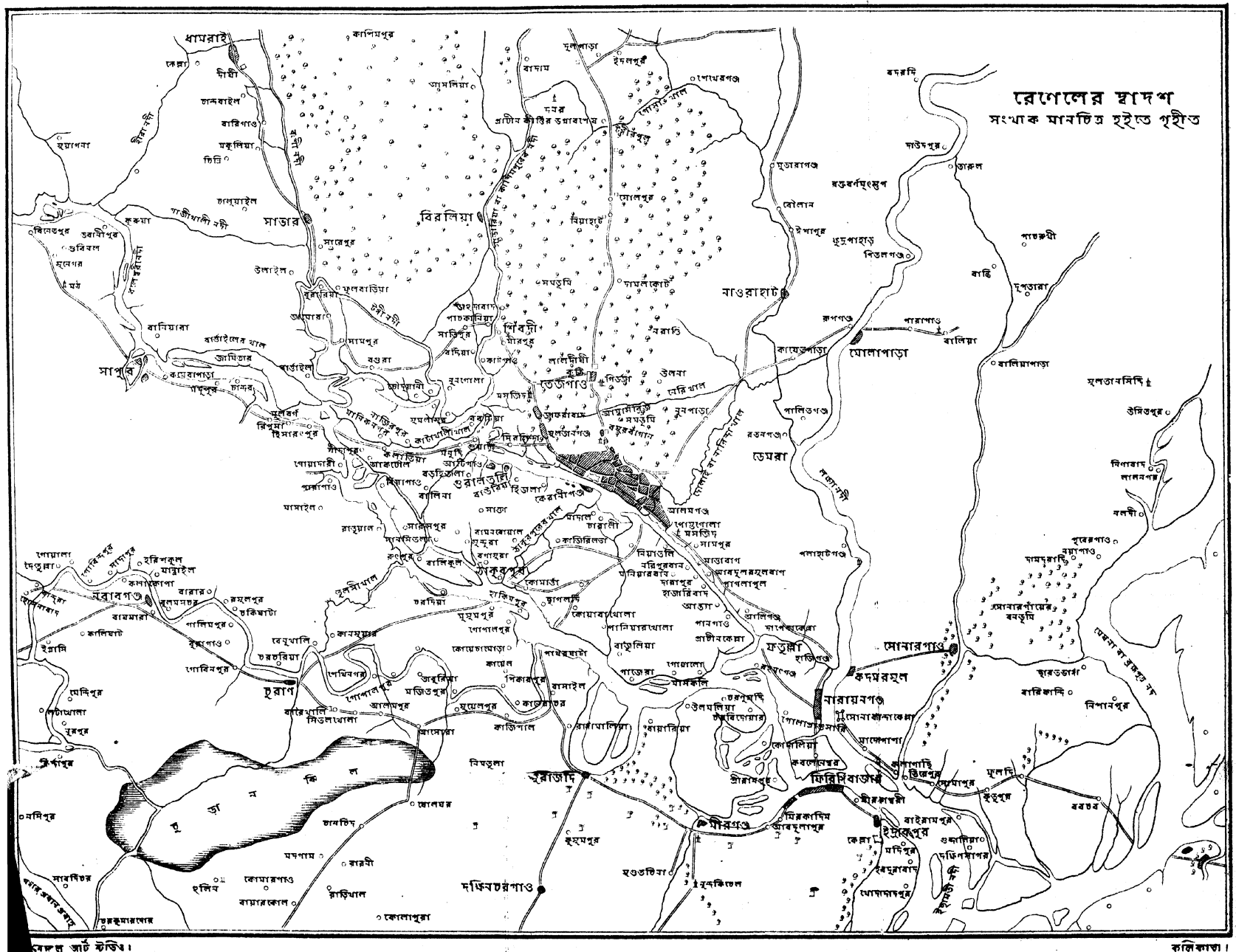
হাণ্টারসাহেব ফিরিঙ্গিবাজার ও ইদ্রাকপুর নামক স্থানদ্বয় ইছামতীর শাখানদীতীরে অবস্থিত বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐস্থানদ্বয় শাখানদীতীরে নহে; ইছামতীর প্রধান প্রবাহের তীরেই অবস্থিত। ধলেশ্বরীর প্রবল আক্রমণে এই স্থানে নদীর প্রসারতা বৃদ্ধি পাইলেও ইছামতী নামটীর বিলোপ সাধন হয় নাই। কিন্তু ফিরিঙ্গিবাজার ও বয়রাগাদীর মধ্যস্থিত নদীর নামটী আর ইছামতী রহিল না।

ইছামতী অতি প্রাচীন নদী। এক সময়ে ইহা পশ্চিমঢাকার একটী প্রধানতম নদী বলিয়া পরিচিত ছিল; একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই নদীতীরে তীর্থঘাট, আগলা, সোলপুর, বারুণীঘাট, এবং যোগিনীঘাট, এই পঞ্চতীর্থ ঘাট বিদ্যমান রহিয়াছে। যোগিনীঘাট, ব্রহ্মপুত্র ও ইছামতীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত।

জাফরগঞ্জের উত্তরে ইছামতীর প্রবাহ নির্ণয় করা সুকঠিন ব্যাপার। প্রাচীন ম্যাপের সহিত বর্ত্তমান সময়ের ম্যাপ তুলনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, জাফরগঞ্জের নিকটে নদী প্রবাহের যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য সংঘটিত হইয়াছে *। মেজর রেণেলের জরীপ সময়ে গঙ্গানদী জাফরগঞ্জের নিকট দিয়াই প্রবাহিত হইত। ধলেশ্বরী তৎকালে গঙ্গার শাখানদী বলিয়াই পরিচিত ছিল। উহার প্রাচীন নাম ছিল গজঘাটা। এই প্রবাহ এখন প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। এই নদীর উত্তরে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী করতোয়া হইতে বহির্গত হইয়া দিনাজপুরের মধ্যদিয়া আসিয়া ঢাকার ইছামতী নদী যে স্থানে শেষ হইয়াছে, তাহার ঠিক বিপরীত দিকে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। দিনাজপুরের

* রেণেলের ষষ্ঠ সংখ্যক মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

ইছামতী নদীর বিষয় বুকানন হ্যামিল্টন উল্লেখ করিয়াছেন। এই নদীটী ক্রমে শুষ্ক হইয়া ক্ষীণতোয়া হইয়া পড়িলেও ইহার অস্তিত্ব একেবারে লোপ পায় নাই। মেজর রেণেল তদীয় মানচিত্রে যেরূপ ভাবে উহাকে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ঢাকার ইছামতী ও দিনাজপুরের ইছামতী অভিন্ন; করতোয়ার একটী শাখা-নদীই দিনাজপুরের মধ্যদিয়া জাফরগঞ্জ হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। ধলেশ্বরীনদী পরে উদ্ভূত হইয়া ইছামতীর মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া উৎপত্তিস্থল হইতে উহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে হিন্দুগণ করতোয়া নদীতে তীর্থস্নান করিয়া থাকেন। ঠিক ঐ দিনই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু নরনারী ইছামতীর পঞ্চতীর্থ ঘাটে স্নান করিয়া পবিত্রতা-লাভ করিয়া থাকে। ইহা হইতেও হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ঢাকার ইছামতীনদী পুণ্যতোয়া করতোয়ারই একটী শাখানদী মাত্র।

অপর একটী ইছামতীনদী পাবনার সন্নিকটে গঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়া জাফরগঞ্জের বিপরীত দিকে হুরাসাগরে পতিত হইয়াছে বলিয়া মেজর রেণেল উল্লেখ করিয়াছেন। এই ইছামতী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা গঙ্গা ও যমুনার শাখানদী। এই নদীর স্রোত কখনও গঙ্গা হইতে যমুনার দিকে আবার কখনও বা যমুনা হইতে গঙ্গাভিমুখে প্রবাহিত হয়।

আর একটী ইছামতীনদী নদীয়া ও যশোহর জেলার মধ্যদিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। মিঃ এ, সি, সেন বলেন "ঢাকা জেলার ইছামতী নদীতীরস্থ ধীবরগণ মধ্যে বংশপরম্পরাগত প্রবাদ এই যে, উক্ত তিনটী ইছামতী পূর্ব্বে একই নদী ছিল।" এই প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয় না।

আমাদের বিবেচনায় গঙ্গার পরিত্যক্ত খাত দিয়াই ইছামতী ও

কুশীনদী প্রবাহিত হইয়াছে। গঙ্গার প্রবাহ পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাওয়ায় নবগঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে। এই সময়েই যশোহরের ইছামতীনদী প্রথমতঃ পাবনা জেলাস্থিত উহার উত্তরদিকস্থ প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। পরে গঙ্গার প্রবাহ পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইয়া পদ্মার উৎপত্তি হইয়াছে।

ধলেশ্বরী ও আলমনদী—ধলেশ্বরীর উর্দ্ধতন প্রবাহের প্রাধান্য অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। ধলেশ্বরীর এই অংশ দিয়া শীতকালে নৌকা চলাচল করিতে পারে না। প্রবাহ ক্রমে উত্তর দিকে সরিয়া পড়িতেছে। প্রথমতঃ গজ ঘাটার খাল দিয়া, পরে সিলিমাবাদের খাল দিয়া এবং অধুনা পোড়াবাড়ীর খাল দিয়া ইহা প্রবাহিত হইতেছে। আলমনদী খুলিয়া যাওয়ায়, পাহাড়পুর এবং সাভারের মধ্যস্থিত ধলেশ্বরীনদী শুষ্ক হইয়া পড়িতেছে। এই আলমনদী প্রায় ২৮ বৎসর যাবৎ উৎপন্ন হইয়া কানাইনদীর পূর্ব্বোল্লিখিত প্রাচীন প্রবাহ আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এক্ষণে চৌহাট ঝিলটীইমাত্র কানাইনদীর চিহ্ন স্বরূপ অবশিষ্ট রহিয়াছে।

আলমনদী ক্রমশঃ প্রবলাকার ধারণ করিলে সাভারের নিকটস্থ ধলেশ্বরীর প্রবাহ আরও পশ্চিম দিকে সরিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। তাহা হইলে বুড়িগঙ্গা নদীটীর অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে সন্দেহ নাই।

ধামরাইর নিকটে আলমনদীর সহিত বংশীনদীর সম্মিলন ঘটিবার কিছু বিলম্ব থাকিলেও উহা যে একপ্রকার অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। তদনুযায়, হীরানদীর প্রাচীন খাতটী খুলিয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে।

বানার— বানার ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব দিকস্থ প্রবাহের একটী শাখানদী মাত্র; উহাই লাক্ষ্যানদীর ঊর্দ্ধতম প্রবাহ। কিন্তু

পূর্ব্বে তাহা ছিল না। বহুকাল পূর্ব্বে ইহা একটী স্বতন্ত্র নদী ছিল। তৎকালে উহার উৎপত্তি স্থান ছিল মধুপুর জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী গুপ্ত-বৃন্দাবনের সন্নিকটে। লাখপুরের নিকটে এই নদীর সহিত লাক্ষ্যা-নদীর সঙ্গম ঘটিয়াছিল। এগারসিন্দুর দক্ষিণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের নিম্ন-প্রবাহ শুষ্ক হইয়া গেলে এই নদী তদীয় জলস্রোতের একাংশ ভৈরব বাজার অভিমুখে প্রেরণ করে এবং অপরাংশ রক্তবর্ণ মৃত্তিকারাশি ভেদ করতঃ নূতন প্রবাহপথ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত বানারনদীর সংযোগ সাধন করিয়া দেয়। এই পয়ঃপ্রণালীর স্রোতোবেগ প্রবল থাকায় বানারনদীর উর্দ্ধতম প্রবাহ ইহার অংশীভূত হইয়া পড়ে। ফলে, এগার সিন্দু হইতে লাখপুর পর্য্যন্ত সমুদয় নদীটাই বানার নাম ধারণ করে। লাক্ষ্যানদীও কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বানার নামেই অভিহিত হইত; কিন্তু নাওন্দসাগরের উত্তর দিকস্থ প্রকৃত বানার-নদীর নামটী বিলুপ্ত হইয়া পড়িল। সম্ভবতঃ এই নূতন বানারনদীর সহায়তায় লাক্ষ্যানদী প্রবল হইয়া পড়ায় ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন প্রবাহটী কলাগাছিয়ার নিকটে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ব্রহ্মপুত্র—ব্রহ্মপুত্রের বর্ত্তমান পূর্ব্বদিকস্থ প্রবাহ ভৈরব বাজারের নিকটে মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। একমাত্র বুকানন হ্যামিল্টন ব্যতীত সমুদয় পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণই ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বদিকস্থ প্রবাহ নির্ণয়ে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন। বুকানন হ্যামিল্টন বলেন, "এগার সিন্দু অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিকস্থ যে পয়ঃ প্রণালী প্রবাহিত হইতেছে, উহা প্রাচীনকালে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া পরিচিত ছিল না।" পাচদোনা হইতে ধলেশ্বরী নদীর কলাগাছিয়া মোহানা পর্য্যন্ত একটী নদীর প্রাচীন খাত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উহারই তীরে লাঙ্গলবন্দ ও পঞ্চমীঘাট অবস্থিত। এই নদীটী এখন
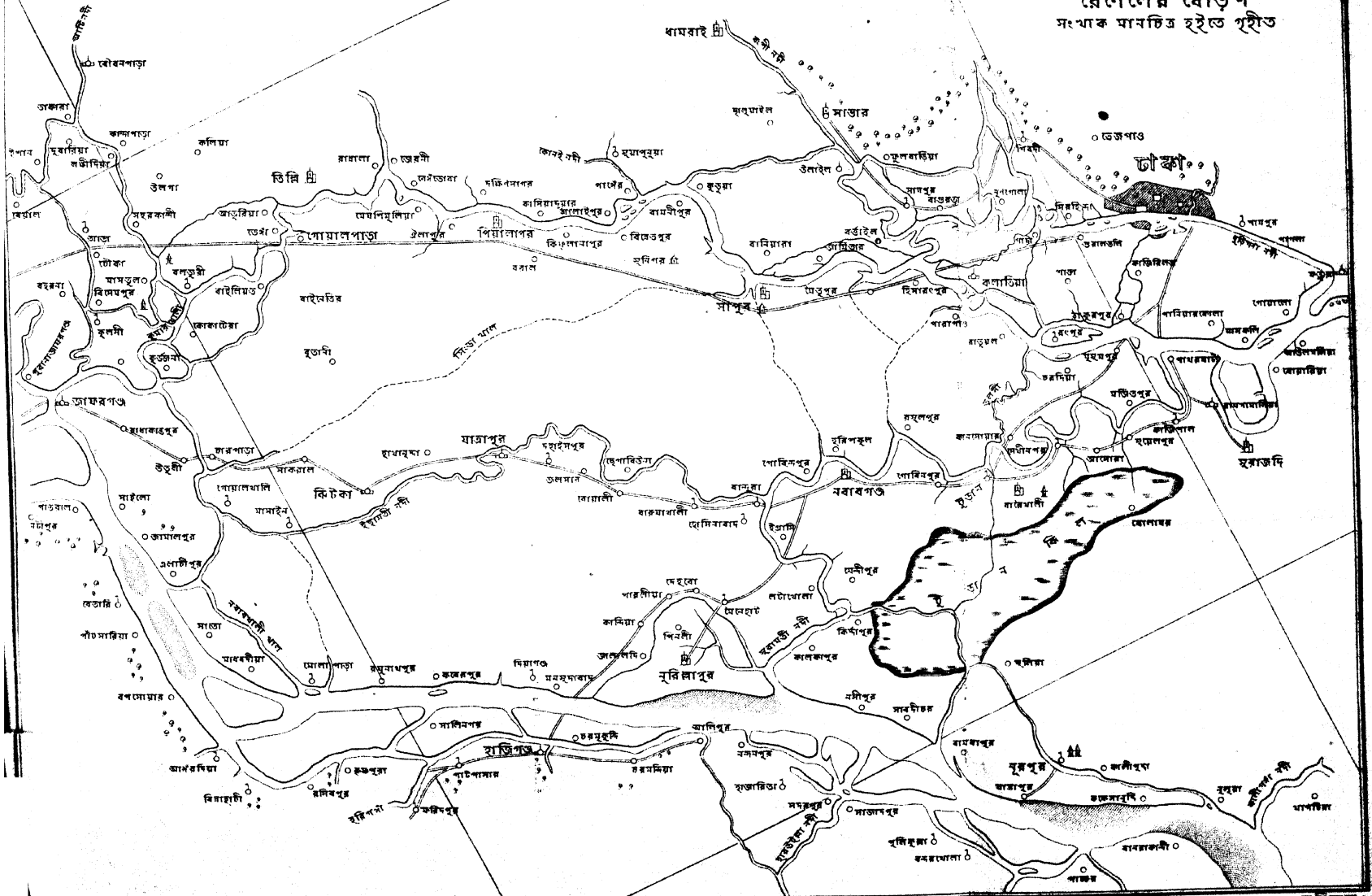
পর্য্যন্তও ব্রহ্মপুত্র বলিয়া পরিচিত। এখানেই অসংখ্য হিন্দু নরনারী অশোকাষ্টমীতে তীর্থস্নান করিয়া থাকে। সুতরাং এই প্রাচীন প্রবাহটীই যে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের একাংশমাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যও এই পয়ঃপ্রণালীটীকেই ব্রহ্মপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাক, এই প্রবাহটীর সহিত এগার সিন্ধুর উত্তর দিকস্থ প্রবাহের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাইতে পারে কিনা। রেভিনিউ ম্যাপে আরালিয়া গ্রাম হইতে এগার সিন্ধুর এক মাইল দক্ষিণস্থ লাথপুর গ্রাম পর্য্যন্ত নদীর একটী প্রাচীন খাত অঙ্কিত রহিয়াছে; এবং লাথপুর হইতে উক্ত প্রবাহটী দক্ষিণপূর্ব্ববাহিনী হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত লাঙ্গল বন্ধের নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই খাতটীই যে ব্রহ্মপুত্রের সর্ব্ব প্রাচীন প্রবাহ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। রেভিনিউ ম্যাপে আরালিয়া হইতে লাথপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত খাতটীকে ভ্রমবশতঃ লাক্ষ্যা-নদীর প্রাচীন খাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। লাথপুরের নিকটে ব্রহ্মপুত্র হইতে একটী শাখা লাক্ষ্যা নাম ধারণ করতঃ প্রবাহিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ লাথপুর গ্রামের নামের সহিত লাক্ষ্যা নদীর সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে।

প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র কলাগাছিয়ার মোহানা পর্য্যন্ত আসিয়াই নিরস্ত হয় নাই। উহা রামপালের পার্শ্বভেদ করিয়া রাজাবাড়ীর দক্ষিণে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। জপসানিবাসী সাধক কবি লালা রাম গতি সেন সার্দ্ধশত বৎসর পূর্ব্বে তদীয় "মায়াতিমির চন্দ্রিকা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"মহাতীর্থ ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার॥

মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণপণ্ডিত তাহে সদ্‌জ্ঞানী বিস্তর" ॥

অশোকাষ্টমীতে অদ্যাপি প্রতিবর্ষে বহুসংখ্যক নরনারী কমলাপুর নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র স্নান করিয়া থাকে। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিক্রমপুরের পূর্ব্বদিকে যে বৃহৎ স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া মেঘনাদ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, উহা পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রেরই প্রবাহ ছিল।

মুন্সীগঞ্জ মহকুমার পূর্ব্বদিকস্থ ক্ষুদ্র পয়ঃ প্রণালীটী এবং তন্নিকট-বর্ত্তী নদীর কতকাংশ যাহা সেরাজাবাদের নদী বলিয়া এক্ষণে পরিচিত, উহাই ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন প্রবাহাংশের শেষ চিহ্নমাত্র। এই অনুমানের সাপক্ষে যে কয়েকটী প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

১ম। রেভিনিউসার্ভেম্যাপে সেরাজাবাদের নদীকেই ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

২য়। এই নদী তীরে একটী তীর্থঘাট আছে, এবং লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাটে যে তারিখে তীর্থস্নানের প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে, এখানেও অদ্যাপি লোকে ঠিক সেই তারিখেই তীর্থস্নান করিয়া থাকে।

ব্রহ্মপুত্রের এই দক্ষিণদিকস্থ প্রবাহ কোন্ সময়ে কলাগাছিয়ার উত্তরাংশের নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাহা সুনিশ্চিত রূপে নিরূপণ করা সহজসাধ্য নহে। এগারসিন্ধুর দক্ষিণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় নদী পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আড়িয়ল খাঁ নদীর মধ্য দিয়া আসিয়া প্রথমতঃ নরসিংদীর নিকটে, পরে ভৈরব বাজারের নিম্নে, মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ধলেশ্বরীই ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ থাকায়, উহার প্রাচীন শুষ্ক খাত কর্ত্তনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

ভুবনেশ্বর *—স্থানীয় কিম্বদন্তী এবং প্রাচীন দলিলাদি দৃষ্টে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বে ভুবনেশ্বর নামে একটী নদী জাফরগঞ্জের কিঞ্চিৎ উত্তর দিক হইতে আসিয়া তেওতা গ্রামের পার্শ্বদেশ দিয়া দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইত। ফরিদপুর জেলার ভুবনেশ্বর নদীটী এই নদীরই নিম্নাংশ হওয়া অসম্ভব নহে। টেইলার সাহেবের টপোগ্রাফি গ্রন্থ পাঠেও ইহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। মেজর রেণেল সাহেবের জরীপ সময়েও এই নদীর অনেক পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। পদ্মানদী ফরিদপুরের পশ্চিমদিকস্থ খাতটী পরিত্যাগ করিয়া জাফরগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইত এবং এখান হইতেই ধলেশ্বরীনদীর উদ্ভব হয়। রেভিনিউ সার্ভে ম্যাপে "মরা পদ্মা" বলিয়া ফরিদপুরের পশ্চিমাংশস্থিত পদ্মার প্রাচীন প্রবাহের উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পদ্মানদীর এইরূপে উত্তরবাহিনী হইবার প্রয়াস পাওয়ার সময়ে ব্রহ্মপুত্রনদের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের ফলে পশ্চিম ও দক্ষিণ ঢাকায় ভয়ানক পরিবর্ত্তন ঘটে।

ব্রহ্মপুত্রের স্রোতো-বাহিত পলি মাটি দ্বারা দেওয়ানগঞ্জ ও ভৈরব-বাজার এতদুভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী ভূমি উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ফলে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ ক্রমশঃ সরিয়া পড়িতে লাগিল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ প্রবাহ পরিবর্ত্তনের ফলেই যমুনার উদ্ভব হইয়াছে। প্রথমতঃ ব্রহ্মপুত্র হইতে জামালপুরের নিকটে দুইটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর উদ্ভব হয়। এই দুইটী প্রবাহ জামালপুরের ১৪ মাইল দক্ষিণে সম্মিলিত হইয়া যমুনা নাম ধারণ করিয়াছে। এই সম্মিলিত প্রবাহ ৫০ মাইল

* রেণেলের মান চিত্র দ্রষ্টব্য।

অতিক্রম করিয়া পুনরায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। উহার পূর্ব্বদিকের নদীই উল্লিখিত ভুবনেশ্বরের ঊর্দ্ধাংশ, এবং পশ্চিম দিকস্থ নদীটী এলামজানি নামে সুপরিচিত।

এলামজানী নদী—এলামজানী নদী ভাসরির নীল কুঠীর পার্শ্বদেশ দিয়া আসিয়া কেদারপুর গ্রামের মধ্যদিয়া তিল্লি গ্রামের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সময়ে ব্রহ্মপুত্রেরপ্রবাহ যমুনা ও ভুবনেশ্বরের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া পদ্মাকে দক্ষিণ দিকে তাড়িত করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, এই সময়ে যমুনা ও ভুবনেশ্বরের প্রসারতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নাটোরের নদী গুলি জাফরগঞ্জের নিকটে পদ্মার সহিত মিলিত হওয়ায় ইহার বল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যমুনা এই নদী-সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক আটিয়ার নিকটে মোড় ঘুরিয়া এলামজানি নদীতে পতিত হইয়া ধলেশ্বরীতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই সময়েই ধলেশ্বরীনদী ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ হইয়া উঠিল। প্রায় এই সময়েই সিঙ্গের ও সাভারের মধ্যবর্ত্তী গাজীখালিনদী, বংশী-নদীর কিয়দংশ, পাথরঘাটা ও রামকৃষ্ণদীর মধ্যস্থিত ইছামতী এবং বয়রা-গাদী ও মুন্সীগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী ইছামতীনদী ধলেশ্বরীর সামিল হইয়া পড়ে।

গাজীখালি—পূর্ব্বে পশ্চিম ঢাকার গাজীখালিনদী একটী প্রধান নদী বলিয়া পরিগণিত ছিল। কানাইনদী আটিয়ার উত্তর দিক হইতে আসিয়া সাভারের নিকটে বংশীনদীর সহিত মিলিত হইয়াছিল; এই কানাইনদীর সহিত বংশীনদীর একটী প্রবাহের সম্মিলনের ফলেই গাজীখালি নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

হীরানদী—হীরানদী পূর্ব্বে ধামরাই এর উত্তর দিক দিয়া আসিয়া সিঙ্গেরের নিকটে গাজীখালি নদীর সহিত বংশীনদীর

সংযোগ সাধন করিয়াছিল। এই নদীর নিম্নাংশ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অধুনা রঘুনাথপুরের ঝিল মধ্যে ইহার সামান্য একটু চিহ্ন মাত্র বিদ্যমান থাকিয়া অতীত স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে।

ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা— ধলেশ্বরীনদী পূর্ব্বে সাভারের ৮ মাইল দূরবর্ত্তী সিঙ্গৈর নামক স্থান হইতে চান্দর পর্য্যন্ত প্রায় সোজাসোজি ভাবেই প্রবাহিত হইত। পরে উহার প্রবাহ কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে সরিয়া যাইয়া সিঙ্গৈরের নিম্নস্থ গাজিখালিনদীর সমুদয় অংশ আত্মসাৎ করিয়া ফেলে, এবং সাভার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে।

সম্প্রতি ধলেশ্বরী প্রবলাকার ধারণ করিয়া মীরগঞ্জের প্রায় অর্দ্ধেক স্থান স্বীয় কুক্ষিগত করিয়াছে।

বুড়িগঙ্গানদী পূর্ব্বে বংশীনদীরই সম্প্রসারণ মাত্র ছিল; কিন্তু পরে ধলেশ্বরীর শাখা নদী রূপে পরিণত হইয়া ইহার বল বৃদ্ধি হয় এবং তুরাগনদীর নিম্নপ্রবাহ আত্মসাৎ করিয়া ফেলে।

১৭৬৪ খৃঃ অব্দে মেজর রেণেল ঢাকার উত্তরাংশেই ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের সম্মিলন সন্দর্শন করিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ষোড়শ শতাব্দীতে উহাই ব্রহ্মপুত্রের মূলস্রোতঃ ছিল। রেণেলের জরীপের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ ঢাকার পশ্চিম দিক দিয়া এবং প্রাচীন জিনাই (যমুনা) নদীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া জাফরগঞ্জের সন্নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই সম্মিলিত প্রবাহ রেণেলের উল্লেখিত নালা ও ফরিদপুরের অন্তর্গত পাচ্চরের মধ্যস্থিত পদ্মার প্রাচীন খাত পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজাবাড়ীর মঠের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে। রেণেলের

জন্নীপ সময়ে এই সম্মিলন স্থান পদ্মা-মেঘনাদের সম্মিলন স্থান হইতে সোজাসোজি উত্তরে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বোক্ত নালা হইতে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত মেন্দিগঞ্জ নামক স্থান পর্য্যন্ত নদীর প্রবাহ প্রায় ১২০ মাইল দৈর্ঘ্য হইবে। উহা দক্ষিণ-পূর্ব্বদিক হইতে ঠিক দক্ষিণদিকে পরিবর্ত্তিত হইয়া দক্ষিণবিক্রমপুরের অন্তর্গত চণ্ডিপুরের দিকে গিয়াছিল (দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ মাইল); রেণেলের ম্যাপের (২৩° নিরক্ষ) শ্রীরামপুর যোজকের মধ্য দিয়া নয়াভাঙ্গনী নামে একটী নূতন নদীর উদ্ভব হইয়া মেঘনাদকে পদ্মার প্রাচীন প্রবাহের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছে। ১৮০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই উহা মেঘনাদ হইতে উৎপন্ন হইয়া পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ মধ্যে আসিয়া পতিত হইয়াছে।

প্রবাহ পরিবর্ত্তনের কারণ*—একাধিক গ্রন্থকারগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৭৮৭ খৃঃ অব্দের প্রবল বন্যাই ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ পরিবর্ত্তনের কারণ। তিস্তানদী গঙ্গা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই প্রবাহ জিনাই (যবুনা) নদীর মধ্যদিয়া নূতন পথ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহাই ব্রহ্মপুত্র অথবা যবুনার প্রধান প্রবাহ। এই প্রবল বন্যা পদ্মা ও মেঘনাদের দক্ষিণেও অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। ঐ সময়ের প্রাচীন কাগজ পত্রাদি হইতে যে সকল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে অনুমিত হয় যে, তিস্তার বন্যা স্রোত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক স্রোত প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের মধ্যদিয়া এবং অপর স্রোত গোয়ালন্দের নিম্নে পদ্মা ও যবুনার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল।

---

* J. A. S. B. 1910.

১৭৮৭ খৃঃ অব্দের বন্যার ফলেই যে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের প্রাচীন প্রবাহের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের কারণ নাই। প্রাচীন দলিলাদি দ্বারাও আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে রেণেল সাহেব মেঘনাদের পূর্ব্বতীরস্থ চাঁদপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরে মোহনপুর নামক স্থান জরীপ করিয়াছেন; কিন্তু প্রাচীন কাগজপত্রাদিতে দৃষ্ট হয় যে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে নদীর প্রবাহ ভয়ানক রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া উহা নদীর পশ্চিম পাড়ে গিয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে নদী পুনরায় সাবেক খাতেই প্রবাহিত হইতেছে। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দের প্রবল বন্যাপ্রবাহে ত্রিপুরা জেলার মেঘনাদ তীরবর্ত্তী প্রায় ১৬ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান নদী গর্ভে বিলীন হইয়া যায় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; পক্ষান্তরে আবার পশ্চিমতীরস্থ ইদিলপুর ও শ্রীরামপুর পরগণায় জল প্লাবন ও ভাঙ্গনী আরম্ভও এই ১৭৮৭ খৃঃ অব্দেই সংঘটিত হয়। প্রকৃত পক্ষে এই সময়েই নদীর ভাঙ্গনী এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, সমুদয় ইদিলপুর পরগণাটীই মেঘনাদ গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে এই আশঙ্কা করিয়া ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর রেভিনিউ বোর্ডে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়া ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সমুদয় মৌজায় ভাঙ্গনী খুব বেশী আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া তিনি রিপোর্ট করিয়াছিলেন, ৭ বৎসর পরে ঠিক সেই স্থান দিয়াই নয়াভাঙ্গনী নদীর ধ্বংশ-কারী প্রবাহ শ্রীরামপুর মোজকের মধ্যদিয়া মনারপুরের (এক্ষণে চরমনপুরা বলিয়া অভিহিত) নিকটে পদ্মার সহিত মেঘনাদের সম্মিলন ঘটাইয়াছে। বস্তুতঃ জল প্লাবন হেতুই যে ঢাকার উত্তর হইতে বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ পর্য্যন্ত ভূভাগের প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ও অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

ভীষণ জল প্লাবনের ফলেই নয়াভাঙ্গনী নদীর সৃষ্টি হইয়াছে, এতৎ-সাপক্ষে প্রমাণাবলি অত্যন্ত প্রবল থাকায়, তিস্তানদীই যে ভয়ানক পরিবর্ত্তনের মূলীভূত কারণ এবম্বিধ অনুমান প্রমাণ সিদ্ধ হইতেছে।

১৭৮৭ খৃঃ অব্দের প্রবল বন্যা স্রোতে রাজনগর পরগণাটীরই ক্ষতি বিশেষরূপে সংসাধিত হইয়াছিল; কিন্তু উহা মেঘনাদ দ্বারা স্পর্শিত হয় নাই। রাজনগর পরগণা সাধারণতঃ পদ্মা ও কালীগঙ্গা-নদীর সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত ছিল। এই কালীগঙ্গানদী খুলিয়া যাওয়ায় ১৮১৮ খৃঃ অব্দ মধ্যে পদ্মানদী মেঘনাদ নদে প্রবেশ লাভ করিবার অভিনব পথ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে এই অভিনব পথটীই স্বনাম ধন্যা কীর্ত্তিনাশা। যে সময়ে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের অধিকাংশ সলিলরাশি যমুনার মধ্যদিয়া জাফরগঞ্জের নিকট পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইতে ছিল, তৎসময় হইতে এবম্বিধ পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণতালাভ করিতে ত্রিংশৎ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

এই সময়ে যমুনার মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপুত্র সন্তর্পণে প্রবাহিত হইতেছিল। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ঢাকার উত্তর দিকস্থ প্রাচীন নদীটীই ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ বলিয়া পরিচিত হইত। "ব" দ্বীপস্থ সমতল ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন হঠাৎ সংঘটিত হইয়াছিল না। ক্রমে ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া স্থান পরিবর্ত্তন দ্বারা অথবা ক্ষুদ্র নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াই উহা সংঘটিত হইয়াছে।

প্রমাণ সমূহের বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, তিস্তানদীর প্রবাহ পরিবর্ত্তনের গোলমালেই দুইটী নূতন নদীর উদ্ভব হইয়াছে। এখানেই নদী গুলির তুমুল সংগ্রাম পুনরায় আরব্ধ হইয়াছিল। তিস্তার ভীষণ আক্রমণের ফলে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল; এজন্যই ঢাকার উত্তর দিকের সঙ্গমস্থলে উহা মেঘনাদের সহিত আটিয়া উঠিতে পারে নাই।

রেণেলের সপ্তদশ
সংখ্যক মানচিত্র হইতে গৃহীত
সাপমারি
জয়রামপুর
গোপালপুর
আমিদাবাদ
বালিমার
আমিরাবাদ
হাজিপুর
বেলানগর
পাচদোনা
নরসিংদি
লক্ষীবর্দি
রামচন্দ্রি
আমালপুর
গড়বাড়িয়া
দুলছেদী
সিমুলিয়া
তিতবদি
নাগরদী
তালতলা
গোড়াব
একডালাচৌকী
জামালপুর
বলাসা
তারপুল
বাদরদি
মসজিদ
টোক
সিংসারি
কুলদী
বগিয়া
পরারমা
ডাওয়াল
বালিপাড়া
বালিয়া
সোনারগাঁও
কদমরসুল
কেল্লা
ফিরিঙ্গিবাজার
নারায়ণগঞ্জ
শ্রীরামপুর
ফতুল্লা
নরন্দ্রি
ঢাকা
তেজগাও
রাজবাড়ী
মীরগঞ্জ
বালিগাঁও
ধানকুনিয়া
জয়রামপুর
মূলফৎগঞ্জ
জপসা
Pagoda seen in both Rivers
রাজনগর
হাটবাড়িয়া
রামরাইদী
বেঙ্গল আর্ট ষ্টুডিও।
কলিকাতা।
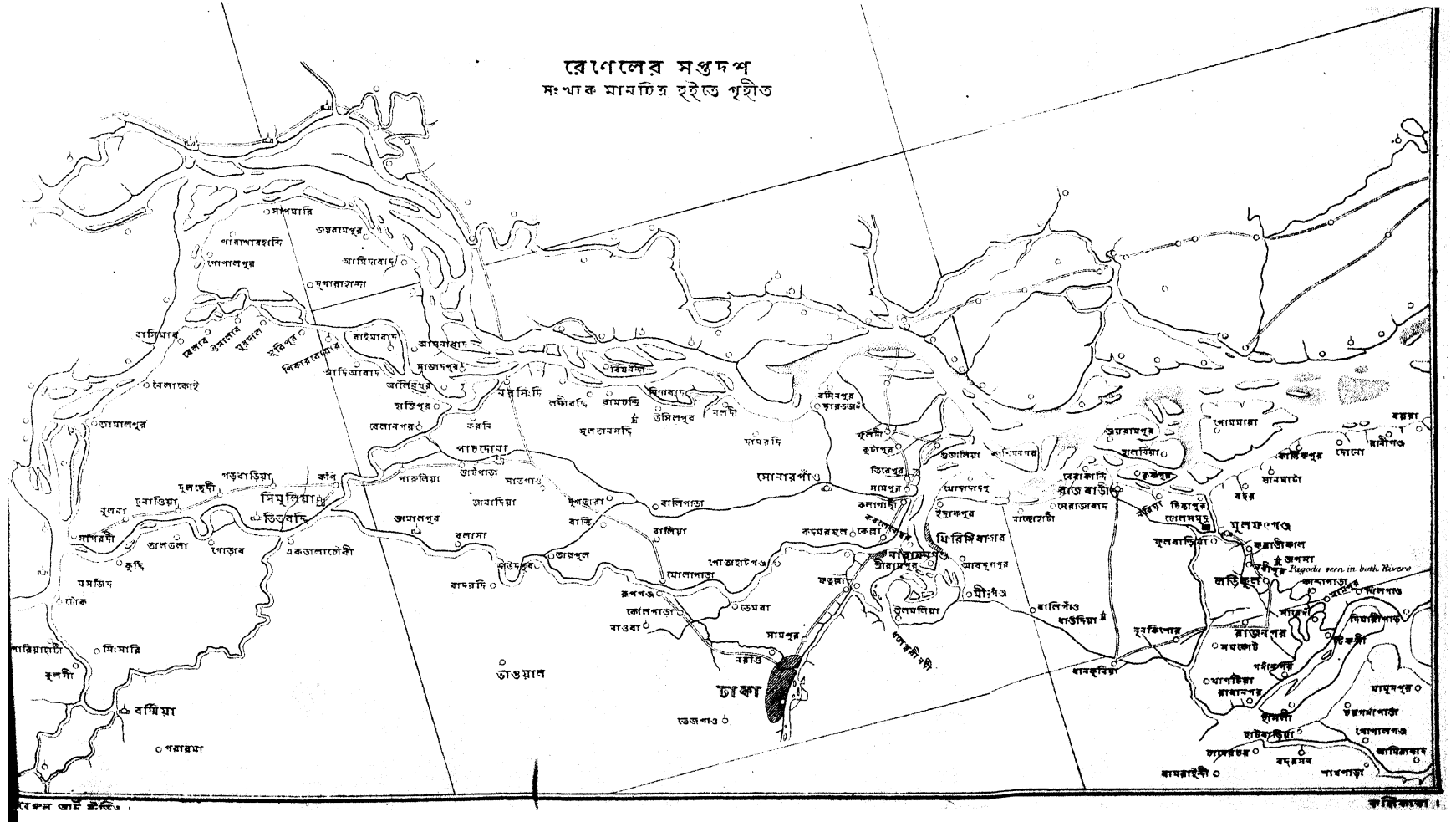
"যখন দুইটী প্রকাণ্ড নদী একত্র মিলিত হয় তখন উহাদের সঙ্গমস্থল সমূহের অনবরত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। সার্ভেয়ার ফার্গুসন সাহেব আশঙ্কা করিয়া ছিলেন, ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ, গড়াইনদী দিয়াই বহির্গত হইবে। বস্তুতঃ গড়াই যেরূপ বৃহৎ আকার ধারণ করিবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল, সেরূপ হয় নাই"। ফার্গুসনের ভবিষ্যদ্বাণী নিস্ফল হইয়াছে।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দে গোয়ালন্দের দক্ষিণদিকে পদ্মানদী দুইভাগে বিভক্ত হয়। তাহার দক্ষিণশাখা ফরিদপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত। এই নদীর খাত এখন শীতকালে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইয়া যায়; উত্তর পূর্ব্বদিকে এইভাবে প্রবাহিত হওয়ায় নদী দক্ষিণদিকে ভাঙ্গিতে পারে নাই।

রেণেলের সময়ে পদ্মা, কালীগঙ্গা ও মেঘনাদের অবস্থা— রেণেল কৃত সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্র দৃষ্টে ঢাকার দক্ষিণে ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণতট হইতে বরাবর দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে, একমাত্র কালীগঙ্গা নামে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা বিক্রমপুরের বক্ষোদেশে উপবীতবৎ শোভিত হইত। মেঘনাদ হইতে একটী পয়োনালী বহির্গত হইয়া, প্রথমতঃ দক্ষিণতটে মুলফৎগঞ্জ ও উত্তর তটে ফুলবাড়ীর নিকটে প্রবাহিত হইয়া, পরে তথা হইতে দুইটী শাখানদী বরাবর পশ্চিমাভিমুখে দুইদিকে বিস্তৃত হইয়া রাধানগরের নিকটে পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। ফুলবাড়িয়া, রাজনগর, সমকোট, ঘাঘটিয়া রাধানগর প্রভৃতি স্থান এই উভয় নদীর মধ্যস্থলে বর্ত্তমান ছিল। দক্ষিণদিকের শাখাতটে মুলফৎগঞ্জ, নবীপুর, জপসা, লড়িকুল, কান্দাপাড়া, সারেঙ্গা, চিকন্দী, গঙ্গানগর, সামপুর; এবং উত্তর দিকের শাখার উত্তরতটে

চণ্ডীপুর, দাগদিয়া, ধানকুনিয়া, মুনকিশোর প্রভৃতি গ্রামগুলি অবস্থিত ছিল। তৎকালে কার্ত্তিকপুর কালীগঙ্গার দক্ষিণভাগে মেঘনাদতটে, এবং রাজাবাড়ী কালীগঙ্গার উত্তরভাগে মেঘনাদ তটে বিদ্যমান ছিল। পূর্ব্বে রাজাবাড়ী ও চণ্ডীপুর এতদুভয় স্থান কালীগঙ্গার উত্তরদিকে ছিল। শ্যামপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, ইদ্রাকপুর, ফিরিঙ্গিবাজার, আবদুল্লাপুর, মীরগঞ্জ, মাকহাটী, সেরাজদী, রাজাবাড়ী, শেখর নগর, হাসারা, ষোলঘর, বারইখালী, নুরপুর, ধাউদিয়া, বলিগাঁ, মুনকিশোর, রাজাবাড়ী, চণ্ডীপুর, প্রভৃতি স্থান রেণেলের ম্যাপে ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা, ও কালীগঙ্গার উভয়তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রেণেল কালীগঙ্গার নামোল্লেখে ভুল করিয়াছেন। গঙ্গানগর হইতে লড়িকুল এবং মুলফৎগঞ্জের মধ্য দিয়া চণ্ডীপুর পর্য্যন্ত প্রবাহিত নদীর নাম কালীগঙ্গা। তিনি ইহার উত্তরের নদীটীকে কালীগঙ্গা বলিয়াছেন। যাহাহউক, ১৮১৮ খৃঃ অব্দে পদ্মার প্রধান স্রোতঃ রেণেলের কালীগঙ্গার খাতে প্রবাহিত হইত। এই পরিবর্ত্তন ক্রমে ক্রমে ঘটিয়াছিল। এমন কি ১৮৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পদ্মা দক্ষিণবিক্রমপুরের পশ্চিমদিক দিয়াই প্রবাহিত হইত। এই নদী তখনও পদ্মা নামে এবং নূতন নদীটীকীর্ত্তিনাশা নামে অভিহিত হইত। এই নূতন নদীটী বাস্তবিক পক্ষে রেণেলের তথাকথিত কালীগঙ্গার বিস্তৃতি মাত্র। এই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে দুইটী নদীর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ব্রহ্মপুত্র, কীর্ত্তিনাশার সাহায্যে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া মেঘনাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা আরম্ভ করিল। ফলে, সম্পূর্ণ অভিনব স্থান দিয়াই নদী প্রবাহিত হইল। রেণেলের উল্লিখিত কালীগঙ্গার প্রকৃত নাম ছিল "নয়ানদী বথ খোলা"। উহার অন্ততঃ ২০০ বৎসর পূর্ব্বেও কোন নদী এই যোজকের সহিত মিলিত হয় নাই।

কীর্ত্তিনাশার স্রোতঃ খুব প্রবল ছিল। পদ্মাও মেঘনাদের তলের (level) পার্থক্যই ইহার স্রোতোবেগের প্রাবল্যের কারণ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। রাজাবাড়ীর দক্ষিণপূর্ব্বে রেণেল কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পোম্মামারা নামক প্রকাণ্ড চর বিধৌত হইয়া যাওয়ায় মেঘনাদ নদ কর্ত্তৃক উত্তরদিকস্থ দ্বীপ গুলি ভরাট হইতে লাগিল। এইরূপে প্রকাণ্ড একটী যোজকের সৃষ্টি হইল। এদিকে কীর্ত্তিনাশা মেঘনাদের পশ্চিমতীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নূতন নদীটীর গতির স্থিরতা ছিল না। স্রোতের প্রাবল্য হেতু ১৮৩০ খৃঃ অব্দে মুলফৎগঞ্জ বিধৌত করিয়া নদী এক মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত হইতে থাকে। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে মেঘনাদ প্রবলাকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে; এবং নূতন নদীটী উত্তরদিকে সরিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া অনুমিত হয় যে, পদ্মার স্রোতঃ উত্তরদিকে প্রবণ ছিল। এই নূতন নদী হইতে মেঘনাদের পশ্চিমপাড় পর্য্যন্ত দক্ষিণদিকে প্রকাণ্ড চর পড়িয়া দ্বীপের চরের সহিত সংযুক্ত হয়। এত বেশী চর পড়িয়াছিল যে, কীর্ত্তিনাশার মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, ইহা অন্যদিক দিয়া প্রবাহিত হইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে ছিল। নুরপুর হইতে পাচ্চরের ধার দিয়া প্রায় ভদ্রাসন পর্য্যন্ত কীর্ত্তিনাশা পুনরায় উহার পুরাতন খাত দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। এখানেও ইহার উত্তর দক্ষিণ প্রবণতা পুনরায় প্রকাশ পায়; এবং গতি চাঞ্চল্য বশতঃ ইহা খাগুটিয়ার (সম কোটের) ধার দিয়া প্রবাহিত হইয়া পুরাতন কীর্ত্তিনাশার সঙ্গম স্থানে অবস্থিত দেব মন্দিরাদি সহ খাগুটিয়া গ্রাম বিধ্বস্ত করে। ফলে রাজনগর হইতে মুলফৎগঞ্জ পর্য্যন্ত আর একটী নূতন নদীর সৃষ্টি হয়। এই সময় (১৮৫৮—৬০) মেঘনাদের সহিত নূতন নদীর সঙ্গম স্থানে, পশ্চিম তীরে, নূতন নদীতে যে চর উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে। পদ্মা নূতন পথে বাহির হইতে চেষ্টা

করিয়াছিল কিন্তু তাহা হয় নাই। নূতন নদী খুব ভরাট হইতে আরম্ভ করিল এবং এই সময়েই কীর্ত্তিনাশার মূল স্রোতঃ উহার পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল। মেঘনাদের স্রোতোপ্রাবল্যে কীর্ত্তিনাশা নূতন পথে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে কীর্ত্তিনাশা রাজনগরের পূর্ব্বদিকস্থ নূতন পথে পুনরায় প্রবাহিত হয়। এই বারের জলস্রোতের সমস্ত বেগ চণ্ডীপুরের নিকটে একত্রিত হয়; ফলে কীর্ত্তিনাশা পূর্ব্বের ন্যায় আর এক বার পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মেঘনাদের পশ্চিম তীরস্থ সমুদয় চর বিধৌত করিয়া ফেলে। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে রাজনগরের সমস্ত কীর্ত্তি নদী গর্ভে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু নদীর দক্ষিণ দিকস্থ ভাঙ্গনী বড় সুবিধা জনক হইয়াছিল না। ১৮৮৬। ৮৭ খৃঃ অব্দে লড়িকুল ও জপসা দেব মন্দিরাদি সহ নদীগর্ভে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া যায়। ইহারই কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে তারপাশা, বাঘিয়া, কাঁচাদিয়া, কালীপাড়া, লৌহজঙ্গ, পোড়াগাছা, বিলাশ পুর প্রভৃতি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানগুলি কীর্ত্তিনাশার কুক্ষি গত হয়।

বর্ত্তমান তার পাশা নামীয় স্থান হইতে নদীর উত্তর তীর ব্যাপী চর পদ্মা-মেঘনাদের সঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তারিত হওয়ায় চর রাজনগর পুনরায় নদী গর্ভস্থ হওয়ার সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আর একটা নদী যেন কৃষ্ণনগর, গঙ্গানগর, ডোমসার, পালঙ্গ, আঙ্গারিয়া প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া কীর্ত্তিনাশা ও আড়িয়লখাঁর সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে!

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সাধারণ কারণ—দক্ষিণ ঢাকাস্থ নদী সকলের গর্ভ প্রায়ই বন্যার সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অনেক স্থানে নদী সরিয়া গিয়া বিস্তীর্ণ ঝিল অর্থাৎ জলা উৎপন্ন হইয়াছে। জেলার সমস্ত নদীই উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে

প্রবাহিত হইয়া প্রান্ত ভাগে পদ্মা ও মেঘনাদের সঙ্গম স্থলের নিকটে উহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে।

নদী প্রবাহের নিত্য পরিবর্ত্তনের ফলে নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। নদীর পরিত্যক্ত খাত ঝিলে পরিণত হইলে, দ্বীপ-উৎপাদন-কারী স্রোতস্বতীর বক্রতা হেতু পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি অপেক্ষা ঝিল সমূহের উচ্চতা অধিক হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে সময় ক্রমে নদীপ্রবাহ উচ্চ ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী নিম্ন ভূমির দিকে ধাবিত হয়; ফলে নদীগর্ভ ভরাট হইয়া যায়, অথবা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইলে উহা ক্ষুদ্র খাড়িতে পরিণত হয় (১)।

ফার্গুসন সাহেবের মতে নদীপৃষ্ঠের ক্রম-নিম্নতা এক মাইলের মধ্যে ছয় ইঞ্চির অধিক হইলে উহা তীরধ্বংশনীতির অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু ক্রমনিম্নতা উহা অপেক্ষা কম হইলে স্রোতোবাহিত পলিমাটি তল দেশে সঞ্চিত হইতে থাকে (২)।

খাতের সমীপবর্ত্তী স্থান সমূহের উচ্চতা বৃদ্ধি করিয়া প্রবাহের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন দ্বারা বদ্বীপস্থ অধিকাংশ ভূমি অধিকার করিবার জন্য গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সংগ্রাম এবং তাহার ফলাফল ফার্গুসন সাহেব পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবৃত করিয়াছেন। অধুনা বদ্বীপের যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তিনি মধুপুর অঞ্চলস্থিত ভূমির উচ্চতার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ

(১) Geology of India Pt. I (Page 406- 408.) by Medlicott and Blanford.

(২) See Mr. Fergusson's paper. I. G. S. XIX 1863. p. 321 and 330.

করিয়াছেন। পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্ব দিকে এই বন ভূমি প্রসারিত হইয়া সমতল ক্ষেত্র হইতে এক শত ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়াছে। এজন্য ব্রহ্মপুত্র ক্রমশঃ পূর্ব্ব দিকে সরিয়া যাইয়া শ্রীহট্টস্থ ঝিল মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে (১)। ফলে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোবাহিত পলিমাটি ঐ ঝিল মধ্যেই সঞ্চিত রহিয়াছে; উহা মেঘনাদের স্রোতের সহিত সমুদ্র গর্ভে আশ্রয় লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। এজন্যই সমুদ্রের সম্মুখস্থ বদ্বীপের প্রান্তভাগ পূর্ব্ব দিকে উপসাগরের ন্যায় বঙ্কিম ভাব ধারণ করিয়াছে (২)।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বদ্বীপের এবম্বিধ বক্রতা আরও বেশী ছিল; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র পলিমাটি সঞ্চিত করিয়া শ্রীহট্টস্থ ঝিল সমূহের উচ্চতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফলে কতিপয় বৎসর মধ্যেই ইহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্ব দিক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিম দিক দিয়া নূতন পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই রূপে প্রবাহ পরিবর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল (৩)। এই দুইটী প্রকাণ্ড নদী পরস্পর নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বদ্বীপের পূর্ব্ব প্রান্তে সঞ্চয় কার্য্য এত দ্রুত বেগে চলিতে লাগিল যে, তাহাতে অনতিকাল মধ্যে অতি ত্বরায় অভিনব চর সমূহের উদ্ভব হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে, উহার পশ্চিম প্রান্ত দিয়া বন্যাস্রোতঃ মন্থর গতিতে সমুদ্র মুখে অগ্রসর হওয়ায় বদ্বীপের ঐ স্থান সমূহের বিশেষ কোন ও পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিলনা।

---

(১) Ibid.
(২) Ibid.
(৩) See Geology of India pt. I (pages 406-408). by Medlicott and Blanford

দেশ প্লাবিত করিয়া প্রবল বন্যাস্রোত সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইবার সময়ে ঝিলমধ্যস্থিত স্থির জলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইলে, উহার স্রোতোবেগের খর্ব্বতা সাধিত হয়। ফলে স্রোতোবাহিত পলিমাটি তথায় সঞ্চিত হইতে থাকে এবং প্রবাহ ও একটী মাত্র খাত মধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া উচ্চ তটভূমি ভেদ করতঃ অসংখ্য নালার সৃষ্টি করিয়া থাকে (১)।

হিমাচলের পাদ পৃষ্ঠ ও উত্তর বঙ্গের উচ্চ ভূমি হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সমূহ প্রখর গতিতে সমতল উপত্যকা প্রান্তরে অবতরণ পূর্ব্বক পরস্পরের সংযোগে পুষ্ট কলেবর হইয়া এক একটী প্রকৃষ্ট জল ধারা রূপে এতদঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছে। এই নদী মালাই ঢাকা জেলার শোভা ও শস্য সমৃদ্ধির এক মাত্র কারণ। হিমালয়-পৃষ্ঠ অথবা উত্তর বঙ্গের উচ্চ স্থান সমূহ বিধৌত করিয়া এই নদী মালা নিম্ন বঙ্গের নিম্ন ভূমিতে একটী মৃৎস্তর আনিয়া সঞ্চয় করিয়া থাকে। ঐ স্তরের উর্ব্বরতা শক্তি এতাদৃশ অধিক যে, যে স্থানে ঐরূপ স্তর সঞ্চিত হয়, তথায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রূপ নদীজালে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় শস্য ক্ষেত্র সমূহে জল দানের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে।

"ব-দ্বীপের" উৎপত্তি—বাঙ্গলার এই নদী বাহুল্য দেখিয়াই কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে, হিমালয়ের গাত্র ধৌত হইয়া যে মৃত্তিকারাশি নদীমুখে সাগর গর্ভে আসিয়া পতিত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে নদীমুখে সেই ধৌত মৃত্তিকারাশি জমিয়া বাঙ্গলা দেশের উদ্ভব করিয়াছে। তাঁহারা বলেন, "নদী প্রবাহ সঞ্চারিত ঐরূপ মৃত্তিকা রাশি

(১) Ibid.

সমুদ্র গর্ভে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রথমে লম্বা ত্রিকোণ ক্ষেত্রের আকারে মোহানা স্থিত সমুদ্রকে ভরাট করিবার চেষ্টা করে, এবং ঐ ত্রিকোণ ক্ষেত্রের তল দেশ নদীর মুখে এবং অগ্রবর্ত্তী কোণ সমুদ্রের দিকে থাকে। কিন্তু সমুদ্রের প্রবল স্রোতোবেগ অতি অল্প পরিসর যুক্ত স্থান সমূহকে কর্ত্তন করিয়া বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়; এই হেতু যখন ভরাট স্থান ক্রমে সমুদ্র ছাড়িয়া উঠে, তখন এক অবিচ্ছিন্ন ত্রিকোণ ভূখণ্ড নির্ম্মিত হওয়ার পরিবর্ত্তে কতক অংশ দ্বীপা-কারে পরিণত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বীপ শ্রেণীর মধ্যে যেটী সকলের মধ্য স্থানে অবস্থিত, সেটী অল্প বিস্তর লম্বা আকার প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ ঐ ভরাট ভূখণ্ড যখন জল ছাড়াইয়া জাগিয়া উঠে নাই, অথবা ভাল রূপে জমাট বাধিয়া গিয়াছে, তখন সমুদ্র জলের স্রোতো-বেগ আর তাহার গাত্র কর্ত্তন করিয়া বিক্ষিপ্ত বা বিধৌত করিতে পারেনা। বরং তাহার মধ্যস্থিত নিম্ন ও নরম অংশ সকল কর্ত্তন করিয়া তথায় গভীর রেখা পাত করিয়া থাকে। জমী জল ছাড়াইয়া উঠিলে এই সকল গভীর রেখাই তখন "বদ্বীপ" মধ্যে বৃহৎক্ষুদ্র নদী এবং খালের আকার ধারণ করে। এই নবোদিত ভূমি ভাগ উহাদের জল ক্রিয়া দ্বারা পুনর্ব্বার ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ও ক্রমাগত জোয়ারের প্রবলতায় প্লাবিত হইয়া পলি মাটি দ্বারা পুন নির্ম্মিত হইলে একরূপ চিরস্থায়ীতা প্রাপ্ত হইতে পারে। তখন অপেক্ষাকৃত পুর্ণ নির্ম্মিত মাটি হইতে নদী নালা বিরল হইয়া অপূর্ণ নিম্ন ভাগে সরিয়া পড়ে, তথায় পুনরায় তথাবিধ রূপে নির্ম্মানের কার্য্য করিতে থাকে। গাঁঙ্গের বদ্বীপ এই রূপেই গঠিত হইয়াছে"। আবার কেহ কেহ বলেন যে "পদ্মা বা মেঘনাদ প্রথমে সমুদ্রের খাড়ি ছিল। পরে নদী গর্ভে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইওসিন যুগে যে সাগর জল হিমালয় তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ত্রেতা যুগে লঙ্কা ধ্বংসের পর, তাহা স্বাভাবিক নিয়মে হিমালয় পৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ লঙ্কা স্থানে

সরিয়া যায়। লঙ্কা দ্বীপের বিস্তৃত ভূখণ্ড ও ঐ সময়ে প্রাকৃতিক নিয়মে পুনর্গঠন করে। নদীকূলে এই সাক্ষ্য বলবৎ। অনুমান হয় তাহাতেই বা ক্রমে নিম্ন বঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে" (১)।

অন্য মতাবলম্বীগণ উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা পঞ্চমীঘাট, লাঙ্গলবন্ধ, ও কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থ ও পীঠ স্থানের উল্লেখ করিয়া বঙ্গের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহারা অনুমান করেন, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, গোদাবরী, কাবেরী, ইরাবতী প্রভৃতি নদীর স্রোতে মহাদেশের কতক ভূমি ভগ্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরের কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে ইহারা নর্ম্মদা নদীর মোহানাস্থিত খাম্বাজ উপসাগর, ইউ-ফ্রেটিস-নদী-মুখস্থিত পারস্য উপসাগর, এবং মীনাম ও মেকিয়াং নদী দ্বয়ের মোহানায় অবস্থিত শ্যামউপসাগরের উৎপত্তির বিষয় উপস্থাপিত করেন। তাহারা বলেন, "এই রূপ প্রত্যেক বেগবতী নদীর মুখে এক একটী ক্ষুদ্র বৃহৎ উপসাগরের সৃষ্টি হইয়াছে। নদীর এক স্থান ভাঙ্গে, এবং সেই মাটি দ্বারা অন্য স্থানে চরা পড়ে। সুতরাং নদীদ্বারা অতি অল্প মৃত্তিকা রাশিই সাগর সঙ্গমে নীত হয়। তদ্বারা কোন প্রকাণ্ড ভূখণ্ড উৎপন্ন হইতে পারেনা। যদি নদীর বালুকা দ্বারা দেশের সীমা বৃদ্ধি হইত, তবে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদ দ্বারা চীনের সীমা বৃদ্ধি হইত। নীল নদ, আমেজন, মিসিসিপী প্রভৃতি নদ নদী দ্বারা ও অনেক দেশ উৎপন্ন হইত। কিন্তু সর্ব্বত্রই যখন নদীর মোহানায় ভূভাগ বৃদ্ধি না হইয়া বরং সাগরের সীমাই বৃদ্ধি হয়, তখন নদী সমূহের বেগে বঙ্গোপসাগরের কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করাই সমধিক সঙ্গত"।

(১) বিশ্বকোষ।

বস্তুতঃ বাঙ্গলা দেশ নূতন নহে; বাঙ্গলার নদী বাহুল্য ও নূত
নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই নদীবহুল বাঙ্গলা বর্ত্তমা
রহিয়াছে। ইহার প্রত্যেক স্থানের অবস্থা বারংবার পরিবর্ত্তি
হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এখন যেখানে নিবিড় অরণ্য
পূর্ব্বে কোন সময়ে তথায় মহা সমৃদ্ধ নগর ছিল; তাহার প্রমাণ ও প্রা
হওয়া যায়। সুন্দর বনের স্থানে স্থানেও তদ্রূপ প্রাচীন পুরীর ভগ্নাবশে
পরিলক্ষিত হয়। তজ্জন্য অনুমান হয় যে, ঐ সকল স্থানে ও পূর্ব্বে জ
পদ ছিল; পরে মগ ও পর্ত্তুগীজ গণের ভীষণ অত্যাচারের ফলে ঐ
স্থানের অধিবাসী গণ স্থানান্তরিত হওয়ায়, উহা অরণ্যানি সঙ্কুল হইয়া
পড়িয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

খাল।

ঢাকা জেলায় অনেকগুলি খাল আছে। তন্মধ্যে তালতলার খাল, দোলাইখাল, মেন্দীখালী, তাতিবাড়ীর খাল, আকালের খাল, আড়ালিয়ারখাল, ইলিসামারী, তুলসীখালি, ব্রাহ্মণখালির খাল, মীরকাদিমের খাল, গোয়ালখালী, কুচিয়ামোড়ার খাল, মৈনটের খাল, যাত্রাবাড়ীর খাল, শিববাড়ীর খাল, ও পাইনার খাল সুপ্রসিদ্ধ।

তালতলার খাল—এই খাল তালতলার নিকটে ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া মালখানগর, ফেগুনাসার, কেচাল, সিলিমপুর, বালিগাঁও প্রভৃতি স্থানের পার্শ্ব দিয়া বহরের নিকটে পদ্মায় পড়িয়াছে। এই বিখ্যাত পয়ঃপ্রণালী খনিত হওয়ায় ধলেশ্বরী হইতে পদ্মায় যাতায়াতের পথ সুগম হইয়াছে। কীর্ত্তিনাশা ও মেঘনাদ ঘুড়িয়া যাওয়া অপেক্ষা এই রাস্তা ২০।২৫ মাইল সোজা। সুতরাং বরিশাল বাসী মহাজন গণের নৌকা পথে ঢাকায় মাল আনিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। শীতকালে এই খালের জল অনেক কমিয়া যায়, সুতরাং ঐ সময়ে মাল বোঝাই করা বড় নৌকা এই পথে যাতায়াত করিতে পারেনা।

প্রবাদ এই যে, মহারাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজা রামদাস দেওয়ান কর্ত্তৃক এই খালটী খনিত হইয়াছিল; কেহ কেহ ইহা রাজবল্লভের অন্যতম কীর্ত্তি বলিয়াও উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমাদের বিবেচনায় রামদাস অথবা রাজবল্লভ এই খালটীর সংস্কার সাধন

করিয়া ছিলেন মাত্র। কারণ, এই খালের উপরে যে একটী অতি প্রাচীন ইষ্টক নির্ম্মিত ভগ্নসেতু অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা বল্লালী পূল বলিয়া খ্যাত। উহার স্থাপত্য শিল্প দৃষ্টে উহাকে সেন রাজগণের কীর্ত্তির অন্যতম নিদর্শন স্বরূপই মনে হয়। যদি তাহা হয়, তবে রাজবল্লভ বা রামদাস কর্ত্তৃক খালটী কি প্রকারে খনিত হওয়া সম্ভব পর হয়। খালটীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫ মাইল হইবে।

দোলাই খাল—এই খাল বালু নদী হইতে বহির্গত হইয়া ঢাকা ফরিদাবাদের নিকটে বুড়িগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই খালের একটী শাখা ঢাকা সহরের মধ্য দিয়া বাবুর বাজারের নিকটে বুড়িগঙ্গা নদীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে (১)। দোলাই খাল ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট ব্যয়ে সংস্কৃত হয়। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে এই খালের মাশুল ধার্য্য হয়। ময়মনসিংহ বাসী মহাজন গণের এই পথে মাল লইয়া যাওয়া সুবিধাজনক। ১৮৩০ খৃঃ অব্দে সাধারণ ব্যয়ে দোলাই খালের উপর লৌহ নির্ম্মিত সেতু প্রস্তুত হয়। এই সময়ে ওয়ালটার সাহেব ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এই খাল খনন কার্য্যে প্রায় ২৫০০০৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

মেন্দীখালী—কাঙ্কার টেকের নিকটে ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া বৈদ্যের বাজারের নিকটে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে।

তাতি বাড়ীর খাল—সোনার গাঁয়ের অন্তর্গত "দামশরণ" বিল হইতে বালুশাই গ্রামের মধ্যদিয়া এই খালটী মেঘনাদে পতিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই খালের পাড়ে তন্তুবায়গণ বাস করিত বলিয়াই ইহা তাতীবাড়ীরখাল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

---

(১) কামার নগরের উত্তর প্রান্ত হইতে ইহার একটী শাখা বংশালের মধ্যদিয়া টঙ্গীর নদীতে মিলিত হইয়াছিল।
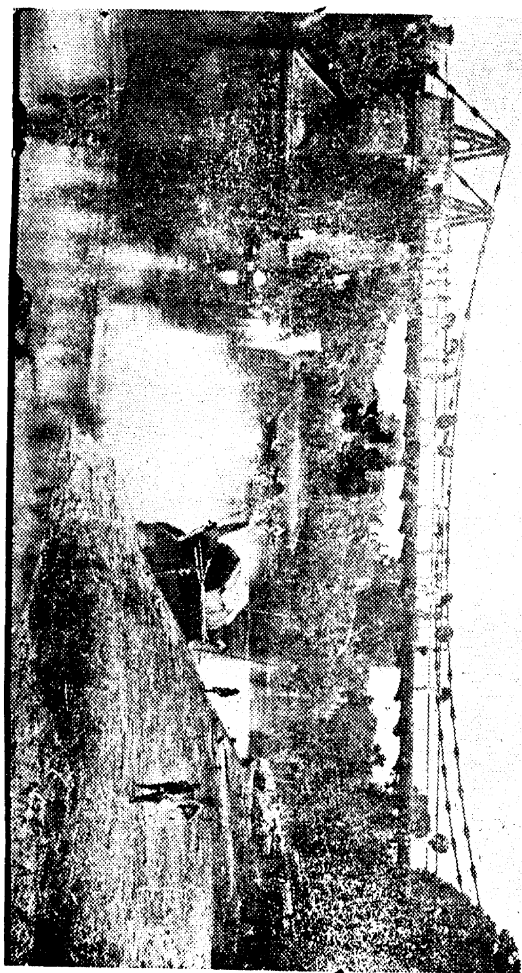
আকালের খাল—মৈকুলীর নিকটবর্ত্তী হাঙ্গানিয়ার বিল হইতে আরম্ভ করিয়া নন্দীপুর, বেহাকৈর, বয়াব, দেওয়ানবাগ, মদনপুর চাঁদপুর, কাশীপুর ও চাপাতলার পার্শ্বদেশ দিয়া কুড়ি পাড়ার নিকটে লাক্ষ্যার সহিত মিলিত হইয়াছে।

দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঈশা খাঁ মসনদ আলী কর্ত্তৃক এই খালটী খনিত হইয়াছিল। চাপাতলা গ্রামে এই খালের উপর প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড সেতু বিদ্যমান আছে। খিজিরপুর হইতে এক রাস্তা এই পুলের উপর দিয়া ঢাকা পর্য্যন্ত প্রসারিত আছে।

যাত্রা বাড়ীর খাল—এই খাল লাক্ষ্যা নদী হইতে হামছাদী গ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হামছাদী গ্রামের বৈদ্যবংশীয় সুবিখ্যাত কৃষ্ণ-দেব বকসী কর্ত্তৃক এই খাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খনিত হয়।

পাইনার খাল—এই খাল ১৮৮০ খৃঃ অব্দে কর্ত্তিত হয়। কালীগঞ্জের নিকটে বুড়িগঙ্গা নদী হইতে বাহির হইয়া শুভড্যা ও পাইনার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

আড়ালিয়ার খাল—ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া লাক্ষ্যা নদীতে পড়িয়াছে।

ত্রিবেণীর খাল—সোনাকান্দার নিকটে লাক্ষ্যা হইতে বহির্গত হইয়া কাইকারটেকের অপর পাড়ে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

জোলা খালী—বুড়িগঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণকীর্ত্তার পার্শ্বদেশ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে।

করিম খালী—এই খালটী বুড়িগঙ্গা হইতে বাহির হইয়া পারজোয়ারের বক্ষোদেশ ভেদ করতঃ ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে।

শ্রীনগরের খাল—ধলেশ্বরী হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীনগর, ব্রাহ্মণগাঁও প্রভৃতি গ্রামের মধ্যদিয়া লৌহজঙ্গের নিকটে পদ্মায় পড়িয়াছে; লৌহজঙ্গের নিকট হইতে ইহার একটী শাখা বাহির হইয়া গাউদিয়ার নিকটে তালতলার খালে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

গোয়ালখালির খাল ও কুচিয়ামোড়ার খাল—ইছামতী নদী হইতে বাহির হইয়া ধলেশ্বরী নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

মৈংটের খাল—পদ্মা হইতে বাহির হইয়া ইছামতী নদীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

মীরকাদিমের খাল—এই খালটী ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয়া সেরাজাবাদের নদীতে পড়িয়াছে।

ইলিসামারীর খাল—এই খাল ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয়া কলাকোপা, নবাবগঞ্জ, বান্দুরা, হোসনাবাদ, জয়পাড়া হইয়া পদ্মায় পড়িয়াছে।

ব্রাহ্মণ খালির খাল—ইছামতী নদী হইতে বাহির হইয়া বালিয়াখালির মধ্যদিয়া নবগ্রামের বিলে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

ঘিয়রের খাল—পুরাতন ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয়া ইছামতী নদীতে পড়িয়াছে।

শিববাড়ীর খাল—এই খাল ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয়া বরাদিয়া, উথুলী, শিবালয়, নালী, হরিরামপুর, লক্ষ্মীকোল, ও নয়া বাড়ীর মধ্য দিয়া পদ্মায় পড়িয়াছে।

এই খালের একটী শাখা হাটিপাড়া, হোসনাবাদ, দেবীনগর হইয়া নারিসার নিকটে পদ্মায় প্রবেশ করিয়াছে।

তেতুল ঝোড়ার খাল—রাজফুলবাড়িয়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ধলেশ্বরী হইতে বহির্গত হইয়া মীরপুরের নদীতে পড়িয়াছে।

হরিশ কুলের খাল—এই খাল জমসার সমতল ভূমি দিয়া প্রবাহিত হইয়া কালীগঙ্গা নদীর সহিত ইছামতী নদীর সংযোগ সাধন করিয়াছে। এই খালটী প্রায় শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় জমসা অঞ্চলের কৃষিজীবি লোকের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

চুড়াইনের খাল—গালিমপুর গোবিন্দপুরের খাল—ইছামতী নদী হইতে বাহির হইয়া আইরল বিলে পড়িয়াছে। এই খাল দিয়া বিক্রমপুরস্থ শ্রীনগর, হাসারা, ষোলঘর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়। বর্ষাকালে এই খালপথে পদ্মা নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়া চলে। বর্ত্তমান সময়ে ফাল্গুন চৈত্র মাসে এই খালটী শুষ্ক হইয়া যায়।

কিরঞ্জির খাল—এই খালটী আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে বারমাস জল থাকে। কিরঞ্জি গ্রাম হইতে ভুড়াখালী পর্য্যন্ত নৌকা পথে সকল সময়েই যাতায়াত করিতে পারা যায়।

ভাসননের খাল—কালীগঙ্গা নদী হইতে উৎপত্তি হইয়া চাইরগা নদী পর্য্যন্ত এই খালটী বিস্তৃত।

ভুরা খালী—এই খালটী খুব প্রশস্ত। কালীগঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া সাতরাখালী পর্য্যন্ত এই খালে বারমাস জলথাকে।

এই জেলার কয়েকটী প্রধান খালের সংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে এক দিকে যেমন যাতায়াত ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের সুবিধা হইবে তেমন আবার দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষেও যথেষ্ট সাহায্য করিবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের বিবেচনায় তালতলার খাল ও হরিশকুলের খালের সংস্কার এবং প্রাচীন ইছামতী নদীর পঙ্কোদ্ধার করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। তালতলার খালে এখন বার মাস নৌকা চলাচল করিতে পারে না। এজন্য ফরিদপুর ও বরিশাল

বাসী মহাজন এবং অপরাপর জনসাধারণ ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মা ও মেঘনাদ ঘুড়িয়া ঢাকায় উপনীত হইতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই খালটী কৰ্ত্তিত হইলে ঢাকা হইতে উপরোক্ত অঞ্চলে যাতায়াত করিবার প্রায় ৩০ মাইল পথ সোজা হইয়া যায়। খালে বার মাস জল থাকিলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের উৎকৃষ্ট পানীয় জলের অভাব দূরীভূত হইয়া দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি সংসাধিত হইবে।

হরিশকুলের খালটী সংস্কৃত হইলে বহুলোকের উপকার হইবে। জেলার এই অঞ্চলে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এখানকার জল এরূপ অপকৃষ্ট যে প্রতিবৎসরই বর্ষা অন্তে খাল ও বিলে মৎস্যের মড়ক দেখা দেয়। ফলে ঐ জল আরও দুর্গন্ধময় হইয়া নিতান্ত অপেয় হইয়া দাড়ায়। জমসার সমতল ক্ষেত্রে যে সমুদয় লোক কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই ইছামতী নদীতীরবাসী। সুতরাং এই খালটীতে বার মাস জল না থাকায় কৃষকগণের দুর্দ্দশার একশেষ হয়। সম্বৎসর মাঠে পরিশ্রম করিয়া সুশস্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেও ক্ষেত্র হইতে শস্য বাড়ী লইয়া যাইতেই তাহাদিগের প্রাণান্ত হয়। পূর্ব্বে তাহারা ধান্যাদি শস্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় করিয়া বাড়ী লইয়া যাইত; কিন্তু এক্ষণে মাঠের পার্শ্বেই অস্বাস্থ্যকর নিম্নভূমিতে অস্থায়ী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মান করিয়া ধান্য হইতে চাউল তৈয়ার করিবার জন্য প্রায় মাসাধিক কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিল ও ঝিল।

ঢাকা জেলার বিলগুলিকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

১ম। উন্নত ভূমিস্থ।

বেলাই বিল, সালদহের বিল, লবনদহের বিল, এই শ্রেণীভুক্ত। সালদহ ও লবনদহের বিল মধুপুরের জঙ্গলের অন্তর্গত; এবং মীর্জ্জাপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরে, ভাওয়াল ও কাশিমপুরের অরণ্যানির সীমান্তস্থানে অবস্থিত। এই শ্রেণীর মধ্যে ভাওয়ালের অন্তর্গত বেলাই বিল সুপ্রসিদ্ধ। এই সুবৃহৎ বিলটীর কোনও কোনও স্থানে বার মাসই জল থাকে। বর্ত্তমান সময়ে যে জলভাগ বেলাই বিল নামে অভিহিত হইয়া থাকে তাহার পরিমান ফল প্রায় ৮ বর্গ মাইল। বাড়িয়া, ব্রাহ্মণগাঁও, বক্তারপুর প্রভৃতি গ্রাম গুলি এই বিলের মধ্যভাগে অবস্থিত। চারিশত বৎসরের পূর্ব্বে এই বিলমধ্যে গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না। তৎকালে এই বিলটী একটী খরস্রোতা স্রোতস্বতীরূপে বিরাজ মান ছিল। প্রবাদ এই যে, ভাওয়ালের তদানীন্তন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ভূস্বামী খড়্গেশ্বর ঘোষ নামক এক ব্যক্তি এই পয়ঃপ্রণালীটী হইতে ৮০টী খাল কর্ত্তন করিয়া নদীজল নিঃশেষিত করিয়া ফেলেন। তদবধি ইহা একটী প্রকাণ্ড বিলে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় একটী ভাটের গান দ্বারা এই প্রবাদটী সমর্থিত হয়। আমরা ঐ গানটী অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম!

"খাইডা ডোস্কা ছিল রাজা—*

খাইডা ডোস্কা ছিল রাজা মহাতেজা কায়েতের কুলে,
কত দালান কোঠা তৈয়ার কর্ল্ল ভাওয়াল জঙ্গলে,
সে যে আপন মনে।

সে যে আপন মনে প্রতাপেতে রাজ্য শাসন করে,
কত সুখ শান্তি বিরাজ করে প্রজার ঘরে ঘরে,
নানা স্থানে স্থানে।

নানা স্থানে স্থানে শুভক্ষণে পুষ্করিণি কাটিল,
বেলাই বিল শুষ্ক করি নিজ প্রতাপ দেখাইল,
ভাই অদ্ভুত কাহিনী"।

ভাওয়ালের পূর্ব্বাঞ্চলস্থ স্থান গুলির অন্তর্ব্বাণিজ্য সাধারণতঃ এই বিল দ্বারাই সাধিত হয়। কিন্তু স্থানে স্থানে এই বিলটী ভরাট হইয়া শস্য ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। তাহাতে বোর ও আমন প্রভৃতি ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধীবরগণ এই বিলের স্থানে স্থানে মৎস্যের "ডাঙ্গা" খনন করিতেছে। গত বৎসর এইরূপ একটী ডাঙ্গা খনন করিতে মৃত্তিকার নীচে সারি সারি কাঠাল গাছের গোড়া পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং বিল হইবার পূর্ব্বে ঐ স্থানটী একটী জনপদ ছিল অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

২য়। সমতল ভূমিস্থ।

সমতলভূমিস্থ বিলগুলি প্রায়ই নদী ভরাটি অথবা নদীর প্রাচী খাত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। বঙ্গের সমতলস্থ ঝিলও বিল গুলি

* খাইডা ডোস্কা কায়স্থের নাম হওয়া সম্ভব কিনা তাহা বিচার্য্য বিষয় কেহ কেহ ইহাকে চণ্ডাল জাতীয় বলিয়াও অনুমান করিয়া থাকেন। "খাই ভুম্‌কা" হইবে কি?

অবস্থান সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। এ গুলির অধিকাংশই উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে এক শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিরাজমান রহিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গঙ্গানদীর প্রাচীন প্রবাহ পূর্ব্বে এই স্থান দিয়াই প্রবাহিত হইত। কাল ক্রমে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাচীন খাত গুলি বিলে অথবা ঝিলে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র অথবা তাহার শাখা নদী গুলির প্রবাহ পরিবর্ত্তন হেতু রায়পুরা অঞ্চলের ঝিলগুলির উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

সুপ্রসিদ্ধ আইরল বা চুড়াইন বিল, হাসারার বিল, (১) জমসার বিল, নরা ঝিল, রঘুনাথপুরের ঝিল, চৌহাট ঝিল, কলাকোপার বিল, খলসী বিল, নবগ্রামের বিল, গরীবপুরের বিল, মলার বিল, হাটিপাড়ার গোং, নান্নার গোং (২), সারারিয়া নল বিল, রপ্তাই বিল, লাঙ্গলাই বিল, শ্যামপুরের বিল, কিরঞ্জির বিল, হাফানিয়ার বিল, দামশরণ বিল, ভাণ্ডারিয়া বিল প্রভৃতি এই শ্রেণী ভুক্ত।

খলসী বিল, নবগ্রামের বিল, গরীবপুরের বিল, মলার বিল, হাটি-পাড়ার গোং, নান্নার বিল, রঘুনাথপুরের ঝিল, ভাণ্ডারিয়া বিল, হাফানিয়ার বিল প্রভৃতিতে বার মাস জল থাকে এবং প্রচুর মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঢাকা জেলায় বিলের সংখ্যাধিক্য বশতঃ মৎস্যের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

মধুপুর জঙ্গলের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ ভূমি অতিশয় নিম্ন। মেজর রেণেল ও বুকানন হ্যামিল্টন প্রভৃতি মনীষিগণ উহা গঙ্গার

(১) প্রকৃত পক্ষে উহা চুড়াইন বিলেরই অন্তর্গত।

(২) পূর্ব্ববঙ্গে নদীকে গাং বলিয়া থাকে; এই গাং হইতে গোং শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

প্রাচীন খাত বলিয়া অনুমান করেন। পূর্ণিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে বরিশাল পর্য্যন্ত স্থান মধ্যে যে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী নিম্নবঙ্গের বক্ষোদেশ ভেদ করিয়া বক্র গতিতে প্রবাহিত হইতেছে, আয়তন অনুসারে উহাদের গভীরতা অত্যন্ত বেশী বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই নদীগুলির নামেরও একটু বিশেষত্ব আছে। পূর্ণিয়ার বনগঙ্গা ঢাকা জেলার কালীগঙ্গা, নারায়ণীগঙ্গা, পোড়াগঙ্গা, বুড়িগঙ্গা, যশোহরের নবগঙ্গা, বরিশালের হরগঙ্গা প্রভৃতি নদীগুলির প্রত্যেকেরই নামের অন্তে "গঙ্গা" শব্দ থাকায় উহারা যে গঙ্গারই শাখানদী মাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রেণেল বলেন "গঙ্গা" শব্দ এখানে নদ্যর্থক; কিন্তু তাহা হইলে বঙ্গের অন্যান্য স্থানের নদীগুলিরও ঐ প্রকার নাম হওয়া স্বাভাবিক ছিল। নামের এবম্বিধ সামঞ্জস্য ও বিশেষত্ব টুকু বড়ই আশ্চর্য্যজনক। হ্যামিণ্টনের পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তির সহিত নদীর নাম গুলির বিশেষত্ব ও অবস্থান প্রভৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, উহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না কি?

প্রাচীন ম্যাপ দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, জাফরগঞ্জ হইতে বিলের এই শ্রেণী বরাবর দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে চলিয়াছে। জাফরগঞ্জ হইতে এই শ্রেণী আইরল বিলের মধ্য দিয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে বরিশাল জেলার অন্তর্গত হরিণাঘাটার মোহানা পর্য্যন্ত যাইয়া শেষ হইয়াছে। নদী শুষ্ক হইয়া অথবা উহার প্রবাহ পরিবর্ত্তন হেতুই যে বিল অথবা ঝিলের উৎপত্তি হইয়াছে, ইছামতী নদীর বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টেও তাহা উপলব্ধি হইতে পারে (১)।

---

(১). See A. C. Sen's Report

ঢাকা জেলার বিল গুলি মধ্যে আয়তন ও প্রশস্ততায় আইরল বিলই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। টেইলার সাহেব ইহাকে চুড়াইন বিল বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। এই সুপ্রশস্ত বিলটী পূর্ব্ব পশ্চিমে ১২ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৭ মাইল প্রশস্ত। আইরল বিলের দক্ষিণ প্রান্তে দয়হাটা, শ্যামসিদ্ধি, প্রাণীমণ্ডল, গাজীঘাট, উত্তর রাড়িখাল; উত্তরে শ্রীধর খোলা, বারুইখালি, শেখরনগর, মদনখালী, আলমপুর, তেঘরিয়া; পূর্ব্ব প্রান্তে হাসারা, ষোলঘর, তেওটখালি, মোহনগঞ্জ; পশ্চিমে কামারগাঁও, জগন্নাথপট্টি, কাঠালবাড়ী, মহতপাড়া, প্রভৃতি।

সম্ভবতঃ রাজসাহীর চলন বিল এবং ঢাকার আইরল বিলেই অতি প্রাচীন কালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম ঘটিয়াছিল। পরে উভয় নদীর প্রবাহ পরিবর্ত্তন হেতু এই স্থান শুষ্ক হইয়া প্রকাণ্ড বিলে পরিণত হইয়াছে (১)। ব্রহ্মপুত্রের "ব"দ্বীপস্থ বর্ত্তমান "ঠোঠা" দেওয়ানগঞ্জ নামক স্থান হইতে রাজসাহী জেলার "চলন" বিল পর্য্যন্ত ভূমি অতিশয় নিম্ন ছিল। এই বিষয় ফার্গুসন সাহেব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বদিক হইতে ব্রহ্মপুত্রের গতি পশ্চিম দিকে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিলে, এই নদী উল্লিখিত নিম্ন ভূমির মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইত বলিয়া অনুমিত হয়। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন প্রবাহ যে আইরল বিল মধ্যেই গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহার আংশিক চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। ব্রহ্মপুত্রে প্রবল বন্যা আরম্ভ হইলে জল স্রোত উক্ত পথ দিয়াই আইরল বিল অভিমুখে প্রবাহিত হইতে

---

(১) Ibid.

থাকে। সাময়িক প্রবল বন্যার ফলে ঐ অঞ্চলের ফসল সমূহের ক্ষতি হওয়ার বিষয় অবগত হওয়া যায় (১)।

দামশরণ বিল—সোনার গাঁয়ের অন্তর্গত বালুসাই গ্রামের পশ্চিমে প্রায় ৫ মাইল দীর্ঘ ও ২ মাইল প্রস্থ "দামশরণ" নামে একটী প্রকাণ্ড মাঠ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উহা একটী তাড়া দাম পূর্ণ বিল ছিল। ঐ তাড়াদাম ব্যাঘ্র, বন্যবরাহ প্রভৃতি বহু বন্য জন্তুর আশ্রয়স্থল ছিল। প্রায় ৬০ বৎসর হইল এই বিল ভরাট হইয়া ধান্য ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

কিরঞ্জির বিল—সুপ্রসিদ্ধ আইরল বিলের পরে এরূপ সুবৃহৎ বিল ঢাকা জেলায় আর দ্বিতীয়টী নাই। উত্তর পশ্চিমে মাণিকগঞ্জ, এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে নবাবগঞ্জ। কালীগঙ্গা নদী এই বিলের মধ্যদিয়া প্রবাহিত। চান্দর, আগলা, সোলা, সিঙ্গৈর, সিঙ্গরা, প্রভৃতি গ্রাম এই বিলের পাড়ে অবস্থিত। শিকারীপাড়া গ্রাম এই বিলের মধ্যে পড়িয়াছে।

নলগোড়া বিল, জালনি বিল, নাড়াঙ্গি বিল, নওগাঁকাঠারর বিল, ঘোষপাড়ার বিল, প্রভৃতি নবাবগঞ্জ থানায় অবস্থিত। এই সমুদয় বিলে বারমাসই জল থাকে। কলাকোপার বিল, খাড়ই বিল, গোজড়া বল, বান্দুরার বিল প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী বিল আছে। এই সমস্ত বিলে বারমাস জল থাকে না।

নদী মাতৃক ঢাকা জেলাতে প্রকৃতির স্বহস্ত রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটী ঝিলের অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত রায়পুরা অঞ্চলে এই প্রকার কতিপয় জলাশয় বিদ্যমান আছে। স্থানীয়

(১) Mr. A. B. sen's report.

জন সাধারণ এই সমুদয় জলাশয়কে "কুর" বলিয়া থাকে। ইহার মধ্যে মহেশপুরের কুর, গোকুল নগরের কুর, এবং আমিরাবদের কুর সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ যোগ্য। এই কুরগুলির জল অত্যন্ত সুস্বাদু, স্বচ্ছ ও তরল।

নদ নদীর প্রবাহ পরিবর্ত্তন এই জেলার বিশেষত্ব, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনাদ ও উহাদিগের শাখানদী সমূহের প্রবাহের নিত্য পরিবর্ত্তন হেতু স্থলভাগ জলে এবং জলভাগ স্থলে সর্ব্বদাই পরিণত হইয়াছে। নদী গুলির প্রবাহ পরিবর্ত্তনের বিষয় আলোচনা করিলে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের সন্নিকটবর্ত্তী রায়পুরা অঞ্চলের ঝিলগুলি উক্ত নিয়মেই হইয়াছে।

মহেশপুরের কুর*—এই কুরটীর প্রাকৃতিক সংস্থান অতি সুন্দর। ইহা আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রায় এক মাইল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। প্রবাদ এই যে, ইহার জলপান করিয়া পূর্ব্বে অনেক লোক নিরাময় হইয়াছে। আকরিক পদার্থের সংমিশ্রণ জন্য ইহার জলরাশির এরূপ অদ্ভূত রোগ মুক্তির ক্ষমতা থাকা আশ্চর্য্য নহে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। সোনার গাঁ পরগণার লাক্ষ্যাও মেঘনাদ তীরবর্ত্তী স্থান সমূহের মৃত্তিকা রক্ত বর্ণ, উহাতে অভ্র ও লৌহের সংমিশ্রণ রহিয়াছে বলিয়া ভূতত্ত্ব বিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। সুতরাং উক্ত প্রবাদ বাক্য একেবারে উপেক্ষণীয় নহে।

---

* প্রতিভা ১৩১৮ চৈত্র সংখ্যা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রসিদ্ধ বর্ত্ম।

প্রাচীন রাস্তা। মোসলমান শাসন সময়ে সেরসাহ সহর সোনার গাঁ হইতে নীলাব পর্য্যন্ত একটী সুপ্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করেন। এতদঞ্চলে উহা "সাহী রাস্তা" নামে সুপরিচিত। তৎপরে মোগল সুবাদার মীরজুমলা, সায়েস্তা খাঁ ও ইব্রাহিম খাঁ কর্তৃক সৈন্যগণের গমনাগমণের জন্য কয়েকটী রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল।

রেণেলের সপ্তদশ সংখ্যক মান চিত্রে কয়েকটী প্রাচীন রাস্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন কালীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ মুলফৎগঞ্জ নামক স্থান হইতে একটী রাস্তা করাতিকাল, নবীপুর, ও লড়িকুলের মধ্যদিয়া রাজনগর পর্য্যন্ত পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল; তথা হইতে এই রাস্তা উত্তর দিকে গমন করতঃ নূন কিশোর হইয়া ধানকুনিয়া পর্য্যন্ত উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই স্থান হইতে রাস্তাটী পূর্ব্ববাহিনী হইয়া ধাওদিয়া গ্রামের পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া মেঘনাদনদতীরবর্ত্তী রাজাবাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই রাস্তাই সুপ্রসিদ্ধ "কাচকীর দরজা" নামে পরিচিত। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে এই রাস্তাটীর অনেকাংশ এক্ষণে নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইদিলপুরের নিকটস্থ বুড়ীরহাটও দেওভোগ নামক স্থান হইতে উহার একশাখা আরম্ভ হইয়া বিক্রমপুর ভেদ করিয়া উত্তরদিকে ধলেশ্বরীনদীর তট পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ম্মবংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক এবং সেনরাজগণের

সময়ে যে সমুদয় রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার কতকাংশ এই কাচকীর দরজার সহিত পরে সংযোজিত হয়; সুতরাং এই রাস্তাটীর সমুদয় অংশ রায় মহাশয়গণের কৃত নয়। স্থানে স্থানে যাহা আছে, তাহা পরে কোথায়ও ভগ্ন হইয়া ক্ষেত্রে, কোথায়ও বা লোকালয়ে এবং অবশিষ্ট শ্বাপদ শঙ্কুল অরণ্যানিতে পরিণত হইয়াছে। এই রাস্তাটীর উৎপত্তি সম্বন্ধে জানা যায় যে চাঁদ-কেদার রায়ের মাতার অদৃষ্ট গণনা করিয়া কোন জ্যোতির্ব্বিদ বলিয়াছিল মৎস্যের কণ্টক বিদ্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু সংঘটন হইবে। এই কারণে কেদাররায়, জননীর জন্য কণ্টকহীন মৎস্যের ব্যবস্থা করেন। কাচকী গুড়ানামে একপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য নদীতে পাওয়া যায়। সেই মৎস্য পদ্মা, মেঘনাদ ও ধলেশ্বরীতে প্রত্যহ ধৃত হইয়া যাহাতে সুবিধা মত রাণীর জন্য পৌছিতে পারে, তন্নিমিত্তই রায় মহাশয়গণ কর্ত্তৃক এই রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছিল। কথার মূলে যাহাই থাকুক, কাচকী মৎস্য ধৃত করিবার ব্যপদেশে উহার সৃষ্টি এই কিম্বদন্তীই চলিয়া আসিতেছে, এবং এই জন্য রাস্তার নাম ও "কাচকীর দরজা হইয়াছিল" (১)!

রেণেলের দ্বাদশ ও ষোড়শ সংখ্যক মানচিত্রে যে কয়েকটী প্রাচীন রাস্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা গেল।

একটী রাস্তা বুড়ীগঙ্গাতীরবর্ত্তী গাট্টানামক গ্রামের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া পারজোয়ারের পূর্ব্ব প্রান্ত স্থিত মামুরদী ও কলাতিয়া, নামক স্থানের মধ্যদিয়া ধলেশ্বরী নদীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তাটী কাটাখালী খালের সহিত প্রায় সমান্তরাল ভাবেই চলিয়াছে। পরে, ধলেশ্বরীর অপর পারস্থিত হিসারতপুর, রিপুসা, মূলবর্গ, মহুপুর,

---

(১) নির্ম্মাল্য ১৩০৭ বারভূঞা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কম্বোপারা, সাপোর, সুনিগর প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্ব দিয়া ধলেশ্বরী নদীর সহিত প্রায় সমান্তরাল ভাবে অগ্রসর হইয়াছে।

বুড়িগঙ্গা তীর হইতে অপর একটী রাস্তা পারজোয়ারের মধ্যদিয়া অগ্রসর হইয়া শুভড্ড্যার সন্নিকটে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। পরে একশাখা ধলেশ্বরী তীরস্থিত ঠাকুরপুর নামক গ্রাম পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে এবং অপর শাখা কোয়ারাখোলা গ্রামের মধ্য দিয়া ধলেশ্বরী নদীর তীর ভূমি পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঠাকুরপুর গ্রাম হইতে অপর একটী রাস্তা কোমারতা গ্রামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া এই শেষোক্ত শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে।

ধলেশ্বরীর দক্ষিণতীরস্থিত মুসুমপুর নামক গ্রামের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিক দিয়া উপরোক্ত রাস্তাটীর সম্প্রসারণ চলিয়াছে, এবং উহা চুড়ান, গোবিন্দপুর, বাঘমারা প্রভৃতি গ্রামের মধ্যদিয়া নবাবগঞ্জের নিকটে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে; উহার একশাখা বান্দুরা, বারুয়াখালী, বোয়ালী, জলেশ্বর, দানিশপুর, যাত্রাপুর, ঝিটকা, সাঙ্করাল, উথুলী, রাধাকান্তপুর হইয়া জাফরগঞ্জ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। তথা হইতে সুর্দ্দা পর্য্যন্ত এই রাস্তাটী চলিয়া গিয়াছে।

অপর শাখা ইগ্রাসী, লটাখোলা, মৈনট, দেহরো, পুরালিয়া, কান্দিয়া প্রভৃতি গ্রামের মধ্যদিয়া পদ্মা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। ইহার সম্প্রসারণ হাজিগঞ্জ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মৈনট হইতে এই রাস্তার একটী ক্ষুদ্র শাখা মুরুল্লাপুর হইয়া পদ্মাতীর পর্য্যন্ত গিয়াছে। পদ্মাতীরবর্ত্তী আলিপুর হইতে অপর একটী রাস্তা চরমুণ্ডিয়া, হাজিগঞ্জ, ও পাটপাসার হইয়া ফরিদপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

ইছামতী তীরবর্ত্তী পাথরঘাটা নামক স্থান হইতে একটী রাস্তা বাসাইলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পশ্চিমে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একশাখা কাজিশাল,

সুয়েলপুর, আগোয়া, আলমপুর, শিতলখোলা, বারৈখালী প্রভৃতি গ্রামের মধ্যদিয়া চুড়াইনের নিকটে সুর্দ্দার রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। আসোরা হইতে ইহার অপর একটী শাখা ষোলঘর, চানচিদ, বায়ারকোল প্রভৃতি স্থান হইয়া নুরপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

অপর শাখাটী রাঙ্গামালিয়া হইয়া সুরাজদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত; এবং তথা হইতে একটী রাস্তা মীরগঞ্জ, আবদুল্লাপুর, মীরকাদিম, ফিরিঙ্গি বাজার প্রভৃতি স্থানের মধ্যদিয়া ইছামতী তীর বর্ত্তী ইদ্রাকপুর পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছে। মীরগঞ্জ হইতে ইহার একটী ক্ষুদ্র শাখা সুগুট-চিনা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। অপর রাস্তাটী নুন্দকিচেল অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

ঢাকা হইতে একটী রাস্তা জাফরাবাদ, মীরপুর, সিবদী, পাচকুণিয়া, সালিপুর, বাগুরতা, সামপুর, জামোরা, বুরারিয়া, সাভার, মকুলিয়া, বারিগাও, ধামরাই হইয়া দিনাজপুরও রঙ্গপুর অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

ঢাকা হইতে অপর একটী রাস্তা, বসুর বাগান, আম্বার্স ব্রিজ এবং তেজগায়ের সন্নিকটবর্ত্তী ফরাসী ও ওলন্দাজদিগের বাগানের পার্শ্বদেশ স্পর্শ করতঃ নিয়াহাট, সলপুর, এবং টঙ্গীরপুলের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। অপর একটী রাস্তা নূনপাড়া, নওরাহাট, ইছাপুর, বৌলন, মুতারাগঞ্জ, হইয়া ভাওয়াল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। তথা হইতে একটী শাখা বাহির হইয়া ফুলপাড়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে টঙ্গীর রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে।

অপর একটী প্রাচীন রাস্তা ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্যামপুরও ফতুল্লা হইয়া নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত প্রসারিত; এবং উহা লাক্ষ্যা নদীর অপর তীর বর্ত্তী বন্দর নামক স্থান হইতে কলাগাছিয়া, সোমাপুর, তিরেপুর, কুটাপুর, ফুলদী, ববচর হইয়া মেঘনাদ তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই

রাস্তা দাউদ কান্দী হইয়া মতলবগঞ্জ, মহবৎপুর ও লক্ষ্মীপুরের মধ্য দিয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ঢাকা হইতে অপর একটী রাস্তা কায়েতপাড়া ও রূপগঞ্জ গ্রামের মধ্য দিয়া লাক্ষ্যাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; এবং লাক্ষ্যা নদীর অপরতীর বর্ত্তী মোনাপাড়া, বালিয়া, পাচদোনা, ভাটপাড়া, পারুলিয়া, কাপি, গুরবাড়িয়া, কুলচেন্দী, ছানান্দিয়া, নুন্না, প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া এগার সিন্ধুর অপরতীরস্থ সাগরদী নামক স্থান পর্য্যন্ত প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। পাচদোনার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে এই রাস্তাটী দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে, এবং অপর শাখাটী মেঘনাদ তীরবর্ত্তী নরসিংদী বন্দর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে।

১৫৪০ খৃব্দে ডিবেরোস তদানীন্তন বাঙ্গালার একটী মানচিত্র অঙ্কিত করেন। উক্ত মানচিত্র অবলম্বন করিয়া ১৬৬০ অব্দে ভ্যান ডেক ব্রুক যে বঙ্গদেশের ম্যাপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতে দেখাযায় যে একটী রাজপথ ঢাকা হইতে ধলেশ্বরী পার হইয়া পর পারে পীরপুর এবং ধলেশ্বরীও যমুনার বিচ্ছেদ স্থল বেদলিয়া দিয়া পাবনা জেলার অন্তর্ব্বর্ত্তী শাহজাদপুর ও হাড়িয়াল পর্য্যন্ত গিয়াছে *।

অপর একটী রাস্তা পদ্মার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ফতেবাদ (বর্ত্তমান ফরিদপুর) হইয়া ঢাকার অভিমুখে গিয়াছে।

বর্দ্ধমান হইতে একটী রাস্তা সেলিমাবাদ, হুগলী, যশোহর, ভূষণা হইয়া সত্রজিৎপুর স্পর্শ করিয়া ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যা নদীর সঙ্গম স্থলে ইদ্রাকপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

---

* Van Den Brouche's map in valentynes works—referred to by Dr. Blochmann.

নূতনরাস্তা—ঢাকা হইতে শ্যামপুর, ফতুল্লা, পাগলা হইয়া নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত ৮ মাইল বিস্তৃত পাকা রাস্তাটী ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং নারায়ণ গঞ্জের অপর তীরবর্ত্তী নবীগঞ্জ নামক স্থান হইতে এই রাস্তাটী পুনরায় আরম্ভ হইয়া কাই কার টেক, ও মোগরা পাড়া হইয়া বৈদ্যেরবাজার পর্য্যন্ত ৭৸ মাইল প্রসারিত। এই উভয় রাস্তার ধারেই প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি রোপিত আছে।

ঢাকা হইতে অপর একটী প্রসিদ্ধ রাস্তা টঙ্গী, সিঙ্গছাড়ি, উলুসারা হইয়া টোক পর্য্যন্ত ৪৬॥ মাইল বিস্তৃত। এই সুবৃহৎ রাস্তাটী ডিষ্ট্রীক্ট ফেরি ফাণ্ডের অর্থানুকুল্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাই ঢাকা জেলার সর্ব্ব প্রধান পথ। এই রাস্তার উপরে স্থানে স্থানে পুল আছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ টঙ্গীর পুল এই রাস্তায় পড়িয়াছে। মোগল সুবাদার মীরজুমলা সর্ব্ব প্রথম এই রাস্তাটীর পত্তন ও পরিসমাপ্তি করেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। টঙ্গীর পুলটী মীরজুমলার নির্ম্মিত বলিয়া জানা যায়; কিন্তু কেহ কেহ বলেন সা টঙ্গী নামক জনৈক ফকির নবাব ইব্রাহিম খাঁর সময়ে এই পুল প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

এই রাস্তার একটী শাখা কুদ্দা হইয়া জয়দেবপুর পর্য্যন্ত ৫মাইল বিস্তৃত।

ঢাকা সহর হইতে একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাস্তা ১৸৹ মাইল দূরবর্ত্তী মগবাজার নামক স্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত।

মুন্সীগঞ্জ হইতে একটী ক্ষুদ্র রাস্তা ধলেশ্বরী তীরবর্ত্তী বারুণী-ঘাট পর্য্যন্ত ৸ মাইল বিস্তৃত।

মুন্সীগঞ্জ হইতে অপর একটী রাস্তা ফিরিঙ্গি বাজার, রিকাববাজার, মীর কাদিম, আবদুল্লাপুর, তালতলা, ইছাপুর, সিঙ্গপাড়া হইয়া ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীনগর নামক স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। এই রাস্তাটী ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ৩।৪ বৎসরের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়।

ঢাকা-গোয়ালন্দ রাস্তা—এই বৃহৎ রাস্তাটী তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া শীলপুর, সুলতানগঞ্জ, জাফরাবাদ, প্রভৃতি গ্রামের পার্শ্বদেশ দিয়া মীরপুর পর্য্যন্ত ১১ মাইল বিস্তৃত। এই রাস্তাটীর পার্শ্বে গাছ আছে। দ্বিতীয় অংশ, মীরপুর হইতে গ্রামের মধ্যদিয়া তুরাগ নদীর পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং পুনরায় নদীর পশ্চিম তীর হইতে আরম্ভ করিয়া বৈলেরপুর, জামুর, হইয়া নন্দখালির নিকটে ধলেশ্বরী নদীর পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত। ধলেশ্বরীর পশ্চিমতীর হইতে এই রাস্তাটী ভাকুন,, জয়মণ্ডপ, ও সিঙ্গৈর, হইয়া বায়রা পর্য্যন্ত ১৬ মাইল বিস্তৃত। তৃতীয় অংশ বাস্তুরা, বানিয়াজুরী, জোকা, মহাদেবপুর ও উথুলী প্রভৃতি গ্রাম ভেদ করিয়া বোয়ালীর নিকটে যমুনা-তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। এই অংশের দৈর্ঘ্য ১৫॥০ মাইল। পার্শ্বে গাছ আছে।

নবাবগঞ্জ হইতে একটী রাস্তা কলাকোপা, পাল্লামগঞ্জ হইয়া মৈনট পর্য্যন্ত ৭।০ মাইল বিস্তৃত। মৈনট হইতে একটী প্রাচীন রাস্তা পুরলিয়া নয়াবাড়ী, জালালদী, পশ্চিমচর, রোস্তমপুর, মনসুরাবাদ প্রভৃতি স্থানের নিকট দিয়া পদ্মাতীর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

কলাতিয়ার রাস্তা কেরাণীগঞ্জ, বরিশুর, খাগাইল প্রভৃতি গ্রামের মধ্যদিয়া আটি পর্য্যন্ত ৭ মাইল বিস্তৃত।

ঝিটকা হইতে এক রাস্তা কলতা সরুপাই হইয়া নবগ্রাম পর্য্যন্ত ৬৷৷৹ মাইল বিস্তৃত।

শ্যামপুর হইতে একটী রাস্তা ফুলবাড়িয়া, কর্ণপাড়া হইয়া সাভার পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ডাঙ্গা হইতে পাকুরিয়া, মাত্রা, পাচদোনা, ও নরসিংদী পর্য্যন্ত ৯।০ মাইল ব্যাপী একটী রাস্তা আছে।

শ্রীপুর—গোসিঙ্গার রাস্তা ৪॥ মাইল ব্যাপি। শ্রীপুর ও গোসিঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম ইহার পার্শ্বদেশে অবস্থিত।

ডেমরার রাস্তা ১ মাইল ব্যাপি; দয়াগঞ্জ ও কাজলা এই রাস্তার পার্শ্বদেশে অবস্থিত। প্রকৃত পক্ষে এই রাস্তাটী ঢাকা সহর হইতেই আরম্ভ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। রাস্তার ধারে বৃক্ষ আছে।

এতদ্ব্যতীত ১। মাইল বিস্তৃত জৈনসারের রাস্তা, ২৮ মাইল ব্যাপী বজ্রযোগিনীর রাস্তা, ১ মাইল ব্যাপী কাটাখালীর রাস্তা, এবং ১॥ মাইল বিস্তৃত সা আলী সার দরগার রাস্তা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তা হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

বন।

ঢাকা জেলার উত্তরভাগ ভীষণ অরণ্যানি সঙ্কুল। এই অরণ্যানির পূর্ব্বভাগ ভাওয়ালের গড় এবং পশ্চিমভাগ কশিমপুরের গড় নামে পরিচিত। এই উভয় ভাগকেই মধুপুর বনভূমির অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই জনসমাগমশূন্য বিরল বসতি বিপুল অরণ্যানির মধ্যে স্থানে স্থানে সুবৃহৎ ইষ্টকস্তূপ ও বিশাল দীর্ঘিকা নয়নগোচর হয়। তাহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, মধুপুর অঞ্চল এক সময়ে বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। এই বিশাল অরণ্যানির কোথায়ও অযত্নগ্রথিত লতা-বিতানে পুঞ্জীকৃত বনপুষ্প, কোথায়ও খণ্ড নীলিমা তুল্য বাপীজলে সলিললীলা-চঞ্চল শুভ্র জলজ ফুলদল, কানন কুন্তলা ধরিত্রীর শ্যাম অঙ্গে শোভা পাইতেছে। ইহার পশ্চিমোত্তর অংশ প্রকাণ্ড বৃক্ষরাজি সমাচ্ছন্ন ও শ্বাপদ সঙ্কুল।

অবস্থান—ঢাকা সহর হইতে এই বিশাল বনভূমি উত্তরে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত পাথরঘাটা হইতে ব্রহ্মপুত্রতীরবর্ত্তী বেলাব নামক স্থান পর্য্যন্ত এই বনের পরিসর প্রায় ৪৫ মাইল হইবে। ইহার পশ্চিম দিকস্থ গণ্ডশৈলমালা সমতল ভূমি অপেক্ষা প্রায় ৪০ ফিট হইতে ১০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। পশ্চিম

দিক হইতে এই গণ্ডশৈলমালা ক্রমশঃ নিম্নতা প্রাপ্ত হইয়া আড়িয়ল খা নদী পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে প্রসারতা লাভ করিয়াছে (১)।

সীমা।—বংশীনদীকে এই বনভূমির পশ্চিম সীমা বলা যাইতে পারে। উত্তর ও পূর্ব্ব সীমায় ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত এবং আড়িয়লখা নদী। দক্ষিণ সীমা বুড়িগঙ্গা নদী। নদরাজ ব্রহ্মপুত্র যৎকাল পর্য্যন্ত এই জেলার পশ্চিমদিকে সরিয়া যাইয়া গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মার সহিত মিলিত না হইয়াছিল, এবং বুড়িগঙ্গানদী ধলেশ্বরীর শাখা নদীতে পরিণত হইয়া সাভার ও ফুলবাড়িয়ার মধ্যস্থিত বানার নদীর অংশ আত্মসাৎ করিতে না পারিয়াছিল, তৎকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের শাখানদীদ্বয় দ্বারাই মধুপুর গড়ের সীমা সংরক্ষিত ছিল। পূর্ব্বদিকস্থ প্রাচীনতম প্রবাহটী এই গড়ের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা রক্ষা করিত, এবং বানার নদী পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত থাকিয়া সমতলভূমি হইতে ইহার বিচ্ছিন্নতা সম্পাদন করিত। ব্রহ্মপুত্রের "বদ্বীপ" এর ন্যায় পরিলক্ষিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা তদন্তর্গত নহে (২)।

ভূতত্ত্ব—এই বন ভূমির মৃত্তিকার প্রথম স্তর অতিশয় কঠিন ও রক্তবর্ণ। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে লোহের সংমিশ্রণ আছে, কিন্তু বালুকার একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথম স্তরের নিম্নের এক অংশ রক্তবর্ণ বালুকা পরিপূর্ণ। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ঐ বালুকারাশি অজয় ও বরাকর নদের তলভাগস্থ বালুকারাশির অনুরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। বিন্ধ্যপর্ব্বতস্থিত বালুকারাশি ও মধুপুর গড়ের মৃত্তিকামিশ্রিত বালুকারাশির তুল্য, ইহা পরীক্ষিত হইয়া প্রমাণীকৃত

---

(১) Vide Mr. A. C. Sen's Report.

(২) Vide Mr. A. C. Sen's Report.

হইয়াছে। ঐ মৃত্তিকা ও বালুকারাশিতে জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না।

এই বনভূমির অবস্থান সম্বন্ধেও একটু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার দক্ষিণ ও বাম ভাগস্থ ভূমি অতিশয় নিম্ন। পূর্ব্ব দিকস্থ গহ্বরশ্রেণী উত্তরে গাড়ো পাহাড়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব দিকে, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের গিরিমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ময়নামতী পাহাড় ও লিমাই পর্ব্বতমালা এই গহ্বর মধ্যে অবস্থিত। এই উভয় গিরিমালার উৎপত্তি ও অবস্থান মধুপুর গড়েরই অনুরূপ সন্দেহ নাই।

এই গহ্বর শ্রেণীর উত্তরাংশে শ্রীহট্টস্থ ঝিল সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং এই নিম্ন ভূমির সমুদয় অংশই মেঘনাদ অথবা উহার শাখানদী ও উপনদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। মিঃ হুকার, শ্রীহট্ট অঞ্চল পরিভ্রমণকালে, বায়ুমানযন্ত্র সহযোগে উক্ত ঝিল গুলির উচ্চতা নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বঙ্গোপসাগরের নীলাম্বুরাশি হইতে ঐ ঝিলস্থ জলরাশির উচ্চতা অতি সামান্য মাত্র অধিক বলিয়া তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মধুপুর গড়ের পশ্চিমদিকস্থ গহ্বর শ্রেণীর উচ্চতা সম্বন্ধে মেজর রেণেলও উল্লিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে ঢাকা জেলাস্থ উক্ত গহ্বর শ্রেণীর বিশেষ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল। ফলে উহা অনেক উচ্চতা লাভ করিয়াছিল। আইরল বিল, জমসা, ধামরাই ও জয়পুরার নিম্ন ভূমি এবং চোহাট ঝিল মধ্যে অদ্যাপি গহ্বর শ্রেণীর চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

মধুপুর বন নিরবচ্ছিন্ন শৈলমালা সমাকীর্ণ নহে, অথবা উচ্চ ভূমির নিরবচ্ছিন্ন সমাবেশও এখানে পরিলক্ষিত হয় না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গণ্ডশৈলের ন্যায়, মৃত্তিকার স্তূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতি

করিতেছে ; মধ্যে মধ্যে গহ্বরসমূহ ও ঝিলরাশি বিদ্যমান থাকিয়া এই উচ্চ বনভূমির উৎপত্তি সম্বন্ধে মনীষিবর্গের বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে।

ফার্গুসন ও ব্ল্যানফোর্ডের সিদ্ধান্ত*—মধুপুর বনাঞ্চলস্থিত ভূমির এতাদৃশ উন্নতাবস্থা প্রাপ্তির কারণ অনুসন্ধান জন্য অনেক মনীষিবর্গই মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন। মধুপুর বনভূমির উচ্চতা নিবন্ধনই ঢাকার উত্তরদিকস্থ ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। কিন্তু, শ্রীহট্টস্থ ঝিলসমূহের নিম্নতাও উহার প্রবাহ-পরিবর্ত্তনের কারণ হইতে পারে। বদ্বীপের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান ও তাহার বিশ্লেষণ করিলে উক্ত মতই অধিকতর সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আবার প্রকৃতির যে অনতুলঙ্ঘনীয় নিয়মাধীনে নদ-নদীগুলি স্রোতোবাহিত পলিমাটির সঞ্চয় দ্বারা ভরাট হইতেছে এবং পুনরায় ঐ ভরটি স্থান দিয়াই অভিনব পথে প্রবাহিত হইতেছে তাহার আলোচনা করিলে উপরোক্ত দুইটী সিদ্ধান্তের কোনও একটীতেই আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না।

এই বনভূমির উত্তর-পশ্চিমদিকস্থ স্থানসমূহ, ব্রহ্মপুত্রের বর্ত্তমান উপত্যকা অথবা শ্রীহট্টস্থ ঝিলসমূহের সন্নিকটবর্ত্তী উহার প্রাচীন উপত্যকাভূমি হইতে অনেক উচ্চ। সুতরাং মধুপুর অঞ্চল এবম্বিধ উন্নতাবস্থায় পরিণত হইবার পরেই তৎসন্নিহিত ভূমির পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এসম্বন্ধে মিঃ ব্ল্যানফোর্ড যে তিনটী অনুমান উপস্থিত করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

---

* Mr. Fergusson's paper : Q. J. G. S XIV, 1863 Page 321 (330) : and Geology of India pt I by Medlicott and Blanford.

* ১ম। নৈসর্গিক কারণে উন্নতাবস্থা প্রাপ্তি।

২য়। সমীপবর্ত্তী কতকস্থান সমূহের নিম্নতা।

৩য়। ব্রহ্মপুত্র ব্যতীত অপর কোনও স্রোতস্বতীর প্রবাহ দ্বারা আনীত মৃত্তিকা রাশি সঞ্চিত হইয়া উচ্চতা প্রাপ্তি।

উপরোক্ত তিনটী অনুমান মধ্যে মিঃ ব্লানফোর্ড শেষোক্তটী অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, "গঙ্গার শাখা নদী সমূহের নিম্নভূমি অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। শ্রীহট্টস্থ নদ নদী সমূহ স্রোতের সহিত অতি অল্প পরিমাণেই পলিমাটি বহন করিয়া আনয়ন করে। সুতরাং ঐ সমুদয় নদী কর্ত্তৃক পলিমাটি সঞ্চিত হইয়া মধুপুর অঞ্চলের এবম্বিধ উচ্চতা প্রাপ্তি একপ্রকার অসম্ভব"। মিঃ ব্লানফোর্ডের মতে ভূকম্প অথবা এতৎ সাদৃশ অন্য কোনও নৈসর্গিক কারণ সমবায়েই এই স্থান উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে' (†)। "নিম্ন বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সমূহেই ভূকম্পের মাত্রা কিছু অধিক বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; সুতরাং ব্রহ্মপুত্রের আসামস্থিত উপত্যকা ও শ্রীহট্টস্থ ঝিল সমূহের নিম্নতা প্রাপ্তি যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেই সংঘটিত হইয়াছে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ভূকম্পের ফলে আসাম ও শ্রীহট্ট প্রদেশের কত-

---

(*) "Madhupur jungle may have been raised.

(2) Parts of the surrounding Country may have been depressed.

(3) "Or that the alluvion of the Madhupur area may have been deposited by some other river than the Brahmaputra—Geology of India by Medlicott and Blanford.

(†) See Geology of Indla by Medlicott and B anford.

কাংশ ভূমি নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে ইহা স্বীকার করা গেলেও ঢাকার উত্তরাংশ স্থিত ভূমিও যে এই কারণেই উচ্চ হইয়া পড়িতে পারে তাহা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না" (১)।

"মধুপুর অঞ্চলের অবস্থান এবং উহার প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে উপলব্ধি হইয়া থাকে যে, আংশিক উন্নতানত অবস্থা গঠন ও ক্ষয় নীতি অনুসারেই সংঘটিত হইয়াছে। ১৮১৯ খৃঃ অব্দের ভীষণ ভূকম্পনে কচ্ছ প্রদেশের পশ্চিমাংশস্থিত কতক স্থানের স্ফীতি এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী অপরাংশের নিম্নতা প্রাপ্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়" (২)।

ব্ল্যান ফোর্ডের সিদ্ধান্ত আমাদিগের নিকটে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মধুপুর অঞ্চল নিরবচ্ছিন্ন শৈলমালা সমাকীর্ণ নহে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উচ্চ মৃত্তিকা স্তুপ বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। প্রথমস্তর স্থিত রক্তবর্ণ মৃত্তিকার নীচেই লাল বালুকা রাশি পরিলক্ষিত হয়। কূপ খনন করিয়া বিভিন্ন মৃৎস্তরের বিশ্লেষণ দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে উহা কোনও কালে বিপর্য্যস্ত হয় নাই।

নদী বাহিত পলিমাটির সঞ্চয় দ্বারাই প্রথমতঃ এই স্থান উন্নত হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ক্রমশঃ নিম্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পরে নদী স্রোতঃ যুগযুগান্তর ক্রমে ইহার বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হওয়ায়, প্রবল স্রোতোবেগে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া এতদঞ্চল উন্নতানত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। রক্তবর্ণ মৃৎস্তরের সমাবেশ পরিলক্ষিত হওয়ায় মনে হয়, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নদীর স্রোতোবাহিত যে পলিমাটি

(১) Mem. G. S. I. N. p. (140) ; VII. P. (156).

(২) Geology of India by Modlicott and Blanford ; and also Mr. A. C. Sen's report.

এখানে সঞ্চিত হইয়াছিল, উহা তাহারই শেষ নিদর্শন স্বরূপ রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে নিয়মে বঙ্গদেশ নদী মেখলায় পরিবেষ্টিত আছে তৎকালে ইহার যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ছিল। বস্তুতঃ সেই সময়ে নদনদী সমূহ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নিয়মাধীনেই প্রবাহিত হইত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎকালে গঙ্গাও ব্রহ্মপুত্রের উত্তরবঙ্গস্থিত শাখানদী সমূহ মধুপুর বনভূমি বিদীর্ণ করিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইত। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র ও গাড়ো পর্ব্বতের অবস্থানের বিশেষত্ব হেতু নদী প্রবাহ এতদঞ্চল কর্ত্তন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয় নাই। পক্ষান্তরে মধুপুর অঞ্চলস্থিত রক্তবর্ণ মৃত্তিকারাশি সুর্ম্মা, মেঘনাদ ও গঙ্গার স্রোতো বাহিত মৃত্তিকা রাশি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সুতরাং সমুদয় বিষয় বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ব্ল্যানফোর্ডের উপেক্ষিত তৃতীয় সিদ্ধান্তটীই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহোদয় মধুপুরের বনভূমি পরীক্ষা করিয়া এই থানে লৌহ খনি আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া মন্তব্যপ্রকাশ করিয়া ছিলেন। উক্ত মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া স্থান অনুসন্ধান ও পরিদর্শন জন্য গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক একজন রাসায়ণিক পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তিনিও সেন মহাশয়ের মতের সমর্থন করিয়াছিলেন।

এই বনভূমি "গড়গজালি" বলিয়া সুপরিচিত। এই গড়ের গজারি বৃক্ষ দ্বারা ঘরের থাম প্রস্তুত হইয়া থাকে। জ্বালানিকাষ্ঠ রূপেও ইহা ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে এতদঞ্চলে হাতীর খেদা প্রস্তুত হইত এবং তাহাতে অনেক বন্য হস্তী ধৃত হইত। বর্ত্তমান সময়ে এই সুবৃহৎ বনভূমি হইতে হস্তী একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে, হিংস্রজন্তুর ও তেমন প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয় না।

অষ্টম অধ্যায়।

পরগণা ও তপ্পা, থানা, ফাড়িথানা, রেজেষ্টরী অফিস, গ্রাম, মহকুমা প্রভৃতি।

পরগণা।

আগলা, আমিরাবাদ, আটিয়া, ঔরঙ্গাবাদ, আজিমপুর বনগাও, বাগমারা কাশিমপুর, বহর, বৈকুণ্ঠপুর, বলৌর, বলরামপুর, বন্দরখোলা, বন্দর একরামপুর, বাঙ্গরা, বরদাখাত, বড়বাজু, ভবানীপুর, ভাওয়াল, বিরোল, বিক্রমপুর, বিরমোহন, বোয়ালিয়া, চান্দপ্রতাপ, চন্দ্রদ্বীপ, চরহাই, চুনাখালী, দক্ষিন সাহাবাজপুর, দক্ষিন সাহাপুর, দোহার, দুর্গাপুর, ফতে-জঙ্গপুর, ফতুল্লাপুর, গঞ্জ শাখরাবাদ, গির্দ্দবন্দর, গোবিন্দপুর, গুণানন্দি, হবিবপুর, হাসনাবাদ, হাসারা, হজরৎপুর, ইব্রাহিমপুর, ইদগা, ইদিলপুর, ইদ্রাকপুর, একরামপুর, এনায়েৎনগর, ইশাখাবাদ, ইসলামপুর, জাফর-উজিয়াল, জাহানাবাদ, জাহাঙ্গীরনগর, জোয়ানসাহী, কার্ত্তিকপুর, সুজা-বাদ, কাশীমনগর, কাশিমপুর, কাসিমপুর কল্যানশ্রী, কাসিমপুর শাসন বাসন, কাশীপুর, কাটারমুলিয়া, খলিলাবাদ, খাঞ্জাবাহাদুরনগর, খানপুর, খড়গপুর, খিজিরপুর, কোসা, মাদারীপুর, মহিয়াদিপুর, মজিদপুর, মাজুমপুর, মকসুদপুর, মিরকপুর সাহবন্দর, মোবারকউজিয়াল, মহবৎপুর মকিপুর, মুকুন্দিয়াচর, মকিমাবাদ, নরসিংহপুর, নসরৎসাহী, নয়াবাদ তালিপাবাদ, নুরুল্লাপুর, পাটপাসার, পুখুরিয়া, পুরচণ্ডী, রায়নন্দলালপুর, রায়পুর, রাজনগর, রামপুর, রামপুরনয়াবাদ, রামপুর শ্যামপুর, রঞ্জাপ,

রসিদপুর, রসুলপুর, রোকন্দপুর, সাহেবাবাদ, সৈয়দপুর, সাজাপুর, সালেশ্বরী, সলিমপ্রতাপসদরপুর, সরাইল, সতরখণ্ড, সাহাবন্দর, সাউভিয়াল, সাজাদপুরতিল্লি, শিবপুর, শিবপুর শ্যামপুর, সিন্দুরী, সিঙ্গের, সোনারগাঁও, সুজাবাদ কুতবপুর, সুজাপুর সাজাপুর, সুলতান প্রতাপ, সুলতানপুর, শ্যামপুর, তালিপাবাদ, তেলিহাটি, উত্তর সাহপুর, ইয়ারপুর।

তপ্পা।

আথরা ক॰াকোপা, আলিপুর, অম্বরপুর, আমিরাবাদ, আমিরপুর, আওলিয়ানগর, ঔরঙ্গাবাদ, বাকীপুর, বলরামপুর, বারৈকান্দী, ভবানীনগর, বিরমোহন, দানিস্তানগর, দৌলতপুর, দিয়ানৎপুব, গোবিন্দপুর, গোপালপুর, হায়দরাবাদ, হাজিখানপুর, হাজিপুর গোপালপুর, হকিয়ৎপুর, হাসনাবাদ, হাবেলীজাহানাবাদ, হাবেলী মামুদপুর, হাবেলী, ইরাদাৎপুর, ইছাপুর, ইতবারনগর, জাফরনগর, কলমা, কামরাপুর, কাষ্টসাগরা, কাটারব, খলসী, খুর্দ্দধামরাই, কুড়িখাই, মহেশ্বরদী, মুকসদপুর, বাহাদুরপুর, মীরাকপুর, মীর্জ্জাপুর, নন্দলালপুর, নারান্দিয়া, নাজিরপুর, নিখলি, পাচভাগ. বারিল, রাধাকান্তপুরখুর্দ্দ, রায়পুর, রামকৃষ্ণপুর, রণভাওয়াল, রসুলপুর, সফিপুরখুর্দ্দ, সকিয়াদ্দিপুর, সাখিলি, সাফরিদনগর, সায়েস্তানগর, সরিফপুর, সিংড়া, শ্রীধরপুর, সুজানগর, সুজাপুর, তৈলপুর, তায়েবনগর।

মহকুমা, থানা, গ্রাম প্রভৃতি।

ঢাকা জেলার সর্ব্বশুদ্ধ ৮৬৯২ থানা গ্রাম ও নগর আছে। সদর মহকুমা ব্যতীত নারায়ণগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, ও মুন্সীগঞ্জ এই তিনটী মহকুমা লইয়া ঢাকা জেলা গঠিত। থানার সংখ্যা ১৩ টী, ফাড়ি থানা ৮টী, এবং রেজেষ্টরী আফিস ১৩টী।

থানা।

সদর মহকুমা—সদর কোতয়ালী, কেরাণীগঞ্জ, কাপাসীয়া, সাভার, নবাবগঞ্জ।

নারায়ণগঞ্জ মহকুমা—নারায়ণ গঞ্জ, রূপগঞ্জ, রায়পুরা।

মুন্সী গঞ্জ মহকুমা—মুন্সী গঞ্জ, শ্রীনগর, লৌহজঙ্গ।

মানিকগঞ্জ মহকুমা—ঘিয়র, হরিরামপুর।

ফাড়ি থানা।

সদর—কালিয়াকৈর, জয়দেবপুর।

নারায়ণ গঞ্জ—নরসিংদী, মনোহরদী, কালীগঞ্জ।

মুন্সীগঞ্জ—রাজাবাড়ী, লৌহজঙ্গ।

মাণিকগঞ্জ—শিয়ালো আরিচা।

রেজেষ্টরী আফিস।

সদর—সদর, কালীগঞ্জ, সাভার, জয়কৃষ্ণপুর।

নারায়ণগঞ্জ—নারায়ণগঞ্জ, রায়পুরা।

মুন্সীগঞ্জ—মুন্সীগঞ্জ, শ্রীনগর, লৌহজঙ্গ, রাজাবাড়ী,

মাণিকগঞ্জ—মাণিকগঞ্জ, ঘিয়র, হরিরামপুর,

গ্রাম।

কোতালী থানায় ১৫ থানা—ঢাকা, ব্রাহ্মণচিরান, চোধুরী-বাজার, রায়ের বাজার, কালুনগর, মধুপুর, সোনাটেঙ্গর, চরকঘাটা, রাজমুন্সুরী, বিবিরবাজার, সুলতানগঞ্জ, সুরাইজাফরাবাদ, উত্তর বাজার প্রভৃতি।

কেরানীগঞ্জ থানায় ১০৬৪ খানা—কেরানীগঞ্জ, সুভড্যা, তেঘরিয়া, বরিশুর, কুণ্ডা, পশ্চীমদী, রোহিতপুর, পাইনা, শাক্তা, কলাতিয়া, মীরপুর, মান্দাইল, আটি, পানিয়া, নাজিরপুর, মদনমোহন-পুর, শীয়ালী, বেলনা, শুভানীপুর, নয়াবাড়ী, বাগাশুর, সুন্দিয়া, শ্রীধরপুর, নোয়াদ্দা, ধীৎপুর, লক্ষীগঞ্জ, দৌলেশ্বর, বিয়ারা, ডেমরা, মাতাইল, কুর্ম্মীটোলা, টঙ্গী, বোয়ালী, গাছা, জয়দেবপুর, রাজেন্দ্রপুর, পুবাইল, দক্ষিণখাঁ, ধীরাশ্রম, হাইদ্রাবাদ, থাইলকুড়ি প্রভৃতি।

কাপাসীয়া থানায় ৮৫৪ খানা—কাপাসীয়া, কারিহাতা, সিঙ্গারদিঘী, লাখপুর, মামুদপুর, পারলীয়া, কালীগঞ্জ, ব্রাহ্মণগাঁও, বলধা, বাগটিয়া, বর্মি, শ্রীপুর, উলুসারা, ধনদিয়া, কাওরাইদ, টোকচাদপুর, ঘোড়াশাল, জাঙ্গালিয়া, বক্তারপুর, গোসিঙ্গা, খোদাদিয়া, সম্মানিয়া, টোকনগর, রাথুরা, কান্দনীয়া, একডালা, ধলজুরি, বালিগাও, বরাব, চরসিন্দুর প্রভৃতি।

নবাবগঞ্জ থানায় ৩৬৫ খানা—নবাবগঞ্জ, আগলা, মাসাইল, হরিশকুল, গোবিন্দপুর, দোহার, নারিসা, মুকসুদপুর, কালীকাপুর, দেবী-নগর, কাওনিয়াকান্দা, মামুদপুর, মৈনট, হোসেনাবাদ, কলাকোপা, নয়াবাড়ী, জয়কৃষ্ণপুর, দাউদপুর, বান্দুরা, শ্রীরামপুর, অন্ধরকোটা, বিনোদপুর, কুসুমহাটী, পল্লামগঞ্জ, নবগ্রাম, শীকারীপাড়া, বক্সনগর, চূড়াইন, গালীমপুর, যন্ত্রাইল, জয়পাড়া, খুলিয়ারা, নয়ানশ্রী, বাহ্রা, সোল্লা, সুতারপাড়া, মাতাবপুর, সুরলিয়া প্রভৃতি।

সাভার থানায় ১১৯৯ খানা—সাভার, রাজফুলবাড়িয়া, তেতুলঝোড়া, সুজর, রোয়াইল, অলকদিয়া, রঘুনাথপুর, কেন্তি, সুয়া-পুর, নারায়, তাকুরতা, বালিশুর, গুগুয়া, কাটিগ্রাম, আমতা, চৌহাট্ট, যাদবপুর, বলিয়াদি, গজারিয়া, গোসত্র, গোয়ালচালা, কালিয়াকৈর,

শ্রীফলতলি, আগুলিয়া, সিমুলিয়া, কাশিমপুর, বাইগনবাড়ী, বিরুলিয়া, বনগাও, ধামরাই, দেবতার পটি, কাজীপুর, কাহেতপাড়া, গণকবাড়ী, রাঙ্গামাটিয়া, ফিরিঙ্গিপাড়া, নলুয়া, চালজোড়া, দেওয়াইর, উল্টাপাড়া প্রভৃতি।

নারায়ণগঞ্জ থানায় ৭৩৬ খানা—নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, ফতুল্লা, নবীগঞ্জ বা কদমরসুল, হরিহরপুর, গন্ধর্ব্বপুর, তারবো, আমিনপুর, লাঙ্গলবন্ধ, বৈদ্যেরবাজার, বারপাড়া, আটী, বারদী, লক্ষ্মীবারদী, মুড়াপাড়া, রুকসি, ধুপতারা, বানিয়াপাড়া, দমদমা, মোগড়াপাড়া, কাইকারটেক, পানাম, আজিমপুর, সিদ্ধিরগঞ্জ, ধামগড়, পঞ্চমীঘাট, হোসনপুর, হাড়িয়া, গাবতলী, যাত্রাবাড়ী, কাচপুর, টাইটকা, ভেকৈর, জালকুড়ি, গোদ্‌নাইল, ধর্ম্মগঞ্জ, হরিহরপাড়া, গোপালনগর, গোপচর, দেওভোগ, বন্দর, কুড়িপাড়া, সম্মানদি, সোনাকান্দা, গাবতলি প্রভৃতি।

রূপগঞ্জ থানায় ৯৮৪ খানা—রূপগঞ্জ, মাঝিনা, নোঁয়াগাও, সাবাসপুর, পিতলগঞ্জ, পসি, ব্রাহ্মণকীর্ত্তি, বিরাব, আড়াইহাজার, মনোহরদী, সুলতানসাহাদী, পাচদোনা, শিলমন্দি, নরসিংদী, নজরপুর, হোসেনহাটা, দাসপাড়া, কাঞ্চনজোয়ার, নওগাও, দামোদরদী, ডাঙ্গা, মাধবদী, ভাটপাড়া, চম্পকনগর, সাটিরপাড়া, রামচন্দ্রদী, সদাসরদী, আলগী, নগরদৈকাদী, মনোহরপুর, রসুলপুর, খিদিরপুর, তুলসীপুর, নাগরী, গোতিয়াব, মুড়াপাড়া, বরুণা, গোলাকান্দাইল, মাওলা, ভোলাব, মুরাদনগর, পাচরুখী, ধুপতারা, পাচগাও, সিলমানদী, চিনিসপুর, কান্দাপাড়া প্রভৃতি।

রায়পুরা থানায় ৮১৬ খানা—রায়পুরা, আমিরাব, রামনগর, মামুদাবাদ, বেলাব, গোতাসিয়া, চালাকচর, নরেন্দ্রপুর, সিমুলিয়া, একদোয়ারিয়া, লাখপুর, জয়নগর, পুঠিয়া, চক্রধা, শিবপুর, হোসেনপুর,

বোয়ালমারা, রামপুরহাট, কসবা, নয়াবাদ, বাজনাব, ব্রাহ্মণদী, মনোহরদী, রসুলপুর, হরিনারায়ণপুর, আলিনগর, পাচকান্দি, পালপাড়া, কুমড়াদি, পুরন্দী, শঙ্করদী, দুলালপুর, আলিপুর, জামালপুর, কাচীকাটা, কালিয়াকুর, মজলিসপুর, মাছিমপুর, সাধারচর, খড়িয়া, ডৌকেরচর, বায়াইকান্দি, আমিরগঞ্জ, বাহেরচর, রামনগর, মহেশপুর, পলাশতলি, হাসিমপুর, নারায়নপুর প্রভৃতি।

মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় ৫৩৫ খানা—মুন্সীগঞ্জ, পঞ্চসার, কমলাঘাট, ফিরিঙ্গীবাজার, মীরকাদিম, রামপাল, বেতকা, পাইকপাড়া, কৈচাল, আউটসাহী, সোনারং, বজ্রযোগিনী, কেওর, সিলিমপুর, বালিগাও, পুড়াপাড়া, কুড়মিড়া, আড়িয়ল, সিমুলিয়া, রাউতভোগ, যশোলঙ্গ, বাঘিয়া, কলমা, বাসিরা, পাচগাও, ভরাকৈর, স্বর্ণগ্রাম, মুলচর, তেলিরবাগ, বহর, সাওগাও, টঙ্গীবাড়ী, কাঠাদিয়া, মিতারা, বানরী, বিদগাও, চাচুৎতলা, রাজাবাড়ী, বাহেরক, বাহেরপাড়া, গুণগাও প্রভৃতি।

শ্রীনগর থানায় ৪৭৭ খানা—শ্রীনগর, রাজানগর, ষোলঘর, হাসারা, শেখরনগর, কুমারভোগ, সেরাজদিঘা, কোলা, ভাগ্যকুল, পাওলদিয়া, মালখানগর, ফেগুনাসার, বয়রাগাদী, কুকুটিয়া, তালতলা, তন্তর, মেদিনীমণ্ডল, কাজিরপাগলা, কোরহাটি, হলদিয়া, তেওটিয়া, ব্রাহ্মণগাঁও, লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, কনকসার, বেজগাও, পশ্চিমপাড়া, জৈনসার প্রভৃতি।

মানিকগঞ্জ থানায় ৭২২ খানা—পয়লা, তিল্লি, বেতিলা, শাক্তা, ধানকোড়া, সাতুরিয়া, চামটা, গরকুল, দরগ্রাম, আটিগ্রাম, জাগীর, চান্দর, লালিতগঞ্জ, মত্ত, দাসোরা, নবগ্রাম, উথলি, ধুল্লা, মিতারা, হাতীপাড়া, বালিয়াটি, শিঙ্গাইর, জয়মণ্টপ, বলধারা, বায়রা, বালিয়ারা, সিমুলিয়া, ছনকা, বঙ্খুরা প্রভৃতি।

হরিরামপুর থানায় ৩৩৮ খানা—বল্লা, ঝিটকা, রাজখাড়া, খাড়াকান্দী, গাগা, ভুবনপুর, মানিকনগর, হরিহরদিয়া, লটাখোলা, গোপীনাথপুর, উজানকান্দী, মালুচী, বালিয়াকান্দী, বাহাদুরপুর, আধার-মানিক, মৃজানগর, পাটগ্রাম, গঙ্গারামপুর, সুতালড়ি, আজিমনগর, লক্ষীকুল, কাজিকান্দা, ইব্রাহিমপুর, লেছরাগঞ্জ, ভাটিকান্দি কাঞ্চনপুর, কালিকাপুর।

ঘিয়র থানায় ৫৯০ খানা—বরটিয়া, জিওনপুর, থলসী, চকমিরপুর, দৌলতপুর, আশাপুর, বানিয়াজুরী, ঘিয়র, শ্রীবাড়ী, মহাদেবপুর, বাসুদেববাড়ী, ঠাকুরকান্দী, নিলুয়া, রামচন্দ্রপুর, টেপ্রি, শিবালয়, আরিচা, ইলিচপুর, তরা, বুতুনী, ধুসুর, শিবালয়, আরিচা দাসকান্দী, বাউলকান্দী, মরিচা, আরাইবাড়ী, ঝাটপাল, তেওতা, নালী প্রভৃতি।

মহকুমা বিভাগ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হইয়া জেলার শাসনকার্য্য দুইভাগে বিভক্ত হয়। ঐ সনেরই মে মাসে মাণিকগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হয়। তৎকালে মাণিকগঞ্জ মহকুমা ফরিদপুর জেলার অধীন এবং মাদারিপুর মহকুমার অন্তর্গত পালঙ্গ থানার ৪৫৮ খানা গ্রাম ঢাকা জেলার সামিল ছিল। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে মাণিকগঞ্জ মহকুমা ও নবাবগঞ্জ থানার কতক অংশ ফরিদপুর জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে আটিয়া থানা এই জেলা হইতে খারিজ হইয়া ময়মনসিংহ জেলার অধীন হয়। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে নারায়ণগঞ্জ মহকুমা স্থাপিত হইয়া জেলার কার্য্যভার চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

নবম অধ্যায়।

কৃষি।

মৃত্তিকার অবস্থা ও রকম—এই জেলার মৃত্তিকা সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) পাহাড়িয়া বা আঠালিয়া, (২) দোয়াসা (ঝিল সমূহের মৃত্তিকা এই শ্রেণীভূক্ত) (৩) চরা।

আঠালিয়া মাটি চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে; কিন্তু তুলা, ইক্ষু ও পাট প্রভৃতি উৎপাদনের পক্ষে এই মাটিই সুপ্রশস্ত। বলা বাহুল্য যে এই সমুদয় ফসল আঠালিয়া মাটিতেই ভাল জন্মে।

দোয়াসা বা বিলের মাটি ধান্য, খেসারী ও মটর প্রভৃতি উৎপাদনের উপযোগী।

পদ্মা ও যমুনার দিয়ারা চরা জমী অপেক্ষা মেঘনাদের চরা জমীর উৎপাদিকা শক্তি বেশী।

অবস্থাভেদে উক্ত ত্রিবিধ প্রকারের জমী আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্তকরা যাইতে পারে। যথা:—

(১) **ভিটিজমী**:—ইহাতে বাড়ী ঘর প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

(২) **নালজমী**:—এই জমী চাষবাসের উপযোগী। নালজমী চতুর্ব্বিধ যথা:—

(ক) বর্ষার—নিম্নভূমি; ইহাতে আমন ধান্য জন্মে।

(খ) খামা—অপেক্ষাকৃত উচ্চ। খাসাধান্য এই জমীতে উৎপন্ন হয়।

(গ) ভতি—এই জমীতে দুই হাত বা আড়াই হাত পরিমিত জল উঠে। আশ্বিনি, কিয়ণ ও বজল ধান্য এই জমীতে উৎপন্ন হয়।

(ঘ) সালি—উচ্চভূমি। রোয়াধান্য উৎপাদনের উপযোগী।

(৩) আউসজমী—এই জমী দ্বিবিধ, যথা :—

(ক) রোয়া—নালজমী হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ। এই জমী আউস ধান্য উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত।

(খ) বুনা—নদীতটস্থ বালুকাময় উচ্চ ভূমি। এই জমীতেও আউস ধান্য উপ্ত হইয়া থাকে।

(৪) বোরোজমী ঃ—এই জমী দ্বিবিধ, যথা :—

(ক) ঝিল অথবা মধুপুর বনান্তর্গত পার্ব্বত্য নদীর কিনারার জমী এই শ্রেণীভুক্ত। ইহা বোরো ধান্য উৎপাদনের উপযোগী।

(খ) যে নদীতে জোয়ার ভাটা হয় এরূপ নদীর কিনারার জমী এই পর্য্যায় ভূক্ত।

(গ) লেপী—কর্দ্দমময় চরা জমী। এই জমীতে লাঙ্গল দিতে হয় না, সুধু লেপী করিয়া ধান্য বপন করিতে হয়।

এই জেলায় মোট ২৭৮২ বর্গমাইল জমী। তন্মধ্যে—

আবাদী	১৪৩২	বর্গমাইল
বাগবাগি চা	৩০০	,,
রাস্তাঘাট	১০০	,,
জলেডুবা	২০০	,,
আবাদের যোগ্য পতিত	৫০০	,,
অনাবাদী	২৫০	,,
	২৭৮২	

কৃষিজ দ্রব্য।

ধান্য—ধান্যের চাষ এই জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে এই ফসলের প্রায় তৃতীয়াংশই আউস ও বোরো জাতীয়। আমন, আউস ও বোরো ভেদে ধান্য ত্রিবিধ।

(১) আমন—আমন ধান্য দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে, যথা :—বুনা ও রোয়া।

(ক) বুনা—রায়েন্দা, বাওয়া, থামা ও সাধারণ এই চতুর্ব্বিধ প্রকারের বুনা ধান্য জন্মে। অপেক্ষাকৃত কঠিন মৃত্তিকায়, এবং যে জমীতে বর্ষার জল ৬।৭ ফিট পর্য্যন্ত উঠে, এরূপ স্থানে, এই জাতীয় ধান্য জন্মিয়া থাকে। আইরল বিল, জমসার চক, জয়পুরার চক, সালদহ, পুবাইলের বিল, লবনদহ, পারজোয়ারের বিল ও শ্যাম-পুরের চক প্রভৃতি স্থানে এই জাতীয় ধান্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ক্ষেত্রে জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধান্যের ডাটও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জাতীয় ধান্যের ডাট ২০ ফিট পর্য্যন্তও লম্বা হয়। ধান্য কর্ত্তিত হইলে ডাটের নিম্ন ভাগ নাড়ারূপে ব্যবহৃত হয়।

রায়েন্দা ও বাওয়া ধান্য মাঘ এবং ফাল্গুন মাসে উপ্ত হয়; কিন্তু অপর জাতীয় আমন ধান্যের ন্যায় উহাও অগ্রহায়ণ পৌষ মাসেই কর্ত্তিত হইয়া থাকে।

(খ) রোয়া—সাইলও সাধারণ রোয়া ভেদে এই জাতীয় ধান্য দ্বিবিধ। খুব কঠিন মৃত্তিকায়, এবং যে জমীতে বর্ষাকালে প্রায় এক ফুট পরিমাণ জল উঠিয়া থাকে, তথায় ইহা উৎপন্ন হয়। মধুপুর অঞ্চলের নিম্নতমভূমিতে এবং আইরলখা নদীতীরে এই ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ও এই জাতীয় ধান্য কিছু কিছু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(২) আউস—আউস ধান্য দ্বিবিধ; সাধারণ ও লেপী।

(ক) সাধারণ—ভেসলান, বোয়াইলা, সাইতা, সূর্য্যমণি প্রভৃতি সাধারণ পর্য্যায় ভুক্ত। বালুকাময় উচ্চভূমিই এই জাতীয় ধান্যের উৎপত্তি স্থান। পদ্মা, মেঘনাদ, যমুনা ও ধলেশ্বরীর উচ্চ তীরভূমিতে এবং মধুপুর বনান্তর্গত ভূমিতে ইহা জন্মিয়া থাকে। বোয়াইলা ও সাইতা বালুকাময় ভূমিতেই প্রচুর জন্মে; কিন্তু বর্ষার প্রথম সময়ে যে ভূমিতে দুই ফিটের অধিক জল উঠিয়া থাকে তথায় ইহা জন্মে না। আউস ধান্যের জমীতে পাটের চাষ ভাল হয় বলিয়া পাটের চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ধান্যের চাষ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। আউস ধান্যই কৃষি জীবির প্রাণ স্বরূপ; সুতরাং ইহার চাষ কমিয়া যাওয়ায় কৃষকদিগকেও ধান্য ক্রয় করিতে হইতেছে। মাঘ হইতে বৈশাখ মাসের প্রথম সময় পর্য্যন্ত ইহার বপন কার্য্য চলিতে পারে। আষাঢ় হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত এই ধান্য কাটিবার সময়। মেঘনাদের চরা জমীতে মাঘ মাসেই ইহার বপন কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে; কিন্তু মাণিকগঞ্জের উত্তরাংশে ইহা বৈশাখ মাসেও উপ্ত হয়। এই জাতীয় ধান্যের "নিড়ানি" বড়ই কঠিন।

(খ) লেপী—সাইতা—পলিপড়া নূতন চরা জমীতে এই ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। পদ্মার কোনও কোনও চরে সাইতা ধান্য প্রচুর জন্মে।

(৩) বোরো—এই ধান্যও সাধারণ ও লেপী ভেদে দ্বিবিধ।

(ক) সাধারণ—রায়পুরা থানার অন্তর্গত স্থান সমূহে, মেঘনাদের তীরবর্ত্তী প্রদেশে, শ্রীরপুর ও কালিয়াকৈর প্রভৃতি স্থানে ইহা প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। রসাল জমীই এ জাতীয় ধান্য উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(খ) লেপী—নূতন জমীতে এই ধান্য জন্মিয়া থাকে। কালিয়াকৈর ও পদ্মার চরা জমীতে ইহা প্রচুর উৎপন্ন হয়। মধুপুর অঞ্চলের বিলে ও পয়োনাশীর খাতে, মেঘনাদের চরা জমীতে ও উহার তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে, এবং পদ্মার কোনও কোনও চরে ইহা জন্মিয়া থাকে। যে কর্দ্দমময় মৃত্তিকায় উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রণ আছে তথায় এই ধান্য ভাল জন্মে। কার্ত্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহেই চারা জন্মাইতে হয় এবং পৌষ মাসে এই চারা রোয়া হইয়া থাকে। সাইলা ধান্যের ন্যায় এই ধান্যও বৈশাখ মাসেই কর্ত্তিত হয়।

বোরো ধান্যের জমীতে "দোন" লাগাইয়া সময়ে সময়ে জল সেচন করা আবশ্যক হয়। মীরপুর অঞ্চলের কৃষকগণ অমাবস্যাও পূর্ণিমাতে এই প্রকারে জল সেচন করিয়া থাকে।

বোরোধান্য উৎপাদনের ব্যয় কম, অথচ ফসলও বেশী উৎপন্ন হয়।

প্রতি বিঘায় আমন ধান্য ৩/ মণ হইতে ১০/ মণ; আউস ধান্য ৪/ মণ হইতে ৮/ মণ; এবং বোরো ধান্য ৪/ মণ হইতে ১২/ মণ পর্য্যন্ত জন্মিয়া থাকে।

এই জেলাতে আমন এবং আউস এই উভয়বিধ ধান্যই একই জমীতে একত্র বপন করিবার রীতি প্রচলিত আছে। এই প্রথার একটী সুবিধা এই যে, যদি কোনও কারণে একটী ফসল নষ্ট হয় তবে অপরটী দ্বারা তাহা পূরণ হইতে পারে। ভাল জন্মিলে সম্বৎসরে দুইটী ফসলই পাওয়া যায়, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এই দুইটী ফসল উৎপাদন করিলে তাহা ঘটিয়া উঠে না।

পাট—পশ্চিমে লাক্ষ্যানদী এবং ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের নিম্নাংশ, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র, পূর্ব্ব ও দক্ষিণে মেঘনাদ, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থান মধ্যে প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। বিক্রমপুরের বিলে এবং মাণিকগঞ্জ অঞ্চলেও

কম পাট জন্মে না। সাতুরিয়ার পূর্ব্বদিকস্থ সমতল ক্ষেত্রে, মধুপুর অঞ্চলের উচ্চভূমিতে, এবং মাণিকগঞ্জ মহকুমার উত্তরাংশে প্রচুর পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। হরিরামপুর, নবাবগঞ্জ ও শ্রীনগর থানায় এবং সাভারের উত্তর পশ্চিমাংশে অপেক্ষাকৃত কম জন্মে। মেঘনাদের চরা জমীতে উৎপন্ন পাটই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত।

নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, জাফরগঞ্জ, ঘিওর, সাতুরা, বায়রা, কোরাণীগঞ্জ, পাইনা, কালীগঞ্জ, লাখপুর, তালতলা, লৌহজঙ্গ প্রভৃতি বন্দর হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর পাট কলিকাতায় রপ্তানি হইয়া থাকে।

কোন্ সময় হইতে এই জেলায় পাটের চাষ প্রথম আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত রূপে অবধারণ করা যায় না। শত বৎসর বয়স্ক প্রাচীন কৃষকের মুখেও শ্রুত হওয়া যায় যে, তাহারা বাল্যকাল হইতেই ইহার চাষ দেখিয়া আসিতেছে। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, তুলার চাষ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিলেই, এই অভিনব কৃষিশিল্পের দিকে কৃষক দিগের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালে প্রতিমণ পাট ॥০ আনার অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত না (১)। পশ্চিমঢাকায় এই চাষের প্রবর্ত্তন অনেক পরে হইয়াছিল। তথায় কুসুমফুলের চাষ হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সূচনা হয়।

উৎপন্নের হার এই জেলার সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন্ অঞ্চলে কত মণ পাট প্রতি বিঘায় জন্মিয়া থাকে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

(১) Report on the Agriculture and Agricultural statistics of Dacca District by Mr. A. C. Sen.

১৮৫৫ খৃঃ অব্দে পাটের মণ ১।০ হয়; ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে বৃদ্ধি পাইয়া ২।০ টাকাতে পরিণত হইয়াছিল; বর্ত্তমান সময়ে ৭॥০ হইতে ১০৲ টাকা মণ চলিতেছে।

ব্রহ্মপুত্রের	চরাজমীতে	প্রতি বিঘায়	৫/	মণ হইতে	১০/	মণ পর্য্যন্ত	জন্মে
মেঘনাদের	,,	,,	৪/	,,	,, ৭/	,,	,,
মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলে		,,	৪/	,,	,, ৬/	,,	,,
মাণিকগঞ্জ ,,		,,	৩/	,,	,, ৬/	,,	,,
মধুপুরের উচ্চভূমিতে		,,	৬/	,,	,, ৭/	,,	,,

কি উচ্চভূমি কি দিয়ারা চর সর্ব্বত্রই পাট উৎপন্ন হইতে পারে। যে ভূমিতে ৪ ফিট পর্য্যন্ত জল উঠিয়া থাকে তথায়ও পাট জন্মিবার পক্ষে বাধা ঘটেনা। যে দোয়াসা মৃত্তিকায় উপচিত উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রন আছে তথায় ইহা ভাল জন্মে। কিন্তু সকল প্রকারের মৃত্তিকাতেই পাট জন্মিতে পারে।

আড়িয়ল খাঁ নদী তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে, বৎসরের প্রথমভাগে পাট উঠিয়া গেলে, ঐ জমীতে পুনরায় আমন ধান্য বপন করা হয়।

পাটের সার—মধুপুর অঞ্চলের উচ্চভূমিতে এবং ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতের তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে গোময় ভস্ম দ্বারা জমীতে সার দেওয়া হয়। মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীনস্থ গ্রাম সমূহে সার দেওয়ার প্রণালী অন্যপ্রকার। তথায় জমীতে প্রথমতঃ কলাই উৎপাদন করিয়া পরে উহা লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত হয়। বর্ষার জল প্লাবনে যে ভূমিতে পলিমাটি পড়ে তথায় সার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

মেঘনাদের চরা জমীতে ফাল্গুন মাসেই বীজ বপন করা হয়। কারণ ঐ সমুদয় স্থান বর্ষাকালে জল মগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু মধুপুরের উচ্চভূমিতে বৈশাখ মাসেও উপ্ত হইয়া থাকে।

উড়চুঙ্গা এবং ছেলা পোকা পাটের অনিষ্ট সাধন করে। কৃষকগণকে এজন্য সর্ব্বদাই সতর্কতা অবলম্বন করিতে দেখাযায়।

প্রতি বিঘায় /২৷৹ সের বীজ বপন করিলে বিঘাপ্রতি ৫/ মণ পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই জেলায় চতুর্ব্বিধ প্রকারের পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। (১) করিমগঞ্জী, (২) ভাওয়ালি (৩) বাকরা বাদী (৪) ভাটিয়াল।

আঁশ, বর্ণ ও দৈর্ঘ্য হিসাবে করিমগঞ্জী পাটই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দৈর্ঘ্যে ভাওয়ালী পাট ও কম লম্বা হয় না, কিন্তু অন্যান্য হিসাবে ইহা অপকৃষ্ট। ভাটিয়াল পাট সাধারণতঃ আমিরাবাদ পরগণাতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থিরজলে ধৌত করা হয় বলিয়া ইহার আঁশ নরম হয়, এবং বর্ণের উজ্জ্বলতা ও অধিক কাল স্থায়ী হয় না। দৈর্ঘ্যে ভাটিয়াল পাট কম বড় হয় না। বাকরাবাদী পাটের বর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল; কারণ ইহাতে উদ্ভিজ্জ তৈল অধিক মাত্রায় থাকে। ইহার আঁশ গুলিও খুব শক্ত।

এতদ্ব্যতীত মেস্তা, মিছট, বিদাসুন্দী, মিথি, নালিয়া (বা নালিতা) রজত প্রভৃতি অপকৃষ্ট পাটও জন্মিয়া থাকে।

বর্ণের বিভিন্নতা অনুসারে উপরোক্ত সর্ব্ববিধ পাটগুলিকেই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথাঃ—

(১) ধলসুন্দর:—ইহার রং ঈষৎ সবুজ বর্ণ। এই জাতীয় পাটই এই জেলায় অধিক জন্মে।

(২) লাল:—ইহার ডাট ও পাতা গুলি রক্তিমাভ।

এই পাট অপেক্ষাকৃত কম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জেলার পূর্ব্বাংশে পাটকে নালিয়া বা নালিতা বলে, কিন্তু পশ্চিমাংশে উহা পাট বলিয়াই অভিহিত হয়। পাটের আঁশ, পাট অথবা কোষ্ঠা বলিয়াই জেলার সর্ব্বত্র পরিচিত।

তুলা—পূর্ব্বে ঢাকা জেলার, বিশেষতঃ ব্রহ্মপুত্র ও বানার নদ-নদীর প্রাচীন খাতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহে ও রায়পাল অঞ্চলে প্রচুর

তুলা উৎপন্ন হইত। বানার নদী তীরবর্ত্তী কাপাসিয়া গ্রামে এত অধিক পরিমাণে তুলা জন্মিত যে, এজন্য ঐস্থান কাপাসিয়া বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়ে। তুলাসার, কাপাসপাড়া, প্রভৃতি গ্রামেও যে পূর্ব্বে তুলার চাষ হইত তাহা ঐ গ্রাম গুলির নাম দ্বারা সূচিত হইতেছে।

বানার নদীতীরবর্ত্তী তুরগাও গ্রামে (এই গ্রাম কাপাসিয়া থানার ৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত) এবং রামপাল নামক স্থানে এখনও সামান্য পরিমাণে তুলার চাষ হইয়া থাকে। বানচিরা নদীতীরবর্ত্তী কতিপয় গ্রামে গাড়ো অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক তুলার চাষ অদ্যাপি সংঘটিত হইতেছে।

"ঢাকা সহরের ১২ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত ফিরিঙ্গি-বাজার নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ইদিলপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত ৪০ মাইল দীর্ঘ এবং ৩ মাইল প্রশস্ত মেঘনাদ তীরবর্ত্তী ভূভাগে, অর্থাৎ কেদারপুর, বিক্রমপুর, রাজনগর, কাত্তিকপুর, শ্রীরামপুর, এবং ইদিলপুর, প্রভৃতি পরগণায়, প্রথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। মরিসস এবং বরবোন প্রবেশ-জাত তুলা প্রতীচ্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও উহা ঢাকা জেলাস্থ উপরোক্ত স্থান সমূহের তুলার নিকটে অপকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া ছিল (১)। "সমুদ্রের সান্নিধ্যই উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপত্তির কারণ বলিয়া মনীষিগণ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। লবণাক্ত বালুকা মিশ্রিত পললময় ভূমিতেই উৎকৃষ্ট কাপাস জন্মিয়া থাকে" (২)।

ধলেশ্বরী নদী হইতে আরম্ভ করিয়া লাক্ষ্যানদী তীরবর্ত্তী রূপগঞ্জ নামক স্থান পর্য্যন্ত ১৬ মাইল বিস্তৃত ভূভাগ, এবং ধলেশ্বরীনদীর

(১) History of the Cotton manufacture of Dacca District.
(২) Remarks of the Commercial Resident of Dacca in 1800.

উত্তরস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদতীরবর্ত্তী কতিপয় স্থানেও খুব উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিত; বলদাখাল, ভাওয়াল, আলেপসিং, এবং রাজসাহী জিলান্তর্গত ভূষণা নামক স্থানেও অল্প পরিমাণে ফুটিতুলা উৎপন্ন হইত। ১৮৯০।৯১ খৃঃ অব্দে এই জাতীয় তূলা উৎপাদনের একবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাহা সফলতালাভ করিয়াছিল না (১)।

মিঃ টি, এল্যান, ওয়াইজ সাহেব ১৮৬০ খৃঃ অব্দের জুন মাসে ময়মনসিংহের জজ সাহেবের নিকটে এতদঞ্চলে তুলার চাষ প্রবর্ত্তন করা সম্বন্ধে যে একখানি সুদীর্ঘ লিপি প্রেরণ করিয়া ছিলেন আমরা তাহা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"ঢাকার পশ্চিমস্থিত সাতমজিল নামক স্থানে, কাপাসিয়া, সোনারগাঁও, ও বহরমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পূর্ব্বে যথেষ্ট পরিমাণে তূলা উৎপন্ন হইত। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বেও ঐ সমুদয় স্থানে অতিউৎকৃষ্ট তূলা জন্মিত।

"এই জেলার অধিকাংশ ভূমিই নদীর স্রোতোবাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। সুতরাং পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জেলার মৃত্তিকা অপেক্ষা এই স্থানের মৃত্তিকা লঘুতর। ঢাকার উত্তরাংশের ভূমি সম্পূর্ণ পৃথক উপাদানে গঠিত। তথায় আবাদীভূমির পরিমাণ অনেক কম। ফলে ঐ স্থান ভীষণ অরণ্যানি সঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে। ঢাকার উত্তর পূর্ব্বদিকস্থ কাপাসিয়া গ্রাম জঙ্গলময় হইলেও তথায় তুলার চাষোপযোগী স্থানের অভাব নাই। ঢাকার "টেঙ্গরী তূলা" জেলার উত্তরাংশস্থিত উচ্চ ও রক্তবর্ণ মৃত্তিকাতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে" (২)

ঢাকা জেলার কোন্ অঞ্চলের তূলা উৎকৃষ্ট এবং কোন্ অঞ্চলের

(১) Letter from the Commercial Resident of Dacca to the Board of Trade, Calcutta dated 30th. Novembor 1800.

(২) Narrative Cotton Hand Book.

তূলা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। বেব সাহেব বলেন "জেলার উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলস্থিত স্থান সমূহে উৎকৃষ্ট তূলা উৎপন্ন হইত"। তিনি দক্ষিণাঞ্চলের তুলা অপকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মিঃ ল্যাম্বসাহেব ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বাদী। তিনি বলেন" গঙ্গা-মেঘনাদের তীরভূমিতে অথবা উহাদের সঙ্গমস্থলে কিংবা তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে (অর্থাৎ জেলার দক্ষিণাংশেই) উৎকৃষ্ট তূলা জন্মিত, এবং তাহা হইতেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মসলিন প্রস্তুত হইত"। আবার, ওয়াইজ সাহেব চরাজমীর পক্ষপাতী। মিঃ প্রাইস পূর্ব্বোক্ত কোনও জমীই মনোনীত করেন নাই; তাহার মতে বংশীনদীর উচ্চ তীর ভূমিই উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপাদনের উপযোগী। 'উক্ত স্থান উচ্চ; সুতরাং জলপ্লাবনের আশঙ্কা বিহীন এবং উহার মৃত্তিকা রক্তবর্ণ ও কঠিন; বালুকা ও কর্দ্দমের ভাগ এক তৃতীয়াংশ মাত্র; এই সমুদয় বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই তিনি ঐস্থান মনোনীত করিয়া ছিলেন।

কাপাসিয়া অঞ্চলের ভূমি এরূপ কঠিন যে বারি পতন হইয়া মৃত্তিকা নরম এবং হল কর্ষণোপযোগী না হইলে তথায় বীজ বপন করা এক প্রকার অসাধ্য। বানার নদী তীরবর্ত্তী কাশিমপুর পরগণার জমি ও ব্রহ্মপুত্রতীরবর্ত্তী ভূমি একই উপাদানে গঠিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চরাজমি হল কর্ষণের পক্ষে সহজসাধ্য বলিয়া তিনি উহার ও প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে মধ্যে এই জেলায় কার্পাস উৎপাদনের জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রায় ৩০০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন (১)। তন্মধ্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি-গণের বেতনাদি বাবদে ২৩৩৫৩৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল।

(১) Ibid.

ঢাকা জেলার মৃত্তিকা যে কার্পাস উৎপাদনের বিশেষ উপযোগী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই (১)। কারণ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, নদী বা সমুদ্রের চর, লোণা ভূমি, উচ্চ স্থান, কঙ্কর বা বালুকাময় স্থান সর্ব্বত্রই কার্পাসের চাষ হইতে পারে। যে সকল ভূমিতে অন্যান্য দ্রব্যের চাষ ভাল হয় না, সেরূপ স্থানেই ইহা উৎপন্ন হয়। অতিশয় আর্দ্র, কর্দ্দমময়, আঁটাল মাটিতে তূলার চাষ ভাল হয় না; এবং জমী অত্যধিক সারবান হইলে বৃক্ষের তেজ অধিক হয়, সুতরাং অধিক তূলা জন্মে না।

ফুলবাড়িয়া, কর্ণপাড়া, বানারতীরবর্ত্তী রণভাওয়াল অঞ্চল, মাণিকগঞ্জ, সোনারগাঁও, বিক্রমপুর, কাপাসিয়ার নিকটবর্ত্তী সুতিপুর, টোক, বক্তাবলির চর প্রভৃতি স্থানে মিঃ প্রাইস ও ওয়াইজ সাহেবের কর্ত্ত্বাধীনে কার্পাস উৎপাদনের চেষ্টা করা হইয়াছিল (২); কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের অভাবেই যে তাহাদের উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছিল তাহা অনুমান করিবার কোনও কারণ নাই বলিয়া ওয়াইজ সাহেব বলিয়াছেন (৩)।

(১) In parts of the Dacca district, Cotton of excellent quality can be, and has been, profitably grown, not only within he limits of the true Gangetic alluvium, but on lands actually subject to annual innudation"

Narrative Cotton Handbook. Page 41.

(২) Ibid.

(৩) "Mr. J P Wise stated his belief that whatever causes the failure might be due, it ought not to be attributed to the Dacca district being unsuited for the growth of exotic contton

আমাদের বিবেচনায় কার্য্যকরী জ্ঞানের অভাব এবং ব্যয়বাহুল্যতাই তাহাদিগের উদ্যমব্যর্থ হইবার কারণ (১)।

Dr. Roxburgh তদীয় Flora Indica গ্রন্থে লিখিয়াছেন ;—
"The Dacca Cotton is a variety of gossypium herbaceum, and differs from other varieties of this species in the following respects :—

1st.—In the plant being more erect with fewer branches and the lobes of the leaves more pointed.

2nd.—In the whole plant being tinged of a reddish colour, even the petiols and nerves of the leaves, and being less pubescent.

3rd. In having the peduncles which support the flowers longer and the exterior margins of the petals tinged with red.

4th.—In the staple of the Cotton being much longer, much finer, and much softer. It was from the produce of this particular variety of Cotton that the finest Dacca Muslins were made.

"The record of Mr. Price's misfortune may, at all events, be taken as proving that some thing more than jealous perseverence and untiring energy is needed to command success where he so signally failed"—Ibid

(১) It is not to be taken for granted that this experiment of cultivating American cotton at Dacca was "so well conducted as to be conclusive".

প্রথমতঃ—এই কার্পাস চাড়ার শাখা গুলি সরল ভাবে উত্থিত হয়; এবং উহাদের সংখ্যাও কম। বিভক্ত পাতা গুলির অগ্রভাগ অধিকতর তীক্ষ্ণ।

দ্বিতীয়তঃ—সমুদয় গাছটীই ঈষৎ লোহিত বর্ণের হইয়া থাকে, এমন কি পাতার বোঁটা এবং শিরাগুলি যে সূক্ষ্ম কোমল তন্তু দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে তাহাও রক্তি মাভ।

তৃতীয়তঃ—পুষ্পের বৃন্তগুলি অধিকতর লম্বা এবং পাপড়িগুলির বহিপ্র্রান্ত ভাগ রক্তবর্ণে রঞ্জিত।

চতুর্থতঃ—তূলার আঁশগুলি অধিকতর সূক্ষ্ম, কোমল এবং দীর্ঘায়তন বিশিষ্ট।

বৎসরে তূলার দুইটী ফসল জন্মিত। একবার এপ্রেল ও মে মাসে এবং পুনরায় সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে। এপ্রেল ও মে মাসে উৎপন্ন ফসলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য ছিল। বর্ষার প্রারম্ভে জমিতে ধান্য বপন করিয়া অক্টোবর মাসে উহা কর্ত্তিত হইলে, ক্ষেত্রস্থিত নাড়াগুলি অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিতে হইত। পরে হলকর্ষণ করিয়া জমী তূলাউৎপাদনের উপযোগী করিবার জন্য কৃষকগণ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিত।

বর্ষাকালে বীজগুলি তূলার সহিত জড়িত করিয়া রাখা হইত এবং যাহাতে বীজে শৈত্য না লাগিতে পারে তজ্জন্য মৃণ্ময়পাত্র ঘৃত অথবা তৈল দ্বারা সুমার্জ্জিত করিয়া তন্মধ্যে উহা রক্ষিত হইত।

নবেম্বর মাসই বীজ বপন করিবার উপযুক্ত সময়। বীজগুলি ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে উহা জল নিষিক্ত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। বিক্রমপুর অঞ্চলে অন্যপ্রকার প্রথা অবলম্বিত হইত। তথায় বীজগুলি

একস্থানে রোপণ করিয়া পরে চাড়া উৎপন্ন হইলে অন্যত্র লাগান হইত।

ক্রমাগত ৩ বৎসর পর্য্যন্ত একই জমীতে তূলা উৎপাদন করা যায়। চতুর্থ বৎসরে জমী পতিত ফেলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু জমীতে পর্য্যায়-ক্রমে তূলার সহিত ধান্যও তিল বপন করিতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বারুজীবিগণ দ্বারাই তূলার চাষ হইত।

৮০ বর্গমাইল পরিমিত জমীতে /২।০ সের বীজ উপ্ত হইলে তাহা হইতে সবীজ ২/০ মণ তূলা জন্মিতে পারে। ৮০ সিকা ওজনের /১ সের কার্পাস মধ্যে ৬৫ সিক্কা বীজ এবং ১৫ সিকা বিবিধ প্রকারের তূলা প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত ১৫ সিকা পরিমাণ তূলার মধ্যে ৫ সিক্কামাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত। তূলার যে অংশ গুলি বীজের সহিত সংলগ্ন ও সংবদ্ধ থাকে তাহা হইতেই অতিসূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মিত হইয়া ঢাকাই মসলিন প্রস্তুত হইত। উহাকে তুলার প্রথম স্তর বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় স্তরের তূলা অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট; কিন্তু তৃতীয় স্তরের তূলাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

ফুটি, মুন্না ও বয়রাতি ভেদে, ত্রিবিধ প্রকারের কার্পাস ঢাকা জেলায় উৎপন্ন হইত (১)। এতদ্ব্যতীত সেরোঞ্জ ও ভোগা জাতীয় কার্পাস হইতে নির্ম্মিত সূতাও ব্যবহৃত হইত। সেরোঞ্জ তূলা উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ মীর্জ্জাপুর নামক স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে ঢাকায় আমদানী হইত। ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম হইতে ভোগা জাতীয় তূলা বিস্তর আসিত। পূর্ব্বে আরাকান হইতে ও যথেষ্ট তূলা আমদানী হইত; কিন্তু ১৮২৪ খৃঃ অব্দে ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হইলে উহা বন্ধ হইয়া যায়।

(১) ওয়াইজ সাহেব নয় প্রকার কার্পাসের উল্লেখ করিয়াছেন।

ইক্ষু—খাগরি, ধলসুন্দর, মারকুলি, কাজলী, লাল বোম্বাই, সারঙ্গ, সাদা বোম্বাই বা গেণ্ডেরী, এই সপ্তবিধ ইক্ষু ঢাকা জেলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বোম্বাই ইক্ষু উৎকৃষ্ট। কাপ্তান সিম্যান সাহেব মরিসস দ্বীপ হইতে লাল বোম্বাই জাতীয় ইক্ষু সর্ব্বপ্রথমে এতদঞ্চলে আনয়ন করেন। প্রথমে এই ইক্ষু ঢাকা জেলাতে খুব জন্মিত, কিন্তু এক্ষণে অতি সামান্য মাত্রই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মধুপুর জঙ্গলের সন্নিকটে এবং ঢাকা ও মীরপুর অঞ্চলে এবং লাক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের তীর ভূমিতে, দোলাই খালের ধারে এবং রামপালে ও নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী দেওভোগ নামক স্থানে প্রচুর ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। তেওতা হইতে নরসিংদী এবং কাওরাইদ হইতে লৌহজঙ্গ পর্য্যন্ত প্রায় যাবতীয় হাটেই, দোলাই খালের তীরবর্ত্তী স্থানের ইক্ষু যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হয়।

ইক্ষুর ক্ষেতে গোময় ও খৈল সাররূপে ব্যবহৃত হয়। বালুকাময় ভূমিতে অথবা পুনঃ পুনঃ ইক্ষু উৎপাদন জন্য ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া গেলে প্রথমতঃ উলুখড় জন্মাইতে হয়।

দুঃখের বিষয় এই যে, এই জেলাতে বিস্তর ইক্ষু উৎপন্ন হইলেও তদনুপাতে গুড় কম প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক বিঘা জমীতে যে পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা ৭/ মণ হইতে ২০/ মণ পর্য্যন্ত গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। সাধারণতঃ খাগরীও ধল সুন্দর জাতীয় ইক্ষুই গুড় প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইক্ষুর ব্যবসায় অত্যন্ত লাভ জনক। একব্যক্তি ৪ বিঘা জমীতে প্রথম বৎসর ৩৫০৲ দ্বিতীয় বৎসর ৪০০৲ এবং তৃতীয় বৎসর ৩০০৲ একুনে ১০৫০৲ টাকার ইক্ষু উৎপাদন করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়,

কিন্তু এই তিন বৎসরে তাহার ৫০০৲ টাকার অধিক খরচ হইয়াছিল না (১)।

ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের উচ্চতীরভূমিতে মারকুলিও, কাজলী এবং ধন বাজারে সারঙ্গ জাতীয় ইক্ষুর চাষ হয়।

সাদা বোম্বাই বা গেণ্ডেরী ইক্ষু দোলাই খালের সন্নিকটবর্ত্তী গেণ্ডেরিয়া নামক স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইত। এখানকার ইক্ষু সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থানের নামানুসারে সাদা বোম্বাই ইক্ষু গেণ্ডেরি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

গম—ঢাকা জেলায় গম বেশী উৎপন্ন হয় না। মোসলমান ব্যবসায়ীগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে ইহা পাটনা হইতে আমদানী হইত, পরে উহারাই এতদঞ্চলে এই শস্যের চাষ প্রবর্ত্তিত করে।

ইছামতী ও ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গম স্থল পাথর ঘাটা নামক স্থানের সন্নিকটে, রোয়াইল গ্রামের উত্তর এবং পূর্ব্বাংশে স্থিত নিম্ন ভূমি সমূহে, এবং তেওতার সন্নিকটে, পদ্মা ও যমুনার সঙ্গম স্থলে গম জন্মিয়া থাকে। ইহা কার্ত্তিক মাসে উপ্ত ও চৈত্র মাসে কর্ত্তিত হয়। প্রতি বিঘায় ২/ মণ হইতে ৫/ মণ পর্য্যন্ত গম জন্মিয়া থাকে।

গমের ক্ষেতে ভুলালিও শিয়ালি নামক আগাছা জন্মিয়া শস্যের হানি করে, সুতরাং মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া দিতে হয়।

যব—যমুনা, পদ্মা, মেঘনাদ ও ধলেশ্বরীর দিয়ারাচরে বালি জন্মিয়া থাকে। বালুকামিশ্রিত পললময় ভূমিতেই ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন

(১) Report on the system of Agriculture and Agricultural statistics of the Dacca District by A. C. Sen C. S. published by Covernment.

হয়। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ইহা উপ্ত হয়। প্রতি বিঘায় ।॰ সের ।২ সের বীজ উপ্ত হইলে ২/ মণ ৩/ মণ বালি প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃত্তিকায় বালুকার অংশ অধিক পরিমাণে থাকিলে ফসল পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। মধুপুর অঞ্চলে ইহা জন্মে না।

চিনা—অন্যান্য স্থান অপেক্ষা নবাবগঞ্জ থানার এলাকায় ইহা অধিক জন্মে। যে ভূমিতে চিনা উৎপন্ন হয় তথায় অন্য কোনও ফসল হয় না। ঝিলের সন্নিকটস্থ কর্দ্দমময় ভূমি চিনা উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত। পৌষ মাসে ভূমি কর্ষণ করিয়া মাঘ মাসে বীজ বপন করা হইলে ৭।৮ দিবস মধ্যেই বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গম হয়। ফাল্গুন মাসে বৃষ্টির অভাব হইলে চিনা ভাল জন্মে না। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে ইহা সুপক্ক হইয়া থাকে। প্রতি বিঘায় ৪/ মণ পরিমাণ চিনা উৎপন্ন হয়।
চিনার গাছ ৬।৭ ইঞ্চি লম্বা হইলেই ক্ষেত নিরাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

কাঐন—বিক্রমপুর ও মাণিকগঞ্জের উত্তরাংশে কাঐন অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বালুকাময় মৃত্তিকা এই ফসল উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ক্ষেতে জল উঠিলে ফসল নষ্ট হইয়া যায়; এমন কি বৃষ্টির জল ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে জমিয়া থাকিলেই সমুদয় শস্য বিনষ্ট হইয়া যায়। মাঘ মাসের মধ্য ভাগ হইতে চৈত্রের প্রথম পর্য্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। জ্যৈষ্ঠ মাসে ফসল কর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রতি বিঘায় ⁄২ সের বীজ উপ্ত হইলে তাহা হইতে ৫/ মণ পর্য্যন্ত কাঐন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উলু—কাওলা ও উলুখড় দ্বারা ঘরের ছাউনী করা হয়। বিক্রমপুর এবং আরালিয়া অঞ্চলে, ঢাকার উত্তরস্থিত কোনও কোনও স্থানে উলুখড় প্রচুর উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মপুত্রের তীর ভূমিতেও উলুখড় জন্মিয়া থাকে। কাওলা মধুপুর অঞ্চলেই বেশী জন্মে।

ক্ষেতে উপর্য্যুপরি ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত উলুখড় জন্মিলে, উহার উৎপাদিকা শক্তি বর্দ্ধিত হয়। ইক্ষুর ক্ষেত অনুর্ব্বর হইয়া পড়িলে ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত উলু খড় জন্মাইতে হয়; তাহা হইলেই উহা অন্যান্য ফসল উৎপাদনের উপযোগী হইয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে উলুখড় জন্মাইতে হইবে, তাহাতে প্রথমতঃ পশ্বাদির মল দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে সার দেওয়া কর্ত্তব্য, পরে ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত উহা গোচারণের মাঠ স্বরূপ ব্যবহার করিতে হয়। উলুখড় গজাইতে আরম্ভ করিলেই উহাতে পশ্চাদির যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অতি অল্পকাল মধ্যেই ইহা সমুদয় মাঠে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। অগ্রহায়ণ মাসে ইহা কর্ত্তিত হয়। গড়ে প্রতি বিঘায় ৩৫ বোঝা উলুখড় জন্মিয়া থাকে।

লটাঘাস—মেঘনাদ, ধলেশ্বরী ও পদ্মার চরে প্রচুর পরিমাণে লটাঘাস বা থাইলা জন্মে। মুন্সীগঞ্জ মহকুমার পশ্চিমাংশে ইহা যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

লটাঘাস গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য। ইহা খাইলে গরুর দুগ্ধ বেশী হইয়া থাকে এবং স্বাদও সুমিষ্ট হয়।

একবার লাগাইলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত ইহা ভোগ করা যায়। বর্ষাকালে মুন্সীগঞ্জের পূর্ব্বাঞ্চলস্থ হাট সমূহে ইহা প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে।

১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দের ভীষণ জল প্লাবনে ঢাকা জেলার অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হইলে এই ঘাস সহস্র সহস্র পশ্বাদির জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়; ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী প্রদেশ হইতেও লোক সকল উহা ক্রয় করিবার জন্য মুন্সীগঞ্জ অঞ্চলের হাট সমূহে আগমন করিত (১)।

---

(১) Mr. A. C. Sen's Report Page 38.

পিয়াজ—এই জেলা মধ্যে নবাবগঞ্জ ও হরিরামপুর এই থানাদ্বয়ের অন্তর্গত গ্রাম সমূহেই প্রচুর পিয়াজ জন্মিয়া থাকে। ছাতিয়া হইতে ঝিটকা পর্য্যন্ত ইছামতীর উভয় তীরবর্ত্তী স্থান সমূহই পিয়াজ উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। ছাতিয়ায় পিয়াজ, শ্রীহট্ট, কাছার এবং অন্যান্য স্থানে ও রপ্তানি হইয়া থাকে (১)।

এই জেলায় কেবল মাত্র ছোট পিয়াজই উৎপন্ন হয়; বড় পিয়াজ জন্মে না। বালুকাময় মৃত্তিকা পিয়াজ উৎপাদনের উপযোগী নহে। অতিশয় শৈত্যের জন্য কর্দ্দমময় ভূমিতে ও ইহা ভাল জন্মে না। গঙ্গা ও যমুনার প্রাচীন পললময় মৃত্তিকার সহিত পুরাতন ইছামতীর মৃৎস্তরের সংমিশ্রণ হওয়ায় ইছামতী তীর-প্রদেশস্থ ঈষৎ পীতাভ মৃত্তিকা পিয়াজ উৎপাদনের পক্ষে সুপ্রশস্ত বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পিয়াজ ক্ষেত্রে অন্য ফসল জন্মে না। ফসল উঠিয়া গেলে, ভূমিতে খড় আস্তীর্ণ করিয়া উহাতে লাঙ্গল দিতে হয়! ঐ খড় পচিয়া মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইলেই উহা ভাল সারের কার্য্য করিয়া থাকে; ভূমিতে অন্য কোনও প্রকার সার দেওয়ার আবশ্যকতা নাই। ক্ষেত্র খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা উচিত, এজন্য ৩।৪ বার নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়ে।

ক্ষেত্রে জল জমিয়া গেলে উহা শস্যের হানি জন্মাইয়া থাকে। সুতরাং সামান্য মাত্র বৃষ্টির জল জমিলেও উহা অনতিবিলম্বে নিঃসারিত করিয়া ফেলিতে হয়।

---

(১) ছাতিয়া হইতে প্রতি বৎসর প্রায় তিন সহস্র মণ পিয়াজ বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে।

পিয়াজ অগ্রহায়ণ মাসে রোয়া হয়; চৈত্র মাসেই শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। শিলাবৃষ্টি পিয়াজের অনিষ্টকারক। সুজন্মার বৎসরে প্রতি বিঘায় ৫০/ মণ শস্য জন্মে; কিন্তু সচরাচর ৩০/ মণের অধিক প্রতি বিঘায় প্রায়ই জন্মে না।

রসুন—ইছামতী নদীতীরে কৃরিমগঞ্জের সন্নিকটে প্রচুর রসুন উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে জমীতে বর্ষাকালে আউস ধান্য জন্মে তথায়ই সাধারণতঃ রসুন উৎপাদন করা হয়।

কার্ত্তিক মাসে আউস ধান্যের খড় মাঠে পুড়িয়া ফেলিতে হয়, পরে ঐ ক্ষেত্র পুনঃ পুনঃ কর্ষণ করিয়া রসুন রোয়ার উপযোগী করিতে হয়। চারা ৬ ইঞ্চি পরিমাণ বড় হইলেই প্রথমে নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। বৃষ্টির জলে গোড়ার মাটি শক্ত হইয়া গেলে পিয়াজের ন্যায় ইহার গোড়াও খুড়িয়া দিতে হয়।

কার্ত্তিক মাসে রোয়া হয়, এবং চৈত্র মাসেই রসুন জন্মে। সাধারণতঃ প্রতি বিঘায় ২০/ মণ রসুন উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কচু—চতুর্ব্বিধ প্রকারের কচু এই জেলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে; তন্মধ্যে নারিকেলি কচুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত।

যে মৃত্তিকায় উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রণ আছে এবং যে মৃত্তিকা শৈতা-গুণ বিশিষ্ট তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কচু জন্মিয়া থাকে। এজন্যই, ঝিলের কিনারায়, নদীর পরিত্যক্ত প্রাচীন খাতে, এবং যে সমুদয় পুষ্করিণী উদ্ভিজ্জ পদার্থ উৎপাদন হেতু ভরিয়া গিয়াছে তথায় কচুর উৎপত্তি বহুল পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়।

অগ্রহায়ণে কচু লাগাইলে শ্রাবণ মাসেই উহা উৎপন্ন হয়।

কলা—এই জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই কদলী জন্মিয়া থাকে কিন্তু রামপাল এবং তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থানের কদলীই বঙ্গের

মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মধুপুর জঙ্গলের ভূমিও উৎকৃষ্ট কদলী উৎপাদনের উপযোগী। রামপাল অঞ্চলের ভূমি খুব উচ্চ এবং মৃত্তিকা পীত বর্ণ।

কবরী, সবরি, চিনিচাম্পা, অমৃতভোগ, মর্ত্তমান, অগ্নিশ্বর, আঠ্যা কানাইবাশী প্রভৃতি নানাবিধ কদলী রামপাল অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে। সবরি সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু কিন্তু কবরা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

ভাদ্র আশ্বিন মাসে জমী চষিয়া কার্ত্তিক মাসে ঐ জমীতে প্রতি বিঘায় দেড় সের পরিমাণ সরিষা বুনন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসে সরিষা কর্ত্তিত হইলে পুনরায় ঐ জমীতে হল চালনা করা হইয়া থাকে। চৈত্রমাসে পুকুরের কর্দ্দম রাশি ৬।৭ ইঞ্চি পুরু করিয়া জমীতে নিক্ষেপ করিতে হয়। বৈশাখ মাসে ভূমি পুনরায় ৩। বার কর্ষিত হইলে ৬।৭ ফিট ব্যবধান এক একটী চারা রোপিত হইয়া থাকে। তৎপরে কোদালি দ্বারা চারার সারির মধ্যে ১৫ ইঞ্চি অন্তর এক একটী ক্ষুদ্র নালা কাটিয়া উহাতে হলদি অথবা আদা রোপন করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসেই চারা হইতে নূতন পত্রের উদ্গম হয়। বর্ষাকালে জমী পুনঃ পুনঃ নিড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ তাহা না করিলে মৃত্তিকা শক্ত হইয়া পড়ে এবং আগাছা জন্মিয়া চারার অনিষ্ট সাধন করে।

শীতকালে এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই আদা ও হরিদ্রা উৎপন্ন হইয়া থাকে। চৈত্র মাসেই কলা গাছের ফুল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পুরাতন পত্র গুলি পুনঃ পুনঃ ছাটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শ্রাবণ হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যেই গাছে ফল পাকিতে আরম্ভ করে। গাছের গোড়ায় যে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারা উৎপন্ন হইতে থাকে তাহা ১ ফিট পরিমাণ উচ্চ রাখিয়া কর্ত্তন করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলে গাছের উচ্চতা বৃদ্ধি পাইতে পারে না, কিন্তু

তাহাতে ঝাড়টী খুব সবলতা লাভ করে। রামপাল অঞ্চলের কৃষকগণ পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কদলীর চাষ করিয়া থাকে। তাহারা একঝাড়ে একটীর অধিক গাছ রাখে না।

মিঃ এ, সি, সেনের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে রামপাল অঞ্চলে প্রতি বিঘার কদলী চাষে প্রায় ৪৮৵৬ খরচ পড়িত এবং আদা, সরিষা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ৮৭৲ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

আদা—রামপাল এবং মধুপুর অঞ্চলের কোনও কোনও গ্রামে প্রচুরপরিমাণে আদা জন্মে। প্রতি বিঘায় ১৫/ হইতে ২৫/ মণ পর্য্যন্ত আদা উৎপন্ন হয়। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে খুব বৃষ্টি হইলে এই ফসলের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

হরিদ্রা—এই জেলায় খুব কম জন্মে। পাটনা ও যশোহর অঞ্চল হইতে হরিদ্রা আমদানী হইয়া এই জেলার অভাব দূর করিয়া থাকে। মধুপুর অঞ্চলের কোনও কোনও স্থানে এবং রামপাল গ্রামে হরিদ্রা উৎপন্ন হয়। প্রতি বিঘায় ৩০/ মণ হরিদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং উহা শুষ্ক হইয়া ৫/ মণে পরিণত হয়।

গোল আলু—এই জেলায় গোল আলুর চাষ প্রায় নাই বলিলেও চলে। ভাওয়াল, আটি, কলাতিয়া এবং রোহিত পুর গ্রামে গোল আলুর চাষ হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নীলকর সাহেব মিঃ ওয়াইজ গোল আলুর চাষ এই জেলায় সর্ব্ব প্রথমে প্রবর্ত্তিত করিয়া ছিলেন। ঢাকা জেলার গোল আলু অতি উৎকৃষ্ট। দোয়াসা মাটি গোল আলু উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত। প্রতি বিঘায় ৩০/ মণ হইতে ৪০/ মণ পর্য্যন্ত গোল আলু উৎপন্ন হয়।

সুধু বোম্বাই আলুই এখানে উৎপন্ন হয়। ইহার বীজ শ্রীহট্ট এবং খাসিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে।

তিল—বিক্রমপুরের কোনও কোনও স্থানে এবং মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে তিল উৎপন্ন হয়। সুধু শ্বেত তিলই এখানে জন্মে। আমন অথবা আউস ধান্যের সহিত এক ক্ষেতে তিল উপ্ত হইতে পারে।

শিলাবৃষ্টি এই শস্যের হানি জনক।

প্রতি বিঘায় প্রায় ৫৴ মণ তিল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেগুন—খাল অথবা ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বতী-তীরস্থ বালুকাময় ভূমি বেগুন উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত। বচিলা ও আটি গ্রামে প্রচুর বেগুন উৎপন্ন হয়। রামপালের বেগুন অতি উৎকৃষ্ট। মধুপুর জঙ্গলের ভাস্তা বেগুন অপকৃষ্ট।

আশ্বিন মাসে বীজ উপ্ত হয়। কার্ত্তিক মাসে চারা উত্তোলন পূর্ব্বক এক হস্ত অন্তর এক একটী চারা মাঠে লাগাইতে হয়। মাঘ মাসের প্রথমেই গাছে ফল ধরে। জ্যৈষ্ঠমাসে বেগুন গাছ মরিয়া যায়।

পোকা ধরিয়া অনেক সময়ে বেগুন নষ্ট হইয়া যায়; এজন্য কৃষকগণ গাছে ছাই দেয়।

মরিচ—এই জেলার পূর্ব্বাংশে, মেঘনাদ, ব্রহ্মপুত্র এবং লাক্ষ্যা নদনদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে প্রচুর মরিচ উৎপন্ন হয়। আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে চাড়া রোপিত হইয়া থাকে। জৈষ্ঠ মাসে মরিচ পক্ক হইতে আরম্ভ করে। প্রতি বিঘায় ৪৴ মণ শুষ্ক মরিচ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই জেলায় পাট অথবা আউস ধান্য উঠিলেই মরিচের চাষ আরম্ভ হয়।

তামাক—মেঘনাদ ও লাক্ষ্যা তীরস্থ বালুকামিশ্রিত মাটিতে তামাক উৎপন্ন হয়। বিলাতী, দেশী, কাস্তাভোগী, শিবারজাতা, বিলাইকানি, বাঙ্গলা, ও হিঙ্গলী এই কয় প্রকার তামাক এই জেলায় জন্মিয়া থাকে।

পাট উঠিয়া গেলেই তামাকের চাষ আরম্ভ হয়।

সাগর কন্দ আলু—মেঘনাদ ও ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ বালুকাময় ভূমিতে সাগরকন্দ আলু বা মিঠা আলু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ভাদ্রমাসের প্রথমে জমীতে চাষ দিয়া চারা লাগাইতে হয়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে আলু জন্মে। প্রতি বিঘায় প্রায় ৩০/ মণ আলু প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কুসুম ফুল—পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদী দ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থান সমূহে, মাণিকগঞ্জ, হরিরামপুর, এবং নবাবগঞ্জ থানার এলাকায়, এবং বিক্রমপুরের কোনও কোনও স্থানে, পূর্ব্বে প্রচুর কুসুম ফুল উৎপন্ন হইত। বর্ত্তমান সময়ে কুসুমফুলের চাষ একেবারে লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল মাত্র, নবাবগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ ও সাভার থানায় এবং ধলেশ্বরী নদী তীরবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে এখনও সামান্য পরিমাণে ইহার চাষ হইয়া থাকে। পাথর ঘাটা গ্রামে উৎপন্ন কুসুম ফুলের রং সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম।

ইহার বীজ হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। /৫ সের বীজ হইতে /১ সের পরিমাণ তৈল প্রস্তুত করা যাইতে পারিত; সরিষার তৈল অপেক্ষা ইহা দরে সস্তা ছিল (১)।

---

(১) "An oil is procured from the seeds, which is used for burning; it sells in the bazars at half the price of mustard oil"—Dr. Taylor's Topography of Dacca.

কৃষকগণ সর্করা ও দুগ্ধ সংযোগে ইহার বীজ ভক্ষণ করিত; পত্রও ডাটের ভস্ম বস্ত্র ধৌত কার্য্যে ব্যবহৃত হইত (২)।

প্রতি বিঘায় অৰ্দ্ধমণ পর্য্যন্ত কুসুম ফুল উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া অবগত হওয়া যায়। টেইলার সাহেব লিখিয়াছেন "কুসুম ফুল ১৬৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইত। প্রতি মণ উৎপাদনের খরচ ৭৲ টাকার অধিক পড়িত না; সুতরাং প্রতি বিঘায় ৩॥০ টাকা লভ্য হইত (৩)।

ঢাকা জেলার ন্যায় উৎকৃষ্ট কুসুম ফুল ভারতবর্ষের অন্য কোথাও জন্মিত না; চীন দেশীয় কুসুম ফুল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত; লণ্ডনের বাজারে এক সময়ে চীনা কুসুম ফুলের পরেই ঢাকার কুসুম ফুলের সমাদর ছিল (৪)।

কুসুম ফুল হইতে লাল ও পীত এই দ্বিবিধ রং প্রস্তুত হইত।

১৭৮৭ খৃঃ অব্দে এই জেলায় উৎপন্ন যাবতীয় কুসুম ফুল ঢাকার বস্ত্র রঞ্জন কার্য্যে নিঃশেষিত হইয়াছিল; ১৮০০ খৃঃ অব্দে ইহার চাষ এতদূর প্রসারতা লাভ করিয়াছিল যে স্বীয় জেলার বস্ত্র রঞ্জন কারীগণের অভাব বিমোচন করিয়াও প্রায় ২০০ শত মণ কুসুম ফুল ভারতের নানা স্থানে রপ্তানি হইয়া ছিল। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে প্রায় ৫০০০/ মণ কুসুম ফুল উৎপন্ন হইত

(২) Dr. Taylor's Topography of Dacca Page 134.

(৩) Ibid.

(৪) "The Dacca safflower, however, is superior to any that is grown in India and ranks next to China safflower in the London market".

(১)। ১৮১০ খৃঃ অব্দে ২০০০/ মণ উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ১৮২৪।২৫ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় ৮৪৪৮/০ মণ কুসুম ফুল আমদানী হয়; ইহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল ২৯০৭৫৫ ॥৬। ইহার মধ্যে প্রায় ⅚ অংশ মালই ঢাকা জেলায় উৎপন্ন হইয়াছিল (২)।

গিমিকুমরা—ঢাকা, বাকরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলা ব্যতীত ইহা অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় ইহা সাধারণতঃ পানের বরজ মধ্যেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু জাফরগঞ্জ ও তেওতার সন্নিকটবর্ত্তী যমুনার দিয়ারা চরে ও ইহার প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

তরমুজ—যমুনা ও পদ্মার চরে প্রচুর পরিমাণে তরমুজ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

করলা—মধুপুরের অরণ্যানি মধ্যে খুব বড় বড় করলা উৎপন্ন হয়। পুবাইলের হাট করলার জন্য ঢাকা জেলায় বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আষাঢ় হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত করলা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভাওয়ালে ও ধলেশ্বরীর চরা জমীতেও করলা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উচ্ছে—ধলেশ্বরীর চরা জমীতে এবং ভাওয়াল অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে উচ্ছে জন্মিয়া থাকে।

ফুটি—ধলেশ্বরীর চরা জমীতে যথেষ্ট ফুটি উৎপন্ন হয়। চৈত্র মাসে ফুটি পক্ক হইয়া থাকে।

(১) History of Cotton manufacture of Dacca.

(২) Ibid and Dr. Taylors Topography of Dacca.

ক্ষিরাই—ঢাকা জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই ক্ষিরাই জন্মে। অগ্রহায়ণ মাসে বীজ উপ্ত হয় এবং ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফসল উৎপন্ন হয়।

মটর—দ্বিবিধ প্রকারের মটর এখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে; (১) ছোট, (২) পাটনাই বা কাবুলী মটর। ধলেশ্বরী তীরবর্ত্তী সুন্দর নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া টাঙ্গাইলের উত্তরস্থিত যমুনা নদীর তীর পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই মটরের চাষ হইয়া থাকে। প্রতি বিঘায় ।২ সের বীজ উপ্ত হইলে তাহা হইতে ৭/০।৮/০ মণ মটর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

খেসারি—মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত প্রায় সমুদয় বিলেই খেসারি উৎপন্ন হয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করা হয় এবং ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফসল কর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রতি বিঘায় ৩/ মণ খেসারি উৎপন্ন হয়। ইহার খড় গবাদি পশুর প্রধান খাদ্য।

মাষকলাই—এই জেলায় দ্বিবিধ প্রকারের মাষকলাই জন্মে। (১) ঠিকরা, (খ) মাষকলাই বা কলাই।

পলল ময় ভূমি মাষ কলাই উৎপাদনের পক্ষে প্রশস্ত। ইহা ত্রিবিধ প্রকারে উপ্ত হইতে পারে :—

(১) ক্ষেত্রে আমন ধানের গাছ থাকিতে থাকিতেই অনেকে মাষকলাই বপন করিয়া থাকে।

(২) বর্ষার জলপ্লাবনে যে ভূমিতে পললময় মৃত্তিকা সঞ্চিত হয়, তথায় বিনা কর্ষণেও উপ্ত হইতে পারে।

(৩) অপেক্ষাকৃত দৃঢ় মৃত্তিকায় দুইবার কর্ষন করিয়াও বীজ উপ্ত হইয়া থাকে। বপন করিবার জন্ত প্রতিবিঘায় /২॥ সের বীজ আবশুক হয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বীজ উপ্ত হয় এবং মাঘ মাসে

ফসল কর্ত্তিত হয়। প্রতি বিঘায় ২/০।৩/০ মণ মাষ কলাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মুগ—মুগ ত্রিবিধ; (১) সোনামুগ, (২) ঘাসীমুগ, (৩) ঘোড়ামুগ। ইহার মধ্যে সোনামুগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

মাণিকগঞ্জ মহকুমায় এবং ব্রহ্মপুত্র নদতীরবর্ত্তী কোনও কোনও স্থানে মুগ উৎপন্ন হয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বীজ বপন করা হয়। পৌষ মাঘ মাসে ফসল জন্মে। প্রতি বিঘায় /২ সের /৩ সের বীজ উপ্ত হইলে ত্রিশ সের হইতে দেড় মণ পর্য্যন্ত মুগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ধঞ্চে—পদ্মাও ধলেশ্বরীর চরে এবং বিক্রমপুরের বিলে প্রচুর ধঞ্চে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধঞ্চে জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার আঁশ পাটের ন্যায় কার্য্যকরী হয় কিনা তাহা বিশেষজ্ঞগণের গবেষণার বিষয় বটে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বপন করা হইলে উহা কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসেই কর্ত্তিত হইতে পারে।

সাধারণতঃ নূতন চরে অথবা পললময় ভূমিতেই ইহা ভাল জন্মে।

শণ—লাক্ষ্যানদীর দিয়ারা চরে শণ প্রচুর জন্মে। বালুকাও কর্দ্দমমিশ্রিত দোয়াসা জমীই শণ উৎপাদনের উপযোগী। নদীতীরে অথবা ঝিলের কিনারায় ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পদ্মার তীরবর্ত্তী প্রদেশে এবং লাক্ষ্যার পূর্ব্ব কূলে সোণার গাঁও অঞ্চলে উৎকৃষ্টশণ জন্মে।

"১৮০৬ খৃঃ অব্দে এই জেলায় প্রায় ১০০০০ দশ হাজার মণ শণ উৎপন্ন হইয়াছিল; ঢাকার ইংরেজ কোম্পানীর কুঠীয়াল ইংলণ্ডীয় রণ-পোত সমূহের ব্যবহারার্থ ঐবৎসর প্রায় ৫৫০০০/০ মণ শণ খরিদ

করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায় (*)। এক্ষণে শণের চাষ প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। মৎস্য ধরিবার জাল এবং নৌকার "গুণ" প্রস্তুত করিবার জন্যই এক্ষণে শণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রতি বিঘায় ৩/ মণ শণ উৎপাদন করা যাইতে পারে।

শর্ষপ—এই জেলায় ত্রিবিধ প্রকারের শর্ষপ উৎপন্ন হয়। (১) মাঘী বা লাল শর্ষপ; (২) রাই বা শ্বেত শর্ষপ; (৩) কৃষ্ণ শর্ষপ।

মাঘী শর্ষপ মাঘ মাসে উৎপন্ন হয়; সাধারণতঃ ইহা চরা জমীতেই ভাল জন্মিয়া থাকে। পুরাতন চরা জমী এবং মধুপুর অঞ্চলের উচ্চভূমি কৃষ্ণ শর্ষপ উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী।

প্রতি বিঘায় ১/ মণ হইতে ৮/ মণ পর্য্যন্ত শর্ষপ জন্মিতে পারে।

মুলা—রামকৃষ্ণদী হইতে রাজানগর পর্য্যন্ত ইছামতী নদীতীরবর্ত্তী প্রায় সমুদয় স্থানেই প্রচুর মুলা উৎপন্ন হয়। রাজানগরের মুলা এই জেলার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কুমরা ও লাউ—এই জেলায় যথেষ্ট জন্মে।

কালিজিরা—ঢাকা সহরের সন্নিকটে সামান্য পরিমাণে কালিজিরা উৎপন্ন হয়।

কফি—ঢাকা সহরের উত্তরাংশে কফির চাষ হয়।

চা—বহুপূর্ব্বে এই জেলায় চার চাষের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। ঢাকার স্বনাম ধন্য স্বর্গীয় নবাব স্যার আবদুল গনি কে, সি, এস, আই মহোদয় তদীয় বেগুন বাড়ী নামক স্থানে এবং ভাওয়ালের স্বধর্ম্মনিরত

(*) Taylor's Topography of Dacca Page 137.
১৮০৮ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট ঢাকা জেলার কৃষকদিগকে শণের চাষ করিতে অনুরোধ করেন; ফলে কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত এই জেলায় প্রচুর শণের চাষ চলিয়াছিল।

স্বর্গগত মহাপ্রাণ রাজা কালী নারায়ণ রায় মহোদয় ভাওয়ালে চায়ের চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন! কিন্তু কোথায়ও সুফল প্রাপ্ত যায় নাই।

পান—ঢাকা জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই পানের বরজ আছে। মীর-কাদিম ও সোণার গাঁও অঞ্চলে প্রচুর পান উৎপন্ন হয়। সোণার গাঁও কাইকার টেকের "এলাচ" ও "কাফি পান" অতি প্রসিদ্ধ। মোগল সুবাদার এবং আমীর ওমরাহগণ প্রত্যহ "কাফ্রিপান" ব্যবহার করিতেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ঢাকার বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর এই পানের অত্যন্ত পক্ষপাতী; এজন্য অদ্যাপি কাইকার টেক হইতে নবাব বাহাদুরের ব্যবহারের জন্য প্রত্যহ ইহা ঢাকাতে প্রেরিত হইয়া থাকে। এই পান অত্যন্ত সুরস ও সুগন্ধ যুক্ত।

নীল—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এতদঞ্চলে নীলের চাষ আরম্ভ হয়, এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই ইহার প্রসারতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ে এই জেলায় নীলের চাষ নাই।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলায় মাত্র ২টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীলের কুঠী সংস্থাপিত ছিল। রাজানগর, সিরাজাবাদ, ইছাপাশা, সাভার প্রভৃতি স্থানে কুঠী নির্ম্মিত হওয়ায় নীলের ব্যবসা অত্যন্ত প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। কতিপয় বৎসর মধ্যে নীলের চাষ এরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে কুঠীয়াল-গণ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই জেলায় ৩১টী নীলের কুঠী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন (১)। প্রতি বর্ষে গড়ে প্রায় ২৫০০/০ মণ নীল উৎপন্ন হইত। নীলকরগণ এই ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে প্রতি বৎসরে প্রায় ত্রিশলক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেন।

---

(১) Dr. Taylor's Topography of Dacca Page 135 and 136.

সাধারণতঃ নূতন চরা জমীতে এবং যে জমীতে আউস ধান্য জন্মে তথায়ই প্রচুর পরিমাণে নীল উৎপন্ন হইত বলিয়া জানা যায়।

নীলকরগণের ভীষণ পাশব অত্যাচারের কবলে পতিত হইয়া তৎকালে অনেক কৃষককে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল।

দশম অধ্যায়।

ভেষজ, উদ্ভিজ্জ, ফলমূল পুষ্পাদি।

ভেষজ।

যজ্ঞডুম্বর, গাম্ভারী, পারুলী, গনিয়ারি, সোণা (নাও সোণা), বেল, শ্রীফল, খদির, রক্তচন্দন, জয়ন্তি, জবা, রক্তকরবী, শ্বেতকরবী, মাধবীলতা, সোণালী, আম আদা, পিপুল, কটকরঞ্জা, জয়পাল, শতমূল, বট, অশ্বথ, পাকুর, মাসানী, রাস্না, ভাণ্ডি, কলকাসন্দ, শিরিষ, ঘৃত-কুমারী, বালা, নাগকেশর, চামেলী, পুনর্ণবা, মনসাসিজ, নিসিন্দা, মহাকাল, জ্যৈষ্ঠমধু, রক্ত এরণ্ড, ভৃঙ্গরাজ, ভুমিকুষ্মণ্ড, অপরাজিতা, ভাঙ্গ, তেজপত্র, ঢেরস, বাবুই তুলসী, আকন্দ, লজ্জাবতী, মুর্ব্ব, পলাশ, হাতীশুড়া, আমলকী, হরিতকী, বয়রা, হিন্তাল, তাল, গুরুচী,* চৈ, চিতা, গোরক চাকলা, ছাইতান, বাসক, মুথা, মানকচু, কেয়া, শ্যামলতা, আমরুল, ঝিন্টি, লালকুঁচ, বরাহক্রান্ত, সজিনা, প্রভৃতি বিবিধ ভেষজ পদার্থ এই জেলায় উৎপন্ন হয়। সাভার অঞ্চল ভেষজ উদ্ভিদাদির চির প্রসিদ্ধ নিকেতন; এখানে ইহা প্রকৃতির অযাচিত দান স্বরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

।

(ক) গাছ গাছরা।

গজারী, চাম্বল, করই, হিজল, বাবলা, বাঁশ, শিমুল, পাকুরকানী, মান্দার, তিন্তিরী, জাবৈল, গোয়ারা, আম্র, কাঠাল, উড়িয়া আম,

ছাইতান, দেবদারু, ঝাউ, বট, জারুল, বউনা প্রভৃতি বৃক্ষাদি এবং বাঁশ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কাপ্তান গ্রেহাম অথবা কর্ণেল টেকি সাহেব পুরানাপল্টনের সন্নিকটবর্ত্তী কোম্পানীর বাগিচায় সেগুণ বৃক্ষ রোপন করিয়াছিলেন। দেশীয় সৈন্য লালবাগে স্থানান্তরিত হইলে গবর্ণমেণ্ট ঐ বাগানটী মিউনিসিপালিটির হস্তে প্রদান করেন। ইহার পরে ঐ সেগুন বৃক্ষগুলি কর্ত্তিত হয়। এসম্বন্ধে ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ এ, এল, ক্লেসাহেব লিখিয়াছেন "The trees have been cut down by whose order does not appear".

এতদ্ব্যতীত ফনিকৃস পার্কের পশ্চাদ্ভাগে ও কতিপয় সেগুন বৃক্ষ ছিল। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে বিভাগীয় কমিশনর মিঃ ডেভিডসনের আদেশে উহা বিক্রয় করা হয়।

পূর্ব্বে এই জেলায় মেহাগনি বৃক্ষ ছিল না। ক্লেসাহেবের রিপোর্টের ফলে গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী মেহগণি বৃক্ষ ঢাকাতে রোপন করেন। মিঃ ক্লে বলেন "নিম্ন বঙ্গের ভূমি মেহগণি চাষের উপযোগী"।

বেত, উলু, কাসিয়া, কাজয়া, লটা, নল, হোগলা প্রভৃতি গৃহ নির্ম্মানোপযোগী সরঞ্জামী প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। অধুনা বেত ও উলু কম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(খ) শাকশবজী।

সাপলা, পদ্ম, ঘেচু, কলমী, হেলেঞ্চা, বনপুই, গিমা, বেতুয়া, ঢেকী, কচু, বনভারালী, ওল, কাটানটে, বনসিম, বাঘনখ, গন্ধ ভাদালিয়া প্রভৃতি শাকসবজী ঢাকা জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

(গ) ফল মূল পুষ্পাদি।

আম, কাঠাল, বেল, কুল, পেয়ারা, আতা, নোনা, জাম, গোলাম জাম, কাঠবউল, গাব, জামরুল, লিচু, লট্‌কা, কামরাঙ্গা, জলপাই, শসা, ঝিঙ্গা চালতা, তেতুল, কত্‌বেল, পেপে, আমরা, বিলাতী আমরা, বাতাপীলেবু, জাম্বির, কাগজী, নারিকেল, তাল, খেজুর, সুপারী, কুচই, সিঙ্গারা, ময়না, ডেফল, আনারস, প্রভৃতি ফল প্রচুর জন্মে।

মাখনা ঢাকা জেলা ব্যতীত অন্য কোথাও দেখা যায় না।

ঢাকা হইতে আরাকান প্রদেশে পলায়ন সময়ে সা সুজা, যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি "সুজা পছন্দ" বলিয়া লোকে ঐ জাতীয় আম্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি পাদন করে। সহরতলী সহর সোণাগাঁ এবং পরগণে সোনার গাঁয়ের নানা স্থানেই অতি উৎকৃষ্ট আম্র পাওয়া যায়; উহা "খাস আম" বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্থানে স্থানে এরূপ উৎকৃষ্ট কাচামিঠা আম জন্মে যে তত্তুল্য আম্র প্রায় দুর্ঘট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তেজগাও এবং ভাওয়াল অঞ্চলের আনারস অত্যুৎকৃষ্ট। উহা "ঢাকাই আনারস" নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। টেইলার সাহেব বলেন তেজগাও অঞ্চলে পর্ত্তুগীজদিগের বাগান ছিল; উহারা উৎকৃষ্ট আনারস উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিত (১)।

মধুপুর অঞ্চলের মৃত্তিকা উৎকৃষ্ট লিচু উৎপাদনোযোগী বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন (২)। আমরা এ বিষয়ে স্থানীয় জমিদার বৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

১) Taylor's Topography of Dacca Page 141

... perhaps exists in the whole of lower

ভাওয়াল, কাসিমপুর ও মহেশ্বরদী অঞ্চলের কাঠাল, ঢাকার আতা, ও কত্‌বেল, কাইকার টেক ও লাঙ্গলবন্দের বেল অত্যুৎকৃষ্ট। যোল-ঘরের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় স্থানের আম্র এই জেলার মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া সুপরিচিত।

পুষ্প।

গেন্দা, যুঁই, বেলি, মালতী, অপরাজিতা, জবা (শ্বেত ও লাল) বকুল, চাঁপা, ভুইচাঁপা, কনকচাঁপা, কাঠালেচাঁপা, আকন্দ, করবী (রক্ত ও শ্বেত), ঝুমকা, পদ্ম, দ্রোণ, ঝিকটি, ভাইট, টুনী, হাজরা, নন্দদুলাল, টগর, প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প এই জেলার সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

একাদশ অধ্যায়।

মৎস্য, পশু, পক্ষী সরিসৃপ, প্রভৃতি।

(ক) মৎস্য।

ঢাকা জেলায় প্রচুর পরিমাণে মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। নদী, ঝিল, খাল, পুকুর, জলাশয় প্রভৃতি নানা জাতীয় মৎস্যে পরিপূর্ণ। পশ্চিম ও দক্ষিণ ঢাকার ঝিল গুলি ক্রমশঃ ভরাট হইয়া যাওয়ায় মৎস্যের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কলিকাতা অঞ্চলে প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে মৎস্য রপ্তানি হওয়ার দরুনও এতদঞ্চলবাসী জনগণ ইহার অত্যন্ত অভাব অনুভব করিতেছে।

শ্রীহট্ট অঞ্চলের ঝিল সমূহ হইতে অর্দ্ধ উপচিত উদ্ভিজ্জ পদার্থ সমুদয় স্রোতোবেগে নীত হইয়া মেঘনাদ নদে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, এজন্যই ইহার জল ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ও ময়লা সংযুক্ত। মেঘনাদে মৎস্যাধিক্যের ইহাই নাকি কারণ (১)!

রঘুনাথপুরের ঝিলটী মৎস্যের একটী নিকেতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রোহিত, কাতল, মিরগেল, কালিবাউস, ভাঙ্গনা, এলাঙ্গি, ধুরা, চেলা, মৌরলা, পুঠী, তিতপুঠী, সরপুঠী, ভোল, ফেসা, ইলিস,

---

(১) "The water of the Meghna is exceedingly dirty and hardly potable, being full of half-decayed organic matter washed down from the Sylhet jheels, and as a consequence there is probably no river in the world which so much abound in fishes as this river."—Mr. A. C. Sen's Report on the Meghna, Page 3.

চাপলা বা খয়রা, বিলসা, ফলি, চিতল, মাগুর, ঝাগুর, সিলঙ্গ, চাইন, পাঙ্গাস, বাগাইর, আইর, বাচা, টেঙ্গরা, গলসা, রিঠা, ঘাগট, বাতাসী, সিং, বোয়াল, ঘাউরা, পায়বা, থল্লা, চান্দা, রঙ্গচান্দা, গজার, শোল, লাঠা, চেঙ্গ, কৈ, ভেদা, ভেটকী বা কোরাল, বাইন, খলিসা, বাইলা, তপস্বী, টাটকিনী, চেপা, কাজুলী, সুবর্ণখরিকা, কুচিলা প্রভৃতি মৎস্য প্রচুর পাওয়া যায়।

মৎস্য ধরিবার জন্য জেলেদিগের জলকর দিতে হয়। তক্‌সীম জমাধার্য্যকালে পার্শ্ববর্ত্তী জমীদার দিগের উপর জলকর ধার্য্য করা হইয়াছিল। সুতরাং তদবধি উহা তালুকের সামিল হইয়া পড়িতেছে। মেঘনাদ প্রভৃতি নদনদীর কোনও কোনও স্থানে গবর্ণমেণ্টের জলকর ব্যতীত বেসরকারী জলকর ও ধার্য্য আছে।

নিম্নে ঢাকা জেলার জলকর মহাল গুলির নাম ও রাজস্ব উল্লেখ করা গেল।

মহালের নম্বর		মহালের নাম	সদর জমা।
৯১৪৭	জলকর	চারিগাও নারায়ণী গঙ্গা—	৩৭১৲
১০০৩৭	”	পরগণা রাজনগর—	১০০৸৪৩/৪
৮৬৭৮	”	নয়ানদী রথখলা—	৫৬১৲
৯৫২৮	”	লাক্ষ্যা—	১৮২৲
৯৫২৯	”	বানার—	১২৲
৯৪২৯	”	হাড়িধোয়া—	৩১৲
৮৩৭৭	”	খোদাদাদপুর—	২০০৲
৮৬৭১	”	গঙ্গামালঙ্গ—	৩৯/৭৩/৪
৮৮৭৩	”	”	৮৯/৬
৪৩৭৮	”	সাহা গোলাম মেন্দী—	১৯২।৶৫১/২
			১৭৭৮৷৵১১ ১/২

নিম্নলিখিত মহাল গুলির অধিকাংশই জলকর।

৮২৪৪	তালুক	হরু দর্পনারায়ণ, জলকর নদী বুড়িগঙ্গা—	৩৮১৲
৯১২২	,,	দেবু শ্যামদয়াল মাঝি জলকর গঙ্গামালঙ্গ—	৪০৲
৯১২১	,,	দেবু শ্যামদয়াল মাঝি, তালুক জলকর ছিলক ভদ্র, জলকর নারায়ণ গঙ্গা—	১৫৲
২৭৩৪	,,	আনন্দীরাম দাস—	৯৷৴৭
৭৩৩৬	,,	তালুক বিহারী দাস—	১৯৲
৫৮৯৭	,,	বাঘ মারা কাশিমপুর—	২৫৷৶১১
৮০৫৪	,,	ডিহিভাগলপুর জলকর বাঙ্গসা—	১১৪৲
			৬০৪৴৬

১৮৫৯ খৃঃ অব্দে ঢাকা জেলার পনরটী বৃহৎ নদ নদীর জলকর ৭২৫ পাউণ্ড ১৮ শিলিং ৮ পেন্স আদায় হইত। নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল। (১)।

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
মরাগঙ্গা	২	১১	০
লাক্ষ্যা	৩৫	০	০
ব্রহ্মপুত্র	১০	১০	০
ধলেশ্বরী	১৩১	৮	০
ইছামতী বা ইলিসামারী	৬১	৪	০
গাজীখালী	৩১	৫	৯
পদ্মা	১২৪	০	

(১) Hunter's Statistical account of Bengal vol V Page 25.

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
তুরাগ	১৫২	০	
কালীগঙ্গা	২৬	২	
হাড়িধোয়া	৫	১৬	
নারায়ণীগঙ্গা	৩৮	১৫	
বুড়িগঙ্গা	৩৮	২	
খোদাদাদপুর	৩৬	৪	
রামগঙ্গা	৩১	১৫	
তালুক আনন্দীরাম দাস	০	১৯	
	৭২৫	১৮	৮

ঢাকা জেলার মৎস্য আমদানীর তুলনায় ইহা তৎকালে প্রচুর আয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল না। ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মৎস্য মাশুল ৮০০০ পাউণ্ড হইতে ১০০০০ পাউণ্ড হইবে বলিয়া অনুমান করিয়া ছিলেন (২)।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ১০ ফিট লম্বা একটী হাঙ্গর মেঘনাদ নদে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়, কিন্তু হাঙ্গর এই জেলার কোথাও দৃষ্ট হয় না।

বড় বড় নদীতে শিশুক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শিশুকের তৈল বাতুরোগের অমোঘ ঔষধি। এক একটী শিশুকে অর্দ্ধমণ হইতে দেড় মণ পর্য্যন্ত তৈল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পদ্মার চাইন ও ইলিসমৎস্য এবং ধলেশ্বরীর ইলিসমৎস্য সুস্বাদু। মাণিকগঞ্জের এবং বিক্রমপুরের কৈ ও চিংড়ি খুব প্রসিদ্ধ।

---

(২) Ibid.

লাক্ষ্যার বাঁচার খ্যাতি খুব আছে। বঙ্গের অন্যত্র কুত্রাপি এরূপ সুস্বাদু মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মেঘনাদের টেকচাঁদা মৎস্য উল্লেখ যোগ্য।

(খ) পশু।

অশ্ব, গর্দ্দভ, বন্যশূকর, গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ, হরিণ, ব্যাঘ্র, চিতা, কুকুর, বিড়াল, ভল্লুক, খেকশিয়াল, উদ, সজারু, শশক, ইন্দুর, কাঠবিড়াল, ছুচো, বানর, উল্লুক, খাটাশ প্রভৃতি নানাবিধ পশু এই জেলায় পাওয়া যায়।

গগু, সম্বর, সুকী, সগ্রা এই চতুর্ব্বিধ প্রকারের হরিণ এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

খাচর ও বাঙ্গর ভেদে মহিষ দ্বিবিধ। বাঙ্গর অপেক্ষা খাচর ভীষণতর। মেঘনাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে পালিত মহিষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

গরু ও ঘোড়া ক্রয় বিক্রয় জন্য চালাকচর ও ঝিটকার হাট সুপ্রসিদ্ধ। ঢাকাই গরু বঙ্গপ্রসিদ্ধ; বস্তুতঃ এরূপ উৎকৃষ্ট গরু বঙ্গদেশের আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দে কলিকাতার প্রদর্শনীতে ঢাকার জে, পি, ওয়াইজ সাহেবের বঙ্গের গো-কুলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

ঢাকার খেদা আফিসের বড় সাহেব ডেল্‌রিম্পল ক্লার্ক সাহেবের একটী প্রকাণ্ডকায় গাভী আমরা সন্দর্শন করিয়াছি। উক্ত পয়স্বিনীটী দৈনিক ত্রিশ সের করিয়া দুগ্ধ প্রদান করিত। এতদ্ব্যতীত ঢাকার মিউনিসিপালিটির বণ্ডটীও আকারে কম বৃহৎ ছিল না।

নবাব সায়েস্তা খাঁ দিল্লী হইতে যে সমুদয় উৎকৃষ্ট বৃষ আনয়ন করিয়াছিলেন তাহাদের সন্তান সন্ততি "দেওশালী গরু" নামে

পরিচিত। ঢাকাতে যে আহির গোয়ালার সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে উহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকে সায়েস্তা খাঁ দেওশাল গাভী প্রতিপালন করিবার জন্য ঢাকায় আনয়ন করিয়া ছিলেন।

ভাওয়াল অঞ্চলের ডোম, ঋষি ও চামারগণ বরাহ প্রতিপালন করিয়া থাকে। ঢাকাতে শ্বেত বরাহ ও দৃষ্ট হয়।

গবর্ণমেণ্টের খেদায় ধৃত হস্তী সমূহ পিলখানায় রক্ষিত হইত। মধুপুরের জঙ্গলে পূর্ব্বে হস্তী পাওয়া যাইত। ময়মনসিংহের ভোলা নাথ চাকলাদার কাপাসীয়ার নিকটে একটী খেদা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই খেদার চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই।

গৃহপালিত পশুপক্ষীর উন্নতি সংসাধন জন্য কালেক্টরের তত্ত্বাবধানে পূর্ব্বে ঢাকায় একটী আদর্শ ফারম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে ভাওয়াল অঞ্চলে সাধারণ পাঠার মূল্য ছিল।• চারি আনা। খাসি একটী এক টাকা মূল্যেই পাওয়া যাইত। এক্ষণে ৩৲ টাকার কমে একটী অজশিশু এবং ৫৲ টাকার কমে একটী খাসি পাওয়া দুর্লভ।

(গ) পক্ষী ও পঙ্গপাল।

গৃধিণী, শকুনি, চিল, কোড়া, বাজ, কোরাল, টিয়া, চন্দনা, ময়না, চরুই, বাবুই, বন্যকুক্কুট, পায়রা, হরিকল, ঘুঘু, টুনী, দুর্গাটুনী, ডাহুক, সালিক, দয়েল, শ্যামা, হরবোলা, ময়ূর, পেচক, কুড়াইলা, বক, মাচরাঙ্গা, হারগীলা, শামুকভাঙ্গা, কাক, বুলবুল, পিপি, তিতর, খঞ্জন, দাড়কাক, পাণিকাউর, বউ কথা কও, বাউর, কুক্কুট, সারস, রামশালিক, চুপি, বাদুর, মদনা, তোতা, হংস, রাজহংস, মোরগ, প্রভৃতি পাখী এই জেলায় দৃষ্ট হয়।

মাণিকজোড়, ধনঞ্জয়, ভৃঙ্গরাজ, শ্যামা প্রভৃতি পাহাড়িয়া পাখী হেমন্তকালে এই জেলায় আগমন করে এবং বর্ষার প্রারম্ভেই এখান হইতে অদৃশ্য হয়।

সোণাগঙ্গা এখন বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ঢাকার মাজিষ্ট্রেট একটী সোণাগঙ্গা দেখিয়া ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। উহা লম্বায় ৪২ ইঞ্চি ছিল।

এক সময়ে মৎস্যরাজ পক্ষীর পালক এই জেলা হইতে চীন ও ব্রহ্মদেশে বহুল পরিমাণে রপ্তাণি হইত। মগেরা ইহার পালকদ্বারা তাহাদিগের পোষাক প্রস্তুত করিত।

বুলবুল ও কোঁড়া দ্বারা শিকারীগণ শিকার করিয়া থাকে। বুলবুলের লড়াই একটী চমৎকার দৃশ্য। এক্ষনেও সহরের তাতিবাজার, নবাবপুর প্রভৃতি অঞ্চলে "লড়াই করিবার জন্য" বহু যত্ন সহকারে বুলবুল প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইয়া থাকে।

পানীভেলা পক্ষী দ্বারা শিকারীগণ পদ্মা নদীতে শিকার করে।

পঙ্গপালের উপদ্রব এই জেলায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

(ঘ) সরিসৃপ প্রভৃতি।

কচ্ছপ, কমঠ, কুম্ভীর, কৃকলাস, টিকটিকি এবং কোব্রা, গোমা, দারাইস, ঢুবরাজ, উলবোরা, জিঙ্গলাপোড়া, লাউটেপা, ঘনিয়া, মেটে-সাপ, ধোরা, আইরলবেকা, শালিকবোরা, শঙ্খিনী, ধ্যামুয়া, দুমুখো, চন্দ্রকোনা, প্রভৃতি সরিসৃপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পদ্মা, মেঘনাদ, ধলেশ্বরী ও যমুনায় বর্ষাকালে কুম্ভীর দৃষ্ট হয়।

মুন্সীপুরের বাজার এবং ধনকুনিয়ার হাট কচ্ছপও কমঠ বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শিল্প।

শিল্পগৌরবে ঢাকা জেলা বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঢাকার বস্ত্রশিল্প স্বীয় মহিমায় জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং এই সুযোগে জগতের ধনরাশি শতমুখী জাহ্নবীর ধারার ন্যায় ভারত-সাগরে আসিয়া পতিত হইয়াছিল। ঢাকার শিল্পিকুলকে রাজশক্তির বলে, অনুগ্রহ সাহায্যে, আপনাদের পণ্যদ্রব্য জগতের গ্রহণীয় করিতে হয় নাই। ঢাকার বস্ত্রশিল্পের জন্য সমগ্র জগৎ যে এক সময়ে সোৎসুক নয়নে তাকাইয়া থাকিত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

যে শিল্প এত উন্নত হইয়াছিল এবং যাহার সম্মুখে আরও কত উন্নতির আশা ছিল, অদৃষ্ট নেমীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে তাহা আজ ভস্মীভূত হইয়াছে। ইতিহাসের জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য এই যে, ঢাকার শিল্প-সম্ভার প্রতিপক্ষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সমরে প্রাণ হারায় নাই। "টপোগ্রাফি অব ঢাকা" গ্রন্থ প্রণেতা মহাপ্রাণ ডাঃটেইলার অতি দুঃখেই বলিয়াছেন, Main points of the preceding speech.

"From this recapitulation of the more prominent facts connected with the sources of industry in this part of the country, it will be seen that the Commercial history of Dacca presents but a melancholy retrospect." (১)

---

(১) Dr, Taylor's Topography of Dacca Page 365.

আমরা এই অধ্যায়ে, অতীতের সুমধুর স্মৃতিটুকু লইয়া ঢাকার শিল্পোন্নতির বিবরণ লিপি বদ্ধ করিতে যথা সাধ্য প্রয়াস পাইব।

(ক) বস্ত্রশিল্প।

প্রাচীনত্ব—ঢাকার বস্ত্রশিল্প অতি প্রাচীনকাল হইতেই জগতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। চীনের মৃণ্ময় বাসন এবং দামাস্কসের ফলক ব্যতীত প্রাচ্য জগতের অন্য কোনও শিল্পই ঢাকার বস্ত্রশিল্প অপেক্ষা অধিকতর প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। প্রাচীন যুগে বাবেলোনিয়া এবং এসিরিয়া প্রদেশ যে সময়ে সভ্যতার চরমসীমায় পদার্পন করিয়াছিল, সেই সময়েও ঢাকার মসলিন জগতের নিকটে সমাদরের পুষ্পাঞ্জলি লাভে সমর্থ হইয়াছিল; একথা মিঃ বার্ডউড প্রমুখ মনস্বীগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অধুনা বাইবেলের যে সমুদয় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা টীকা টীপ্পনী সংযোগে প্রকাশিত হইয়াছে তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে বাইবেলের কোনও কোনও স্থানে অতি সূক্ষ্ম মসলিনের ন্যায় একপ্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে। উহা যে ভারতীয় মসলিন হইতে অভিন্ন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই (১)।

তৎকালে শত শত বানিজ্যতরণি বঙ্গদেশ হইতে পেলেসটাইন বন্দরে উপনীত হইয়া পণ্য সম্ভারের আড়ম্বরে বৈদেশিক দিগকে চমৎকৃত করিয়া দিত। প্লিনি বলেন "রোমক বনিকগণের ভারতের সহিত বানিজ্য সম্বন্ধে রোমের সৌভাগ্যলক্ষ্মীও শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল।

---

(১) Ezekiel Ch. xvi, 10, 13 and Isiah Ch. iii, 23 :
See Harris's Natural History of Bible and also interpretation given by Bishop Louth, Dr. Stock and Mr. Dodson.

রোমক মহিলাকুল সেই সমস্ত সুচিক্কণ মসলিনের অন্তরাল হইতে আপনাদিগের অঙ্গরাগ প্রকাশ করিতেন" (১)।

প্রফেসর উইলসন লিখিয়াছেন "তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ বস্ত্রশিল্পে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল' (২)! মিঃ ইয়েট্‌স বলেন "খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিশতাব্দীতে ভারতীয় কার্পাস বস্ত্র গ্রীস দেশে বিক্রীত হইত (৩)।

গ্রীক দার্শনিক এবং ব্যঙ্গকাব্য লেখকগণ নানাবর্ণ রঞ্জিত চাকচিক্য বসন সজ্জিত বিলাস ব্যসনামোদী গ্রীক যুবকগণের প্রতি সমালোচনার তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন; ঢাকার অতি সূক্ষ্ম ঝুনা মলমলই যে তাঁহাদের তীব্র সমালোচনার বিষয় তাহা তাঁহাদিগের লেখা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। Juvenal এই সূক্ষ্ম বস্ত্রকে "multitia" নামে অভিহিত করিয়াছেন (৪)।

প্রাচীনকালে ঢাকায় এরূপ সূক্ষ্ম মলমল প্রস্তুত হইত যে, বিংশতি হস্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একখানা বস্ত্রখণ্ড পক্ষীপালকের ন্যায় ফুৎকার দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া চলিত (৫)

---

(১) "Pliny when speaking of Muslin, terms it a dress, under whose slight veil our women continue to shew their shapes to the public".
"Muslin of Dacca Constituted the *Seriae vestes* which were so highly prized by the ladies of Imperial Rome in the days of its luxury and refinement"—Cotton manufacture of Great-Britain by Dr. Ure.

(২) See Introduction to the Rigveda Sanghita.

(৩) Tesitriuum Antiquorum, L C page 341

(৪) Juvenal Sat ii 65

(৫) History of the Cotton manufacture.

এরিয়েন তদীয় Periplus of the Erythrean sea" নামক নৌসম্বন্ধীয় পত্রিকায় বঙ্গের মসলিনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; এরিয়েন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে অথবা তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকালে জীবিত ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

কার্পাস। সংস্কৃত কার্পাস শব্দে তুলা বুঝায়। হিব্রু—কার্পাস, পারসী কারবস্, এবং হিন্দি কাপাস একই অর্থব্যঞ্জক। কাপাস শব্দ Esther গ্রন্থে উল্লিখিত আছে (১)। কার্পাস হইতেই প্লিনির সময়ে carpassium or carpassian শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এই শব্দ দ্বারা তৎকালে সমুদয় বস্ত্রই সূচিত হইত। ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়া নামকস্থানে প্রচুর পরিমাণে তূলা জন্মিত বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে কার্পাস শব্দ এই কাপাসিয়া হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে (২)।

নবম শতাব্দীতে লিখিত মোসলমান ভ্রমণ কারীদ্বয়ের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে ভারতীয় মসলিন বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ছিল (৩)।

১৫১৬ খৃষ্টাব্দে Barbosa ডুরিয়া ও সাদা মসলিনের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। ১৫৬০ খৃঃ অব্দে "মোহিত" (৪) নামক গ্রন্থে মসলিন-নির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ, ওড়না এবং বহুমূল্য মলমলসাহীর বিষয়

---

(১) Book of Esther Ch i v. 6.

(২) Dr Taylor's Topography of Dacca page 163.

(৩) Account of India and China by two Mohammedan travelers.

(৪) A Turkish Nautical journal by Sidi Chapridan Translated by J. Van, Hammer Barron Purqstall. See J A S of Calcutta vol V p 467.

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মলমলসাহী ও মলমলখাস অভিন্ন। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী রাল্‌ফ্ ফিচ্ লিখিয়াছেন "সোনারগা। পরগণাতেই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়"।

সাম্রাজ্ঞী নুরজাহান ঢাকার মসলীনের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর তদীয় প্রিয়তমা মহিষীর মনোরঞ্জনার্থ ঢাকাই মসলীনের জন্য অজস্র অর্থব্যয় করিতেন। সম্রাট সাজাহান এবং ঔরঙ্গজেবের সময়ে দিল্লীর বেগমমহলে ঢাকাই মসলীন একধিপত্য-লাভ করিয়াছিল; যাহাতে এই মসলীন ভারতের বাহিরে না যাইতে পারে তজ্জন্য ইহারা রাজাদেশ প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

ভ্রমণকারী টেভারনিয়ার লিখিয়াছেন "পারস্যের রাজদূত মহম্মদ আলিবেগ ভারত হইতে প্রত্যাগমন কালে পারস্যের শাহকে উপহার দেওয়ার জন্য ৬০ হাত দীর্ঘ একখানা মসলিন অতি ক্ষুদ্র একটী নারিকেলের মালার মধ্যে পুরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন"। বিংশতি হস্ত দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ গজ প্রস্থ একখণ্ড মসলীন অঙ্গুরীয়কের ছিদ্র মধ্যদিয়া একদিক হইতে অপর দিকে টানিয়া নেওয়া যাইত (১)।

১৪০ হাত হইতে ১৬০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা একখানা মলমলের ওজন ৪ তোলা মাত্র হইত। এইপ্রকার মলমল দিল্লীর বাদশাহ দিগের জন্যই প্রস্তুত হইত। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ও এই মলমল ঢাকাতে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ঐ বৎসরে সোনার-গাঁয়ে ১৭৫ হাত লম্বা একখানা মলমল প্রস্তুত হয়; উহার ওজন হইয়াছিল মাত্র ৪ তোলা। পূর্ব্বে ঢাকাতে ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত বলিয়া জানা যায়।

---

(১) Dr Taylor's Topography of Dacca Page 163.

মসলীনের সূতা—"ঢাকার বস্ত্র শিল্পের ইতিহাস" প্রণেতা, অজ্ঞাত নামা গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে এক পাউণ্ড ওজনের একফেটি সূতা তাহার সমক্ষে পরিমাপ করা হইলে উহা ২৫০ মাইল লম্বা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

কলের সূতা অপেক্ষা এই সূতা নরম; কিন্তু কলের প্রস্তুত মসলীন অপেক্ষা হস্ত নির্ম্মিত মসলীন শক্ত। একজন তন্তুবায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে চরকায় সূতা কাটিয়া একমাস মধ্যে মাত্র অর্দ্ধতোলা পরিমিত সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইত। এই প্রকার এক তোলা সূতার মূল্য ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ৮৲ টাকা মাত্র ছিল।

১৮৫১ খৃঃ অব্দে লিখিত Trigonometrcal Survey গ্রন্থ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনাদ এই নদ নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থলে ১৯৬০ বর্গ মাইল পরিমিত ভূখণ্ড ব্যাপি প্রায় সমুদয় স্থানেই উৎকৃষ্ট মসলীন প্রস্তুত হইত (১)।

ঢাকা, সোণারগাঁও, ডেমরা ও তিতবদ্দি নামক স্থানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মসলীন প্রস্তুত হইত। মুড়াপাড়া, বালিয়াপাড়া এবং লাক্ষ্যা নদীতীরস্থ অন্যান্য গ্রামে নানাবিধ মসলীন সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইত। আবদুল্লাপুরের রেশম ও কার্পাস মিশ্রিত বস্ত্র তৎকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিল। কলাকোপা প্রভৃতি অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। হলদীয়ার ছিট ও লুঙ্গি, ঢাকা জেলায় সুপরিচিত ছিল। অধুনা নানা কারুকার্য্য সমন্বিত সুচিকণ জামদানী ও মলমল, নপাড়া, মৈকুলী, বৈহাকের, চরপাড়াবাশটেকী, নবিগঞ্জ, উত্তর সাহাপুর, প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত হয়।

(১) Vide Trigonometrical survey of India printed by order of the House of Commons, 15th April 1851.

বয়ন—আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসই মসলীন প্রস্তুতের উপযুক্ত সময়। একখানা ডুরিয়া বা চারখানা মসলীন প্রস্তুত করিতে প্রায় দুই মাস কাল অতিবাহিত হইত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট মলমল খাস অথবা সরকারআলি অর্দ্ধ থান বয়ন করিতে ৫।৬ মাস কাল লাগিত। উহার মূল্য ৭০৲।৮০৲ টাকা অবধারিত ছিল।

মসলিন*—"জগত প্রসিদ্ধ সূক্ষ্ম ও সুচিক্কণ কার্পাস বস্ত্র। ইংরেজ বণিকগণ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মছলীপত্তন বন্দর হইতে পূর্ব্বে মসলিন লইয়া যাইত। তাহাদের বিশ্বাস, মছলী বা মসলী অথবা অপভ্রংশ মসলিয়া শব্দ হইতে স্থান মাহাত্ম্য-জ্ঞাপনার্থ এই সূক্ষ্ম বস্ত্রের নামকরণ হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, তুর্কের সুলতান বা প্রাচীন খালিফাগণ স্ব স্ব ভোগ সুখ চরিতার্থ করিবার জন্য বহুপূর্ব্ব কাল হইতে এই সূক্ষ্ম ও সুচিক্কণ বস্ত্র শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি পরিচ্ছদরূপে ব্যবহার করিতেন। মোসলমান বণিকগণ ঢাকা জেলার প্রস্তুত প্রসিদ্ধ মলমল বস্ত্র তুর্কের রাজধানী মোসল নগরে লইয়া যাইত। পরে ঢাকার তন্তুবায়সমিতির অবনতি বা হ্রাস নিবন্ধন হউক, আর পর্ত্তুগীজাদি জলদস্যুর প্রভাবেই হউক ঢাকাই মলমল বস্ত্রের প্রসার কমিয়া যায়। সেই সময়ে সৌখিন তুর্কগণ মোসল নগরে সূক্ষ্ম মলমল বস্ত্র বয়নের চেষ্টা করে। মোসলের সূক্ষ্মতম কার্পাস বস্ত্র গুলি মোসলী বা মসলিন আখ্যায় অভিহিত হয়।

বিভিন্ন প্রকারের মলমল এখানে প্রস্তুত হইত বলিয়া অবগত হওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটীর বিবরণ প্রদত্ত হইল।

---

* Eng. Cyclo. Art and Science vol III. p 851.

বিশ্বকোষ।

১। ঝুনা—হিন্দি ঝিনা (সূক্ষ্ম) হইতে ঝুনা শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা দেখিতে ঠিক মাকড়শার জালের ন্যায়। ইয়ুরোপীয় গ্রন্থকারগণ ইহাকে অসাধারণ-শক্তি-সম্পন্না দেবযোনীগণের কোমল কর-সম্ভূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১)। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ ; ওজন ৮॥ আউন্স।

বিলাসী ধনীবর্গের পুরাঙ্গনাগণ এবং নর্ত্তকী ও গায়িকা বর্গই সাধারণতঃ ইহা ব্যবহার করিত। "কুলভা" নামক একখানা প্রাচীন তিব্বতীয় গ্রন্থে ঝুনা মসলিনের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুণী-গণ ও এই সুচিকণ বস্ত্র ব্যবহার করিতেন বলিয়া তাহাতে লিখিত আছে। একদা কলিঙ্গ রাজ একখানা ঝুনা মসলিন কোশল রাজকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'Gt sing Dgah-mo' নাম্নী স্খলিতচরিত্রা জনৈক ধর্ম্মযাজিকা কোনও প্রকারে উহা হস্তগত করিতে সমর্থ হন। তিনি একদা এই বস্ত্র খানা পরিধান করিয়া সর্ব্ব সমক্ষে বহির্গত হইলে, "নগ্নদেহে" লোকলোচনের গোচরীভূত হইবার জন্য তাহাকে অবমানিতা ও লাঞ্ছিতা হইতে হইয়াছিল। অতঃপর, ধর্ম্ম যাজিকাগণকে কেহই এবম্বিধ সূক্ষ্ম বস্ত্র উপহার প্রদান করিতে পারিবেনা এবং তাহারাও উহা গ্রহণ করিতে পারিবেনা বলিয়া রাজা-দেশ প্রচারিত হইয়াছিল (২)।

(১) "...... When the City was in its most flourishing condition that those gossamer like Muslins were made, which have been compared "to the work of fairies rather than of men", and which constituted "the richest gift that Bengal could offer to her native Princes."—Taylor's Topography of Dacca page 363.

(২) Analysis of the Dulva by A Csoma Korosi in Res. Asiatic Society of calcutta vol x x pt I page 85.

২। রং—ইহা প্রায় ঝুনা মসলিনের ন্যায়ই সূক্ষ্ম। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ; ওজন প্রায় ৮ আউন্স ৪ ড্রাম। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১২০০।

৩। সরকার আলি—ইহার সূত্রগুলি নিবিড় সন্নিবিষ্ট হইলেও ইহা অত্যন্ত কোমল এবং দেখিতে অতিশয় রমণীয়। বঙ্গের নবাবগণের জন্যই ইহা প্রস্তুত হইত। সরকার আলি নামে এক প্রকার বাদশাহী জায়গীরের উল্লেখ বহু গ্রন্থে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। দিল্লীশ্বরের জন্য প্রতি বৎসর যে পরিমাণ মলমল ঢাকা জেলায় প্রস্তুত হইত তাহার ব্যয় সঙ্কুলন জন্যই এই জায়গীরের সৃষ্টি হইয়াছিল। নবাব ও সুবাদারগণ প্রতি বৎসর সম্রাটকে যে সমুদয় দ্রব্যাদি উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিতেন তন্মধ্যে সরকার আলি অন্যতম। সরকার আলি জায়গীরলব্ধ রাজস্ব ইহার প্রস্তুত জন্য ব্যয়িত হইত বলিয়া ইহা "সরকার আলি" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। দৈর্ঘ্য ১০ গজ, প্রস্থ ১ গজ; ওজনে ৪ আউন্স কি ৪॥ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৯০০।

৪। খাসা—পারসী "খাসা" (উৎকৃষ্ট, সুদৃশ্য) শব্দ হইতেই খাসা মলমলের নাম করণ হইয়াছে। ইহার সূত্র গুলিও ঘন সন্নিবিষ্ট। আবুল ফজল তদীয় আইন-ই আকবরি নামক গ্রন্থে এই মলমলকে "কসাক" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সোনারগাঁও অঞ্চল উৎকৃষ্ট "খাসা মলমল" প্রস্তুতের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল (১)। সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাসা

---

(১) "Sarcar Sunargong. In this Sircar is fabricatde cloth, called Cassah" — Gladwin's translation of Ain-i-Akbari-Page 305,

মলমল "জঙ্গলখাসা" নামে অভিহিত হইত। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ হইতে ১৷৷০ গজ; ওজন ১০৷৷০ হইতে ২১ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৪০০ হইতে ২৮০০।

৫। সবনম্—এই স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ড রূপক চ্ছলে পারসী ভাষায় "সান্ধ্য শিশির" (evening dew) বলিয়া অভিহিত হইত। শ্যামল তৃণ শস্পোপরি ইহা আস্তীর্ণ করা গেলে শিশির সিক্ত দূর্ব্বাদল বলিয়া ভ্রম জন্মিত। একদা পরীক্ষাচ্ছলে নবাব আলিবর্দ্দিখাঁ এক খানা সবনম্ মল মল ঘাসের উপরে ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে যে একটী গরু ঘাস খাইতে খাইতে ঐ বহু মূল্য বস্ত্র খণ্ড উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়া ছিল (১)। অনেক ইয়োরোপীয় কবি এই বস্ত্রকে "বায়ুর জাল" বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন (২)। ইহার দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ; ওজন ১০ হইতে ১৩ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ৭০০ হইতে ১৩০০।

৬। আবরোয়ান—আব্—জল, রোয়ান—প্রবাহিত হওয়া। নির্ম্মল সলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় ইহা অতিশয় স্বচ্ছ, এজন্যই ইহার নাম আব্রোয়ান। জলের সহিত এরূপ ভাবে মিশিয়া থাকে যে জল হইতে না তুলিলে কাপড় বলিয়া বুঝা যায় না। কথিত আছে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের এক কন্যা এই বস্ত্র পরিধান করিয়া পিতৃসন্নিধানে উপনীত

---

(১) Bolt's Considerations in the affairs of India page 206.

(২) Some of the muslins of India and especially those of Dacca, are of the most astonishing degree of fineness so as to justify the poetical designation "a web of woven wind"—Eng. cyclo. Art and Science Vol III, page 851.

হইলে পিতা তাহাকে আবরুহীনা বলিয়া ভৎ‍র্সনা করেন। উত্তরে কন্যা বলিলেন, "তবু আমি সাত পুরু কাপড় পড়িয়াছি" (১)। ইহার দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ, ওজন ৯ হইতে ১১॥ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ৭০০ হইতে ১৪০০।

৭। আলা বাল্লে—তন্তুবায়কুল আলাবাল্লে শব্দের অর্থ করেন অতি উৎকৃষ্ট। ইহার সূত্রগুলি নিবিড় সমাচ্ছন্ন। "Sequel to the Periplus of the Erythrean Sea" নামক পুস্তিকায় ডাক্তার ভিন্‌সেণ্ট এই বস্ত্রকে "abollai" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলেন "abollai" এই গ্রীক শব্দটী, লাটিন abolla শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। লাটিন abolla শব্দে সৈনিকের কুর্ত্তা বুঝায়। এরিয়েন ভারতীয় কার্পাস সম্পর্কেই সম্ভবতঃ এই শব্দটী প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। আমাদিগের বিবেচনায় "আলাবাল্লে" সংজ্ঞক মলমলকেই তিনি abollai বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ; ওজন ৯৸০ হইতে ১৭ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১১০০ হইতে ১৯০০।

৮। তঞ্জেব—পারসী "তন্"—শরীর, এবং জেব — অলঙ্কার। ইংলণ্ডে ইহা তাঞ্জেব নামে সুপরিচিত। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ; ওজন ১০ হইতে ১৮ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৯০০।

৯। তরন্দাম—তন্তুবায়গণ এই শব্দের অর্থ 'আজরাখা' বলিয়া থাকেন। আরবী "তুরা"—রকম, এবং পারসী "উন্দাম"-শরীর, এই দুইটী শব্দের একত্র সংযোগে তরন্দাম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বে "তেরেন্দাম" নামে ইহা ঢাকা হইতে ইংলণ্ডে রপ্তানি হইত। দৈর্ঘ্য

(১) See Bolt's Considerations on the affairs of India page 206

২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ। ওজন ১৫ হইতে ২৭ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১০০০ হইতে ২৭০০।

১০। নয়নসুক—ইহা অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের। আইন-ই আকবরি গ্রন্থে ইহা "ভুনসুক" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আবুল-ফজল ইহার মূল্য ৪৲ টাকা হইতে ৮০৲ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১৷৷০ গজ; প্রতান সূত্র সংখ্যা ২২০০ হইতে ২৭০০।

১১। বদনখাস—নয়ন সুকের ন্যায় ইহার সূত্র গুলি ঘন সন্নিবিষ্ট নহে। দৈর্ঘ্য ১০ গজ হইতে ২৪ গজ, প্রস্থ ১৷৷ গজ; ওজন ১২ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ২২০০।

১২। সরবন্দ—সুর (মস্তক); বন্ধনা (বন্ধন করা) এই দুইটী শব্দের সমবায়ে এই শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহা শিরস্ত্রাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। দৈর্ঘ্য ২০ গজ হইতে ২৪ গজ, প্রস্থ অর্দ্ধ গজ হইতে এক গজ; ওজন ১২ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ২১০০।

১৩। সরবতি—সরবতি শব্দের অর্থ মোচড়ান অথবা কুণ্ডলীকৃত ভাবে জড়াইয়া রাখা। ইহাও শিরস্ত্রাণ রূপে ব্যবহৃত হইত। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সরবন্দের অনুরূপ।

১৪। কুমীস—আরবী কুমীস্ (সার্ট) শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এই বস্ত্র দ্বারা মোসলমান গণ কুর্ত্তা প্রস্তুত করিতেন। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১ গজ; ওজন ১০ আউন্স। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৪০০।

১৫। ডুরিয়া—ডুরিয়া প্রস্তুত প্রণালী একটু স্বতন্ত্র রকমের। দুইটী সূত্র একত্র পাকাইয়া ইহার তানা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং বয়ন করিলে উহা ডুরিয়ার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বেজা ও সেরোজ জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের তুলা হইতে সূতা

কাটিয়া ইহার বয়ন কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। ডুরিয়া মসলীন নানাবিধ। যথা, ডোরাকাটা, রাজকোট, ডাকান, পাদশাহীদার, কুণ্ডিদার, কাগজাহি, কলাপাত প্রভৃতি। দৈর্ঘ্য ১০ হইতে ২০ গজ এবং প্রস্থ ১ হইতে ১॥ গজ পর্য্যন্ত।

১৬। চারখানা—এই মলমল বিভিন্ন বর্ণের সূত্রদ্বারা নির্ম্মিত। ইহা ডুরিয়ারই অনুরূপ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ডুরিয়ার ন্যায়। ডুরিয়া ও চার খানার "ডোরা" গুলির আয়তন সমান নহে। "Periplus of the Erythrean sea" গ্রন্থে ইহা Dia krossia নামে ভারতীয় বস্ত্র সমূহ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। Apollonias, Dia krossia শব্দের অর্থ করিয়াছেন "ডুরিদার। চারখানা ছয় প্রকার যথা :—নন্দন সাহী, আনার দানা, কবুতরখোপা, সাকুতা, বাছাদার, কুণ্ডিদার।

১৭। জামদানী—ঢাকার জামদানী বস্ত্র বিখ্যাত। উহার ফুল ও অন্যান্য কারুকার্য্য তাতেই তোলা হয়। সুনিপুণ তন্তুবায়গণ বস্ত্র বয়ন করিতে করিতে যথা স্থানে বংশ নির্ম্মিত সূচী সাহায্যে প্রতান সূত্রের সহিত ফুলের সূত্র বসাইয়া দেয়। সোজা, বাঁকা, সকল দিকেই ইহারা ফুলের সারি রাখিয়া দেয়। বাঁকা সারি হইলে তাহাকে তেড়ছা বলে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও পৃথক পৃথক ফুল কাঁটা হইলে তাহাকে বুটিদার কহে।

পূর্ব্বে ইহার বয়ন কার্য্যে ২০০ শত হইতে ২৫০ নম্বরের সূত্র ব্যবহৃত হইত। জামদানী বস্ত্র প্রস্তুতের খরচ অত্যন্ত বেশী। সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই বস্ত্রের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। তিনি ইহার এক একখানা ২৫০৲ টাকা মূল্য দিয়া গ্রহণ করিতেন। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে নায়েব নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁ প্রত্যেক খানা জামদানী বস্ত্র প্রস্তুত করিবার খরচ স্বরূপ ৪৫০৲

টাকা প্রদান করিতেন। Periplus of the Erythrean sea" গ্রন্থে ইহা skotulats বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৭০০।

জামদানী বস্ত্র নানাবিধ যথা :—তোড়াদার, কারেলা, বুটিদার, তেরছা, জলবার, পান্নাহাজার, মেল, তুবণিজাল, ছাওয়াল, বাল আর, ডুরিয়া, গেদা, সাবুরগা প্রভৃতি।

জামদানী বস্ত্রের নির্ম্মাণ কার্য্য মোগল গবর্ণমেণ্টের হস্তে এক চেটিয়া ছিল। সর্ব্বোৎকৃষ্ট জামদানী বস্ত্র মুরসিদাবাদের নবাবগণের জন্যই প্রস্তুত হইত। ঢাকা আড়ংএর তন্তুবায়গণই সাধারণতঃ ইহা প্রস্তুত করিত। এজন্য ঢাকার সদর মলমল খাস কুঠীর দারোগা তন্তুবায় দিগকে দাদন দিয়া রাখিতেন। কিন্তু সদর মলমল খাস কুঠীতে দারোগার কর্ত্তৃত্বাধীনে অতি অল্প পরিমাণ জামদানী বস্ত্রই প্রস্তুত হইত। অধিকাংশ বস্ত্রই তন্তুবায়গণ স্বীয় গৃহে বয়ন করিতেন। কিন্তু তাহারা ৩ গিনির অধিক মূল্যের মসলীন অপরের নিকটে বিক্রয় করিতে পারিতেন না। এজন্য ইউরোপীয় এবং দেশীয় এই উভয়বিধ বণিকসম্প্রদায়ই মসলীনের ব্যবসারের জন্য দালালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইত (১)।

তন্তুবায়গণকে "ছাপ্পা জামদানী" নামে একপ্রকার কর প্রদান করিতে হইত। গভর্ণমেণ্টের অজ্ঞাতসারে জামদানী বস্ত্র বিক্রয় করিবার অধিকার প্রাপ্তির জন্যই তন্তুবায় কুল এই কর প্রদান করিত। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে এই কর রহিত হয় (২)।

এখনও ২০০৲ টাকা মূল্যের অত্যল্প সংখ্যক কয়েক খানা জামদানী

(১) History of the Cotton manu facture of Dacca District.
(২) Ibid.

মসলিন ত্রিপুরার মহারাজা এবং অন্যান্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত পরিবার বর্গের জন্য ঢাকাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪০০৲ টাকা মূল্যের জামদানী মসলীনও মধ্যে মধ্যে প্রস্তুত করিতে দেখা যায় (১)!

ঢাকা সহর ব্যতীত নাঙ্গি, ডেমরা, ধামরাই, কাচপুর, সিদ্ধিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও জামদানী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৮। **মলমলখাস**—দিল্লীর সম্রাটগণের ব্যবহারার্থ ইহা প্রস্তুত হইত। এই মসলীন এরূপ সূক্ষ্ম যে একটী অঙ্গুরীয়কের ছিদ্র দিয়া সমুদয় বস্ত্র খণ্ড একদিক হইতে অপর দিকে টানিয়া নেওয়া যায়। দৈর্ঘ্য ১০ গজ, প্রস্থ ১ গজ; ওজন ৮।৶০ আট তোলা ছয় আনা। মূল্য সাধারণতঃ ১০০৲। প্রতান সূত্র সংখ্যা ১৮০০ হইতে ১৯০০।

মলমলখাস মসলিন প্রস্তুত করিবার জন্য সুবাদারগণের নিয়োজিত স্বতন্ত্র লোক ঢাকা ও সোণারগাঁয়ের কুঠীতে অবস্থান করিত। উহা মলমলখাসকুঠী নামে অভিহিত হইত। তন্তুবায়গণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একজন দারোগা মলমলখাসকুঠীর অধ্যক্ষ স্বরূপ তথায় সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন। তাতের কার্য্যে যাহারা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে, এরূপ লোকদিগকেই মলখাস কুঠীর কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। এই সমুদয় তন্তুবায়গণের নামের একখানা রেজেষ্টরী বহি কুঠীতে রাখা হইত। প্রত্যেক কার্য্যকারক প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে কুঠীতে উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিতেছে কিনা তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দারোগার কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল (২)।

(১) A Survey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam for 1907-1908, by. Mr G. N. Gupta M, A, I, C. S.

(২) History of the Cotton manufacture of Dacca District.

প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন হইল কিনা তাহার পরীক্ষা দারোগা স্বয়ং করিতেন। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে দারোগার অধীনস্থ কর্ম্মচারী সূতাগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিত। আদর্শ মলমলখাসের সূতার সহিত তুলনায় উহা সমশ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হইলে কার্য্যারম্ভ করিতে দেওয়া হইত। এরূপ কঠিন ব্যবহার প্রচলিত ছিল বলিয়াই মলমলখাস প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগিত (১)।

উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকারের মসলিন মধ্যে মলমলখাসই অত্যন্ত মনোরম। সূক্ষ্মতায় ও ইহাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। আবরোয়া, সব্‌নম্, সরকার আলি, তুঞ্জেব যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানীয়।

১৮৬২ খৃঃ অব্দে বিলাতের শিল্প প্রদর্শনীতে ঢাকাই মসলিনের সহিত ইয়ুরোপজাত মসলিনের তুলনা করা হয়। ফলে ঢাকাই মসলিনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এই বিষয়ে ওয়াটসন সাহেবের উক্তি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "However viewed, therefore, our manufacturers have something still to do. With all our machinery and wondrous appliances, we have hither to been unable to produce a fabric which for fineness and utility can equal the "woven air" of Dacca—The product of an arrangements which appear rude and primitive but which in reality admirably adapted for their purpose (২).

(১) I bid.

(২) The Textile manufacture and Costumes of the people of India by F Watson. 1866.

১৮৬২ খৃঃ অব্দে বিলাতের শিল্প প্রদর্শণীতে প্রেরিত মলমল-গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল (১)।

নাম	রকম	দৈর্ঘ্য প্রস্থ,	ওজন	মূল্য
১। আবরোয়া	সাদা মসলিন	২০ X ১ গজ	৭॥ আউন্স	৬ পা—৪ শি
২। সরকার আলি	,, ,,	,, ,,	৬৶	,,
৩। সবনম্	,, ,,	১৯গ ১৪ই X ৩৪ই	৬॥০	৩—৪—
৪। তুঞ্জেব	,, ,,	২১গ ৫ই X ১গ	১২।০	৫—০—
৫। নয়নসুখ	,, ,,	১৯গ ১৮ই X ১গ ৭ই	১পা ২।০	৪—০—
৬। জঙ্গল খাস	,, ,,	২১গ ৬ই X ১গ ৫ই	১পা ৯।০	৫—২—

কর্ম্মচারীগণের উৎপীড়ন—নবাবী কর্ম্মচারীগণ তন্তুবায় গণের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়ে মলমলখাসকুঠীর কর্ম্মচারীগণ তন্তুবায়গণের শ্রমলব্ধ অর্থের অংশ হইতে শতকরা ২৫৲ টাকা হারে কর্ত্তন করিয়া রাখিত বলিয়া ঢাকার রেসিডেণ্ট লিখিয়া গিয়াছেন।

Abbe Raynel ঢাকার তন্তুবায় কুলের অবস্থা বর্ণনায় এক স্থানে লিখিয়াছেন, "ইহারা ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্টকার্য্য পরিসমাপ্ত করিলে নবাবের কর্ম্মচারীগণ উহাদিগের দ্বারা বেশী কাজ করাইয়া লইয়া তদ্বাবদে উপযুক্ত পারিশ্রামিক প্রদান করিতে সর্ব্বদাই কার্পণ্য করিত; এবং কার্য্য করিবার সময়ে উহারা এক প্রকার বন্দী অবস্থায়ই কাল যাপন করিত (২)।

(১) Ibid.

(২) Raynel's History of the Settlement & Trade of the Europeans in the East and West India vol II page 157.

বঙ্গের সুবাদারগণ মলমলখাস প্রস্তুতের জন্য প্রতি বৎসর যে অর্থ ব্যয় করিতেন তাহা দিল্লীশ্বরের প্রাপ্য বার্ষিক নজরানা স্বরূপে ধরিয়া লওয়া হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উহা বাঙ্গলার রাজস্ব হইতেই ব্যয়িত হইত এবং সরকার আলি জায়গীরের হিসাবে খরচ লিখা হইত।

বিভিন্ন সময়ে মলমলখাস বস্ত্রের মূল্য কত ছিল তাহা নিম্নোদ্ধৃত তালিকা দৃষ্টে প্রতীয়মান হইবে (১)।

প্রস্তুতের সময়	দৈর্ঘ্য প্রস্থ	তানার সূতার পরিমাণ	ওজন	মূল্য।
সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসন সময়ে	১০গজ ৩৫´ X ১গজ ৩২৳´´	১৮০০	১০তো।	১০০৲ আর্কটমুদ্রা
১৭৯০।১৮০০	,, ,,	,,		১২॥০—৮০৲ ,,
১৮৫০	১০ গজ X ১গজ	,,		৪॥০—১০০৲ ,,

নবাব জাফর আলিখাঁ সম্রাট ঔরঙ্গজেব সন্নিধানে প্রতিবৎসর ৫০০ খানা মলমলখাস বস্ত্র নজরানা স্বরূপ প্রেরণ করিতেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ঢাকার নায়েব নাজিম নসরৎজঙ্গ বাহাদুর প্রাচীন দলিলাদি দৃষ্টে নবাব জাফর আলির প্রদত্ত উপঢৌকনাদির যে একটী তালিকা কমার্সিয়েল রেসিডেন্টের নিকটে প্রেরণ করিয়া ছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। মলমলখাস ব্যতীত স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাদলা, পাখা, শ্রীহট্টের ঢাল, নাগকেশরের আতর প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য ঢাকা হইতে প্রেরিত হইত বলিয়া জানা যায়। সমুদয়ে মোট ১২৭৮৭১৮ ব্যয়িত হইয়াছিল।

---

(১) History of the Cotton manufacture of Dacca District.

ঢাকা আড়ং।

১০০ খানা জামদানী ধুতী ২৫০৲ হিসাবে — ২৫০০০৲
৫০ „ „ „ রেশমী বুটাদার ২০০৲ হিসাবে — ২০০০০৲
৬০ খানা রেজা অর্থাৎ রৌপ্য সূত্রের কারু কার্য্য
খচিত মসলিন ১০০৲ হিসাবে — ৬০০০৲
ধোলাই ও ইস্ত্রি খরচ — ১৪৮০৲

৪২৪৮০৲

সোণারগাঁও আড়ং।

১০০ খানা সাদা মসলিন ২০০৲ হিসাবে — ২০০০০৲
২০ „ সাদা সরবন্দ ৮০৲ „ — ১৬০০৲
ধোলাই ও ইস্ত্রি খরচ— ২৯৫০।০

২৪৫৫০।০

নাগকেশরের আতর — ২৬০৲
৫০ খানা শ্রীহট্টের ঢাল ১৬৲ হিসাবে — ৮০০৲
ঢালের কারু কার্য্য বাবদ — ২৬৮০৲

৩৪৮০৲

১০০ খানা স্বর্ণ সূত্রের
জরাও করা লাঠী এবং
২০০ খানা তালপত্রের পাখা— ২০০৲
উহার কারু কার্য্য খরচ— ৪০০০৲

৪২০০৲

সোণার বাদলা— ৫০০০৲
রৌপ্য বাদলা — ১১০০০৲

১৬০০০৲

বিভিন্ন বস্ত্রাদি—মসলিন ব্যতীত নিম্ন লিখিত বিভিন্ন প্রকারের বস্ত্রাদিও ঢাকা জেলার নানা স্থানে প্রস্তুত হইত।

বাফ্‌তা—বাফ্‌তা কলাকোপা নামক স্থানে বিস্তর প্রস্তুত হইত। ইহা খুব মোটা ; সাধারণতঃ গাত্র বস্ত্র স্বরূপেই ব্যবহৃত হইত। বাফ্‌তা নানাবিধ। যথা, হাম্মাম, ডিমটী, সাল, জঙ্গলখাসা, গলাবন্দ প্রভৃতি। দৈর্ঘ্য ১২ গজ, প্রস্থ ১ গজ।

বুন্নি—হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সর্ব্ব জাতীয় লোকের নিকটেই বুন্নির আদর ছিল। দৈর্ঘ্য ১০ গজ, প্রস্থ ১ গজ।

একপাট্টা ও জোর—সাধারণতঃ হিন্দু গণই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। দৈর্ঘ্য ২ গজ হইতে ৩ গজ, প্রস্থ ১॥ গজ।

হাম্মাম—গামছার ন্যায়। দৈর্ঘ্য ২০ গজ, প্রস্থ ১॥ গজ।

লুঙ্গী—মোসলমানগণ ইহা সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কসিদা—বুটাতোলা মসলিন "কসিদা" নামে পরিচিত। কসিদা নানাবিধ। তন্মধ্যে কাটাউরমী * নৌবত্তি, আজিজুল্লা এবং দোছাক প্রধান। কার্পাস সূত্র ও রেশমের সংমিশ্রনে কাসিদা বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

---

* হিন্দি "কুটাও" (বস্ত্রে বুটাতোলা) এবং আরবী "রুমী" (রোমীয় বা গ্রীস দেশীয়) এই উভয় শব্দের সংমিশ্রণে উদ্ভূত হইয়াছে। রোম সাম্রাজ্যের জনগণের ব্যবহারার্থ প্রেরিত হইত বলিয়াই উক্ত কসিদাবস্ত্র এবম্বিধ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। "রুমী" এই শব্দ অদ্যাপি ভারতে প্রচলিত আছে। তুরস্কের সুলতান রুমের বাদশাহ বলিয়া অদ্যাপি এতদঞ্চলে পরিচিত। তুরস্ক অথবা তুরস্ক সম্রাটের শাসনাধীনস্থ জনগণকে রুমী বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই "রুমী" শব্দ ভারতে মোসলমান আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। তুর্কি এবং গ্রীকগণ ভারতে মোসলমান অধিকারের বহু পূর্ব্ব হইতেই পূর্ব্বদেশে বানিজ্য ব্যপদেশে আগমন

কার্পাস সূত্রা দ্বারা কসিদা বস্ত্রের যে অংশ বুনন হয় তাহাতে সীবন শিল্প সন্নিবেশিত করিয়া উহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। ইহার দৈর্ঘ্য ১। গজ হইতে ৬ গজ, প্রস্থ ১ হইতে ১।০ গজ পর্য্যন্ত হয়। সাধারণতঃ আরব দেশেই ইহার সমাদর অধিক। কথনও কথনও রেঙ্গুন, পিনাং প্রভৃতি সুদূর পূর্ব্বাঞ্চলেও ইহা বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু জিদ্দা নগরেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রপ্তানি হয়।

মক্কার সন্নিকটবর্ত্তী মীনার নামক স্থানে যে একটী সাম্বৎসরিক মেলার অধিবেশন হয় তাহাতে প্রচুর পরিমাণে কসিদা বস্ত্র বিক্রিত হইয়া থাকে। আরব, পারস্য ও তুরস্ক দেশীয় সৈনিক গণের শিরস্ত্রাণ ও ফতুয়া এবং মহিলাকুলের ঘাঘরা এই কসিদা বস্ত্র দ্বারা প্রস্তুত হয়।

পূর্ব্বে ৫০।৬০ রকমের কসিদা বস্ত্র প্রস্তুত হইত। ইহার এক এক খানা ৫০০৲ টাকা মূল্যে ও বিক্রীত হইত।

রেশম বিহীন কার্পাস সূত্রের কসিদা বস্ত্র "চিকন" নামে সুপরিচিত। চিকন বস্ত্রে নানা বর্ণের সূত্রাদি যোগে পুষ্প প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত করা হয়। হিন্দি ভাষায় এই কার্য্যকে চিকনকারি ও চিকন দাজী বলে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকগণই কসিদার বুটা ও উহার অন্যান্য সূচীশিল্প প্রস্তুত করিয়া থাকে। এখনও ঢাকার প্রতি তন্তুবায় পল্লিতেই গৃহ কার্য্য সমাপন করিয়া পুরাঙ্গনা গণ অবসর মত এই কার্য্য করিয়া থাকেন। ধোপানী গণও তাহাদিগের যাবতীয় কাজ কর্ম্ম পরিসমাপ্ত করিয়া অবসর

করিতেন। তাহাদিগকেও রুমী বলিত, ইহা জানা যায়। Cosmos Indicoplenstes উল্লেখ করিয়াছেন যে তদীয় বন্ধু Sopatrus ৫০০ খৃঃ অব্দে সিংহলদ্বীপে উপনীত হইলে, সিংহল রাজ তাহাকে রুমী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। (Vincent's Periplus of the Erythrean sea).

মতে কসিদার কার্য্য করিত। মোসলমান রমণীকুল মধ্যেই ইহার প্রচলন অত্যন্ত বেশী ছিল। সম্ভ্রান্ত বংশীয়া পুরমহিলাগণও এই কার্য্য করা হেয় মনে করিতেন না; বরং ইহাতে বিশেষ দক্ষতা ও কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করিতে না পারিলে সকলের নিকটে উপহসনীয় হইতেন।

এইরূপে এক্ষণেও ঢাকার প্রায় প্রত্যেক স্ত্রীলোকই মাসিক ৪৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

কসিদার নক্‌সা গুলি পারস্য দেশীয় জন গণের অভিরুচি অনুসারেই অঙ্কিত হয়। তুরস্ক রাজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার কসিদা বস্ত্রের ও আদর কমিয়া আসিতেছে। এক্ষণে তথাকার প্রধান সৈনিক পুরুষ গণই কেবল মাত্র কসিদার শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিবার অধিকারী। কিন্তু পূর্ব্বে সমুদয় সৈনিক গণকেই ইহা ব্যবহার করিতে হইত।

কসিদা বস্ত্র সরবরাহ করিবার জন্য পূর্ব্বে "ওস্তাগর" ও "ওস্তানী" গণ মহাজনদিগের সহিত চুক্তি করিত। যে নমুনার "বুটা" বা কারুকার্য্য করিতে হইবে পূর্ব্বেই তাহার একটী আদর্শ "চিপিগর"গণ সন্নিধানে প্রেরণ করিবার রীতি ছিল।

কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল মহম্মদ আলি পাশা ইজিপ্ত দেশে কাসদার কার্য্য প্রবর্ত্তন করিবার জন্য ঢাকা হইতে অনেক তসর তথায় পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু উদ্যম ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ঐ সমুদয় বস্ত্র খণ্ড ঢাকাতে পুনঃ প্রেরণ করেন।

১৮৪০ খৃঃ অব্দে ১২০০০০ খণ্ড কসিদা বস্ত্র এখান হইতে বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ১৮৯৫ সনে ৯০০০০৲ টাকার কসিদা বস্ত্র বিক্রীত হইয়াছিল। ১৮৯৬ সনে কেবল মাত্র আরব দেশেই ২৫০০০০৲ টাকার বস্ত্র রপ্তানি হইয়াছিল।

ঢাকা সহর ব্যতীত, সানেরা, বিলিশ্বর, মাতাইল, দাগর প্রভৃতি স্থানের মোসলমান স্ত্রীলোকগণও ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু ঢাকা নগরী এবং মাতাইল গ্রামই এই কার্য্যের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

মিঃ ইউর তদীয় "Cotton manufacture of Hindusthan" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "মসলিনের বয়ন কার্য্য জলের নীচে সম্পন্ন হইয়া থাকে"। বলাবাহুল্য যে এই উক্তি নিতান্ত ভ্রমাত্মক। গ্রীষ্মকালে মসলিন বয়নকালে তন্তুবায়গণ তাতের নীচে জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দিত। কারণ জলীয় বাষ্প উত্থিত হইয়া উহা সূতার সংস্পর্শে আসিলে তানার সূতাগুলি একটু নরম হইত সুতরাং সূত্র ছিন্ন হইবার আশঙ্কা থাকিত না। এই প্রণালী অবলম্বিত হইত বলিয়াই বিদেশীয় লেখকগণের উক্ত রূপ ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছিল সন্দেহ নাই।

মসলিনের ছিট—নন্দনসাহী, আনারদানা, কবুতরখুপী, সাকুতা, পাছাদার, কুস্তিদার প্রভৃতি মসলিনের নানাবিধ ছিট পূর্ব্বে এখানে প্রস্তুত হইত বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

তাত—১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ঢাকা সহরে ১৫০০, সোণারগাঁয় ৭০০, ডেমরাতে ৯০০, তিতবদ্দিতে ৩৬০ এবং মুড়াপাড়া, আবদুল্লাপুর ও অন্যান্য স্থানে ৭০০, সর্ব্বশুদ্ধ ৪১৬০ খানা তাত ঢাকা জেলাতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বস্ত্র ব্যবসা—১৮০০ খৃঃ অব্দে ঢাকা সহরে ৪৫০০০০৲, সোণারগাঁয়ে ৩৫০০০০৲, ডেমরাতে ২৫০০০০৲ তিতবদ্দিতে ১৫০০০০৲ টাকার মসলিন প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ব্বে ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায় সাধারণতঃ হিন্দু, মোগল, পাঠান, ·বানী, আরমাণী, গ্রীক, পর্ত্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী ও দিনেমার বণিকগণের হস্তে ছিল। কিন্তু এক্ষণে হিন্দু-দিগের হস্তেই ইহা ন্যস্ত রহিয়াছে।

বিভিন্ন সময়ে ইংরেজ কোম্পানী ঢাকাই মসলিন যে মুল্যে খরিদ করিতেন তাহার একটী তালিকা প্রকাশ করা গেল *

মসলিনের রকম	তানা	দৈর্ঘ্যপ্রস্থ গজ	দেশী সূতার প্রস্তুত (১৭৬০-৬৪ খঃ অব্দ)	দেশী সূতার প্রস্তুত (১৮০০ খৃঃ অব্দ)	বিলাতি সূতার প্রস্তুত (১৮৪৫ খৃঃ অব্দ)
ডুরিয়া	১৫০০	৪০×২	১২৲ আর্কট	১৫৲ সিকা	১১৲ কোম্পানী
ঐ মধ্যম	১৯০০	,,	১৮৲	২০৸৶০	১৪৲
ঐ বড়	,,	৪০×২।০	২০।০	২২॥৵০	১৬৲
ঐ সূক্ষ্ম	২০০০	৪০×২	২৫৲	২৯৲	২০৲
উৎকৃষ্ট চারখানা	২১০০	৪০×২	৩০৲	২৮৲	১৮৲
ঐ বড়	,,	৪০×২॥০	৩৩৸	৩৭॥৶	২৮৲
ঐ সর্কোৎকৃষ্ট	,,	৪০×২	৫০৲	৪৪৲	৩৫৲
আবরোয়া	১৪০০	,,	৩৬৲	৩৯৵০	২৭৲
জামদানী	,,	২০×২	৫০৲	৩৬.০	২৪৲
সরবতি (সাধারণ)	,,	৪০×২	৫৲	৭৷০	৬৲
মলমল	১২০০	,,	৭॥০	১০।০	৭৲
সূক্ষ্মমলমল	১৩০০	৪০×২	৯৲	১২৶	৮৲
ঐ লম্বা	,,	৪৮×২	১১৲	১৪৸৶০	১০৲

* Descriptive and Historical account of the cotton manufacture of Dacca District.

মসলিনের রকম	তানা	দৈর্ঘ্যপ্রস্থ গজ	দেশী সূতায় প্রস্তুত (১৭৬০-৬৪ খৃঃ অব্দ)	দেশী সূতায় প্রস্তুত ১৮০০ খৃঃ অব্দ	বিলাতী সূতায় প্রস্তুত ১৮৪৫ খৃঃ অব্দ
ঐ উৎকৃষ্ট	১৪০০	৪৮×২	৩০৲	৩৩৷৷০	২২৲
,,	১৬০০	৪০×২	২০৲	১২৲	১৫৲
ঐ লম্বা	১৮০০	৪৫×২	৪৭৲	৫০।০	৩৫৲
আলাবল্লী	১৫০০	৪০×২	১০৲	১৩৷৷০	৯৲
ঐ উৎকৃষ্ট	১৭০০	,,	১৫৲	১৭৷৷৵০	১৩৲
ঐ অত্যুৎকৃষ্ট	১৮০০	,,	২৫৲	২৯৸৴	২০৲
তাঞ্জেব (উৎকৃষ্ট)	,,	,,	৮৲	১১৸৵০	৯৲
ঐ অত্যুৎকৃষ্ট	,,	,,	১৪৲	১৮৲	১৪৲
ঐ চওড়া	১৬০০	৪০×২।০	৮৲	১২৸৵০	১০৲
ঐ অত্যুৎকৃষ্ট	,,	৪০×২	৩৬৴০	৩৬।৴০	২৪৲
ঐ উৎকৃষ্ট	,,	,,	১৪৲	১৫৷৷৵০	১১৲
ঐ অত্যুৎকৃষ্ট	,,	,,	১৯৷৷০	২২৵০	১৬৲
নয়নসুখ উৎকৃষ্ট	২২০০	,,	৩৩৷৷০	৩৩৲	২২৲
ঐ	২৫০০	,,	৩৫৲	৩৩৲	২৪৲
ঐ অত্যুৎকৃষ্ট	২৭০০	৪০×২।০	৫০৲	৫০৲	৩৫৲
তরন্দাম উৎকৃষ্ট	,,	,,	২০৲	২১৲	১৮৲
ঐ	,,	,,	৫৫৲	৬০৲	২৫৲

ঢাকায় ইংরেজবণিকগণের কুঠী স্থাপন—১৬৬৬ খৃঃ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকগণ ঢাকাতে বাণিজ্যকুঠী সংস্থাপন করেন (১)। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ১৬৬০ খৃঃ অব্দের পরে ১৬৬৬ খৃঃ অব্দ মধ্যে কুঠী সংস্থাপিত হইয়াছিল। কারণ ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে টেভারণিয়ার ঢাকায় ইংরেজকুঠী সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কিন্তু ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে কি তৎপূর্ব্বে কুঠী স্থাপিত হইলেও ১৬৬৮ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে উহা কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষীয়-গণের অনুমোদন প্রাপ্ত হয় নাই (২)।

ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কের পশ্চিমে, যে স্থানে ঢাকা কলেজের সুরম্য অট্টালিকা বিরাজমান রহিয়াছে, তথায় ইংরেজ কোম্পানীর কুঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে মিঃ প্রাট ঢাকা কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন।

একখানা ক্ষুদ্র একতল অট্টালিকা, তন্মধ্যে একটী সুপ্রশস্ত কক্ষ, এবং কর্ম্মচারী বর্গের বাসোপযোগী কয়েক খানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ

---

(১) "The English factory was started about the year—1666" Bowrey,

(২) In a letter to Hughly dated 24th Jany. 1668, the Court Comment on information received in the previous year that "Dacca is place that will vend much Europe Goods, and that the best Cossacs, mullmulls may then be procured." If the factory at Hughly were of opinion that the settling a factory at Dacca would result in a large sale of broad cloth they had liberty given them to send 2 or 3 fit persons thither to reside". Letter Book No 4.

এবং একটী কক্ষ লইয়াই উহা গঠিত হইয়াছিল (১)। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দে এই স্থানেই মেঃ আয়ার এবং ব্রাডিল নামক কোম্পানীর এজেণ্ট যুগল, সায়েস্তাখাঁর পরবর্ত্তী অস্থায়ী নবাব বাহাদুরখাঁ কর্ত্তৃক বন্দী অবস্থায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

১৬৭০ খৃঃ অব্দ হইতেই ঢাকায় ইংরেজদিগের ব্যবসায় ক্রমশঃ উন্নতির মুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে ; এবং কতিপয় বৎসর মধ্যেই উহা যথেষ্ট প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। তৎকালে কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ জনস্মিথ। তৎপরে মিঃ রবার্ট এলওয়াজ অধ্যক্ষপদ লাভ করেন।

১৬৭৫ খৃঃ অব্দে মিঃ এলওয়াজ ঢাকা নগরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সেমুয়েল হার্ব্বি ও ফিচ্ নিড্হাম নামক সাহেবদ্বয় সহকারী রূপে ঢাকার কুঠীর কার্য্য পরিচালনা করেন। ১৬৭৬ খৃঃ অব্দে মিঃ হার্ব্বি কাউন্সিলে যে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কুঠীর অট্টালিকাটী ব্যবসায়ের পক্ষে অনতিপরিসর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীর বেষ্টিত কুঠীটীর চারিদিকে এবং প্রাঙ্গণ মধ্যে কতিপয় পর্ণ কুটীর থাকায় অগ্নিদেবের অনুগ্রহ নিতান্ত সুলভ বলিয়া তদীয় আশঙ্কার বিষয় ও জ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ফলে কৌন্সিলের কর্ত্তৃপক্ষ ঢাকাতে সহস্র টাকার পণ্য সম্ভার রক্ষণোপযোগী ইষ্টক নির্ম্মিত একটী নাতি ক্ষুদ্র অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন (২)।

---

(১) Diary of Streynsham master under date 23rd Nov. 1676 p. 269 f.

(১) "The council did therefore order that brick buildings be forthwith erected to secure the Company's goods not exceeding one thousand Rupees for the year"—Bowrey.

সম্রাট ফেরোখসিয়ার ইংরাজ কোম্পানীর বাণিজ্যশুল্ক রহিত করিয়া দিলে, ১৭২৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৩০ খৃঃ অঃ মধ্যে ঢাকায় একটী সুপ্রশস্ত নূতন বাণিজ্যকুঠী নির্ম্মিত হইয়াছিল (১)। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ মধ্যে সমচতুষ্কোণাকার একটী অট্টালিকা, এবং শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অনেকগুলি পণ্যাগার এই সময়ে নির্ম্মিত হয়। প্রাঙ্গণ মধ্যেই কুঠিয়াল সাহেবগণের বাসোপযোগী একটী অট্টালিকা, শ্রমজীবিগণের কার্য্য করিবার গৃহ, গাঁট বাধিবার জন্য স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ, একটী আফিস কক্ষ, ভৃত্য ও সিপাহী শান্ত্রী গণের নিমিত্ত কয়েকখানা গৃহ, অবস্থিত ছিল।

কর্ম্মচারীগণের বেতন—কুঠীর অধ্যক্ষ ও তদীয় সহকারী বর্গ অতি সামান্য বেতন মাত্র প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু স্বীয় নামে স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবসায় করিবার অধিকারও তাহাদের ছিল। খোরাকী খরচ কোম্পানীই বহন করিতেন (২)।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দে যে সমুদয় ব্যক্তিবর্গের হস্তে ঢাকার কুঠীর ভার ন্যস্ত ছিল তাহাদিগের নাম, বয়স এবং বেতনাদির একটী তালিকা প্রদত্ত হইল (৩)।

নাম	আগমনের তারিখ	বয়স	বেতন	পদ।
রিচার্ড বিচার—	২।৮।১৭৪৩,	৩৫	৪০৲	কুঠীর অধ্যক্ষ
উইলিয়ম সামার—	২৫।১১।১৭৪৫,	২৬	৪০৲	Second at Dacca.

(১) History of Cotton Manufacture of Dacca Disrict.

(২) "A common table was maintained at the factory, at the expense of the Company".

(৩) See Appendix V. Pages 411 and 412 : Hill's Bengal Records vol. III.

লুক স্কে্ফটন—	২৫।৯।১৭৪৬	২৬	৩০৲	third at Dacca
টমাস হাইওম্যান—	১৬।৭।১৭৪৯	২৪	১৫৲	4th ,, ,,
সেমুয়েল ওয়ালার—	,, ,,	২৬	১৫৲	5th ,, ,,
জন কার্টিয়ার—	২৫।৯।১৭৫০,	২৪	১৫৲	সহকারী
জন জনষ্টন—	৯।৭।১৭৫১	২৫	৫৲	,,

১৭৬১ খৃঃ অব্দে ঢাকা কুঠীর খরচ ৫৭৬৬৬॥৶ হইয়াছিল। তন্মধ্যে বাটা ও ভাড়া এবং কর্ম্মচারীবর্গের খোরাকী বাবদে অর্দ্ধেকেরও বেশী খরচ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। সৈনিক বিভাগের খরচ, দরবার খরচ, নৌকাভাড়া, ভূমির রাজস্ব, কুঠী মেরামত প্রভৃতি বাবদে অবশিষ্ট টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল (১)।

---

(১)	বাটা ও ভাড়া —	—	—	২৫৫৯৩॥০
	খোরাকী খরচ—	—	—	৪৩৬৯।০
	গাড়ী ভাড়া ও ভূমির রাজস্ব	—	—	২৮১০৶০
	চাকরান মাহিয়ানা খরচ	—	—	৮৫৮৲
	সৈনিকবিভাগের খরচ	—	—	৮৬০॥৶০
	দরবার খরচ—			৯৩২৲
	কুঠীর প্রাঙ্গণ মধ্যস্থিত বাঙ্গালার খরচ		—	১৭৫২৵০
	মেরামতি খরচ—	—	—	১২৪১০।৶০
	তেজগাঁয়ের বাঙ্গালার খরচ	—	—	১০১৯।৶০
	ঐ মেরামতি খরচ	—	—	১১৬।৷৴০
	বজরা ও নৌকা ভাড়া	—	—	৯২৫৷৴০
	সাধারণ খুচরা খরচ	—	—	৪৯৪৬৷০
				৫৭৬৬৬।৶০

ঢাকায় ফরাসী কুঠী—ফরাসীগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশে আগমন করিলেও ১৭২৬ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ইহারা ঢাকায় বানিজ্য ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ ইহারা দেশীয় দালালগণের মধ্যস্থতায় দ্রব্যাদি খরিদ করিতেন, কিন্তু ১৭৪০।৪১ খৃঃ অব্দে যখন নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ ঢাকার নায়েব নাজিম পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন দুইজন ফরাসী দেশীয় এজেণ্ট ঢাকায় আগমন পূর্ব্বক এখানে বাণিজ্যকুঠী সংস্থাপনের অধিকার প্রাপ্ত হন। ইহারা ঢাকাতে একটী "গঞ্জ" বা বাজার খরিদ করিয়া উহা "ফরাসগঞ্জ" নামে অভিহিত করেন, এবং তেজগাঁও নামক স্থানে কতিপয় অট্টালিকা নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বানিজ্য আরম্ভ করেন। ঢাকার নবাব বাহাদুরের আসানমঞ্জিল প্রাসাদের প্রাঙ্গণ মধ্যস্থিত পুষ্করিণীর পারে ফরাসীদিগের বাণিজ্যকুঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দে নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতাস্থিত ইংরেজ কোম্পানীর কুঠী অধিকৃত হইলে ঢাকার কুঠীও নবাবের হস্তে পতিত হয়। এই সময়ে মেঃ বিচার, স্ক্রেফটন, হাইণ্ড্ম্যান, কার্টিয়ার, ওয়ালার, জনষ্টন, কাডমোর প্রভৃতি ইংরেজকর্ম্মচারীবর্গ এবং কতিপয় ইংরাজমহিলা ঢাকার ফরাসী কুঠীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। *

---

* উইলিয়ম সামার এই সময়ে কলিকাতায় ছিলেন। সুতরাং স্ক্রেফটন, হাইণ্ড্ম্যান, ওয়ালার, কার্টিয়ার, জনষ্টন, লেপ্টেনেণ্ট কাডমোর (ইনি ঢাকার সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন), উইলসন (কোম্পানীর ডাক্তার), শিশুপুত্র সহ মিসেস বিচার, মিসেস ওয়ার উইক, মিস হার্ডিং প্রভৃতিকে ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ মসিয়ার কার্টিনের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে ইংরেজগণ পণ্ডিচেরী অধিকার করিলে, ঢাকার ফরাসী কোম্পানীর কুঠীও ইংরেজ দিগের হস্তগত হইয়াছিল (১)। কিন্তু ১৭৮৩ খৃঃ অব্দের জনুয়ারী মাসের সন্ধির সর্ত্তানুসারে উহা প্রত্যর্পিত হয়। এই ঘটনার দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ইংরেজগণ উহা পুনরায় অধিকার করেন। কিন্তু আমিনের সন্ধি সর্ত্তে পুনরায় উহা প্রত্যর্পন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজগণ তৃতীয়বার ফরাসীকুঠী হস্তগত করিয়া ১৮১৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮১৫ খৃঃ অব্দে ফরাসীদিগকে উহা পুনরায় ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ফরাসীগণ অনন্যোপায় হইয়া ১৮৩০ খৃঃ অব্দে তাহাদিগের কুঠীটী, তেজগাঁয়ের বাড়ীগুলি, এবং ২৬খানা পর্ণকুটীরসমন্বিত ফরাসগঞ্জ বাজার বিক্রয় করিয়া ফেলিলেও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট অদ্যাপি ঢাকাতে তাহাদিগের স্থায়ী রাজকীয় অধিকার পরিত্যাগ করেন নাই (২)।

ওলন্দাজ কুঠী—ওলন্দাজগণ ১৬৬৬ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই ঢাকাতে বাণিজ্যকুঠী সংস্থাপন পূর্ব্বক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। বাবুর বাজারস্থ বর্ত্তমান মিটফোর্ড হাসপাতালের পশ্চিমোত্তর কোণৈক প্রান্তে ইহারা কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টেভারণিয়ার ইহাদিগের বাণিজ্যকুঠী সন্দর্শন করিয়া-

---

(১) এই সময়ে লেপ্টেনেণ্ট কাটই ঢাকায় ইংরেজদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়েই প্রভিন্সিয়াল কৌন্সিলের সেক্রেটারী মিঃ লজের আদেশানুসারে ফরাসীদিগের জগদীয়ার কুঠীও ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। জগদীয়ার কুঠী ঢাকা-কুঠীর অধীনস্থ একটী শাখা মাত্র ছিল।

(২) Vide History of the Cotton Manufacture of Dacca District.

ছিলেন (১)। ঐ সময়ে বিদেশীয় বণিকগণ মধ্যে ইহাদিগের প্রতিই বাণিজ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না ছিলেন। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ ১৬৭২ খৃঃ অব্দে সুবাদারের আদেশক্রমে ইহাদিগের অবাধ বাণিজ্যপ্রবাহ বাধা প্রাপ্ত হয়। ঐ সময়ে প্রকাশ্যভাবে ইহারা বাণিজ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু সুবাদারের আদেশের প্রতিকূলাচরণ করিয়া দেশীয় গোমস্তাগণের সাহায্যে গোপনভাবে ব্যবসায় চালাইতেও ক্ষান্ত হন নাই। ১৭৪২ খৃঃ অব্দের বহুপূর্ব্ব হইতেই ওলন্দাজগণ ঢাকার কুঠী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে ইহারা পুনরায় ঢাকাতে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৮১ খৃঃ অব্দে ওলন্দাজ-গণের বাণিজ্যকুঠী ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। ঐ সময়ে উহাদিগের বাণিজ্যকুঠীর অধ্যক্ষ ঢাকাতে ইংরেজ হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন (২)।

বস্ত্র ব্যবসায়ে দালাল— কোম্পানীর সমুদয় মালপত্রই দালালের মধ্যস্থতায় খরিদ হইত। নির্দ্দিষ্ট সময়ে মাল যোগাইবার জন্য কুঠীয়ালগণ ইহাদিগকে চুক্তিতে আবদ্ধ করিতেন। তন্তুবায়গণকে অগ্রিম দাদন দেওয়ার জন্য দালালেরা কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ হইতে দ্রব্যাদির আনুমানিক মূল্যের অর্দ্ধাংশ কি ততোধিক গ্রহণ করিত। চুক্তি রক্ষার জন্য দালালগণ যথেষ্ট পরিমাণে জামিন দিতে বাধ্য হইত (৩)।

মহামতি বার্ক লিখিয়াছেন "১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ঢাকার বাণিজ্য দেশীয় দালালগণের মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হইত। এই সময়ে তন্তুবায়দিগের

---

(১) "The Hollanders finding that their goods were not safe in the ordinary houses of Dacca, have built there a very fair house"—Tavernier's Travels Book I. Page 103.

(২) See History of the Cotton Manufacture of Dacca District.

(৩) See Grant's History of East India Coy. Page 67.

নিকটে দাদন বাবদে কোম্পানীর কিছুই প্রাপ্য ছিল না; কিন্তু ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে এই দাদনের টাকা অনেক পরিমাণে বাকী পরিয়া যায়। তন্তুবায়গণ এক বৎসরে যে পরিমাণ টাকার মাল যোগাইতে পারিবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা দাদন দেওয়া হইয়াছিল। এইপ্রকারে উহাদিগকে কোম্পানীর নিকটে দায়াবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল; ফলে, বিদেশী অন্যান্য কুঠীয়ালগণের এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের অন্তরায় ঘটিয়াছিল” (১)। এই প্রকারে ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায় ইংরেজ কোম্পানীর একচেটিয়া হইয়া উঠিল।

যাচনদার—কুঠীতে সমুদয় মাল একত্রিত করা হইলে যাচনদারগণ চুক্তি পত্রে উল্লিখিত আদর্শ বস্ত্রের সহিত উহা তুলনা করিয়া নির্ব্বাচন করিয়া দিত। উৎকর্ষাপকর্ষতা অনুসারে বস্ত্রগুলিকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সজ্জিত করিবার রীতি প্রচলন ছিল। দাদনে যে সমুদয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা হইত তাহার উপরে অন্যান্য যাবতীয় খরচ খরচা বাদে শতকরা ৮৲ হিসাবে, এবং নগদ খরিদা মালের উপরে শতকরা ৪॥৹ হিসাবে, লভ্য ধরিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইত। অন্যান্য খরচ শতকরা ৭।৹ টাকার কম পড়িত না (২)।

প্রাদেশিক সমিতি, ওয়েয়ার হাউসকিপার ও গোমস্তা--১৭৭৪ খৃঃ অব্দে একজন অধ্যক্ষ ও চারিজন সভ্য লইয়া ঢাকায় একটী প্রাদেশিক সমিতি সংস্থাপিত হইলে এতৎপ্রদেশের বাণিজ্য ও রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার ইহাদের হস্তে ন্যস্ত করা হয়। কলিকাতায় যে সমুদয় মাল রপ্তানি করা হইত তদ্বিষয়ের

(১) See Burkes works Vol. XI. Page 138.

(২) History of Cotton Manufacture of the Dacca District.

বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার জন্য একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ নিযুক্ত হইলেন। তাহার পদের নাম হইল "সব এক্‌স্‌পোর্ট ওয়েয়ারহাউস কিপার"।

ঢাকার রাজস্বাদি কলিকাতায় প্রেরণ করিবার রীতি তখন পর্য্যন্তও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলনা। উহা ঢাকা, লক্ষ্মীপুর, ও চট্টগ্রামের কুঠী সমূহের বস্ত্র ব্যবসায়ে খাটান হইত। এই সময়েই দালালের মধ্যস্থতায় ব্যবসায় করিবার প্রথা রহিত করিয়া উহাদিগের স্থলে প্রত্যেক আড়ংএ "গোমস্তা" নিযুক্ত করা হয়। আড়ংএ খাতা (Ware house) নির্ম্মাণের অনুষ্ঠানও এই সময়েই আরম্ভ হয়।

ঢাকার কুঠীতে মাল চালান দিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক আড়ংএর গোমস্তাগণ উহা "যাচাই" ও "বাছাই" করিয়া "খাতার" মধ্যে বোঝাই করিয়া রাখিত।

এই সময়ে জেসারাৎখাঁ ঢাকার নায়েব নাজিম পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ভারই ইহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। তিনি কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন; তাহাতে তন্তুবায়-দিগের উপরে আড়ংএর গোমস্তার সর্ব্বময় ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল।

নায়েব—১৭৭৪ খৃঃ অব্দে বিভিন্ন আড়ংএ "নায়েব নিযুক্ত করিয়া তন্তুবায়দিগের যাবতীয় মোকদ্দমার বিচার ভার ইহাদিগের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। রাজস্ব সংক্রান্ত মোকদ্দমাদি ব্যতীত একশত টাকার অনধিক দাবীর মোকদ্দমার বিচার ও ইহারা করিতে পারিতেন। দশ টাকা দাবীর মোকদ্দমায় ইহাদের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইত।

রেসিডেন্ট—কুঠীর বণিজ্যব্যবসায় সুচারু রূপে পরিচালনা করিবার জন্য ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে ঢাকা নগরীতে একজন রেসিডেন্ট

নিযুক্ত হন। ফলে দেশীয় গোমস্তাগণের অব্যাহত ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইল।

১৮০০ খৃঃ অব্দে ঢাকার রেসিডেণ্ট লিখিয়াছেন "আড়ংএর গোমস্তাগণের প্রতি আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল যে, নূতন চুক্তিপত্র লিখিত হইবার পূর্ব্বে তন্তুবায়গণ-সম্পর্কিত সমুদয় ব্যবস্থা তাহাদিগের সমক্ষে পঠিত হইবে; উহারা যে পরিমাণ বস্ত্র প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে যোগাইতে সক্ষম হইবে, তজ্জন্য প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে চুক্তিনামা লিখিয়া দিবে"। বৎসরান্তে একবার করিয়া তন্তুবায়গণের হিসাব নিকাশ করা হইত। চলিত হিসাব ঠিক রাখিবার জন্য উহাদিগের প্রত্যেকের নিকটেই একখানা করিয়া হাতচিঠা থাকিত। ১৮১৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্তই এই ব্যবস্থানুযায়ী সমুদয় কার্য্য চলিয়াছিল; ঐ সনেই ঢাকাস্থ কোম্পানীর কুঠীর বিলোপ সাধন হয়।

নবাবী আমলে বস্ত্রব্যবসায়ের প্রসারতা—১৭৫৩ খৃঃ অঃ ২৮৫০০০০৲ টাকার বস্ত্র বিক্রীত হইয়াছিল। ঢাকার কমার্সিয়েল রেসিডেণ্ট ১৮০০ খৃঃ অব্দে যে ইহার একটী তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করাগেল।

দিল্লীর বাদশাহের জন্য।

সাদা ও বুটাদার মসলিন এবং রৌপ্য খচিত বস্ত্র—১০০০০০৲ (আর্কটমুদ্রা)

মুর্শিদাবাদের নবাবের জন্য।

নবাব এবং তদীয় দরবারস্থ আমীর ওমরাহ-
বর্গের জন্য নানাবিধ বস্ত্র—　　৩০০০০০৲　　,,

জগৎশেঠের জন্য।

সূক্ষ্ম ও মোটা নানাবিধ বস্ত্র (ব্যবসায়ের জন্য)—১৫০০০০৲　　,,

তুরাণী দিগের জন্য।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ বন্দরে রপ্তানি হইত—	১০০০০০,	,,
পাঠান ব্যবসায়ীর জন্য।		
উত্তর পশ্চিম প্রদেশস্থ বন্দরে রপ্তানী হইত —	১৫০০০০,	,,
আরমানী ব্যবসায়ী।		
বসোরা, মোচা এবং জিদ্দা বন্দরে বিক্রয় করিবার জন্য—	৫০০০০০,	,,
মোগল ব্যবসায়ী।		
(ইহার কতকাংশ বঙ্গদেশে বিক্রিত হইত, অবশিষ্টাংশ বসোরা জিদ্দা ও মোচা বন্দরে বিক্রীত হইত)—	৪০০০০০,	,,
ইংরেজ কোম্পানী।		
ইউরোপে রপ্তানী হইত—	৩৫০০০০,	,,
হিন্দু ব্যবসায়ী।		
দেশে বিক্রীত হইত—	২০০০০০,	,,
ফরাসী কোম্পানী।		
ইউরোপে রপ্তানী হইত—	২৫০০০০,	,,
ফরাসী ব্যবসায়ী গণ।		
বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রয় করিবার জন্য—	৫০০০০,	,,
ওলন্দাজ কোম্পানী।		
ইউরোপে বিক্রয় করিবার জন্য—	১০০০০০,	,,

ইংরাজ শাসন সময়ে ঢাকার বস্ত্রব্যবসায়—১৭৬৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ড হইতে আনীত অর্থ দ্বারাই ইংরেজ কোম্পানী ঢাকার বস্ত্র ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ লাভ করিবার পরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। তখন উহারা প্রাদেশিক রাজস্ব হইতেই ব্যবসায়সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে ঢাকায় ইংরেজ কোম্পানীর বাৎসরিক মজুত মাল দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সময়েই বেসরকারী ব্যবসায়ী গণ এতদ্দেশীয় মুচ্ছুদীগণের নিকট হইতে মূল ধন গ্রহণ করিয়া বানিজ্য করিতে আরম্ভ করেন।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ইংরেজ কোম্পানী দশ লক্ষ টাকার এবং বেসরকারী ব্যবসায়ীগণ বিশলক্ষ টাকার বস্ত্র ঢাকা হইতে বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ১৭০২৮৯ পাউণ্ড (১৩৬২১৫৪৲) মূল্যের বস্ত্র এখান হইতে রপ্তানি হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ৭৭৬৪০ পাউণ্ড, বেসরকারী ইংরেজ বনিকগণ ৫৮৫৩৫ পাউণ্ড, এবং হিন্দু ও অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ ৩৪০৯৪ পাউণ্ড মূল্যের বস্ত্র রপ্তানি করেন। ১৭৯০ হইতে ১৭৯৯ অব্দের মধ্যে ঢাকা কুঠীর অধীনস্থ অন্যান্য আড়ং হইতে ১৩৬২৬০১৮৸৶৬ টাকার বস্ত্র খরিদ হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল।

১৭৮৭ খৃঃ অব্দে লাক্ষাসায়ারে ৪১টী মাত্র সূতার কল প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ঐ বৎসর ঢাকার শুল্কাগার হইতে ৫০০০০০০৲ টাকার (খরিদদর) বস্ত্র বিদেশে প্রেরিত হয়। এই সময়েই ঢাকার বস্ত্র শিল্প উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। ইহার পর হইতেই ঢাকায় বস্ত্র শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়।

ঢাকার মসলিনের ন্যায় নয়নানন্দকর সূচিকন মলমল বিলাতি কলে অদ্যাবধি ও প্রস্তুত হয় নাই। বোধ হয় হইবেও না। ডাক্তার ফরবেস ওয়াটসন বলেন—

"However viewed, therefore, our manufacturers have something still to do. With all our machinery and wondrous appliances, we have hitherto been unable to produce a fabric which for fineness or utility can equal the 'woven air' of Dacca, the products of arrangements which appear rude and primitive, but which in reality are admirably adapted for their purpose" (১).

বস্ত্র শিল্পের অবনতি—ঢাকার বস্ত্র শিল্পের সমৃদ্ধি গৌরব, প্রসারতা ও প্রতিপত্তি, ইউরোপীয় বণিককুলের ঈর্ষানল প্রদীপ্ত করিয়াছিল। ১৭০০ খৃঃ অব্দে সর্ব্বপ্রথমে জর্ম্মানীর অন্তর্গত পেইসলি সহরে ঢাকাই মসলীনের অনুকরণে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়াস আরম্ভ হইলেও ১৭৮১ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ইংলণ্ডে উহা সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলনা। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই তথায় বস্ত্র শিল্প প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। ১৭৮১ হইতে ১৭৮৭ খৃঃ অব্দ মধ্যে ইংলণ্ডের ব্যবসায় ২০০০০০০ পাউণ্ড হইতে ৭৫০০০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শিল্পোন্নতির অন্তরায়—বস্ত্র শিল্পের উন্নতি কল্পে ইংরেজগণ ১৮০০ খৃঃ অব্দে ভারতীয় বস্ত্র ইংলণ্ড হইতে দূরীভূত করিবার জন্য

---

(১) See A Hand-book of Indian products by T. N. Mukherjee published by J. Patterson.

আইন করিয়া নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। যে সমুদয় বস্ত্রাদির রপ্তানি নিষিদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে ঢাকাই মসলিন সম্পর্কীয় নিম্ন লিখিত দ্রব্যগুলি পড়িয়াছিল। মলমল, আবরোয়া, ঝুনা, রং, তারেন্দাম, তাঞ্জেব জামদানী, ডুরিয়া, এবং খাসা (১)।

১৮০১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে ঢাকাই মসলিনের উপর শত করা ৫৲ টাকা শুল্ক ধার্য্য হইয়াছিল; ইহাতে বঙ্গদেশে কোম্পানীর আয়ের পরিমাণ যথেষ্ঠ হ্রাস পাইলেও উহারা নিষিদ্ধ বস্ত্র সমূহ ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন না (২)।

টেইলার সাহেব তদীয় "টপোগ্রাফি অব ঢাকা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,"ইংরেজগণের বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্তির কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ঢাকার বস্ত্র শিল্পের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল বটে (৩) কিন্তু ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই ঢাকার বস্ত্র শিল্পে দারুন আঘাত লাগিয়াছিল। ঐ বৎসর ইংলণ্ডে প্রায় ৫ লক্ষ খণ্ড সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮০৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডীয় বস্ত্র শিল্পের সুবর্ণযুগ বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। কল কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে বস্ত্র শিল্পের ক্রমোন্নতি সাধিত হইতে লাগিল। শিশু শিল্প রক্ষা করিবার জন্য ইংরেজ গণ বিদেশীয় বস্ত্রের উপর শত করা ৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত কর নিদ্ধারিত করিয়াছিলেন। এত অধিক পরিমাণে শুল্ক দিতে হওয়ায় ঢাকার বস্ত্র

---

(১) See History of the Cotton Manufacture of Dacca District.

(২) Grant's History of the East India Company.

(৩) কিন্তু অজ্ঞাত নামা গ্রন্থকার এই সময়কেই ঢাকার বস্ত্রব্যবসায়ের "সুবর্ণযুগ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঢাকাই বস্ত্রশিল্পের অবনতি ১৮০১ খৃঃ অব্দের পরেই আরম্ভ হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে প্রস্তুত বস্ত্রাদির সহিত প্রতিযোগীতা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল। সুতরাং ঢাকার বস্ত্রশিল্প উত্তরোত্তর বিলুপ্ত হইতে লাগিল। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে ৩০ লক্ষ ঢাকার টাকাই মসলিন ইংলণ্ডে রপ্তানি হইত কিন্তু ১৮০৭ খৃঃ অব্দে উহা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ৮॥ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে মাত্র ৩॥ লক্ষ টাকার মসলিন বিলাতে রপ্তানি হইয়াছিল (১)।

স্যার জর্জ্জ বার্ডউড্ লিখিয়াছেন "১৭৮৫ খৃঃ অব্দে নটিংহাম নগরে সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হইলে ঢাকার মসলিন শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে ঢাকাই মসলিনের অনুকরণে ইংলণ্ডে ৫০০০০০ খণ্ড মোটা বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু লাঙ্কাসায়ার ও মাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়কুল তখন পর্য্যন্ত ও ঢাকার তন্তুবায়গণের সহিত প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে সমকক্ষ ভাবে দণ্ডায়মান হইবার সামর্থ্যলাভ করিতে পারে নাই। সুতরাং ইংলণ্ডের এই শিশু শিল্পের উন্নতি কল্পে, এবং শিল্পচাতুর্য্যে ঢাকার তন্তুবায়গণের সমকক্ষতালাভ করিবার জন্য, মসলিনের উপর শত করা ৭৫৲ টাকা কর সংস্থাপিত হইয়াছিল"। ফলে ইংলণ্ডে ঢাকাই মসলিনের কাটতি হ্রাস পাইতে লাগিল (২)।

ঢাকার এই প্রাচীন শিল্পের এবম্বিধ শোচনীয় পরিণাম লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রাণ মিল এবং বার্ডউড্ যে তীব্র কষাঘাত করিয়াছেন তাহা জগতের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

---

(১) Taylor's Topography of Dacca.

(২) Ibid.

মনস্বী বার্ডউড পার্লেমেন্টের এই আইনকে "১৭০০ সনের কলঙ্কর আইন" ("The scandalous law of 1700") বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

বণিকগণের মূলধন ৫৬০২০০৲ টাকার অধিক ছিল না। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে শুধু বাণিজ্য ২০৫৯০০৲ টাকার হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ঐ বৎসরে ইংরেজ কোম্পানী এতদতিরিক্ত টাকা ঢাকার বস্ত্রব্যবসায়ে ব্যয় করেন নাই।

ইংলণ্ডে ভারতীয় বস্ত্রের শুল্কহ্রাস—১৮২৫ খৃঃ অব্দে মিঃ হাস্‌কিসন ভারতীয় বস্ত্র শুল্ক হ্রাস করিয়া শতকরা ১০৲ টাকায় পরিণত করিলে ইংলণ্ডে ঢাকাই মসলিন অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা ঢাকার বস্ত্রশিল্পের আর উন্নতি সংসাধিত হইল না। এই অসাময়িক অনুগ্রহে ঢাকার মসলিন শিল্প উন্নতিলাভ করিতে পারিল না (১)। কারণ ইহার কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতেই বিলাতী সূক্ষ্ম সূত্র ঢাকায় প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতে ছিল। টেইলার সাহেব অতি দুঃখের সহিত বলিয়াছেন "অতীত ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি করিলে ঢাকার বাণিজ্যের ইতিহাস নিতান্ত শোচনীয় বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে" (২)। ত্রিংশৎ বৎসর কাল মধ্যেই ঢাকার বাণিজ্য একেবারে ধ্বংশমুখে পতিত হইয়াছিল; ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে।

দাদনে অত্যাচার—দাদন দিয়া কাজ করাইবার প্রথা বহুপূর্ব্ব হইতেই এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। নবাবী আমলেই এই প্রথার সূচনা হয়। কোম্পানীর কুঠীয়াল গণের হস্তে ইহার পরিপুষ্টি সাধন হইয়াছিল। অনেক সময়ে এই দাদনের ফলে তন্তুবায়কুল ঘোরতর অন্যায়রূপে নিপীড়িত হইত। অনেক বস্ত্রব্যবসায়ী ও

(১) "This boon came too late".—Clay.

(২) Taylor's Topography of Dacca.

রাজকর্ম্মচারী ৫০০৲ টাকা মূল্যের বস্ত্র ১০০৲ টাকা প্রদান করিয়াই গ্রহণ করিত। দাদন গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে তন্তুবায়দিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইত; এবং অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া দাদন গ্রহণ করিতে বাধ্য করিত। ধর্ম্মাধিকরণে সুবিচার লাভের প্রত্যাশায় তন্তুবায়কুল উপস্থিত হইলে সুফললাভ সুদূরপরাহত ছিল। বস্তুত এই দাদন ব্যাপারে তন্তুবায়কুলের প্রতি যেরূপ ভীষণ অত্যাচারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা মনে হইলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

উইলিয়ম বোল্টস্ তদীয় considerations on Indian affairs (1772 A. D.) নামক গ্রন্থে দাদনে অত্যাচার সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে তৎকালে শিল্পিগণ কিরূপ নিষ্ঠুর ভাবে প্রপীড়িত হইত। তিনি লিখিয়াছেন, "দেশের যাবতীয় শিল্প দ্রব্যই ইংরেজ কোম্পানীর হস্তে একচেটিয়া। কোন্ শিল্পিকে কতমাল, কিরূপ মূল্যে যোগাইতে হইবে তাহা কোম্পানীর স্বেচ্ছামতই স্থিরীকৃত হইত। এজন্য দালাল, পাইকার ও তন্তুবায় প্রভৃতিকে সিপাহীর সাহায্যে হাজির করিয়া মালের পরিমাণ, মূল্য ও মাল দিবার নির্দ্দিষ্ট সময় ইত্যাদি একখানা দলিলে আপনাদিগের সুবিধা মত সর্ত্ত উল্লেখে তাহাতে শিল্পিগণের স্বাক্ষর করিয়া লওয়া হইত। এজন্য শিল্পিগণের সম্মতি বা অসম্মতির অপেক্ষা করা হইত না। এই সময়ে তন্তুবায় প্রভৃতির হস্তে অগ্রিম কিছু টাকা বায়না স্বরূপ প্রদত্ত হইত। শিল্পি ঐ টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে তাহার বস্ত্রাঞ্চলে উহা বাঁধিয়া দেওয়া হইত। তৎপরে কাছারীর সিপাহীগণ চাবুক মারিতে মারিতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিত। অন্য কাহারও কাজ করিতে পারিবে না, এই সর্ত্তে অনেক

শিল্পিকে বাধ্য করিয়া তাহাদিগের সহিত কল্পনাতীত চাতুরী করা হইত। যে দরে তন্তুবায়দিগের নিকট বস্ত্রাদি ক্রয় করা হইত তাহা বাজারদর অপেক্ষা অনেক কম। ইহার উপর আবার যাচনদার দিগের সহিত যোগাযোগে উৎকৃষ্ট মালও অপকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা হইত। ফলে ইহার জন্য হতভাগ্য তন্তুবায়দিগকে শতকরা ৪০৲ টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইত। যে সমুদয় তন্তুবায় চুক্তিপত্রানুযায়ী মাল সরবরাহ করিতে অসমর্থ হইত, তাহাদিগের গৃহ ও গৃহজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ক্ষতিপূরণ লওয়া হইত। অনন্যোপায় হইয়া এই সময়ে বহুশিল্পি স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলী কর্ত্তন করিয়া কার্য্যে অক্ষমতাজ্ঞাপন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইত। এইরূপে অনেক শ্রেষ্ঠ শিল্পি বৃদ্ধাঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া চিরকালের জন্য মসলিনের ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল" (১)।

ঢাকায় বিলাতি সূতা আমদানী—১৮২১ খৃঃ অব্দে কলের সূতা সর্ব্বপ্রথমে এখানে আমদানী হয়। ১৮২৭ খৃঃ অব্দে ৩০৬৩৫৫৬ পাউণ্ড বিলাতী সূত্র ঢাকায় প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে আমদানীর মাত্রা দ্বিগুন হারে বর্দ্ধিত হইয়া ৬৬২৪৮২৩ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। ১৮২৮ খৃঃ অব্দ হইতেই কলের সূতা ঢাকার বাজারে একরূপ একচেটিয়া হইয়া যায়। বিলাতি সূতার আমদানীর ফলে চরকা ও টাকুর প্রস্তুত দেশী সূত্রের আদর দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। কারণ, দেশীয় সূত্র বিলাতী

(১) "They have been treated also with such injuries that instances have been known of cutting off their thumbs to prevent their being forced to wind silk.— W. Bolts. 1772.

সূত্রের সহিত প্রতিযোগীতায় স্পর্দ্ধা করিতে পারিত না। সুতরাং ইংলণ্ডে ঢাকাই মসলিনের শুল্ক হ্রাস পাইলেও কলের সূতা প্রচুর আমদানী হওয়ায় মসলিন শিল্প আর উন্নতিলাভ করিতে পারিল না।

এক সময়ে ঢাকা জেলা ইংলণ্ডের—ইয়োরোপের নগ্নতা দূর করিয়াছিল—আর আজ সমগ্রভারতবাসীকে ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়।

বিলাতী ও দেশী বস্ত্রের তুলনা জ্ঞাপক ১৮৩০ খৃঃ অব্দের মূল্য তালিকা প্রদত্ত হইল। (১)

	ঢাকায় প্রস্তুত	কলে প্রস্তুত।
১ নং ছোট বুটাদার জামদানী—	২৫৲	৮৲
২ নং „ „	১৬৲	৫৲
জামদানী মেছি পস	২৭৲—২৮৲	৬৲
(তেরছা বুনন) জামদানী		
(Jaconet Muslin ৪০॥০)—	১২৲—১৩৲	৪—৪॥০
১নং ও ২নং জঙ্গল খাস—	৩৮৲—৪০৲।২৪৲—২৫৲	২০৲—২২৲।৯৲—১০৲
নয়ন সুখ-৪০ × ২$\frac{২}{৪}$	৮৲—৯৲	৫৲—৬৲
Cambric (কাম্বিজ খাসা)—	১৩৲—১৪৲	৬৲—৯॥০
লাল অথবা আসমানী		
রঙ্গের জামদানী—	১৫৲—১৬৲	৪৲—৫৲
জামদানী সারি—	১২৲—১৩৲	৫৲—৫॥০
মলমল—	১০৲—১১৲	৭৲—৮৲
সলিম ৪৮ × ৩—	২৮৲—৩০৲	১০৲—১৫৲

---

(১) Asiatic Researches Vol XVII.

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যবসায়ের অবস্থা—মসলিন শিল্পের

এবম্বিধ শোচনীয় অধঃপতনের পরেও ঢাকায় প্রতি বৎসর প্রায় বিংশতি সহস্র মসলিন প্রস্তুত হইত। টেইলার সাহেবের গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৮৩৮ খৃঃ অব্দে ৮ তোলা ওজনের একখানা মসলিন তৎকালে ১০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত।

১৮২০ খৃঃ অব্দে ঢাকার জনৈক বস্ত্রব্যবসায়ী ১০॥ সাড়ে দশ তোলা ওজনের ১০গজ দৈর্ঘ্য ও ১গজ প্রস্থবিশিষ্ট দ্বিখণ্ড মসলিন চীনদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহার প্রত্যেক খানার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল ১০০৲। ১৮২২ খৃঃ অব্দে চীনদেশ হইতে পুনরায় উক্ত বস্ত্র ব্যবসায়ীর নিকটে দুই খানা তদনুরূপ মসলিনের জন্য লিখিত হইয়াছিল কিন্তু ইতি মধ্যে ঐ মসলিন নির্ম্মাতার মৃত্যু হওয়ায় উহা আর প্রেরিত হয় না (১)।

১৮২৩।২৪ খৃঃ অব্দে ঢাকার শুল্কাগার হইতে ১৪৪২১০১৲ টাকা মূল্যের বস্ত্র বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৮২৯।৩০ খৃঃ অব্দে ৯৬৯৯৫২৲ টাকার বস্ত্র বিক্রীত হয় (২)।

১৮৪৪ খৃঃ অব্দে যে পরিমাণ বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল (৩)।

---

(১) "In 1870, a Resident of Dacca, on a special orde received from China, procured the manufacture of two pieces of Muslin, each ten yds. long by one wide and weighing 10½ sicca rupees—The price of each piece was sicca rupees 100. In 1822, the same individual received a second Commission for two similar pieces, from the same quarter, but the parties who had supplied him on the former occassion had died in the mean time, and he was unable to execute the Commission". Asiatic Researches Vol XVII.

(২) Asiatic Researches Vol. XVII.

(৩) Ibid.

১।	দেশী ২৫০ নং ও তদূর্দ্ধ নম্বরের সূতায় নির্ম্মিত সূক্ষ্ম মসলিন দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, এবং নেপালের দরবারে ও দেশীয় জমীদার গণের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল—	৫০০০০৲
২।	বিলাতি ৩০ হইতে ১০০ নম্বরের সূতায় প্রস্তুত অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট মসলিন –	৫০০০০০৲
৩।	নিম্ন শ্রেণীস্থ জন গণের ব্যবহারোপযোগী ৩০ ও তন্নিম্ন নম্বরের দেশী সূতায় প্রস্তুত—	১৫০০০০৲
৪।	কার্পাস ও রেশম মিশ্রিত জরির কাজ করা বস্ত্র (জিদ্দা বন্দরে প্রেরিত হইত)—	২০০০০০৲
৫।	মসলিন, নেটের কাপড়, পশমী বস্ত্র, রুমাল জরীর ও রেশমী কাজ করা শাল প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্র—	৪৫০০০৲
৭।	সূতার বুটাদার বস্ত্র—	১০০০০৲
		৯৫৫০০০৲

১৮৯০ খৃঃ অব্দে কলিন্স সাহেব লিখিয়াছেন "যাহারা বিলাতী সূত্র-দ্বারা সাধারণ রকমের মসলিন প্রস্তুত করিতে পারে, এরূপ তন্তুবায় এখনও ঢাকাতে ৫০০ ঘর বিদ্যমান আছে এবং ২।১ টী পরিবারে এখনও ঢাকার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মসলিন প্রস্তুত হইতে পারে। কমিসনার পিকক সাহেবের বার্ষিক বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে "১৮৮৫ খৃঃ অব্দে নবাব স্যার আব্দুলগণি বাহাদুর প্রিন্স অব ওয়েলেসকে উপহার প্রদান

করিবার জন্য যে তিন খণ্ড মসলিন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ব-বিষয়ে প্রাচীন সূক্ষ্ম মসলিনের আদর্শানুরূপ হইয়াছিল। উহার প্রত্যেক খানার ওজন হইয়াছিল ৯।০ তোলা মাত্র। উহার এক এক খানা ২০ গজ দৈর্ঘ্য ও ১ গজ প্রস্থ বিশিষ্ট ছিল"।

১৮৭৯।৮০ খৃঃ অব্দে ৮০ হাজার টাকার মসলিন বিক্রীত হইয়াছিল। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ২০০০০৲ টাকার মসলিন প্রস্তুত হয় কিন্তু প্রায় ১০০০০৲ টাকার বস্ত্রই অবিক্রীত থাকে। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে মসলিন বিক্রয়লব্ধ ২৫০০০৲ টাকা ঢাকার তন্তুবায়গণের হস্তগত হইয়াছিল। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে এক সহস্র মুদ্রার এবং ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে পঞ্চ-সহস্র মুদ্রার মসলিন প্রস্তুত হয়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ১৫২৮০ টাকার মসলিন নেপাল দেশে নীত হয়। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে প্রায় ২৭০০০৲ টাকার মসলিন বিক্রীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

এখনও ৩৫০ নং ও ৪০০নং সূতাদ্বারা অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের মসলিন প্রস্তুত হইতে পারে। স্বদেশীআন্দোলনের ফলে ঢাকার বস্ত্রশিল্পের উন্নতি সংসাধিত হইলেও সূক্ষ্ম মসলিন শিল্পের উন্নতি হয় নাই।

উৎকৃষ্ট গোলাবতন সাড়ি বর্ত্তমান সময়েও প্রস্তুত হইতেছে। বালিয়াটি, ধামরাই, আবদুল্লাপুর প্রভৃতি গ্রামের তন্তুবায়গণই সাধারণতঃ উহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। ঢাকাই "ভিটির ধুতির" আদর এখনও রহিয়াছে।

শিল্প বাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার লোক সংখ্যাও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। ১৮০০ খৃঃ অব্দে ঢাকা সহরের অধিবাসীর সংখ্যা ২ লক্ষ ছিল বলিয়া জানা যায়। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে উহা ৬৮০৩৮ সংখ্যায় পরিণত হয়।

শিল্প সম্বন্ধে কয়েকটী কথা—ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় এ দেশের শিল্প এখানকার ও অন্য দেশের বাজারে বিক্রয় করিবার পক্ষে ব্যাঘাত অনেক। অবাধ বাণিজ্য ভারতের শিল্পোন্নতি ও শিল্প জাত দ্রব্য বিক্রয়ের প্রধান অন্তরায়। বৈদেশিক পণ্যের নিমিত্ত আমাদিগের দেশের দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের স্বদেশজাত পণ্য অপর দেশে ঐরূপ অবাধে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ইহাতে আমাদিগের দুই দিকেই ক্ষতি হইতেছে। বৈদেশিক আমদানী দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগীতা রক্ষার জন্য উহা যে মূল্যে বিক্রীত হয় তাহাতে লাভ অতি সামান্যই থাকে।

এতদ্দেশে স্বদেশী দ্রব্যের বিক্রয়াধিক্য ঘটাইতে হইলে অবাধ বাণিজ্যের পথ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করা অত্যাবশ্যক। যে সমুদয় স্থান শিল্প বাণিজ্যে আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তৎসমুদয় দেশেই প্রথমে স্বীয় শিল্পোন্নতির কামনায় বৈদেশিক পণ্যের উপর অত্যধিক মাশুল ধার্য্য করিয়া এবং আইন বিধিবদ্ধ করিয়া উহার আমদানী বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইংলণ্ডও যে এক কালে এইরূপে বিলাতে ঢাকার বস্ত্রশিল্পের আমদানী রহিত করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলে বিলাতি বস্ত্রশিল্প অচিরে উন্নতির পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রিন্স বিসমার্ক বলিয়াছিলেন' "বৈদেশিকেরা জার্ম্মানীর বাজার লুণ্ঠন করিতেছে, সুতরাং জার্ম্মান শিল্পিকুলের মঙ্গলবিধান জন্য অন্ততঃ কিছুদিন অবধি বাণিজ্যের দ্বার রুদ্ধ করা উচিত। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আমাদিগের হৃদয় বিচলিত হয় না, অভিজ্ঞতার উপরে আমার মত সংস্থাপিত। আমি দেখিতেছি, যে সকল দেশে আবাধ বাণিজ্য নাই, সে সকল দেশ সমৃদ্ধিশালী হইতেছে, পক্ষান্তরে যাহারা অবাধ বাণিজ্যের উপাসক,

তাহারা ক্রমে ধ্বংশের পথে অগ্রসর হইতেছে। অধিক কি, শক্তিশালী ইংলণ্ডও ক্রমশঃ অবাধ বাণিজ্যের মায়া কাটাইতেছেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিলাতি দ্রব্যের বিক্রয়ার্থ অন্ততঃ বিলাতের বাজার রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে পূর্ণ মাত্রায় রক্ষণী-নীতির অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা বৈদেশিক দ্রব্যের মাশুল কম করিয়া ক্ষয়গ্রস্ত রোগীর ন্যায় মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছি"।

এই বলিয়া প্রিন্স বিসমার্ক জর্ম্মানী দেশে অবাধ বাণিজ্যের বিলোপ সাধন করিয়াছিলেন। আজি জার্ম্মানীর শিল্প ও বাণিজ্য তাঁহার অভিজ্ঞতা ও দূর দর্শিতার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। ইংলণ্ডের সম্বন্ধেও তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় সফল হইয়াছে। কারণ, এক্ষণে বিলাতের একটী প্রধান রাজনীতিক দল অবাধ বাণিজ্যের বিলোপ সাধন করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। ভারতীয় শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থাতেও যে অবাধ বাণিজ্যের সঙ্কোচ নিতান্ত আবশ্যক, একথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন। ভূত পূর্ব্ব বড়লাট লর্ডমিণ্টো বলিয়াছেন "বৈদেশিক পণ্যের আমদানীর গতি প্রতিহত করিতে না পারিলে ভারতের শিল্পোন্নতি হইবে না"।

বিলাতের শিল্প ও শিল্পির স্বার্থের দায়ে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি একরূপ অসম্ভব হইয়াছে। পূর্ব্বে মাঞ্চেষ্টরের কার্পাস জাত দ্রব্যের উপর শতকরা ৫৲ টাকা শুল্ক আদায় করা হইত; কিন্তু কল ওয়ালাদিগের আপত্তিতে ঐ শুল্ক কমাইয়া ৩া॰ টাকা করা হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতজাত কার্পাস দ্রব্যের উপরে ঐ পরিমাণে চুঙ্গিকর বসিল।

শুল্কনীতির সংস্কার ব্যতীত ভারতীয় শিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই বিষয়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্ত পদ আবদ্ধ।

পার্লেমেন্টের কোনও দলই বিলাতী শিল্পিদিগের স্বার্থের প্রতিকূল কোনও ব্যবস্থার অনুমোদন সহজে করিতে পারেন না। কিন্তু আমাদের দেশীয় শিল্পের প্রতি ভারতগবর্ণমেণ্টের অনুরাগ কার্য্যতঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দেশীয়গণের উৎসাহ শত গুণে বর্দ্ধিত হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট দেশীয় দ্রব্যের সমাদর করিতেছেন সন্দর্শন করিলে সাধারণ লোকেও স্বভাবতঃই উহা ক্রয়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে।

রেলগাড়ী ও ষ্টীমারের মাশুলের হার হ্রাস করিলে দেশীয় দ্রব্য ভারতের নানা স্থানে প্রচলন করিবার যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারে।

এ দেশের খাল গুলির সংস্কার হইলে নৌকা যোগে অল্প ব্যয়ে মালপত্র চালান করিবার সুবিধা হইবে।

বস্ত্র ধৌত প্রণালী।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই মসলিন ও অন্যান্য সূক্ষ্মবস্ত্রধৌত কার্য্যে ঢাকা বঙ্গদেশের শীর্ষস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে ঐতিহাসিক আবুলফজল লিখিয়াছেন যে, সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত কাটার সুন্দর (কোঙরসুন্দর) গ্রামে একটী বৃহদায়তন দীর্ঘিকা আছে। উহার জল রাশি এরূপ স্বচ্ছ ও শুভ্র যে ইহাতে মলমলখাস বস্ত্র ধৌত হইয়া অপূর্ব্ব শুভ্রত্ব প্রাপ্ত হয় (১)। পূর্ব্বে এই দীর্ঘিকার চতুঃপার্শ্বে বহু সংখ্যক তন্তুবায় বাস করিত।

ঢাকা সহরের নারান্দিয়া নামক মহল্লা হইতে আরম্ভ করিয়া চারি মাইল দূরবর্ত্তী তেজগাও গ্রাম পর্য্যন্ত স্থান মধ্যে নানা স্থানে

---

১) "In the town of Catare soonder is a large reservoir of water which gives a peculiar whiteness to the cloths that are washed in it".

—Glad win's Translation of Aini Akbari P. 305.

ধোপা খানা আছে। এই স্থানের কূপজলও কোওর সুন্দরের স্বনাম প্রসিদ্ধ দীর্ঘিকার জলের অনুরূপ গুণ বিশিষ্ট (১)। তেজগাঁয়ে ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজদিগের বিস্তৃত ধোপাখানা ছিল (২)। অজ্ঞাত নামা গ্রন্থকার এই স্থানের কূপজলের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। ঢাকা সহরের অন্যান্য স্থানের কূপজল হইতে ঐ স্থানের কূপজলের স্বাদের বৈলক্ষণ্য আমরাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

সূক্ষ্ম মসলিন ধৌতকরা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সাধারণ বস্ত্রের ন্যায় ইহা "পাটে" আছড়াইতে হয় না। প্রথমে জলে সিদ্ধ করিয়া, পরে সাজিমাটি ও সাবান মিশ্রিত ক্ষারজলে নিমজ্জিত করিতে হয়। অতঃপর উহা শ্যামল দূর্ব্বাদল সমাচ্ছন্ন ক্ষেত্রে আস্তীর্ণ করিয়া রৌদ্র-তাপে শুষ্ক করা হয়। অর্দ্ধ শুষ্কাবস্থায় বস্ত্র গুলি একত্রিত করিয়া ফুটন্ত জলে নিক্ষেপ করতঃ "সিদ্ধ" করিয়া লইতে হয়। পরে উহা লেবু-রস-সিঞ্চিত স্ফটিক-স্বচ্ছ জল মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া কিয়ৎকাল রক্ষিত হইয়া থাকে।

কাঁটা করা—ধৌত করিবার সময়ে বস্ত্রের সূত্রগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া বিশৃঙ্খল হইলে পুনরায় যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে উহাদিগকে সজ্জিত করিয়া দেওয়ার নাম "কাঁটা করা"। মসলিন ও অন্যান্য ঢাকাই সূক্ষ্ম বস্ত্র যে ঢাকা সহর ব্যতীত ভারতের অন্য কোনও স্থানে উত্তমরূপে ধৌত হইতে পারে না, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অন্যত্র কোথাও কাঁটা করিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত নাই বলিয়াই তাহারা সূক্ষ্ম বস্ত্র ধৌত কার্য্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন

---

(১) History of the Cotton manufacture of Dacca District.

(২) Ibid and Taylor's Topography of Dacca.

করিতে সমর্থ হয় না। এই বিষয়টী ঢাকা জেলার বিশেষত্ব। এই ব্যবসায়ী দিগের সাধারণ নাম "নর্দ্দিয়া"।

রিফুগর—ধৌত করিবার সময়ে অথবা অন্য কোনও প্রকারে বস্ত্রের কোনও স্থানে ছিদ্র হইলে রিফুগরগণ ঐ ছিদ্রটীর মধ্যে সূত্র চালনা করিয়া এরূপ ভাবে মিলাইয়া দেয় যে তখন আর উহার অস্তিত্ব নিরূপণ করিবার উপায় থাকে না। টেইলার সাহেব লিখিয়াছেন "an expert ruffoger can remove a thread the whole length of a web of muslin, and replace it with one of a similar quality" (১)। তিনি ঢাকার রিফুগর দিগকে অহিফেন সেবী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অহিফেনের নেশায় বিভোর হইলেই নাকি ইহারা খুব ভাল কাজ করিতে পারে। বর্ত্তমান সময়েও ঢাকায় রিফুগরদিগের সংখ্যা কম নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা টেইলার সাহেবের উক্ত মন্তব্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিতে অক্ষম।

দাগধোপী—মসলিন অথবা অন্যান্য সূক্ষ্ম বস্ত্রে কোনও প্রকার দাগ পড়িলে ইহারা তাহার বিলোপ সাধন করিতে সমর্থ হয়। লৌহ অথবা তদ্‌গুণ বিশিষ্ট কোনও পদার্থের সংযোগে উহাতে দাগ পড়িলে "আম্বলিপাতার"রস, ঘৃত, লেবুর রস ও সাজিমাটির জল দ্বারা ধৌত করিয়া দাগধোপীগণ ঐ চিহ্নের অপনোদন করিয়া থাকে।

কুমদীগর—যে সমুদয় শ্রমজীবি শঙ্খ দ্বারা বারম্বার বস্ত্র মার্জ্জনা করিয়া উহার উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিয়া থাকে তাহারা "কুমদীগর" নামে পরিচিত। একখানা শক্ত তিন্তিরি বৃক্ষের কাষ্ঠো-

(১) Dr. Taylor's Topography of Dacca, page 176.

পরি বস্ত্র খণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক শঙ্খ সহযোগে উহা মার্জ্জিত হয়। এই সময়ে ঐ বস্ত্র খণ্ডের উপরে ভাতের মাড় দেওয়া হইয়া থাকে।

কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলের কমলার প্রিয়পুত্রগণ ঢাকাই শঙ্খকরা বস্ত্রের যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন।

ইস্ত্রী কার্য্য—ইহা বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে, সুতরাং পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক।

(খ) সীবন।

সূচীকর্ম্মের জন্য বোগদাদ নগরী চিরপ্রসিদ্ধ। অনেকে অনুমান করেন বোগদাদ নগরী হইতেই সূচীকর্ম্ম প্রথমতঃ ঢাকা সহরে প্রচলিত হইয়া ক্রমে ভারতের অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মোসলমানগণই এই শিল্পোন্নতির মূল। তাঁহারাই ইহার শিক্ষাদাতা। ১৫৪০ খৃঃ অব্দে সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে ভারতবর্ষ হইতে সূচ প্রস্তুত প্রণালী সর্ব্ব প্রথমে ইংলণ্ড দেশে প্রচারিত হয় (১)। ভারতে যে কোনও কালে সূচ প্রস্তুত হইত তাহা আজ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয় না কি?

অতি পূর্ব্বে বসোরা নগর হইতে ঢাকাতে সূচের আমদানী হইত। মসলিনের ন্যায় সূক্ষ্ম বস্ত্রোপরি সূচী কর্ম্ম করিবার জন্য যে সূচ ব্যবহৃত হইত তৎকালে তাহা বসোরা ব্যতীত অন্যত্র সুলভ ছিল না।

"রিফুগরী," "জরদজী," "চিকনকরি," বা "চিকন্দজাল," "কসিদা" প্রভৃতি নানাবিধ সূচীকর্ম্মের বিষয় অবগত হওয়া যায়।

---

(১) "The manufacture of needles introduced into England from India in 1540 during Elizabeth's time,"—Act of Needle Work page, 354.

জরদজী—এই শিল্প ঢাকা নগরীতে বহুকাল হইতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে Abbe de Guyon বলিয়াছেন, "সুবর্ণ ও রৌপ্য খচিত জরাই এবং রেশমী কারু কার্য্য সমন্বিত নানাবিধ উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি, জরাই গলাবন্ধ এবং মসলিন ঢাকা হইতেই ফরাসী দেশে নীত হইয়া থাকে" (১)।

মসলিন, পশমীশাল, রুমাল প্রভৃতি বস্ত্রের উপরে রেশম এবং স্বর্ণ অথবা রৌপ্যসূত্র দ্বারা নানাপ্রকার নয়নলোভন সুন্দর কারু কার্য্য সম্পন্ন হইত। জরাই কাজ নানাবিধ। মসলিন অথবা সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ডোপরি স্বর্ণ ও রৌপ্য সূত্র অথবা বাদলা দ্বারা কারু কার্য্য সম্পাদিত হইলে উহা "গোলাবতন" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। টুপীর উপরে এবম্বিধ কারুকার্য্য করা হইলে উহা "গম্বু" নামে পরিচিত হয়। শিরস্ত্রাণ, চর্ম্মপাদুকা, ফরসীর নল প্রভৃতির উপরে ঐ প্রকার কারুকার্য্য থাকিলে তাহা "সলমা" নামে অভিহিত হয়। এতদ্ব্যতীত সুবর্ণসূত্র জড়িত লেস এবং brockade প্রভৃতিতেও এবম্বিধ কারুকার্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার সাধারণ নাম "বুনন"।

যে আদর্শে কারুকার্য্য করা হইবে তাহা প্রথমতঃ একখানা মসীবিমণ্ডিত কাষ্ঠফলকে পেন্সিল দ্বারা অঙ্কিত করা হয়; উহাকে "নকাসী" করা বলে।

Penant সাহেব জরদজী কার্য্যের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। সাধারণ কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র খণ্ডের উপরে এরূপ আশ্চর্য্য কারু কার্য্য করা হয় যে উহা রেশম নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম জন্মে (২)।

---

(১) See Histore des Indes Orientals. Par M. L. Abbes Guyan Vol II page 30.

(২) See Penant's View of Hindusthan Vol II. page 340.

ঢাকার কারুকার্য্যসমন্বিত বস্ত্র ইউরোপখণ্ডেও যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে প্রায় এক সহস্র খণ্ড জরাই কাজ করা বস্ত্র ঢাকাতে প্রস্তুত হয়; তন্মধ্যে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জন্যও কয়েক খানা নীত হইয়াছিল।

চিকন করি বা চিকন্দজান—মসলিন বস্ত্রের উপরে কার্পাস সূত্রের কারুকার্য্য এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মোসলমানগণের পোষাকপরিচ্ছদেই এবম্বিধ কারুকার্য্য সমধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

কাপড়ের উপর ফুলতোলা ও বুটাতোলার নামও চিকণ। সহিষ্ণুতা ও সূক্ষ্ম কার্য্যে নৈপুণ্য থাকায় এ দেশীয় লোকে অতি অল্পায়াসেই চিকণ শিক্ষা করিতে ও উহাতে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয়। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতার মধ্যেও আজ পর্য্যন্ত ঢাকার কসিদা, জামদানী, কারচব প্রভৃতি বস্ত্র স্বীয় পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সচরাচর কার্পাস সূত্র, রেশম, উর্ণা, অথবা স্বর্ণ, রৌপ্যাদির তার প্রভৃতিই এই কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সূত্রাদিও যথাসাধ্য সুরঞ্জিত করিয়া লইতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন জমির উপর ভিন্ন ভিন্ন সূত্রাদি দ্বারা কাজ করাতে উহাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। যথা, কারচব, জামদানী, ঝাপন, চারখানা, মুগা, কসিদা ইত্যাদি।

রেশমী ও পশমী বস্ত্রে কার্পাস সূত্র ব্যতীত ঐ সকল দ্রব্য দিয়াও সূচীকার্য্য সম্পন্ন হয়। স্বর্ণ রৌপ্যাদির তার ও রেশম সূত্র জড়াইয়া একরূপ সূত্র হয়। উহাকে চলিত ভাষায় "গোলাবতন" বলে। সূচী কার্য্যে ইহারই বেশী ব্যাপার।

অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে স্বর্ণ রৌপ্যের কাজ থাকিলে তাহাকে

"কারচিকা" বলে। সূতার কাপড়ের উপর সোণারূপার কাজের নাম কামদানি।

কসিদা—ইহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

(গ) রঞ্জন শিল্প।

কুসুম ফুল ও নীলের চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জন শিল্প এতদ্দেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। লাল, নীল, বাসন্তি, হরিদ্রা, সবুজ ও কাল প্রভৃতি রং দ্বারাই বস্ত্রাদি সাধারণতঃ রঞ্জিত হইয়া থাকে। কসিদা ও অন্যান্য বস্ত্রের উপরে ছাপ মারিয়া রং করা হইত। যে শ্রেণীর লোক এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে তাহাদিগকে "চিপিগর" বলে। ক্ষুদ্র কাষ্ঠ ফলকে নানাবিধ কারুকার্য্য করিয়া তাহা দ্বারা বস্ত্রাদিতে ছাপা দেওরা হইত। ধার্ম্মিক হিন্দু ও মোসলমান গণের ব্যবহারের নিমিত্ত "নামাবলি" এবং "কুফন" প্রভৃতি অদ্যাপি প্রস্তুত হইয়া থাকে (১)।

(ঘ) কার্পাস সূত্রশিল্প।

ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণ প্রধান দেশে তূলাই পরিচ্ছদের একমাত্র প্রধান উপাদান। এজন্য হিন্দুরাই সর্ব্বাগ্রে তূলা হইতে সূত্র নির্ম্মাণ ও বস্ত্রবয়ন করিতে শিখিয়াছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অধিকাংশ দেশের লোকেই এক সময়ে ভারতবাসীর নিকট এই শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রাচীন শিল্প বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

---

(১) ভগবানের নাম এবং দশ মহাবিদ্যার স্তোত্রাদি সম্বলিত বস্ত্র "নামাবলি" নামে সুপরিচিত।

কোরাণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোকাবলি যে বস্ত্রে ছাপ হয় তাহার নাম "কুফন"।

দিল্লীর সম্রাটগণের পুরমহিলাগণের ব্যবহারের জন্য যে সূক্ষ্ম মসলিন ঢাকাতে প্রস্তুত হইত তাহার আদর্শ সূত্র এত সূক্ষ্ম হইত যে ঐরূপ দেড়শত হস্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একগাছা সূত্রের ওজন একরতির অধিক হইত না (১)। সোনারগাঁও অঞ্চলে ঐরূপ ১৭৫ হস্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একগাছি সূত্রের ওজন একরতি মাত্র হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায় (২)। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে একপোয়া পরিমিত কার্পাস হইতে উৎপন্ন একযোড়া সূত্রের দৈর্ঘ্য [illegible]০ মাইল হইয়াছিল বলিয়া অজ্ঞাত নামা গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন (৩)। কিন্তু ১৮০০ খৃঃ অব্দে একরতি ওজনের ১৪০ হস্ত দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট সূত্র অপেক্ষা সূক্ষ্মতর সূত্র তৎকালে প্রস্তুত হইত না (৪)।

কলে নির্ম্মিত সূত্র অপেক্ষা ঢাকার কার্পাস সূত্র কোমলতর হইলেও বিলাতি বস্ত্র অপেক্ষা ঢাকাই ধুতি ও মসলিন অধিকতর মজবুদ।

অতি সূক্ষ্ম মসলিন নির্ম্মাণোপযোগী একতোলা পরিমাণ সূত্র প্রস্তুত করিতে প্রায় একমাস কাল অতিবাহিত হইত। উহার মূল্য প্রতি তোলা ৮৲ টাকা পর্য্যন্ত হইত।

---

(১) History of the Cotton manufacture of Dacca District.

(২) Ibid.

(৩) Ibid.

(৪) Ibid. Sir Charles Wilkins সাহেব বিলাতের মিউজিয়মে ঢাকার মসলিন নির্ম্মাণোপযোগী সূত্রের নমুনা প্রেরণ করিয়াছিলেন ; Sir Joseph Baubs কর্ত্তৃক উহার ওজন এবং দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হইলে প্রতি পাউণ্ডে উহা ১১৫ মাইল ২ ফার্লং ৬০ গজ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল।

See Baine's History of Cotton manufacture.

স্বাভাবিক শৈত্য ও জলীয় বাষ্প প্রধান স্থানে সূতা কাটিলে আঁশ নরম হওয়ায় শীঘ্র বাড়িয়া পড়ে বলিয়া ঢাকা অঞ্চলের তন্তুবায়গণ অতি প্রত্যুষে অরুণোদয়ের পূর্ব্বে এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। বায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হইলে, চরকার নীচে জল রাখিয়া কার্য্য করে; তাহাতে বায়ু জলসিক্ত হইয়া তুলার আঁশকে নরম করিয়া দেয়। তৎপরে প্রাতে ৯টা কি ১০টা পর্য্যন্ত উহারা মধ্যম রকমের সূতা কাটে; অপরাহ্নে ৩টা কি ৪টার সময় হইতে সূর্য্যাস্তের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূতা কাটা হইয়া থাকে।

ডাঃ ওয়াটসন ঢাকাই, ফরাসী, ও ইংলণ্ডীয় মসলীন সূতা অনুবীক্ষণ যোগে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ইউরোপে যত প্রকার সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার সমুদয় গুলি অপেক্ষাই ঢাকাই মসলীনসূতার ব্যাস অনেক কম (১); এবং ইউরোপীয় সূতা অপেক্ষা প্রত্যেক ঢাকাই সূতার আঁশও (Filaments) অনেক পরিমাণে কম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঢাকাই সূতার আঁশের ব্যাস (diameter of the ultimate filaments or fibres) ইয়ুরোপে প্রস্তুত সূতার তুলা অপেক্ষা অনেক বড়। এই দুইটী কারণে সূক্ষ্মতায় ও দৃঢ়তায় ঢাকাই সূতা অন্যান্য দেশের সূতাকে পরাস্ত করিয়াছে (১)। আরও একটী বিশেষত্ব এই যে, তুলার আঁশ মোটা হওয়ায় এবং সূতা চরকায় কাটা হয় বলিয়া প্রতি ইঞ্চি সূতার পাক বেশী হয় (২)।

---

(১) The Textile manufacture and Costumes of the people of India by F. Watson, 1866.

(২) "These causes—Combined with the ascertained result that the number of twist in each of length in the Dacca yarn

ওয়াটসন লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বে যে মসলিন প্রস্তুত হইত, তাহার সূতা বিলাতী মসলিন অপেক্ষা দৃঢ় হইলেও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। কারণ, তৎকালে এখানে টাট্‌কা কার্পাস আনিয়া যে সূতা প্রস্তুত হইত তাহা ইংলণ্ডের যন্ত্রনিষ্পিষ্ট কার্পাসসূত্র হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট। ভারতীয় বস্ত্রের উৎকৃষ্ট খ্যাতি কেবল মাত্র এখানকার তন্তুবায়গণের যত্নে ও কার্য্যকুশলতায় ঘটিয়াছে বলা যাইতে পারে। ঢাকার তন্তুবায়গণ সূতা পাট করিতে জানে। এই কারণেই তাহাদের বস্ত্রবয়ন খ্যাতি আজিও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে" (১)। বস্তুতঃ ঢাকার তন্তুবায়গণ এরূপ অধ্যবসায় ও ধীরতা সহকারে প্রত্যেকটী সূতা স্বতন্ত্র ভাবে খৈএর মণ্ড সহযোগে পাট করে যে তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়।

চরকা ও ডলনকাঠীর সাহায্যেই ঢাকার সূতা কাটা হইত। চরকা দ্বারা অপেক্ষাকৃত মোটা দ্বিতীয় শ্রেণীর সূতা এবং ডলন কাঠী দ্বারা অতি সূক্ষ্ম মসলিনের সূতা প্রস্তুত হয়। ভোগা জাতীয় তুলায় উৎপন্ন ৩০ নম্বর ও তন্নিম্নশ্রেণীর সূতাই চরকায় কাটা হইয়া থাকে। উপরের শ্রেণীর সূতা প্রস্তুত করিতে হইলে "টাকুয়া" ও "ডলন-কাঠী"র সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। অতি সূক্ষ্ম ১০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট একটী পরিষ্কার লৌহ শলাকায় (সূচের ন্যায়) নিম্নতম অংশে এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থান রাখিয়া তথায় একটী ক্ষুদ্র মৃৎগোলক সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। এই যন্ত্রটীর নামই "ডলনকাঠী"।

---

amounts to 110 and 80·7, while in the British it was only 68·8 and 56.6, not only account for the durability of the Dacca over the European fibre"—Balfour's Cyclo, India.

(১) The Textile manufactures and Costumes of the people of India 1866.

কর্দ্দমসংযুক্ত নরম মৃত্তিকার ঢিপির উপরে একটী ভগ্ন কড়ি অথবা কবুতর কি কচ্ছপডিম্বের খোসা সংস্থাপন পূর্ব্বক টাকুয়ার নিম্নাগ্র ভাগ উহাতে ঈষৎ বঙ্কিমভাবে রক্ষা করিয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে উহা ঘুরাইতে হয়; এবং বাম হস্তে তুলার পাজদ্বারা টাকুয়ার অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমশঃ পাজটী উপরের দিকে উঠাইতে হয়। এরূপ করিলেই তুলার আঁশ হইতে সূতা প্রস্তুত হইতে থাকে।

প্রথমতঃ তুলা উত্তম রূপে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। অতঃপর চরকা ও ডলনকাঠীর সাহায্যে ভোগা জাতীয় অপকৃষ্ট তুলা এবং ডলনকাঠীর সাহায্যে উৎকৃষ্ট মসলীন নির্ম্মাণোপযোগী সূতার তুলা পরিষ্কৃত করিতে হয়। তুলা পরিষ্কৃত করা হইলে পরে উহা "পিঞ্জিতে" হয়।

ক্ষুদ্র বংশদণ্ড নির্ম্মিত ধনুকে পশ্বাদির নাড়ীর সূক্ষ্ম তার অথবা মুগার সূক্ষ্ম সূত্র সংযোগ করিয়া উহার ছিলা প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। এই যন্ত্র সাহায্যে তুলা ধুনিতে হয়। তুলা ধুনিবার পূর্ব্বে উহা আঁচড়াইয়া লওয়া হয়। বোয়াল মৎস্যের জোয়ালের হাড় দ্বারা আঁচড়াইবার যন্ত্রটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। জোয়ালের হাড়ে বোয়াল মৎস্যের যে ক্ষুদ্র দন্তপাটিকা আছে তাহা তুলা আঁচড়াইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া তন্তুবায়গণ বলিয়া থাকে।

"ধুনা" হইয়া গেলে তুলার "পাঁজ" চিতল অথবা কুচিলা মৎস্যের শুষ্ক খোসার মধ্যে জড়াইয়া রাখিতে হয়। সুতরাং তুলায় ধূলা অথবা শৈত্য লাগিতে পারে না।

সাধারণতঃ অষ্টাদশ হইতে ত্রিংশৎ বৎসর বয়স্কা হিন্দু রমণীগণই সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মাণ করিতেন। ত্রিংশৎ বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই তাহাদিগের

ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। প্রভাতসময় এবং অপরাহ্ন কালই সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মাণের উপযুক্ত সময়। বায়ুর শৈত্য হ্রাস প্রাপ্তি ঘটিলেই সূত্র ছিন্ন হইবার আশঙ্কা। ধীর, স্থির প্রফুল্ল ও একনিষ্ঠ চিত্ত না হইলে সূক্ষ্ম সূত্র নির্ম্মিত হইত না (১)।

সূতা পাট করণ। যে সূতায় তানা প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা দিবসত্রয় পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখিতে হয়। এই সময়ে প্রত্যহই ঐ জল পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। চতুর্থ দিবসে সূতার মোড়াগুলি জল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক উহার মধ্যে দুই খানা ক্ষুদ্র যষ্টিখণ্ড রাখিয়া ঐ যষ্টিদ্বয়ের সাহায্যে মোড়াগুলি ভালরূপে নিংড়াইয়া লইয়া পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। কয়লার গুড়া, গৃহধূম, অথবা ভাতের হাড়ির কালী, জলে মিশ্রিত করিয়া ঐ জলে পূর্ব্বোক্ত শুষ্ক সূত্রগুলি পুনর্ব্বার দুই দিন পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিতে হয়। অতঃপর পরিষ্কার জল দ্বারা উহা ভালরূপে ধৌত করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লওয়া আবশ্যক। সূতাগুলি নাটাইয়া আবার একদিন পর্য্যন্ত উহা জলে রাখিতে হয়। পরে ঐ সূতা ভালরূপে নিংড়াইয়া একখানা কাষ্ঠখণ্ডের উপরে সাজাইয়া রাখে। খুব পরিষ্কার চুণ, জলে মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে খৈ ভিজাইয়া মণ্ডের ন্যায় প্রস্তুত করিতে হয়। সূতাগুলি ঐ মণ্ডে উত্তমরূপে মাখাইয়া লওয়া আবশ্যক। পরে এক একটী করিয়া সূতা নাটাইতে হয়। নাটাইবার সময়ে লক্ষ্য রাখা উচিত যেন, একগাছা সূতা অপর একগাছার গায়ে না লাগে। নাটাইয়ের সূতাগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইতে হয়।

---

(১) "The cause of the perfection of Muslin manufacture of India must be sought for the exquisitely fine organisation of the natives of the East. Their temperament realizes every feature of that described under the title nervous by physiologists".—Dr. Ure.

পরেনের সূতাগুলি বয়নের দুই দিবস পূর্ব্বে ঠিক করিয়া লইতে হয়। একদিনে যে পরিমাণ সূতার কাজ হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা একদিন জলে ভিজাইয়া রাখা আবশ্যক। পরে ভালরূপে নিংড়াইয়া লইতে হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে সামান্যরূপে পাট করিয়া লইলেই হইল।

সবনম মসলিনের সূতা পাট করিবার সময়ে খৈএর মণ্ডের সহিত অতি অল্প পরিমাণে গৃহধূম মিশ্রিত করিয়া লওয়া হয়। সুতরাং সূত্রগুলি ঈষৎ কালবর্ণে পরিণত হয়। এজন্যই তন্তুবায়গণ সবনম শব্দে অর্দ্ধ কৃষ্ণবর্ণ অথবা "গোধূলি" বুঝিয়া থাকে। (১)

তানা অপেক্ষা পরেনের সূতা সূক্ষ্মতর। মসলিনের মুখপাত সূক্ষ্মতম সূতায় প্রস্তুত হয়। শেষভাগের সূতা অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের, মধ্যের দিকে আরও একটু মোটা সূতা ব্যবহৃত হয়।

বিলাতীসূতা—১৮২৪ খৃঃ অব্দে ঢাকায় বিলাতী সূতার আমদানী আরম্ভ হইলে এখানকার সূত্রশিল্পের অবনতি ঘটে। বিলাতীসূতার সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী সূত্র অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারিল না। সুতরাং দিন দিন উহা ক্ষয়গ্রস্ত রোগীর ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। টেইলার সাহেব তদীয় 'টপোগ্রাফি অব ঢাকা' নামক গ্রন্থে দেশী ও বিলাতী সূত্রের মূল্যের তারতম্য প্রদর্শন পূর্ব্বক যে একটী তালিকা প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

---

(১) "The starch used for shenen Muslins is mixed with a small quantity of lamp black, and hence the name shibnem signifying "halfdark" or twilight according to the weaver's interpretation."—Taylor's Topography of Dacca. Page 175.

সুতার নম্বর।	দেশী সুতার ওজন।	বিলাতী সিকিমোড়া সুতার মূল্য।	দেশী সিকিমোড়া সুতার মূল্য।
২০০নং	১ তোলা	৶০	৸৵০
১৯০নং	১ ৴১৮	৵১৫	॥৵০
১৮০নং	১ ৴১৫	৵১৫	।৵০
১৭০নং	১৵১৬	৵১০	।৴০
১৬০নং	১।০	৵১০	।০
১৫০নং	১।৴৭	৵১০	৶১০
১৪০নং	১।৵১৭	৵৫	৶০
১৩০নং	১॥ ১২	৵৫	৶০
১২০নং	১॥৵১৩	৴১৫	৵১৫
১১০নং	১৸৴৫	৴১৫	৵০
১০০নং	২	৴৫	৵০
৯০নং	২ ৶১১	৴৫	৴১৫
৮০নং	২॥০	৴৫	৴১৫
৭০নং	২৸০	৴১।০	৴১৫
৬০নং	৩।৴৫	৴২॥	৵০
৫০নং	৪	৴৫	৵০
৪০নং	৫	৴৭॥	৵০
৩ নং	৬॥৵০	৴১০	৵০

বিক্রমপুর, সোনারগাঁও ও ধামরাই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ রমণীগণ অতি উৎকৃষ্ট পৈতার সূতা কাটিতে পারিতেন। উহার এক একটী পৈতা এলাচীর খোসার মধ্যেও ভরিয়া রাখা চলিত। এই শিল্পটীরও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে। তৎকালে ঘরে ঘরেই চরকার প্রচলন ছিল। প্রবাদ এই যে, এই দেশে বিলাতী সূতা চালাইবার জন্য কোম্পানীর লোকে সেই সময়ে অনেকের চরকা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল, কোথায়ও চরকার উপর গুরুতর কর ধার্য্য করা হইয়াছিল। এই প্রবাদ সত্যমূলক কিনা তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না; কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দুর্ল্ভ নহে (১)।

(ঙ) তাঁত।

ঢাকাতে তাঁত কলের উন্নতি সংসাধিত হয় নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে প্রণালীতে বস্ত্রবয়ন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে সেই প্রথার উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই।

ঢাকার স্বনাম প্রসিদ্ধ প্রথ্যাতনামা মনীষী স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহোদয় উন্নত প্রণালীর একটী তাঁত প্রস্তুত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু উহা সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

---

(১) "Francis Carnac Brown had been born of English parents in India and like his father had considerable experience of the Cotton industry in India. He produced an Indian Charka or spinning wheel before the select Committee and explained that there was an oppressive Moturfa tax which was levied on every charka, on every house, and upon every implement used by artisans: The tax prevented the introduction of saw-gins in India"—India in the Victorian Age P. 135.

অতঃপর অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ললিতকুমার দত্ত এম, এ, বি, এল মহোদয় স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্ব হইতেই একটী অভিনব ও উন্নত প্রণালীর তাঁত প্রস্তুত জন্য চেষ্টা করিয়া অধুনা প্রায় সফলকাম হইয়াছেন। এই তাঁতে সূত্রগুলির তানা কার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়া বয়নকার্য্যও এক সঙ্গেই সম্পন্ন হইতে পারিবে। এই কলটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হইয়া লোকলোচনের গোচরীভূত হইলে বিজ্ঞানালোকে সমুদ্ভাসিত প্রতীচ্য জগৎও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবে সন্দেহ নাই।

বিক্রমপুর অঞ্চলে অতি প্রাচীন কাল হইতেই উৎকৃষ্ট মাকু প্রস্তুত হইত বলিয়া অবগত হওয়া যায় (১)।

নৌশিল্প।

ঢাকা জেলা নদীজালে সমাচ্ছন্ন; এজন্যই এতদঞ্চলে নৌকার প্রয়োজন বেশী। সুতরাং অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে এতদ্দেশ-বাসিগণ নৌশিল্পে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ বস্ত্রশিল্পের ন্যায় বঙ্গীয় নৌশিল্পও প্রতীচ্য জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল।

"যুক্তি কল্পতরু" নামক একখানা প্রাচীন গ্রন্থে জলযান নির্ম্মান কৌশলের বিস্তারিত আলোচনা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে পূর্ব্বকালে যানের কক্ষগুলি কনক, রজত ও তাম্র এই ধাতুত্রয়ের বা উহাদের মিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা সুসজ্জিত করা হইত (১।) চতুঃশৃঙ্গ যান সিতবর্ণে, ত্রিশৃঙ্গ যান রক্তবর্ণে, দ্বিশৃঙ্গ

(১) See History of the Cotton Manufacture of Dacca District.

(১) "কনকং রজতং তাম্রং ত্রিতয়ম্বা যথাক্রমম্"॥

যান পীতবর্ণে, এবং একশৃঙ্গযান নীলবর্ণে চিত্রিত করিবার রীতি ছিল। যানের মুখগুলি কেশরী, মহিষ, নাগ, হস্তী, ব্যাঘ্র, পক্ষী ভেক বা মনুষ্যের মুখের অনুকরণে নির্ম্মিত হইত। নির্গৃহ ও সগৃহ ভেদে নৌকা দ্বিবিধ। সগৃহ নৌকা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত। যে জলযানে খুব বৃহৎ মন্দির থাকিত তাহাকে "সর্ব্বমন্দিরা" বলা হইত। ইহা রাজধন, অশ্ব ও রমণী বহনে ব্যবহৃত হইত। দ্বিতীয় শ্রেণীর যানের নাম ছিল "মধ্যমন্দিরা"। ইহার মন্দির মধ্যভাগে থাকিত বলিয়া ইহা মধ্যমন্দিরা নামে খ্যাত ছিল। ইহা বর্ষাকালে রাজাদিগের বিলাস যাত্রার জন্য ব্যবহৃত হইত। যে যানের মন্দির অগ্রভাগের দিকে থাকিত তাহা "অগ্রমন্দিরা" নামে পরিচিত ছিল। ইহা চিরপ্রবাস যাত্রায় এবং রণে ব্যবহৃত হইত। মন্দিরগুলি কাষ্ঠ অথবা ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হইত (১)।

---

(১) "চতুঃ শৃঙ্গা ত্রিশৃঙ্গাভা দ্বিশৃঙ্গা চৈক শৃঙ্গিণী॥
সিত রক্তা পীত নীল বর্ণান্দত্যাদ্‌যথা ক্রমম্।
কেশরী মহিষো নাগো দ্বিরদো ব্যাঘ্র এবচ॥
পক্ষী ভেকো মনুষ্যশ্চ এতেষাং বদনাষ্টকম্"।
"সগৃহা ত্রিবিধা প্রোক্তা সর্ব্ব মধ্যাগ্রমন্দিরা।
সর্ব্বতো মন্দিরং যত্র সাজ্ঞেয়া সর্ব্বমন্দিরা॥
"রাজ্ঞাং বিলাস যাত্রাদি বর্ষাসু চ প্রশস্যতে।
অগ্রতো মন্দিরং যত্র সাজ্ঞেয়া ত্বগ্রমন্দিরা॥
চিরপ্রবাস যাত্রায়াং রণে কালে ঘনাত্যয়ে॥
* * * * *
কাষ্ঠজং ধাতুজঞ্চেতি মন্দিরং দ্বিবিধং ভবেৎ।
কাষ্ঠজং সুখ সম্পত্যৈ বিলাসে ধাতুজং মতম্"॥
শব্দ কল্পদ্রুম বসুমতি সংস্করণ ৮৯৪ পৃঃ।

নৌকা দ্বিবিধ। সামান্য এবং দীর্ঘ।

সামান্য নৌকা দশবিধ:—ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পটলা, অভয়া, দীর্ঘা, পত্রপুটা, গর্ভরা ও মন্থরা। সার্দ্ধ এক হস্ত বৃদ্ধি হইলে ভীমা প্রভৃতি নৌকা হইবে। ইহার মধ্যে ভীমা, অভয়া ও গর্ভরা নৌকা শুভজনক নহে।

দীর্ঘনৌকাও দশবিধ:—দীর্ঘিকা, তরণি, লোলা, গড়রা, গামিনী, তরি, জঙ্ঘালা, প্লাবিনী, ধরণী, ও বেগিনী। ইহার মধ্যে লোলা, প্লাবিনী ও গামিনী দুঃখপ্রদা" (১)।

মহাভারতে যন্ত্র চালনীয় নৌকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়াযায়। যথা:—

"ততঃ স প্রোষিত বিদ্বান্ বিদুরেন নরস্তদা।
পার্থানাং দর্শয়া মাস মনো মারুত গামিণীম্॥
সর্ব্ববাত সহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিণীম্।
শিবে ভাগিরথীতীরে নরৈর্ব্বি শ্রম্ভিভিঃ কৃতাম্"॥

ভা ১।১৫০।৪৫

"এই যন্ত্রচালনীয় নৌকা শব্দে কলের জাহাজই বোধ হয়। বর্ত্তমান সময়ে জাহাজের যে সকল লক্ষণ দেখাযায়, তাহা পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র চালনীয় নৌকার সহিত তুল্য। এই নৌকা মনোমারুতগামিণী, যন্ত্রে চালিত ও ইহাতে নানা প্রকার পতাকা শোভিত হয়" (২)।

নৌকা প্রস্তুতের জন্য কিরূপ কাষ্ঠের প্রয়োজন তাহাও হিন্দু দিগের নিকটে অপরিজ্ঞাত ছিলনা। বৃক্ষায়ুর্ব্বেদে কোন্ জাতীয় বৃক্ষ কি প্রকার গুণবিশিষ্ট তাহার উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। পরস্পর

---

১) বিশ্বকোষ নৌকা শব্দ।

(২)

বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট কাষ্ঠ দ্বারা নৌকা প্রস্তুত করিলে উহা সুখপ্রদ হয় না বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। •

লঘু যৎ কোমলং কাষ্ঠং সুঘটং ব্রহ্ম জাতি তৎ।
দৃঢ়াঙ্গং লঘু যৎ কাষ্ঠমঘটং ক্ষত্র জাতি তৎ॥
কোমলং গুরু যৎ কাষ্ঠং বৈশ্যজাতি তদুচ্যতে।
দৃঢ়াঙ্গং গুরু যৎ কাষ্ঠং শূদ্র জাতি তদুচ্যতে॥

* * * * *

ক্ষত্রিয় কাষ্ঠে-র্ঘটিতা ভেজে মতে সুখ সম্পদং নৌকা।
অন্যে লঘুভিঃ সুদৃঢ়ৈ র্বিদধতি জল দুষ্পদে নৌকাং॥
বিভিন্ন জাতিদ্বয় কাষ্ঠ জাতা ন শ্রেয়সে নাপি সুখায় লোকা।
নৈষা চিরং তিষ্ঠতি পচ্যতে চ বিভিদ্যতে বারিণী মজ্জতেচ॥
ন সিন্দু গাগ্যার্হতি লৌহ বদ্ধং তল্লোহ কান্তৈর্হ্রিয়তে হি লৌহম্॥
বিপদ্যতে তেন জলেষু নৌকা গুণেন বদ্ধং নিজগাদ ভোজঃ" ॥

কথিত আছে মহারাজ মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে পূর্ব্বাঞ্চলের নিমিত্ত নৌসেনা বিভাগের সৃষ্টি হয়। নদীবহুল দেশ বলিয়া এতদ্দেশে বহু প্রাচীনকাল হইতেই নৌবিভাগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। পাল রাজগণও নৌবিভাগের বিশেষ আদর করিতেন। পালরাজগণের তাম্রশাসনাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, নৌবিভাগের অধ্যক্ষ "তারিক" নামে অভিহিত হইতেন।

প্রাচীন কাল হইতেই বাঙ্গালীরা ডিঙ্গা সাজাইয়া সমুদ্রে যাতায়াত করিত। সমুদ্রে গমনাগমনের জন্য পূর্ব্ব বঙ্গের নাবিকগণ সমুদ্র পথে বিশেষ দক্ষ ছিল। কবিকঙ্কন, কেতক দাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ বাঙ্গাল মাঝিদিগকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করিয়াছেন।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বাণিজ্য ব্যপদেশে দক্ষিণ পাটনে গমনোদ্যত চাঁদসদাগর বর্দ্ধকী আনিয়া বিবিধ ডিঙ্গা প্রস্তুত করিয়া ছিলেন। ঐ ডিঙ্গাগুলি বিবিধ পণ্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ করিয়া তিনি দক্ষিণপাটনে যাত্রা করিয়াছিলেন; কোন কোনও নৌকা বৃক্ষরাজি পরিপূর্ণ, কোনওটীতে বা হাট বাজার বসিত। তৎকালে "চন্দন কাষ্ঠে গুড়া আর ডালি" প্রস্তুত করিবার রীতি প্রচলিত ছিল।

বঙ্গে বার ভূঞার আধিপত্য কালে খিজিরপুর, বন্দর, শ্রীপুর ও ধাপা প্রধান নাবিস্থান ছিল। কার্ভালোর সহিত আরাকান রাজ সেলিম সার যে ভীষণ জলযুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে কার্ভালোর রণতরী সমূহের কতক ভগ্ন ও কতক নষ্ট হইয়া গেলে, তিনি আপনার নৌ শ্রেণী গঠনের জন্য শ্রীপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

মগ ও পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি জলদস্যুর উৎপাত নিবারণের জন্য মোগল সুবাদার গণ নৌবলের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। নবাব মীরজুম্লার আসাম অভিযান সময়ে এবং সায়েস্তাখাঁর চট্টগ্রাম অধিকার কালে ঢাকার নৌ বলের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

টেভারণিয়ার যে সময়ে ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে এখানে বহুসংখ্যক সূত্রধর নবাব সায়েস্তাখাঁর আদেশ মতে নৌকা প্রস্তুত করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। তিনি এখানে সূত্রধরের সংখ্যাধিক্য সন্দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায় (১)।

---

(১) "There is but one continued row of houses separated one from the other, inhabited for the most part by carpenters, that build galleys and other small boats". Traverniers Tavels Book I, Page 103.   Bangabashi edition.

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্তও যে এই শিল্প ঢাকা হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছিলনা, তাহা আমরা বিশপ হিবারের গ্রন্থ হইতেও অবগত হইতে পারি (১)।

ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিশ মীরজুম্লা ও সায়েস্তা খাঁর সময়ের নৌবলের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তৎপাঠে কোষা, জলবা, ঘ্রাব, পারেন্দা, বজরা, পাতেলা, সলব, পালেল, বহর, বালাম, খাটকুড়ি, মহালকুড়ি, পালওয়ার, জঙ্গি খালু প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের নৌকার বিষয় অবগত হওয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়েও ঢাকা জেলায় কোষা, বজরা, ভাওয়ালী, ছান্দী, ছিপ, ডিঙ্গি, পলয়ার, পান্সী, কুমারিয়া নৌকা, ঘাসী নৌকা, জেলেডিঙ্গি, গহেনারনৌকা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত পান্নুয়া নৌকা, ডাকেরনৌকার বিষয় ও অবগত হওয়া যায়। নাওধুরী, সারেঙ্গা, ডোঙ্গা নৌকার ব্যবহারও কোনও কোনও স্থানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

মীরের বাগের মাঝিগণ পলওয়ার ও লাল ডিঙ্গির পরিচালনার জন্য বিখ্যাত। নৌকা পরিচালনায় জেলে মাঝিগণ সিদ্ধহস্ত। ভীষণ তরঙ্গ সঙ্কুল পদ্মা নদীতে ঝড়ের মধ্যেও ইহারা সুকৌশলে অবলীলা-ক্রমে নৌকা চালাইয়া থাকে।

শিকারিগণ পূর্ব্বে ছিপ নৌকার মাঝিগিরি করিত।

---

(১) Boating is popular, and they make boats very well here", Bishop Hebers Narrative of a Journey Vol I. Page 186.

জন্মাষ্টমীর বড় চৌকী (ইসলামপুর)।

এই চৌকীতে ভগবানের নরসিংহাবতার প্রদর্শিত হইয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে ।বিংশতি হস্ত দীর্ঘ বিরাট মূর্ত্তিটি পরিবর্ত্তিত হইয়া হিরণ্যকশিপুর সভামণ্ডপে িরিণত হইত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিবিধ শিল্প।

(ক) জন্মাষ্টমীর চৌকী।

ঢাকা শিল্পপ্রধান স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিবিধ শিল্প কলার বিকাশ এখানে যতটা পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বঙ্গের অন্যান্য স্থানে সুলভ নহে। জন্মাষ্টমীর বড় চৌকীর শিল্পচাতুর্য্য জগৎ প্রসিদ্ধ। এক একখানা চৌকী উচ্চতায় ত্রিতল অট্টালিকাকেও পরাজয় করিয়া থাকে। এই সুবিশাল চৌকীগুলি বংশ দণ্ড এবং কাগজ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহার বিভিন্ন অংশ গুলি খণ্ডিতাকারে সহরের নানা স্থানে বিভিন্ন কারিকরগণ দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও মিসিলের প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা পূর্ব্বে একত্র করা হয়; এবং সংযোজিত করা হইলে, উহা যে পৃথক পৃথক ব্যক্তিগণ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। কোনও কোনও শিল্পী চৌকীগুলি সুধু সুনিপুণ ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, উহাতে বিবিধ প্রকারের কল সংযোজনা করিয়া নানা প্রকার অদ্ভুত ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে; এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চৌকীগুলির দৃশ্য আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দর্শকবৃন্দের চিত্তবিমোহন করিতে সমর্থ হয়। এই অভিনব প্রণালী গত কয়েক বৎসর যাবৎ সূচিত হইয়াছে; এবং ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী আনন্দ হরিকেই ইহার প্রকৃত প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর চৌকী গুলির মধ্যে

"বেলুন" "ভগবানের বিশ্বরূপ প্রদর্শন", "উর্ব্বশীর শাপ বিমোচন" প্রভৃতি চৌকী শিল্পচাতুর্য্যে শীর্ষস্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নভোমণ্ডলস্থ গ্রহগণের ভ্রমণ ও গ্রহাদি এবং পৌরাণিক ও সাময়িক যুদ্ধবিগ্রহাদি, দুর্গ, কেল্লা, সার্কাস, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি ক্রীড়া কৌশল ও বড়চৌকীতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

(খ) শঙ্খ শিল্প।

এই জেলা মধ্যে সহর ঢাকা ও মাণিকগঞ্জস্থিত শঙ্খকারগণ উৎকৃষ্ট শঙ্খ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই শিল্প অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ঢাকার শাঁখারী বাজারে এই শিল্পিগণ সাধারণতঃ বাস করিয়া থাকে। এখানে প্রায় ১০০ শত ঘর শাখারী বাসকরে। এতদ্ব্যতীত ফরিদাবাদেও ৫।৬ ঘর শাঁখারী আছে। বর্ত্তমান সময়ে ঢাকা সহরে প্রায় ৫০০ শত জন লোক এই শিল্পদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ইহাদের ব্যবসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সাধারণ শাঁখার জোড়া ।৵০ হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া থাকে। শঙ্খশিল্পিগণ সাধারণতঃ ১০০ শত টাকা মূলধন লইয়াই স্বীয় ব্যবসায় আরম্ভ করে।

শঙ্খের সমুদয় কার্য্যই হস্তদ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়। করাত দ্বারা শঙ্খছেদন করা অত্যন্ত পরিশ্রমের কার্য্য, ইহাতে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালনা অধিকতররূপে করিতে হয়। শঙ্খ কর্ত্তিত হইলে পর, উহা একখণ্ড প্রস্তরোপরি বিশেষ ধৈর্য্যসহকারে ঘর্ষণ করাও কম আয়াস সাধ্য নহে।

শাঁখা, অঙ্গুরী, বালা, চুড়ি, ঘড়িরচেন, বোতাম, ও কাণের

জন্মাষ্টমীর বড়চৌকী (নবাবপুর)।

ফুল, প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য শঙ্খ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। শঙ্খকার-গণ এই সমুদয় দ্রব্যের উপরে নানা প্রকার কারুকার্য্য খচিত করে। বিবিধ কারুকার্য্য সমন্বিত লতাবালা, শঙ্খবালা, উপরবেণী, উপরশঙ্খ, লতাসাপ, দোসাপা, মকরমুখো, চেনবালা, বকুলস্ চুড়ি প্রভৃতির শিল্প নৈপুণ্যের খ্যাতি বঙ্গ প্রসিদ্ধ। এই সমুদয় শঙ্খ লঙ্কাদ্বীপ, মান্দ্রাজ উপকূল, ও বোম্বাই প্রদেশ হইতে ঢাকাতে আমদানী হয়। সাধারণতঃ লঙ্কাদ্বীপ হইতে তিতকৌড়ি শঙ্খ, সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে জাহাজী, ধলা ও পটী শঙ্খ এবং মান্দ্রাজ উপকূল হইতে গড়বাকী শঙ্খ কলিকাতা হইয়া ঢাকাতে আমদানী হইয়া থাকে। সুরতি, দুয়ানাপটী, ও আলাবিলা শঙ্খই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রতি বৎসর সমুদ্র উপকূল হইতে প্রায় লক্ষ টাকার শঙ্খ ঢাকাতে আমদানী হয়; এবং ঢাকা হইতে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার নানাবিধ শাঁখার দ্রব্য ভারতের নানা স্থানে প্রেরিত হয়।

এই শিল্প সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। টিউটি-করিন প্রভৃতি স্থানের শঙ্খ ভরতগবর্ণমেণ্টের হস্তে এক চেটিয়া; সুতরাং ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্ট শঙ্খ ব্যবসায়ীদিগকে উহা সুবিধায় বিক্রয় করিতে পারেন। তাহা হইলেই ইহাদিগের যথেষ্ট সাহায্য করা হইল বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।

ঢাকার প্রেমচাঁদ সুর, দ্বারিকানাথ নাগ প্রভৃতি কারিগরের তৈয়ারি শাঁখার দ্রব্য বঙ্গ প্রসিদ্ধ।

(গ) সাবান।

ঢাকা সহরে সাবানের একটী কারখানা আছে, তাহা "বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরী" নামে পরিচিত। প্রায় ৩০০০০৲ টাকা মূলধন লইয়া এই

ফ্যাক্টরীটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯০৫ খৃ; অব্দের কলিকাতা শিল্প-প্রদর্শনীতে ঢাকার বুলবুল সাবানই দেশীয় সাবানের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

দেশী সাবান। সাবান প্রস্তুত প্রণালী সম্ভবতঃ মোসলমান-গণই সর্ব্বপ্রথমে এতদ্দেশে প্রচলিত করিয়া ছিলেন। "সাবুন" এই আরবী শব্দ হইতেই সাবান শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ঢাকার বাঙ্গালা সাবান এক সময়ে সমগ্রভারতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ঢাকাই তৎকালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাবানের অভাব মোচন করিত। সুদূর বসোরা এবং জিদ্দার বন্দরেও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঢাকার সাবান বিক্রীত হইত (১)।

বাঙ্গলা সাবান নিম্নলিখিত উপাদানে প্রস্তুত হইত (২)

শামুকের চূণ—	১০/০
সাজিমাটি—	১৬/০
লবণ—	১৫/০
তিলতৈল—	১২/০
ছাগচর্ব্বি—	।৫
	৫৩।৫

(ঘ) স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্য।

ঢাকার কর্ম্মকারগণের শিল্পচাতুর্য্য বঙ্গপ্রসিদ্ধ। স্বর্ণ ও রৌপ্যা-লঙ্কারের উপর ইহারা এরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ফলাইতে পারে যে তদ্দৃষ্টে

(১) Vide History of the Cotton Manufacture of Dacca District.
(২) Ibid.

বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ঢাকাই কর্ম্মকারগণের আর একটী বিশেষত্ব এই যে ইহারা অতি অল্প পরিমাণ স্বর্ণ দ্বারা নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পারে। বঙ্গের অন্যান্য স্থানের কর্ম্মকারগণ এই বিষয়ে ঢাকার কর্ম্মকারগণের সমকক্ষ নহেন।

প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইল ইরানের বাদশাহ ঢাকার অবদান কল্পতরু প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় নবাব স্যার আসান উল্লা বাহাদুর কে, সি, আই, ই মহোদয়ের নিকটে ঢাকার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচীন হুসনী দালানের একখানা আলোক চিত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। সুধু সামান্য একখানা আলোক চিত্র সুদূর প্রদেশে প্রেরণ করা স্বর্গীয় নবাব বাহাদুরের মনে ভাল লাগিল না। তিনি ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ কারিকর আনন্দ হরির হস্তে ইমামবাড়ার একখানা স্বর্ণ ও রৌপ্য তার নির্ম্মিত প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিবার ভার অর্পণ করেন। আনন্দ হরিও স্বীয় গুণপনা প্রদর্শনের উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া অতি সুচারুরূপে কার্য্যটী সম্পন্ন করেন। আমরা স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নবাব বাহাদুরের "আসান মঞ্জিল" প্রাসাদের উক্ত প্রকার একখানা প্রতিকৃতিও প্রস্তুত করিয়া আনন্দহরি বিস্তর প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

যাঁহারা ঢাকার ইতিহাস প্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমীর মিসিল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বোধ হয় এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে মিসিলের অগ্রগামী কুঞ্জরযূথের মস্তকোপরি পরিশোভিত সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত মুকুট গুলি এবং নানা কারুকার্য্য খচিত রৌপ্য ও হিরণ্ময় ছোট চৌকী সমূহ শিল্পচাতুর্য্যে ও কলানৈপুণ্যে সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত বিষয়ে গোপী কর্ম্মকার বর্ত্তমান সময়ে ঢাকার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ।

এখানকার রৌপ্য নির্ম্মিত আতরদান, গোলাব বাস প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট।

(ঙ) ডাকের সাজ।

রাংএর নানাবিধ কারুকার্য্য জন্য গোয়ালনগর, পানিটোলা প্রভৃতি মহলা সুপ্রসিদ্ধ। কাষ্ঠ ফলকোপরি বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত নক্‌সা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রাংএর সূক্ষ্ম পাত উপর্য্যুপরি সন্নিবেশিত করতঃ হস্তের চাপ দিয়া ডাকের সাজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই শিল্পটী বিনষ্ট হইয়া আর একটী অভিনব শিল্প ইহার স্থান অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে অনেকেই জর্ম্মান প্রভৃতি দেশ হইতে আগত রাংএর পাতদ্বারা নির্ম্মিত ডাকের সাজে দেবীর অঙ্গ ভূষিত করিতে অনিচ্ছুক; সুতরাং ঢাকার এই শিল্পিগণ তৎস্থলে সোলার সাজ প্রস্তুত করিয়া ইহার অভাব পূরণ করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত বাদলা চুমকী ও সলমার কারুকার্য্যও প্রশংসার্হ।

(চ) লৌহের কারখানা।

অতি প্রাচীন কালে ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত লোহাইদ্ ও কীর্ত্তনিয়া প্রভৃতি স্থানে লৌহের কারখানা ছিল বলিয়া অনুমিত হয়; ঐ সমস্ত স্থান খনন করিলে এক্ষণেও নানাবিধ যন্ত্রাদির ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ স্থানে লৌহের খনি ছিল বলিয়া ঐতিহাসিক আবুল ফজল উল্লেখ করিয়াছেন (১)।

কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল লক্ষ্মীবাজারের জমীদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল শর্ম্মা মহোদয় ঢাকা নগরীতে একটী লৌহের কারখানা

(১) আইন-ই-আকবরি।

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ কারিকর শ্রীযুক্ত কানাইলাল কর্ম্মকারের তত্ত্বাবধানে ইহা প্রথমে পরিচালিত হয়। লৌহের নানাবিধ ঢালাই কাজ এই কারখানায় সংঘটিত হইয়া থাকে।

(চ) পিতল, তাম্র ও কাংস্য পাত্র।

ঢাকা সহরের ঠাঠারি বাজার মহল্লাল, ধামরাই গ্রামে পিতল, তাম্রও কাংস্য নির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। লৌহজঙ্গ ও নবাবগঞ্জ থানার এলাকাভুক্ত কোনও কোনও স্থানেও এই সমুদয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। ধামরাইএর কাঁসের বাসন উৎকৃষ্ট। ভরণের কাজই অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়। পূর্ব্বে লৌহজঙ্গের সন্নিকটবর্ত্তী ভুয়ালী গ্রামে ভরণের কাজ হইত। ঢাকার স্বনাম খ্যাত স্কুল ইন্‌সপেক্টর স্বর্গীয় মহাত্মা দীননাথ সেন মহোদয় পিতল নির্ম্মিত এক অভিনব প্রণালীর দীপাধার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

(জ) টিনের বাক্‌স।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই সহরে টিনের বাক্‌স প্রস্তুত প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। পূর্ব্বেও এখানে টীনের বাক্‌স প্রস্তুত হইত; কিন্তু বিলাতী বাক্সের সহিত প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে উহা সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলনা। সুতরাং তখন উহার বড় একটা সমাদর পরিলক্ষিত হয় নাই। পরে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে উৎসাহিত হইয়া শিল্পিগণ উৎকৃষ্ট ও অভিনব প্রকারের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করায় উহার কাট্‌তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিঃ জি, এন, গুপ্ত ঢাকাই টিনের বাক্সের বিষয় গৌরবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন (১)।

---

(১) Vide G. N. Gupta's report Page.

(ঝ) হস্তীদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্যাদি।

বহুকাল হইতেই ঢাকাতে হস্তীদন্ত নির্ম্মিত শাঁখা ও চুরি প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। এখানে খেদা আফিস থাকায় হস্তীদন্ত সংগ্রহ করা অনায়াস সাধ্যছিল; সুতরাং শিল্পিগণ উহা সংগ্রহ পূর্ব্বক শাঁখা, চুড়ি, পাশারছক ও ঘুটি বোতাম প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইত। এই শিল্পটী এক্ষণেও লুপ্ত হয় নাই।

(ঞ) শৃঙ্গের কারখানা।

মহিষের শৃঙ্গ নির্ম্মিত শাঁখা, হরিণের শৃঙ্গের পাশার ছক ও গুটি প্রভৃতি অদ্যাপি বহুল পরিমাণে এখানে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

(ট) কাচের চুড়ি।

মোসলমান শাসন কাল হইতেই এই জেলায় কাচের চুরি প্রস্তুত হইত। ঢাকার কাচের চুরি ভারত প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ফিরোজাবাদের কাচের চুরির অধিক সমাদর হওয়ায় ঢাকাই চুরির ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়াছে। ঢাকার চুরি হাট্টা মহল্লাটির নাম দ্বারাই ঢাকাই চুরির ব্যবসায়ের গৌরব সূচিত হয়।

(ঠ) দেশী কাগজ।

প্রাচীনকাল হইতেই অড়িয়ল গ্রামে হরিদ্রাবর্ণের এক প্রকার পুরুকাগজ প্রস্তুত হইত। উক্ত কাগজ প্রস্তুত কারকগণ "কাগজী" নামে পরিচিত ছিল। এই কাগজ গুলি দৈর্ঘ্যে দেড় হস্ত ও প্রস্থে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত হইত। পূর্ব্বে আড়িয়ল গ্রামে প্রায় ৫০০ ঘর কাগজী বাস করিত। উহারা কাগজ প্রস্তুত করিয়াই জীবিকা

নির্ব্বাহ করিত। এক্ষণে দেশী কাগজের সমাদর নাই ; সুতরাং উহারাও অন্যবিধ উপায় অবলম্বনে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে।

(ড) মোজা ও গেঞ্জির কারখানা।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সহরের নানা স্থানে এবং কোনও কোনও পল্লীতেও মোজার কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্ব হইতেই ঢাকা জজকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম, এ, বি, এল মহোদয় আমেরিকা হইতে Semi Automatic machine আনাইবার চেষ্টা করেন। পরে তাঁহারই যত্নে ঢাকাতে Branson এর কয়েকটী মোজার কল আনীত হয়। ঢাকায় মোজার কল প্রতিষ্ঠাও প্রচলন সম্বন্ধে উপেন্দ্র বাবুই প্রথম উদ্যোক্তা।

বর্ত্তমান সময়ে গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী এবং দাসব্রাদার্স কর্তৃক পরিচালিত কারখানা দুইটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। গুপ্ত এণ্ড কোম্পানীর কারখানায় সূত্র রঞ্জিত করা হয়। এই উভয় কারখানাতেই উৎকৃষ্ট মোজাও গেঞ্জি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মিঃ জি এন গুপ্ত তদীয় রিপোর্টে এই কারখানা দ্বয়ের কার্য্য প্রণালীর বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছেন (১)।

(ঢ) ইট ও সুরকির কল।

ঢাকা সহরের নানা স্থানে প্রায় দশটী কারখানা হইতে প্রতি বৎসর ৩০ হইতে ৭০ লক্ষ ইট প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রত্যেক

---

(১) Vide A Survey of the Industries and Resources of Eastern Bengal and Assam by G. N. Cupta. I. C. S. published by Govt.

ইটের কারখানাতেই ২।১টী করিয়া সুরকীর কল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ব্যবসায় মন্দ লাভজনক নহে।

(ণ) ঝিনুকের দ্রব্যাদি।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে পূত মন্দাকিনী প্রবাহে যে-সমুদয় শিল্প উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তন্মধ্যে ঢাকার ঝিনুকের নির্ম্মিত দ্রব্যাদি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। বস্তুতঃ ঢাকার ঝিনুকের নির্ম্মিত বোতাম, ঘড়ির চেইন, মাথার ফুল প্রভৃতি সৌন্দর্য্যে বিলাতি দ্রব্যাদির সহিত সগৌরবে স্পর্দ্ধা করিতে সমর্থ। ঢাকার নারেন্দা প্রভৃতি স্থানেই ইহা বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে ও প্রেরিত হইয়া থাকে।

(ত) পেন হোল্ডার।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে এই নগরীতে যে সমুদয় স্বদেশী দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে তন্মধ্যে "গোল বদন কারখানায়" প্রস্তুত পেন হোল্ডার অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এই কারখানায় প্রায় ত্রয়োবিংশতি প্রকারের অতি উৎকৃষ্ট হোল্ডার প্রস্তুত হইতেছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ গুলিই বিদেশজাত দ্রব্যাদি অপেক্ষা মনোরম ও সস্তা হইয়াছে। ইহাদিগের প্রস্তুত চন্দন কাষ্ঠের হোল্ডার গুলি খুব ভাল।

এতদ্ব্যতীত কালী, ব্রস্কো প্রভৃতি ও নানা স্থানে প্রস্তুত হইতেছে।

(থ) মৃৎশিল্প।

বিক্রমপুর ও চন্দ্রপ্রতাপের কুম্ভকারগণ প্রতিমা নির্ম্মাণে সুদক্ষ। কাঁচাদিয়ার স্বর্গীয় গৌরীকান্ত সেন অতি সুন্দর মৃণ্ময় মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে পারিতেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কলাকোপা ও তৎ-

সন্নিহিত কতিপয় স্থানে সুবৃহৎ মৃণ্ময় তৈলাধার নির্ম্মিত হইয়া থাকে; উহা সাধারণতঃ "মট্‌কী" নামে পরিচিত। এক একটী মট্‌কী এরূপ প্রকাণ্ড যে তাহাতে ৪০/ চল্লিশমণ পর্য্যন্ত তৈল রাখিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত ক্ষুদ্রায়তনেরও নানাবিধ পাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। মৃণ্ময় "মোড়া" "ভাঝি" ও "চার" প্রভৃতি নির্ম্মাণ জন্যও এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ঢাকার মৃত্তিকা মৃৎশিল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মাটীর গাথুনীতে প্রকাণ্ড অট্টালিকাদিও সচরাচর নির্ম্মিত হইয়া থাকে; উহা "কাঁচাগাথনী" বলিয়া পরিচিত।

উৎকৃষ্ট চূণকাম করিবার জন্য ঢাকার রাজমিস্ত্রীগণ প্রসিদ্ধ। এই চূণ কাম (stucco panelling) নবাব সায়েস্তা খাঁ এই স্থানে প্রবর্ত্তিত করেন বলিয়া উহা সায়েস্তাখানি চূণকাম বলিয়া পরিচিত। নর্থব্রুক-হলে এই চূণকামের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

(দ) বেত্র ও বংশ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি।

ঢাকা জেলার নানা স্থানে বিশেষতঃ নবাবগঞ্জ থানার এলাকাভূক্ত স্থান সমূহে বাঁশও বেত্র নির্ম্মিত কুলা, ডালা, বীচন, মোড়া, ছোচা, পল, ডুলা, ঝাকা, ধামা প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বেদিয়াগণই এই সমুদয় জিনিষপত্র নির্ম্মাণে সুদক্ষ।

এতদ্ব্যতীত এই জেলায় নল ও মোতরা নির্ম্মিত চাচ ও শীতল পাটীও বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হয়।

মালীটোলা, লক্ষ্মীবাজার ও কুমারটুলীর চর্ম্মকারগণ উৎকৃষ্ট জুতা প্রস্তুত করিতে পারে। ঢাকায় বিস্তৃত চর্ম্মের ব্যবসা আছে। প্রতিবৎসর বহুলক্ষ টাকার চর্ম্ম এখান হইতে কলিকাতা হইয়া ইউরোপে প্রেরিত হইয়া থাকে।

সঙ্গীত কলায়, বিবিধ যন্ত্রের বাদনে, ঢাকা এক সময়ে বঙ্গদেশের আদর্শ স্থানীয় ছিল। কলকণ্ঠ গায়কের সুমধুর কাকলী; সেতার, এস্রাজ ও তানপুরার মুর্চ্ছনা; পাখোয়াজের রোল, কাওলাতের গম্ভীর নিনাদ, তবলার বোল, ও টপ্পার মিহি সুর, গম্ভীর নিশীথে প্রায়, প্রতি মহল্লাতেই শ্রুত হইত। সঙ্গীত চর্চ্চায় ঢাকা এখন পশ্চাৎপদ নহে।

বিবিধ বাদ্য যন্ত্রাদিও বহুকাল হইতেই ঢাকায় প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। সেতার ও এস্রাজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ জন্য চুণীলাল ও সুকলাল মিস্ত্রী সুদক্ষছিল। বর্ত্তমান সময়ে মুন্নালাল মিস্ত্রীর নাম করা যাইতে পারে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "সৌন্দর্য্যের অনুরাগ অল্প ব'লয়া অথবা বিদেশীয় শাসনে শিক্ষার সুযোগের অভাবে বঙ্গীয় স্থপতিগণ নির্ম্মাণ কার্য্যে সবিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে নাই; অন্যের উদ্ভাবিত শিল্প বিদ্যার অনুকরণ মাত্র করিয়া আসিয়াছে" (১)! এটী যে নিতান্ত ভ্রান্তধারণা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিল্প চর্চ্চায় ঢাকা জেলার স্থান অনেক উচ্চে। বস্তুতঃ নানাবিধ শিল্পীর একত্র সমাবেশ এক ঢাকা ব্যতীত বঙ্গের অন্যত্র কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। ঢাকা সহরের বিবিধ মহল্লার নামকরণও বিভিন্ন শিল্পিগণের অবস্থান অনুযায়ীই হইয়াছিল। তৎকালে এক জাতীয় শিল্পিগণ এক মহল্লাতেই বাস করিতেন। ঢাকার কামারনগর, তাঁতীবাজার, পাণীটোলা বা জামদানী নগর, শাঁখারী বাজার, সুতার নগর, মালীটোলা, গোয়াল নগর, কুমারটুলী, চুড়িহাট্টা, সূত্রাপুর, জড়িয়াটুলি, কাঁসারি বাজার প্রভৃতি মহল্লার নাম শিল্পিগণের বিভিন্ন কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। মোসলমান শাসন সময়ে ঢাকার বিবিধ শিল্প উন্নতির শীর্ষ স্থান অধিকার করিলেও ইহা স্বীকার্য্য যে প্রাচীন হিন্দুদিগের সময়েও এই জেলার বিভিন্ন শিল্পাদি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ বিক্রমপুরস্থ জপসা গ্রাম পূর্ব্বে ঢাকা জেলারই অন্তর্গত ছিল। এখন উহা ফরিদপুর জেলার সামিল

---

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

হইয়া পড়িয়াছে। এই জপসা গ্রামের অন্তর্গত একটী পাড়ার নাম ছিল রাজকান্দি। তথায় শূদ্র জাতীয় এক শ্রেণীর বহু লোক বাস করিত; উহারা রাজমিস্ত্রীর কার্য্য করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিল। নবাবগঞ্জ থানায় যন্ত্রাইল নামে একটী গ্রাম আছে। পালরাজগণের সময়ে এই স্থানে যন্ত্রশালা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধামরাইর হিন্দু শিল্পিগণ বস্ত্রবয়ন কার্য্যে যেরূপ নিপুণতা প্রদর্শণ করিয়াছিল, মৃৎ-শিল্পেও তাহা হইতে তাহারা কোনও অংশে ন্যূন ছিল না। শিল্প নৈপুণ্যে ধামরাইর অধিবাসিগণ সিদ্ধহস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আধুনিক যুগে কাঁচাদিয়া নিবাদী ৺গৌরীকান্ত সেন ভাস্কর্য্য ও চিত্র-শিল্পে যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শণ করিয়াছেন তাহা শুধু ঢাকা জেলাবাসীর কেন সমগ্র বাঙ্গালী জাতীরই গৌরবের বিষয়। সাহাবাজ নগরের ৺কাশী মুখোপাধ্যায়, ও ৺মদন গণক, তারপাশার (ইদানীং কনকসার) চন্দ্রমণি পাল, নাগের হাটের তিলক পাল, ঢাকার চুনীলাল, আনন্দ হরি ও গোপী কর্ম্মকার প্রভৃতির শিল্প নৈপুণ্যের খ্যাতি এই জেলার বহুলোকের মুখে শ্রুত হওয়া যায়। বস্তুতঃ শিল্পচাতুর্য্যে ঢাকা জেলা যে সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত অনিন্দ্য সুন্দর ধাতব ও প্রস্তর মূর্ত্তিগুলি প্রাচীন কালের উন্নত ভাস্কর্য্য শিল্পের জ্বলন্ত নিদর্শন। এই মূর্ত্তিগুলির নির্ম্মাণ কৌশল দক্ষিণাপথের শিল্পিগণের অনুরূপ বলিয়া, উহা যে বঙ্গীয় শিল্পিগণের সুনিপণ হস্ত প্রসূত, তাহা স্বীকার করিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হন। কিন্তু একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক এই যে, বাঙ্গালী চিরকালই অনুকরণে সিদ্ধ হস্ত। বঙ্গের প্রাচীন ভাস্করগণ যে অন্যের উদ্ভাবিত অভিনব ও উন্নত শিল্প বিদ্যার অনুকরণ করিয়াও এতদ্দেশে উহার বহুল প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছিল না, তাহা মনে

হয় না। বিশেষতঃ তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে তৎকালে বঙ্গীয় জনসাধারণ প্রত্যেকেই তাহাদিগের নিত্য আরাধ্য দেবতার মূর্ত্তির জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত। বঙ্গদেশের প্রত্যেক পল্লিতে পল্লিতে এরূপ কত অসংখ্য মূর্ত্তি লোকলোচনের অন্তরালে রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে।

বিবিধ কারুকার্য্য খচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর ও ইষ্টক খণ্ড সাভার অঞ্চলের অরণ্য মধ্যে এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা যে নবম কি দশম শতাব্দীর ভাস্কর্য্য শিল্পের নিদর্শন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তালতলা ও মীরকাদিমের খালের উপরে যে দুইটী পুল দৃষ্ট হইয়া থাকে উহা বল্লালী পুল বলিয়া সাধারণো সুপরিচিত। সেনরাজগণের সময়ে হিন্দু স্থাপত্য যে কতদূর উন্নত ছিল তাহা এই পুল দুইটীর নির্ম্মাণ-কৌশল সন্দর্শন করিলেই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়।

রোমীয় স্থাপত্য ও গ্রীক হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ প্রণালীর তুলনায় মোসলমানের কীর্ত্তি লঘুতর হইলেও নানা স্থানের মকবেরা, মসজিদ, কাটরা, লঙ্গর খানা, দুর্গ প্রভৃতি তাৎকালিক স্থপতির অসাধারণ নির্ম্মাণকৌশল প্রদর্শন করিতেছে।

পরিবিবির সমাধি-মন্দির, সাতগুম্বজ মসজিদ, বড়কাটরা, ছোটকাটরা, ইমামবাড়া প্রভৃতি মোগলের উন্নত স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। মহারাজ রাজবল্লভের কীর্ত্তিনিকেতন রাজনগরের নবরত্ন, পঞ্চরত্ন, সপ্তদশরত্ন একবিংশ রত্ন, প্রভৃতি গগনচুম্বি সৌধাবলি সৌন্দর্য্যে ও স্থপতি কৌশলে তৎকালে সমগ্র বঙ্গদেশের শীর্ষ স্থানীয় ছিল। লালাকীর্ত্তি নারায়ণের প্রতিষ্ঠিত বুরুজ, অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ৺কৃষ্ণদেব সেনের নির্ম্মিত যাত্রাবাড়ীর দুর্গ, দেওয়ান দর্প নারায়ণের পঞ্চরত্ন প্রভৃতি মনোরম অট্টালিকা অষ্টাদশ শতাব্দীর স্থাপত্য শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

ডাক্তার ওয়াইজ এসিয়াটিক জার্ণেলে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ বর্ণনে লিখিয়াছেন, একটী পিত্তল নির্ম্মিত কামানই চন্দ্রদ্বীপের ভূঞা রাজগণের স্মারক রূপে বিদ্যমান আছে। ঐ কামানটীর গাত্রে রাজা কন্দর্প নারায়ণের নাম ও '৩১৮' এইরূপ একটী চিহ্ন এবং নির্ম্মাতা "রূপিয়া খা সাং শ্রীপুর" এই কথাগুলি অঙ্কিত আছে, উহার দৈর্ঘ্য ৭ৡ ফিট, বেড় ২।০ ফিট, অগ্রভাগের ব্যাস ৯॥ ইঞ্চি (১)। ঐ সময়ে শ্রীপুর সমৃদ্ধি গৌরবে বঙ্গদেশ মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। চাঁদ কেদারের রাজধানী বিক্রমপুরান্তর্গত শ্রীপুরে তৎসময়ে বহু শিল্পীর একত্র সমাবেশ হইয়াছিল।

মুর্শিদাবাদের "জাহানকোষা" তোপ ও জাহাঙ্গীর নগরে দারোগা শের মহম্মদের ও পরিদর্শক হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে প্রধান কর্ম্মকার জনার্দ্দন দ্বারা ১০৪৭ হিঃ জমাদিয়াসসানি মাসে (অক্টোবর ১৬৩৭ খৃঃ অঃ) নির্ম্মিত হইয়াছিল (২)। ঐ সময়ে মোগল সুবাদার ইসলাম খাঁ মুসেদী রাজধানী ঢাকায় অবস্থান করিয়া বঙ্গের শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ইহার ওজন ২১২ মণ এবং অগ্নিসংযোগ করিতে ২৮ সের বারুদের প্রয়োজন।

রেণেল সাহেবের মেময়ের পাঠে ঢাকার বর্ত্তমান সুবৃহৎ কামান ব্যতীত আর একটী তোপের বিষয় অবগত হওয়া যায় (৩)। তারিখ-ই নসরৎজঙ্গি" গ্রন্থে এই তোপের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ১৬৬০ খৃঃ অব্দে খানখানান মোয়াজুম খাঁর

---

(১) Dr. Wise on Barbhuyas.

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

(৩) Rennel's memoirs
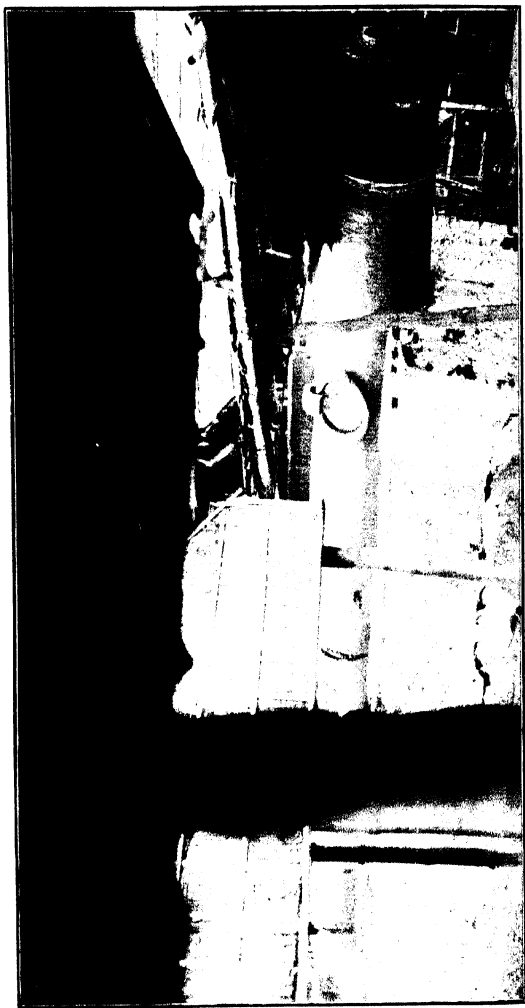
ঢাকার বড় তোপ।

(মীরজুম্লা) সৈন্যদিগকে শিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে এবং বিপন্মুক্ত হইবার জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কাটরার দ্বারদেশে এই কামানটী এবং বর্ত্তমান তোপটী স্থাপিত ছিল। পরে বৃহত্তরটী বুড়ি-গঙ্গাগর্ভস্থিত মোগলানী চরে স্থানান্তরিত করা হয়। নদীর স্রোতো-প্রাবল্যে মোগলানী চর বিধৌত হইলে দুইটী সুবৃহৎ গোলাসহ উহা সলিলশায়ী হইয়া যায় (১)।

চতুর্দ্দশটী লৌহপিণ্ড পিটাইয়া ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। রেণেল সাহেবের গ্রন্থ হইতে ইহার পরিমাপ প্রভৃতি উদ্ধৃত করা হইল।

		ফিট ইঞ্চি
দৈর্ঘ্য	...	... ২২—১০॥ সাড়ে দশ ইঞ্চি
বেড়	...	... ৩—৩
মুখের ব্যাস	...	... ২—২॥ আড়াই ইঞ্চি
মুখ হইতে চারি ফিট দূরবর্ত্তী—		
স্থানের ব্যাস	...	... ২—১০
ছিদ্রের ব্যাস	...	... ১—৩¼

ওজন ৮০০ মণেরও অধিক এবং ৬ মণ গোলা চালাইতে সক্ষম।

ঢাকার বর্ত্তমান কামানটীও ঐ সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮৩০—৩১ খৃঃ অব্দে (হিঃ ১২৪৬) ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ালটার সাহেব সোয়ারীঘাট হইতে উহাকে স্থানান্তরিত করিয়া চকবাজারের মধ্যস্থলে স্থাপিত করেন। শেষোক্ত তোপটীর পরিমাপ প্রভৃতি ঢাকার স্কুল ইনস্পেক্টর ষ্টেপলটন সাহেবের লিখিত নোট হইতে প্রদত্ত হইল।

---

(১) Tarikhi Nasaratjangi.

	ফিট ইঞ্চি	
দৈর্ঘ্য—	১১—০	
মুখের ব্যাস—	১—৭॥	সাড়ে সাত ইঞ্চি
বেড়—	২—৩	
ছিদ্রের ব্যাস—	০—৬	

উক্ত দুইটী কামান কালেখাঁ ও ঝমঝমা নামে অভিহিত হইত বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। মেনুসীর গ্রন্থে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কামান-গুলির যে নাম প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঝমঝমা নামটী দৃষ্ট হইয়া থাকে। মেনুসীর উল্লিখিত "ঝমঝমা"র সহিত ঢাকার তোপটীর কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও ইহা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, ঢাকার তোপটীরও এবম্বিধ নাম হওয়া অসম্ভব নহে।

গত ১৯০৯ খৃঃ অব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত দেওয়ানবাগ (মনোহর খানের বাগ) নিবাসী মৌলবী মুজাফরহোসেন তাঁহার বাটীস্থ একটা নিম্নস্থান (গাড়া) ভরাট করিবার জন্য কোনও উচ্চস্থান হইতে মাটি কাটিয়া আনায়, তথায় ৭টী পিত্তল নির্ম্মিত কামান আবিষ্কৃত হয়। তৎপর দিবস, সুবর্ণগ্রামের ইতিহাসপ্রণেতা শ্রীযুক্ত স্বরূপচন্দ্র রায় মহাশয় এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করিলে উহা ঢাকা নগরীতে স্থানান্তরিত করা হয়। তন্মধ্যে ৪টী কামান হুমায়ুনবিজয়ী শেরশাহ কর্ত্তৃক ও ২টী ঈশাখাঁ মসনদআলি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। অপরটী কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। শ্রীযুক্ত এইচ, ই, ষ্টেপলটন সাহেবের প্রতি উহার সময়নিরূপণ প্রভৃতির ভার অর্পিত হয়। তিনি ১৯০৯ সনের অক্টোবর মাসের এসিয়াটিক জার্ণেলে ঐ কামানগুলির
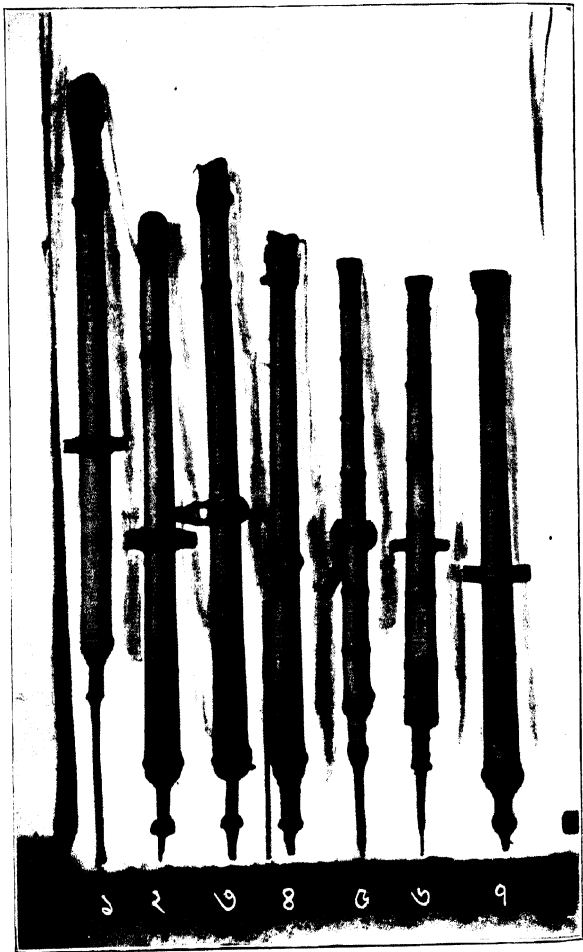
দেওয়ানবাগে প্রাপ্ত ষোড়শ শতাব্দের কামান।

যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

উহার মধ্যে ৪টী কামানের অগ্রভাগ ব্যাঘ্রমুখের অনুরূপ করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে এবং একটীতে শেরসাহের নাম খোদিত আছে।

অপর তিনটীর মধ্যে দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ঈশাখাঁর নাম ও হিঃ ১০০২ সন অঙ্কিত রহিয়াছে। অবশিষ্ট দুইটী ঈশাখাঁর নির্ম্মিত কামানের প্রায় অনুরূপ; সুতরাং ঐ দুইটীও তৎসময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

এই কামানগুলির দৈর্ঘ্য ৩ ফিট ১০ ইঞ্চি হইতে ৫ ফিট ১ ইঞ্চি। ওজন এক মণ হইতে ২ দুই মণ পর্য্যন্ত।

১নং কামানঃ—এই কামানটীর খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, - উহা হিঃ ৯৪৯ সনে (১৫৪২ খৃঃ অঃ) সৈয়দ আহম্মদ রুমি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাতে অনুমান হয়, বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা খিজিরখাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিবার পরবর্ত্তী বৎসরই উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎকালে বঙ্গের কোন শাসনকর্ত্তা না থাকায় দিল্লীশ্বর শেরসাহের নামই উহাতে অঙ্কিত রহিয়াছে।

উহার পশ্চাদ্ভাগে, চুল্লির শেষাংশে, নিম্ন অঙ্কিত (*) চিহ্নটী পরিলক্ষিত হয়। কামানটীর নিম্নাংশে তিনটী খোদিত লিপি আছে; অগ্রভাগের নিম্নদেশে, খোদিত লিপিটীতে পারসী সিকস্ত অক্ষরে "রিফাৎগাজী" এই নামটী লিখিত আছে। ইহা হইতে মিঃ ষ্টেপলটন অনুমান করেন যে রিফাৎগাজী এই কামানটীর পরিচালক (গোলন্দাজ) অথবা পরবর্ত্তী স্বত্বাধিকারী কোনও এক ব্যক্তি হইবেন।

---

* ⊠

অপর দিকের কটিদেশের নিম্নে বঙ্গাক্ষরে "তরপ রাজা" নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। ইহা কামানটীর নাম হওয়া অসম্ভব নহে। এই অক্ষর কয়টীর পরে, নীচের দিকে "২।৬" সংখ্যা লিখিত আছে।

আবার অপর দিকে "৩।৪" সংখ্যাও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই দুইটী সংখ্যা উহার ওজন পরিজ্ঞাপক বলিয়া ষ্টেপলটন সাহেব অনুমান করেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত ওজন ১ মণ ২৭ সের মাত্র। উক্ত সংখ্যা দুইটী ওজন পরিজ্ঞাপক হইলে দুই স্থানে দুই প্রকার সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য কি, এবং বর্ত্তমান ওজনের সহিত উহার বৈষম্য কেন হয়, তাহার সদুত্তর কেহই প্রদান করিতে পারেন নাই। টমাস সাহেব বলেন শেরসাহের সময়ে ৫১৮ পাউণ্ডে এক মণ নির্দ্দিষ্ট ছিল; অর্থাৎ শেরসাহের সময়ের মণ আকবরের সময়ের মণের ২৮/৩৪ অংশ। ইহা হইতে ওজন বৈষম্যের কথঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। নিম্নের তালিকা দ্রষ্টব্য।

কামানের নম্বর	খোদিত সংখ্যা	বর্ত্তমান ওজন	গণনায় মীমাংসিত সংখ্যা
১নং	(৩'১৪)	……	……
২নং	(২'১৬)	১'২৭	১'২২
৩নং	(২'১৬)	১'৩৬½	১'২২
৪নং	(২'২৮½)	১'২০¾	১'৩০

১নং কামানটীর দৈর্ঘ্য ৪ ফিট ৯ ইঞ্চি; ছিদ্রের ব্যাস ১¾ ইঞ্চি ব্যাঘ্রমুখাঙ্কিত স্থানের নিম্নাংশের বেড় ৯½ ইঞ্চি।

২নং ও ৩নং কামান—এই দুইটীর অগ্রভাগও ব্যাঘ্রমুখের অনুরূপ; কিন্তু ব্যাঘ্রের মস্তকটী বিভিন্ন প্রকারের। ২ নম্বরেরটীর ওজন ১৸৵।৹ এক মণ সোয়া ত্রিশ সের; ছিদ্রের ব্যাস ১½ ইঞ্চি।

ঈশা খাঁর কামান।

হাতে খোদিত লিপি নাই ; কিন্তু নিম্নের অঙ্কিত (*) চিহ্নটী বিদ্যমান আছে।

৩ নম্বরেরটীর ওজন ১৷৬৷৷ একমণ সাড়ে ছত্রিশ সের। ছিদ্রের ব্যাস ২ ইঞ্চি ; দৈর্ঘ্য ৫ ফিট ২ ইঞ্চি। পারসী সিকস্ত অক্ষরে শাসনকর্ত্তা সরকার মাবুদখান এর নাম অঙ্কিত আছে। এই ব্যক্তির নাম কোনও ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ইহার গাত্রে বঙ্গাক্ষরে ১০ ও ২।৬ সংখ্যাদ্বয় অঙ্কিত আছে। প্রথমোক্ত সংখ্যাটী কামানের নম্বরজ্ঞাপক এবং শেষোক্তটী ওজন বিষয়ক বলিয়া মনে হয়।

৪নং—ইহার অগ্রভাগও ব্যাঘ্রমুখাকৃতি। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তিনটী হইতে এইটী একটু স্বতন্ত্র রকমের। পূর্ব্বোক্ত তিনটীর ন্যায় ইহার দুই দিকে কড়া নাই। কটিদেশের চূড়ীটীও স্থূলতর। দৈর্ঘ্য ৪ ফিট ৮ ইঞ্চি, ছিদ্রের ব্যাস ১¾ ইঞ্চি। বঙ্গাক্ষরে "নি ৩৯১ ২৷৮৷৷" অঙ্কিত আছে। 'নি' এই অক্ষরটীর অর্থ বুঝা যায় না। ৩৯১ সংখ্যাদ্বারা কামানের নম্বর সূচিত হইতেছে এইরূপ অনুমান করা যায়। ২৷৮৷৷ ওজন পরিজ্ঞাপক। কিন্তু প্রকৃত ওজন ১৷৷/৫ এক মণ পৌণে একুশ সের।

৫নং—এই কামানটীতে বঙ্গাক্ষরে নিম্নলিখিত কয়টী কথা লিখিত আছে।

সরকার শ্রীযুত ইছা খাঁ

? (বমসনদী কি) সন হীজাব

১০০২

ছিদ্রের ব্যাস ১⅙ ইঞ্চি ; দৈর্ঘ্য ৩ ফিট ১১ ইঞ্চি। ওজন ১/২৷৷ এক মণ আড়াই সের। খোদিত হিজরী সন হইতে অনুমিত হয়,

---

* (চিহ্ন)

রাজপুতকুলধুরন্ধর রাজা মানসিংহ দিল্লীশ্বর আকবরের নিয়োগ অনুসারে ঈশাখাঁর বিরুদ্ধে যে সময়ে এতদঞ্চলে অভিযান করিয়াছিলেন সেই বৎসরই এই কামানটী প্রস্তুত হইয়াছিল।

৬নং—৫ নম্বরের প্রায় অনুরূপ, কিন্তু দৃঢ়তর। দৈর্ঘ্য ও সমান। ছিদ্রের ব্যাস ১৫ পৌণে দুই ইঞ্চি; ওজন ১ মণ ৭ সের। বঙ্গাক্ষরে ৪+১২৬ ও ১৷৷৩ লিখিত আছে। পারসী অক্ষরে লিখিত কথা কয়টীর অর্থ বোধগম্য হয় না। নিম্নদেশে ইংরাজী অক্ষরের ন্যায় 3।9—। এই সংখ্যা সন্নিবিষ্ট আছে।

৭নং—ইহাতে কোনও খোদিত লিপি অথবা কারুকার্য্য নাই। দৈর্ঘ্য ৪ ফিট ৬ ইঞ্চি; ছিদ্রের ব্যাস ১৫ পৌণে দুই ইঞ্চি; ওজন ১ মণ ৩০ সের।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বানিজ্য* বন্দর ও ওজন।

ঢাকা জেলা নদীমাতৃক দেশ বলিয়া বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মেঘনাদের সুনীল সলিলরাশি ভেদ করিয়া অসংখ্য বাণিজ্যতরণী সর্ব্বদা নানাস্থানে যাতায়াত করিতেছে। নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে পণ্যসম্ভার-পরিপূর্ণ পোতসমূহ পদ্মানদীর দক্ষিণদিকস্থ শাখানদী বাহিয়া ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মাতে পতিত হয়, এবং তথা হইতে বলাসিয়া ও মেঘনাদ অতিক্রম করিয়া, অথবা ধলেশ্বরীর শাখানদী দিয়া, ঢাকায় এবং নারায়ণগঞ্জ বন্দরে উপনীত হয়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে চিনি বোঝাই করা নৌকা গঙ্গানদী দিয়া গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত আগমন করে, এবং তথা হইতে যমুনা অতিক্রম করিয়া ধলেশ্বরীতে পতিত হয়। এই সমুদয় চিনি মাণিকগঞ্জ অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথমে আমদানী হইয়া থাকে। আসাম, কুচবিহার, রঙ্গপুর এবং পাবনা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে যমুনা বাহিয়া বাণিজ্যতরণীসমূহ এতদঞ্চলে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছে।

মধুপুর জঙ্গলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি দুইটী বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। মধুপুর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল

---

* প্রাচীন বানিজ্যের বিবরণ ২য় ও ৩য় খণ্ডে প্রদত্ত হইবে।

হইতে বিস্তরপণ্যবাহী তরণী বংশী ও তুরাগ নদী অতিক্রম করিয়া ধলেশ্বরীতে পতিত হয়; অথবা বানচেরা, টঙ্গী ও বালু নদী বাহিয়া লাক্ষ্যা নদীতে উপনীত হয়; তথা হইতে জেলার সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

ভাওয়াল অঞ্চল হইতে নানাবিধ দ্রব্যাদি বেলাই বিল অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

আসাম, ত্রিপুরা, ও ময়মনসিংহ হইতে পাট; যশোহর, তারপুর এবং গাজীপুর হইতে চিনি; শ্রীহট্ট হইতে চূণ, কমলালেবু, কমলা-মধু; আসাম ও রঙ্গপুর হইতে কাঠ; রঙ্গপুর ও পূর্ণিয়া হইতে তামাক; চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও আরাকান হইতে কার্পাস; ত্রিপুরা হইতে সুপারি ও মরিচ; বাথরগঞ্জ হইতে চাউল, নারিকেল, সুপারি; ময়মনসিংহ হইতে চামড়া, আবির ও পনির; ব্রহ্মদেশ হইতে সেগুন-কাষ্ঠ, হস্তীদন্ত, গোলমরিচ, মোম, কেরোসিন তৈল; রেঙ্গুন হইতে আতপ তণ্ডুল; আসাম হইতে এণ্ডি, তসর, মুগারথান; পাটনা হইতে কলাই; কলিকাতা হইতে নানাবিধ মনোহারী জিনিষ পত্র, সুতা, মদ, কেরোসিন, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, চাউল, চিনি, ছাতা, জুতা, কাপড়, ইত্যাদি; লঙ্কাদ্বীপ ও মালাবার হইতে শঙ্খ প্রভৃতি এই জেলার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বন্দরে আমদানী হইয়া থাকে।

পাট, চামড়া, বাংলা সাবান, শাঁখা, রৌপ্যালঙ্কার, পনির, বাসন পত্র, কসিদা ও অন্যান্য ঢাকাই বস্ত্রাদি এই জেলা হইতে বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। মাণিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ও মীর-কাদিমের তৈল উৎকৃষ্ট। মীরকাদিমের পান পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

নদী অথবা বড় খালের পারেই এই জেলার প্রায় সমুদয় প্রসিদ্ধ

বন্দরগুলি অবস্থিত। কোনও কোনও স্থানে সপ্তাহে দুই বার করিয়া হাট বসে, এবং কোনও কোনও স্থানে দৈনিক বাজার হয়।

মেঘনাদতীরে ভৈরববাজার, রায়পুরা, বৈদ্যেরবাজার ; ধলেশ্বরী-তীরে অথবা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ঘিয়র, কেদারপুর, সাতুরিয়া, মাণিক-গঞ্জ, বায়রা, তালতলা, মীরকাদিম, ফিরিঙ্গিবাজার, রিকাববাজার, বারুণীঘাট, মুন্সীগঞ্জ ; বুড়ীগঙ্গাতীরে ঢাকা ও ফতুল্লা ; লাক্ষ্যাতীরে বর্দ্ধি, লাথপুর, কালীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, সোনাকান্দা ; যমুনা-তীরে জাফরগঞ্জ, তেওতা ; এবং পদ্মাতীরে আরিচা, ভাগ্যকুল, ও লৌহজঙ্গ প্রভৃতি বন্দর অবস্থিত। লৌহজঙ্গের অনতিদূরে তরভিয়ার বাজার অবস্থিত ; এতদ্ব্যতীত বংশীনদী তীরে কালিয়াকৈর, ধামরাই, এবং সাভার ; তুরাগতীরে মীরপুর ; বানচেরাতীরে কাওরাইদ ; এবং আইরলখাঁ ও মেঘনাদের শাখানদীর সঙ্গমস্থলে নরসিংহদী বন্দর অবস্থিত।

মীরপুর—তুরাগ নদীর তটে ; চাউল, ধান্য, গুড়, লবণ, তৈল, চিড়া, বস্ত্র, কেরোসিন, তামাক, রাবগুড়, কাঠ প্রভৃতির বাণিজ্যস্থান। ঢাকা হইতে ৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

নারিসা—পদ্মা (ইলিসামারী) তটে ; ধান্য, বস্ত্র, সুপারি, তামাক-তৈল, গুড়, প্রভৃতি।

ধামরাই—বংশীনদীর শাখা কাকলাজানী নদীর তীরে ; ধান্য, চিনি, গুড়, বস্ত্র, পিত্তলের বাসন, শাঁখা, দেশী কাপড়, মনোহারি জিনিষ, সুপারি, হলুদ, তামাক, পান, সুপারি, বানিয়াতি জিনিষ ও মসলা। ঢাকা হইতে ২০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

মদনগঞ্জ—লাক্ষ্যাতটে ; ধান্য, পাট, তিসি, মরিচ, চিনি, সুপারি, সরিষা, চাউল, নারিকেল, হরিদ্রা। নারায়ণগঞ্জের অপর পারে

লাক্ষ্যা এবং ধলেশ্বরীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। নারায়ণগঞ্জের বণিক-গণ দ্বারাই এই বন্দরটী প্রথমে সংস্থাপিত হয়। নারায়ণগঞ্জের ন্যায় এখানেও লবণ এবং পাটের বিস্তৃত কারবার আছে।

নারায়ণগঞ্জ, মদনগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, লৌহজঙ্গ ও পদ্মাতীরবর্ত্তী বন্দর-গুলি এই জেলামধ্যে প্রধান আমদানী ও রপ্তানির স্থান। নারায়ণ-গঞ্জের ন্যায় কারবারের স্থান পূর্ব্ববঙ্গে আর নাই। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে নারায়ণগঞ্জ স্বাধীন বন্দর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৬ সনের ১২ই মে তারিখের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনী অনুসারে নারায়ণগঞ্জ পোর্ট চট্টগ্রাম বন্দরের অধীন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

নরসিংদি—আইরলখাঁ ও মেঘনাদের এক শাখানদীর সঙ্গমস্থলে ঢাকা হইতে প্রায় ২৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বদিকে অবস্থিত। লবণ, ডাল, সরিষা, চাউল, চিনি, কেরোসিন প্রভৃতির বাণিজ্যস্থান।

লাখপুর—লাক্ষ্যাতীরে; ডাল, পাট, পিতলের বাসন, কেরোসিন প্রভৃতি।

মাণিকগঞ্জ বা ললিতগঞ্জ—ধলেশ্বরীতটে; সূত্র, বস্ত্রাদি ও শাঁখা।

জাগির—ধলেশ্বরীতটে, মাণিকগঞ্জের সন্নিকটে; চিনি, লবণ, তৈল, তামাক, মরিচ, গুড়, সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি।

সাতুরিয়া—গাজীখালি ও ধলেশ্বরীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। লবণ, পাট কাঠ, বাঁশ প্রভৃতি।

বায়রা—ধলেশ্বরী তটে; পাট।

তেওতা—যমুনাতীরে; লবণ, সূত্র ও বস্ত্রাদি।

জাফরগঞ্জ—যমুনাতীরে; পাট ও লবণ।

কাঞ্চনপুর—পদ্মার সন্নিকটে; পাট ও তুলা।

ঘিয়র—ধলেশ্বরীতীরে; পাট ও বস্ত্র।

আরিচা—পদ্মাতীরে ; সূতা ও বস্ত্র।

গড়পাড়া -ধলেশ্বরীর সন্নিকটে ; পাট।

মীরকাদিম—ধলেশ্বরীর তটে, স্বনামপ্রসিদ্ধ খালের পারে অবস্থিত। গুড়, লবণ, তামাক, হরিদ্রা, কেরোসিন, সুপারি, ধান্য, চাউল, পান, বস্ত্র, পিতলের বাসন, টীন, সরিষার তৈল, হোগ্লা, শীতলপাটি, আদা, কলা, খৈল, খল্পা, কাইতা প্রভৃতি।

লৌহজঙ্গ—পদ্মাতীরে ; লবণ, গুড়, তামাক, ডাল, চিনি, কেরোসিন চাউল, বস্ত্র, পিতলের বাসন, পাট, টীন, সরিষার তৈল. তিল তৈল নারিকেল তৈল, কাঠ প্রভৃতি।

মুন্সীর হাট—চিনি, লবণ, তামাক, ধান্য, চাউল, বস্ত্র, সরিষার তৈল, বাতাসা, প্রভৃতি।

তালতলা—ধলেশ্বরী নদী ও স্বনামপ্রসিদ্ধ খালের তীরে ; চিনি, লবণ, তামাক, চাউল, বস্ত্র ও সরিষার তৈল।

শেখর নগর—তৈল, লবণ, তামাক, চিনি, ডাল, ধান্য, বস্ত্র, হরিদ্রা, সুপারি, কলা, পান, তুলা, রাবগুড়, ও চিড়া।

বারইখালী—তৈল, লবণ, তামাক, কেরোসিন, চিনি, বস্ত্র, হরিদ্রা মরিচ, কলা, গুড়, রাবগুড়, চাউল, চিড়া ও পান।

ধানকুনিয়া—খালের ধারে ; তামাক, চিনি, কেরোসিন, রাবগুড়, লবণ, তৈল, পাট, গুড়, চাউল, ধান্য, নারিকেল তৈল, বস্ত্র প্রভৃতি।

বান্দুরা—ইলিসামারী, তুলসীখালী ও ইছামতী এই নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। চিনি, তৈল, তামাক, গুড়, কেরোসিন, হরিদ্রা, চিটা, চিড়া, পান, মরিচ, বস্ত্র, চাউল, কলা, লবণ, ধান্য ; এখানে প্রচুর ধান্য আমদানী হয়। প্রতিদিন ২০।২৫ খানা ধান্য বোঝাই করা বড় নৌকা এখান হইতে বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হইয়া থাকে।

কলাকোপা—ইছামতীতটে; তৈল, চিনি, তামাক, গুড়, হরিদ্রা, কেরোসিন, চিটা, চিড়া, সুপারি, মরিচ, চাউল, বেনেতি জিনিষপত্র, চুণ, পেয়াজ, আদা, কলাই, খেসারি, মুগ, ছোলা, ইক্ষু, জোলার কাপড়, পাট, গাব, লৌহ, চুড়ি, কাগজ, ছালা, পুস্তক, খাতা, চাটাই, বেত, পাটি, মনোহারী জিনিষ, ধান্য, পান, লবণ, কাঠ, বস্ত্র, কুসুমফুল, তূলা, মটর ও গম।

করিমগঞ্জ—লবণ, তৈল, তামাক, রাবগুড়, গুড়, চিনি, মরিচ, কেরোসিন, বস্ত্র, জোলার কাপড়, লৌহ, ধান্য, চাউল, পান, সুপারি, কলা, লটাঘাস ও চাটাই।

পালোনগঞ্জ—ইলিসামারী তীরে; লবণ, তৈল, তামাক, গুড়, চিনি, মরিচ, কেরোসিন, বস্ত্র, জোলার কাপড়, ধান্য, পান, সুপারি, কলা ও রাবগুড়।

কালিয়াকৈর—বংশীতটে; লবণ, গুড়, চিনি, তামাক, ডাল, লৌহ, কেরোসিন, গজারিকাঠ, জ্বালানিকাষ্ঠ, ছন্, সরিষা, বাঁশ, ধান্য, চাউল, তিল।

কেরানীগঞ্জ,—বুড়িগঙ্গাতটে; তৈল, লবণ, গুড়, চিনি, তামাক, রাবগুড়, হরিদ্রা, মরিচ, চিড়া, বস্ত্র ও লৌহ।

পুটিয়া—হাড়িধোয়াতীরে। গরু ও ঘোড়া ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

কালীগঞ্জ—লাক্ষ্যাতীরে; বস্ত্র, লবণ, গুড়, চিনি, তামাক, কেরোসিন, পাট, কাঁটাল ও সরিষা।

টঙ্গী—নদীতটে; কাঠ।

মীর্জ্জাপুর—তুরাগতটে; ধান্য, পাট, সরিষা, তিল, গজারী কাঠ।

ভেওতা—যমুনাতীরে; বস্ত্র, লবণ, লৌহ, তৈল, তামাক, চাউল, ধান্য, মটর, চিড়া, চিনি, ঘি, ময়দা, সূতা, কাঠ ও কেরোসিন।

নারায়ণগঞ্জ—লাক্ষ্যাতীরে; পাট, তামাক, সুপারি, তুলা, কাঠ, তৈল, কেরোসিন, ঘি, চিনি, লবণ, চাউল, ধান্য, চামড়া, কয়লা, ডাল, ধাতু, সরিষা, পিতল ও টীন।

তরাকর—খালের ধারে; এই হাটটী ডিঙ্গি নৌকা ক্রয়বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুরের নানাস্থান হইতে বর্ষাকালে এই স্থানে বহুলোক নৌকা ক্রয় করিবার জন্য আগমন করে।

সুবচনী—স্বনামপ্রসিদ্ধ খালের ধারে; বিক্রমপুরমধ্যে প্রসিদ্ধ।

মাকোহাটি—স্বনামপ্রসিদ্ধ খালের ধারে।

আটী—বুড়িগঙ্গার শাখাতীরে; আটির কুঠীর হাট গরু, পাঁঠা ও ভেড়া ক্রয় বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

দিঘীরপাড়—পদ্মার একটী শাখা নদী তীরে; বাঁশ ও কাঠ বিক্রয়ের কেন্দ্র স্থান।

কনকসার—খালের ধারে এই হাটটীও কাঠ বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

শ্রীনগর—স্বনামপ্রসিদ্ধ খালের ধারে; প্রতি হাটে প্রায় ৪০০০৲ টাকার দ্রব্যাদি বিক্রীত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে এই হাটে প্রায় ২॥ লক্ষ টাকার পাট খরিদ বিক্রয় হয়, এবং প্রায় ৮০।৯০ খানা ধান্য ও চাউল পরিপূর্ণ বড় বড় পলোয়ার নৌকা সর্ব্বদাই এই বন্দরে উপস্থিত থাকে।

হলদীয়ার হাটে দূরদেশ হইতে আনীত মরঙ্গী ও সুন্দরী কাঠ প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হয়। এখানকার জোলাদিগের প্রস্তুত ছিট ও লুঙ্গি ঢাকাজেলায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

ভাওয়ালের অন্তর্গত বর্ম্মির হাটে বহুল পরিমাণে গজারী কাঠ বিক্রীত হইয়া থাকে। এই সমুদয় গজারী কাঠ ভাওয়ালের গড় হইতেই প্রতি বৎসর আমদানী হয়।

মহেশ্বরদীর অন্তর্গত পুটিয়া ও চালাকচর এবং হরিরামপুর থানার অধীন ঝিটকারহাট, গরু ও ঘোড়া বিক্রয়ের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। দূরদেশান্তর হইতে বহুলোক এই হাটে আসিয়া গরু ও ঘোড়া ক্রয় করে।

এতদ্ভিন্ন আগরা, কোমরগঞ্জ, গোবিন্দপুর, বাগমারা, শিকারপুর, দাউদপুর, মামুদপুর, জয়পাড়া, লেছরাগঞ্জ, খাবাশপুর, বুতুনী, তিল্লি, কেদারপুর, দৌলতপুর, শ্রীবাড়ী, মহাদেবপুর, বানিয়াজুরী, মাচান, নয়াবাড়ী, হোসনাবাদ, রঘুনাথপুর, সাভার, কাসিমপুর, মীর্জ্জাপুর, কলাতিয়া, নাজিরপুর, বহর, বজ্রযোগিনী, টঙ্গিবাড়ী, সোনারং, কলমা, আউটসাহী, হাসারা, বেজগাঁও, বালিগাঁও, চাচুরতলা, সিদ্ধিগঞ্জ, রূপগঞ্জ, বেলাব, মাধবদী, বালিয়াপাড়া, চেঙ্গাকান্দী, রামচন্দ্রদী, ধর্ম্মগঞ্জ, উদ্ধবগঞ্জ, কাচপুর, পঞ্চমীঘাট, লাঙ্গলবন্ধ, সোণাকান্দা, মুন্সীরাইল, শ্রীনগর, ষোলঘর, গালিমপুর, পলাস, টোকচাঁদপুর, ভাওয়ারিয়া, ফতুল্লা, জিঞ্জিরা, আবদুল্লাপুর, ভাগ্যকুল, রোয়াইল, ডেমরা, নবাবগঞ্জ, মাইজ্‌পাড়া, বারদী, রিকাববাজার, বিদগাঁও, গারুরগাঁও, দিঘীরপাড়, ইমামগঞ্জ, পুবাইল, সেরেজদিঘা, কামারখাড়া, প্রভৃতি স্থানে হাটবাজার আছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই চীন, তুরস্ক, সাইরিয়া, আরব, ইথিওপিয়া, পারস্য, ইতালী, লেস্তুইডক, স্পেন, সুরাট, পেগু প্রভৃতি স্থানের সহিত ঢাকার অবিচ্ছিন্ন বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল।

ঢাকার নারানখাদা ও বাকরখানি রুটির যথেষ্ট খ্যাতি আছে। বাকেরখাঁ কলান, (বড় বাকেরখাঁ) এর নামানুসারে এই রুটির নাম বাকরখানি হইয়াছে। ঢাকা সহরের পনীর, মলাই, ও অমৃতি; ফতুল্লা ও টাইটকার চিড়া, আবদুল্লাপুরের ক্ষীর; সোনারগাঁয়ের "হরিদাসখানি" দধি ও

সরভাজা; রামপালের কলা; বিক্রমপুরের পাতক্ষীর এবং নারিকেলের নির্ম্মিত জিরাচিড়া ও সন্দেশাদি বঙ্গপ্রসিদ্ধ। বিক্রমপুরের দধি ও ঘৃত অতি উৎকৃষ্ট। রোহিতপুর অঞ্চল হইতে বিস্তর ক্ষীর ঢাকাতে আমদানী হয়। হরিরামপুর থানার অধীন ঝিটকা গ্রামস্থ হাজারীগাজীর নামানুসারে তথাকার খেজুরগুড় "হাজারীগুড়" আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এখন হাজারীর পৌত্রগণ এই গুড় প্রস্তুত করে। ইহা অতি সুগন্ধবিশিষ্ট ও সুস্বাদু।

ভাওয়াল অঞ্চলের মধু ও মোম উৎকৃষ্ট।

বর্ত্তমানে ঢাকার কাঁসারি ও কুম্ভকারগণ পাইকারী ব্যবসায় করিয়া অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে। ইহারা মাল বোঝাই করিয়া ত্রিপুরা, নোয়াখালী, ও ময়মনসিংহ জেলার নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া কাঁসা ও পিতলের জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া থাকে। "গাওয়ালে" বহির্গত হইয়া মৃণ্ময় হাড়িপাতিলের বিনিময়ে ধান্য গ্রহণ করিয়া থাকে। জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াও কেহ কেহ অর্থশালী হইয়াছে।

তিলি, কুণ্ড, সাহা, বসাক, ও সুবর্ণ বনিকগণই জেলার প্রধান ব্যবসায়ী ও ধনী। ইহাদের তেজারতি বহু দূরদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ব্যবসায়ে অর্থশালী হইয়া অনেকেই লক্ষপতি হইয়াছেন। কেহ কেহ রাজা ও রায়বাহাদুর উপাধি পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঢাকার গন্ধবণিকগণমধ্যেও ব্যবসায়ে অনেকে বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। বাস্তবিক "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী" এই কথার তাৎপর্য্য ইহাদিগের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে অনেকেই নিঃস্ব। অধিকাংশেরই চাকুরীর উপর জীবিকা নির্ভর করিতেছে। দুর্ভিক্ষের

সময়ে এই তিন শ্রেণী মধ্যে অনেককেই যেরূপ কষ্ট পাইতে হয়, এরূপ আর কোনও শ্রেণীতে নয়, কারণ আভিজাত্যগৌরবহেতু ইহারা প্রাণান্তেও অন্যের নিকট প্রার্থী হয় না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল ব্যবসায় বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্যবসায়বুদ্ধির অভাবে আশানুরূপ ফললাভে কেহই সমর্থ হন নাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত অভিজাতসম্প্রদায় চাকুরীর মোহময় মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়া প্রতীচ্য দেশানুযায়ী ব্যবসায় প্রচলন করিতে পারিলে দেশের পক্ষে মঙ্গল, নতুবা এই হতভাগ্য দেশের আর কল্যাণ নাই।

ওজন।

ঢাকা জেলার সর্ব্বত্র জিনিষের ওজন সমান নহে। স্থানে স্থানে বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়। কাঁচি ও পাকি ভেদে ওজন দ্বিবিধ। কাঁচি ওজন ৬০ তোলায় এক সের, ও পাঁকি ওজন ৮০ তোলায় একসের হয়। টেইলার সাহেব যে সময়ে তদীয় "টপোগ্রাফি" প্রণয়ন করেন, তৎকালে ৮০৷৷০ তোলায় সের প্রচলিত ছিল, এবং কোনও কোনও জিনিষ ৭৮ তোলাতেও সের ধরা হইত।

পিতলকাঁসার জিনিষাদি কাঁচি হিসাবে, এবং চাউল, তৈল প্রভৃতি পাকি হিসাবে পরিমাণ করা হয়।

পাকি ওজনও সর্ব্বত্র সমান নহে। কোনও স্থানে ৮০ তোলা, কোথায় ৮২ তোলা, কোনও স্থানে ৮২৷৷৵০, কোথাও ৮৩৷৷৵০ এবং ৯০ তোলায় পাকি ওজন ধরা হয়। মীরকাদিম বন্দরে গুড় ক্রয়-বিক্রয় সময়ে ৯০ তোলায় সের ধরা হয়।

প্রচলিত ওজনের প্রণালী ঃ—

৪	ধানে	১ রতি,
৪	রতিতে	এক মাসা,
১২	মাসায়	এক তোলা,
৫	তোলায়	এক ছটাক,
১৬	ছটাকে	এক সের,
৫	সেরে	এক পসারি,
৮	পসারিতে	এক মণ।

সোণারূপা প্রভৃতি ১০ মাসায় এক তোলা ধরা হয়। ঔষধও মসলা ১২ মাষায় এক তোলা; মণি রত্ন, প্রবাল প্রভৃতি ১২॥ মাসায় এক তোলা।

মসলিন ওজন দরে বিক্রীত হইত। উহার নাম ছিল 'খুদি'। উৎকৃষ্ট মলমল ওজনে যত পাতলা হইত, ততই উহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত।

ষোড়শ অধ্যায়।

মেলা।

এই জেলার বহু স্থানে সাময়িক মেলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কার্ত্তিক বারুণীর মেলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই মেলাটী ধলেশ্বরীর দক্ষিণ তীরে কমলাঘাট ষ্টেশনের অনতিদূরে মুন্সীগঞ্জের উত্তর এবং রিকাব-বাজারের পূর্ব্বদিকে জমিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই মেলা কার্ত্তিক মাসের পৌর্ণমাসিতে আরম্ভ হইয়া কেবলমাত্র তিন সপ্তাহ কাল স্থায়ী হইত। বর্ত্তমান সময়ে অগ্রহায়ণ অথবা পৌষ মাসে আরম্ভ হইয়া ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত থাকে। মেলার সময়ে প্রায় সহস্রাধিক পণ্য-বীথিকা এই স্থানে সমাগত হয়। চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী নানাস্থান হইতে বিপুল জনসংঘ ক্রয়বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইয়া এই স্থানটীকে আনন্দ-মুখরিত করিয়া তোলে। প্রতি বৎসরই আমোদ প্রমোদান্বেষি দর্শক ও ব্যবসায়ীগণের প্রায় ত্রিংশৎ সহস্র তরণী এখানে সমাগত হইয়া থাকে। এই মেলায় ন্যূনাধিক এক কোটি টাকার মাল বিক্রীত হয়। অনেক ব্যবসায়ী দূরদেশান্তর হইতে সমাগত হইয়া সম্বৎসরের মাল এখান হইতে খরিদ করিয়া নেয়। এতৎপ্রদেশে এরূপ বিরাট মেলা আর নাই। অমৃতসহর, দিল্লী, প্রভৃতি নানা দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও বণিকগণ এখানে বাণিজ্য করিতে আগমন করে। মগ জাতিরা কাচ এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ এই মেলায় আনয়ন করে। শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, পাবনা, বাখরগঞ্জ, সুন্দরবন-

প্রভৃতি অঞ্চল হইতে অনেক পাইকার ক্রয়বিক্রয়ের জন্য এখানে আসিয়া থাকে।

কাবুলী মেওয়া, শাল, বনাত প্রভৃতি নানাবিধ শীতবস্ত্র; শ্রীহট্ট ও কাছার প্রদেশ হইতে কমলালেবু; ব্রহ্মদেশ ও আসামজাত নানাবিধ কাষ্ঠ, মোম; কলিকাতা হইতে বিবিধ মনোহারি জিনিষ, ছাতা, জুতা, কাপড় প্রভৃতি; রংপুর ও পূর্ণিয়ার তামাক; এবং ঢাকা জেলার নানা স্থান হইতে উৎপন্ন বিবিধ শিল্পসম্ভারের একত্র সমাবেশ এখানে পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বে রেশমী বস্ত্র, লৌহ, চর্ম্ম, কার্পাস, চিনি, নীল, লাক্ষা, মৃগনাভি, প্রভৃতি দ্রব্যাদি নানাস্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে ঐ মেলায় বিক্রয়ার্থ সমাগত হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইত। জুয়াখেলা, রং তামাসা এবং অন্যান্য প্রকারের আমোদ প্রমোদেরও ত্রুটী হয় না। মেলার নিত্য সহচর চোর, জুয়াচোর, গাইটকাটার ও প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহাদিগের দমনোদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টের সান্ত্রী প্রহরী নিয়োজিত থাকিলেও উহাদিগের কবল হইতে সরল বিশ্বাসী দর্শকবৃন্দকে প্রায়ই লাঞ্ছিত হইতে দৃষ্ট হয়।

প্রথমতঃ বারুণীস্নান উপলক্ষেই এই মেলাটীর অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল। এখনও মেলার সময়ে পূর্ণিমাতিথিতে হিন্দুগণ এখানে তীর্থ স্নান করিয়া পবিত্রতালাভ করে।

"হিষ্টরী অব কটন মেনুফেক্চার" নামক গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা লেখক এই (১) স্থানটীকে ঐতিহাসিক Gange Regia নামক স্থানের সহিত অভিন্ন মনে করেন। এই Gange Regia সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত।

---

১) ডাঃ টেইলারকেই অনেকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

মেজর রেণেল প্রাচীন গৌড় নগরকে, D'Anville রাজমহলকে, বিলফোর্ড হুগলী নগরীকে, হীরেন (Heren) ছুলিয়াপুর নামক স্থানকে Gange Regia আখ্যা প্রদান করিতে সমুৎসুক।

কোনও অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার বলেন "হিন্দুরাজত্ব সময় হইতে এই বারুণী মেলার অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে এই স্থানের নাম ছিল লক্ষীবাজার (লক্ষবাজার)। কোনও মহাজনের ব্যবসায়ের মূলধন লক্ষমুদ্রার ন্যূন হইলে তিনি এই স্থানে বাস করিতে পারিতেন না; ইহাই নাকি বিক্রমপুরাধিপের আদেশ ছিল"। দেশের ব্যবসায়বাণিজ্য পরিচালনাবিষয়ে হিন্দুরাজগণের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল; তাঁহারা কোনও দ্রব্যাদির রপ্তানি একেবারে বন্ধ করিয়াও দিতে পারিতেন। ক্রয়বিক্রয়াদি রাজানুজ্ঞা অনুসারেই সম্পন্ন হইত। লভ্যাংশের শতকরা ৫৲ টাকা রাজার প্রাপ্য ছিল (১)।

অশোকাষ্টমীর মেলা।

প্রতি বৎসর অশোকাষ্টমীর দিন নদরাজ ব্রহ্মপুত্রের পূতসলিলে অবগাহন করিবার জন্য লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাটে নানা দূরদেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী সমাগত হয়। এই উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্রতীরে মেলা জমিয়া থাকে। ২।৩ দিবসব্যাপী এই মেলাটী স্থায়ী হয়। এই মেলাটি চৈত্রবারুণী নামে সাধারণ্যে সুপরিচিত।

ধামরাইর রথমেলা।

রথদ্বিতীয়া উপলক্ষে ধামরাই গ্রামে একটী মেলার সূচনা হইয়া প্রায় একপক্ষকাল স্থায়ী হয়। ধামরাই বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত; এই সময়ে বহুটাকার সূক্ষ্মবস্ত্রাদি এখানে বিক্রীত হয়।

---

(১) Heren's Asiatic Nations Vol III. Page 349.

উত্থানএকাদশী এবং মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষেও এখানে মেলা বসিয়া থাকে।

কলাতিয়ার মেলা।

কলাতিয়া গ্রামের ধীবরগণ সম্রাট পঞ্চম জর্জের মেলা নামে একটা নূতন মৎস্তমেলা স্থাপন করিয়াছে। প্রতি বৎসর ১২ই ডিসেম্বর এই মেলার অধিবেশন হয়। প্রচুর পরিমাণে মৎসের আমদানী করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করাই এই মেলার উদ্দেশ্য। এই বৎসর ১২ই মাঘ মেলা বসিয়াছিল।

মাণিকগঞ্জের মেলা।

দোলপূর্ণিমা ও শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে মেলা জমিয়া থাকে। দোলমেলা প্রায় একপক্ষকাল স্থায়ী হয়। মেলা উপলক্ষে নানাবিধ আমোদ প্রমোদেরও রীতিমত ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

কলাকোপার মেলা।

কলাকোপা রাজারামপুর নামক স্থানে একমাসব্যাপী একটী মেলার অধিবেশন হয়। প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমায় আরম্ভ হইয়া দোলপূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই মেলাটি স্থায়ী হইয়া থাকে। কলাকোপার হরেকৃষ্ণ পোদ্দার এই মেলার সংস্থাপক। খেজুরের চিনী ও খেজুরের গুড় প্রচুর পরিমাণে এই মেলায় বিক্রীত হয়।

বুতুণীর মেলা।

প্রতি বৎসর বারুণী স্নান উপলক্ষে এখানে একটি মেলা জমিয়া থাকে। পূর্ব্বে নানা দূরদেশান্তর হইতে অনেকানেক লোক এই মেলায় সমাগত হইত। কিন্তু এক্ষণে মেলাটীর আর পূর্ব্বের ন্যায় সম্পদ নাই। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের ঔদাস্তে ইহা শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে।

শ্রীনগরের রথমেলা।

রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে অষ্টাহব্যাপী একটী বৃহৎ মেলার অধিবেশন হয়। এই মেলায় শ্রীনগরের প্রসিদ্ধ কুম্ভকারগণের প্রস্তুত নানাবিধ সুদৃশ্য মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বিক্রমপুরের নানাস্থান হইতে এই সময়ে এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। দূরদেশান্তর হইতে আগত দোকানদারগণ বিবিধ পণ্যসম্ভার দ্বারা তাহাদের ক্ষুদ্র পণ্য-বিথীকা পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে। এই সময়ে নানাবিধ আমোদ প্রমোদেরও ত্রুটী হয়না।

লৌহজঙ্গের ঝুলনমেলা।

শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে লৌহজঙ্গ গ্রামে একটী বৃহৎ মেলা জমিয়া থাকে। এতদুপলক্ষে লৌহজঙ্গের প্রসিদ্ধ ধনী পালচৌধুরীগণ যথেষ্ট আমোদপ্রমোদেরও সুব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন।

উয়ারীর মেলা।

প্রতি দুইবৎসর অন্তর এই গ্রামে মাঘমাসে একটী মেলার অধিবেশন হইয়া থাকে। এই মেলা সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। মেলা উপলক্ষে এই স্থানে নানা দূরদেশান্তর হইতে বহু সাধু, ফকির, বৈরাগী ও বৈষ্ণব প্রভৃতির সমাগম হয়। মেলার কয়দিন সাধুসন্ন্যাসীগণ খোলকরতাল সংযোগে নামকীর্ত্তন ও নানাবিধ উৎসবাদি করিয়া থাকেন। দিবারাত্রি সমভাবেই কীর্ত্তন চলিয়া থাকে। এই মেলার একটী বিশেষত্ব এই যে, পূর্ব্বে কাহাকেও মেলার বিষয়ে সংবাদ না দিলেও সাধুসন্ন্যাসীগণ নির্দ্দিষ্ট দিবসে এই স্থানে সমবেত হইতে আরম্ভ করে।

রাড়িখালের মেলা।

এই গ্রামেও প্রতিবৎসর মাঘমাসে ফকিরদিগের একটা মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলা দুইদিন মাত্র স্থায়ী হয়। নানা স্থান হইতে সশিষ্য বহু ফকির এই সময়ে এই মেলায় আসিয়া যোগদান করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত চৈত্র সংক্রান্তি এবং ১লা বৈশাখ তারিখে ঢাকা জেলার প্রায় সমুদয় বন্দরেই ক্ষুদ্র বৃহৎ মেলার অধিবেশন হয়। উহা "গলইয়া" নামে সুপরিচিত। এই সমুদয় গ্রাম্য মেলায় হাড়ি, পাতিল প্রভৃতি মৃন্ময় পাত্র, নানাবিধ মসলা বালকচিত্তবিনোদনকারী নানাবিধ খেলনা ও মনোহারি জিনিষ, বিন্নি, জিলিপি, ফাঁপা, বাতাসা প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হয়।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে ঢাকায় কৃষিও শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দ হইতে মহারাণীর ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণের স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারী তারিখে নবাব বাহাদুরের বিস্তীর্ণ সাহবাগ উদ্যানে শিল্প প্রদর্শনী হইত। এই প্রদর্শনীর সমুদয় ব্যয় ভার স্বর্গীয় নবাব আসানউল্লা বাহাদুর বহন করিতেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

সাধারণ স্বাস্থ্য ও জল বায়ু।

ঢাকা জেলার জল বায়ু ও সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নয়। নিম্নবঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটী ঋতুর, বিশেষতঃ বর্ষার প্রকোপ অধিকতর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

শীত—শীতের প্রকোপ জেলার দক্ষিণাংশ অপেক্ষা উত্তরাংশেই অধিকতররূপে অনুভূত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মের এবম্বিধ তারতম্য অক্ষাংশের পার্থক্যহেতুই যে সংঘটিত হয়, তাহা নহে। জেলার দক্ষিণ-ভাগ নদীসঙ্কুল; পক্ষান্তরে উত্তরভাগ বৃক্ষরাজিসমাচ্ছন্ন। জেলার উত্তরাংশের শীতাতিশয্যের ইহাই নাকি প্রধান কারণ। শীতকালে তাপমান যন্ত্রদ্বারা ৮৭'৮° ডিগ্রীর অধিক এবং ৫০'৪° ডিগ্রীর ন্যূন তাপ এই জেলায় পরিলক্ষিত হয় না। শীতকালে এই জেলায় কোনও কোনও স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। আশ্বিন, কার্ত্তিক ও চৈত্র মাসে কলেরা আরম্ভ হইয়া থাকে। মাঘ মাসে বৃষ্টিপাত হইলে রবিশস্য ভাল জন্মে।

শীতকালে পশ্চিম, উত্তর এবং পশ্চিমোত্তর কোণ হইতে বাতাস বহিতে থাকে। শীতের প্রারম্ভে প্রথমতঃ পশ্চিমদিক হইতে বাতাস বহে। শীতবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর গতির পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে উত্তরদিক হইতে বহিতে থাকে। শীতের প্রাচুর্য্যবশতঃ তুষারপতন দ্বারা শস্যহানির বিষয় অবগত হওয়া যায় না।

অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত শীত স্থায়ী থাকে। ১৩১১ সনের

২১শে মাঘ শুক্রবার হইতে এই জেলাতে প্রবল শীত এবং তদানুষঙ্গিক তুষারপতন হইয়াছিল।

গ্রীষ্ম—বঙ্গের অন্যান্য অনেক জেলা অপেক্ষা এই জেলায় গ্রীষ্মাতিশয্য কম। এই জেলার উত্তরাংশস্থিত নিবিড় বনরাজি এবং দক্ষিণভাগস্থিত নদনদীকুল ও ঝিলসমূহের অবস্থানই নাকি ইহার অন্যতম কারণ। বৈশাখের অন্তে এবং জৈষ্ঠের প্রারম্ভেই গ্রীষ্মের প্রকোপ কিছু বেশী হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে তাপমানযন্ত্র দ্বারা ৯৯·৩° ডিগ্রীর অধিক এবং ৬৫° ডিগ্রীর ন্যূন তাপ এই জেলায় পরিলক্ষিত হয় না। গ্রীষ্মের শেষভাগে মধ্যে মধ্যে বারিপাতনিবন্ধন তাপ হ্রাস পাইতে থাকে।

সাধারণতঃ বৈশাখ অন্তেই ষান্মাসিক বায়ুপ্রবাহ আরম্ভ হইতে থাকে। এই সময়ে প্রায় প্রত্যহই সায়ংকালে আকাশমণ্ডল ঘনসমাবৃত হইয়া ঝড় উঠিয়া থাকে। ফলে কোথাও বৃহৎ মহীরূহ সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়ে; কোথাও বা গৃহসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। প্রকৃতির এই তাণ্ডবনৃত্যকালে নদনদীর জলস্রোতও ভীষণ তরঙ্গায়িত হইয়া আরোহীসহ ক্ষুদ্র বৃহৎ তরণীসমূহ স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া ফেলে।

ষান্মাসিক বায়ুপ্রবাহ প্রথমে দক্ষিণদিক হইতে প্রবাহিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে উহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া পূর্ব্বদিকে এবং অবশেষে উত্তরপূর্ব্বদিকে সরিয়া যায়।

সাধারণতঃ চৈত্রমাসেই শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে। শিলাবৃষ্টিতে বোরধান্য, তিল, ক্ষিরাই পাট এবং আম্রের ক্ষতি সংসাধিত হয়।

চৈত্রমাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্তই গ্রীষ্মের প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়।

বর্ষা—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ঢাকা জেলা নদীবহুল দেশ। অসংখ্য নদনদী ইহার বক্ষোদেশে উপবীতবৎ শোভা পাইতেছে। এই জেলার পূর্ব্বে, দক্ষিণে, এবং পশ্চিমে তিনটী প্রধান নদনদী প্রবাহিত।

বৈশাখ মাস হইতেই নদীজল ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে অথবা শ্রাবণ মাসের প্রথমেই উহা সম্পূর্ণতা লাভ করে। বর্ষার জলপ্লাবনে একদিকে যেমন লোকের বাড়ীঘরে জল উঠিয়া অশান্তির উৎপাদন করে, পক্ষান্তরে আবার সম্বৎসরের আবর্জ্জনারাশি ধৌত করিয়া ম্যালেরিয়া বীজ সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হয়। ভাওয়াল ও ঢাকা সহরের উত্তরাংশ এবং কাশিমপুর অঞ্চল ব্যতীত জেলার প্রায় সমুদয় স্থানই বর্ষাকালে প্লাবিত হইয়া যায়। সেই প্লাবনমধ্যে, গ্রামগুলি যেন প্রবল-পবন-তাড়িত উর্ম্মিসঙ্কুল সমুদ্রমধ্যে বৃক্ষরাজিপরিশোভিত অসংখ্য দ্বীপমালার শোভা ধারণ করে। আর, গ্রামগুলির অভ্যন্তর দেখিলে মনে হয়, যেন সমুদয় জেলাটাই ভেনিস নগরের আকার ধারণ করিয়াছে। নৌকার সাহায্য ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সময়ে কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি জলজ পুষ্প ঝিলের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়, এবং নদীর ধার শুভ্র কাশপুষ্পদ্বারা ভূষিত হইয়া উহা ভাসমান উদ্যানবৎ প্রতীয়মান হয়।

সাধারণতঃ আশ্বিন মাস হইতেই বর্ষার জল কমিতে আরম্ভ করে; কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রকৃতি পুনরায় রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। এই সময়ে পুনঃ পুনঃ শিলাবৃষ্টি ও ঝড় হইয়া সমুদয় জেলাটিকে আলোড়িত করিয়া তোলে।

কার্ত্তিক মাসেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়।

বর্ষার জল প্লাবনে পললময় মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং বর্ষার কষ্ট নিতান্ত বিপজ্জনক হইলেও উহা একাধিক প্রকারে উপকারসাধন করিতে সমর্থ হয়।

এই জেলার দক্ষিণাংশ অপেক্ষাকৃত নিম্ন হইলেও বর্ষা অন্তে এই স্থানে জল আবদ্ধ থাকে না; সুতরাং এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ একেবারেই নাই। মাণিকগঞ্জের পশ্চিমভাগে এবং ভাওয়াল অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক পরিলক্ষিত হয়।

লাক্ষ্যাতীরবর্ত্তীস্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর। পদ্মার সলিলরাশি অতিশয় ঘোলা হইলেও উহা পান করিলে কোনও অসুখ হয় না।

এই জেলায় ম্যালেরিয়া, জ্বর, অজীর্ণ, প্লীহা, উদরাময়, কোরণ্ড, গোঁদ এবং চর্ম্মরোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। ঢাকা সহরে গোদ ও কোরণ্ড রোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা অধিক লক্ষিত হয়। কূপোদক পানই নাকি এই সমুদয় রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ।

১৮১৭ খৃঃ অব্দে যশোহর অঞ্চল হইতে এই জেলায় কলেরা রোগ প্রথম প্রবেশ লাভ করে। জলের কল স্থাপনের পূর্ব্বে ঢাকা সহরে কলেরার প্রকোপ খুব বেশী ছিল।

১৮৩৭ খৃঃ অব্দে এই জেলার উত্তরাংশে গোমড়ক আরম্ভ হয়। তাহাতে বহু সংখ্যক গো কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে উহা পুনরায় আরম্ভ হয়।

পূর্ব্বে বসন্ত রোগের প্রকোপও যথেষ্ট উপলব্ধি হইত। এক্ষণে কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

প্রাকৃতিক বিপ্লব।

ভূমিকম্প—কোনও প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ভারতবর্ষীয় অতীত ভূমিকম্পসমূহের আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া ভূকম্পহিসাবে ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষকে দ্বাদশটী বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই দ্বাদশ বিভাগ মধ্যে অষ্টম বিভাগে নিম্নবঙ্গ অবস্থিত। তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে এই দ্বাদশ প্রদেশের মধ্যে অষ্টম প্রদেশই সর্ব্বাপেক্ষা চঞ্চল এবং পৃথিবীস্থ ভূকম্পোপযোগী যাবতীয় স্থানের অন্যতম একটী।

অনেকের বিশ্বাস, আগ্নেয়গিরির অভ্যুদয়ই ভূকম্প উৎপত্তির সর্ব্বপ্রধান কারণ; কিন্তু পর্য্যবেক্ষণদ্বারা এই সিদ্ধান্ত অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যে সমুদয় নৈসর্গিক উপায়ে ভূকম্প সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে গঠনসম্বন্ধীয় ও ক্ষয়সম্বন্ধীয় কারণই অত্যন্ত বলবান্।

একটী বৃহৎ ভূমিকম্প হইলে ছোট ছোট অনেক কম্প তৎপশ্চাতে হইয়া থাকে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পের পরে অনুকম্পের (after-shock) বিবরণ সংগ্রহের জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছে। তাহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, মধ্যে মধ্যে আসামও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সমুদয় ছোট ছোট ভূমিকম্পের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ১২ই জুন তারিখের জগৎপ্রসিদ্ধ ভূকম্প-জাত অনুকম্পের জের মাত্র।

এই ভূমিকম্পে জেলার উত্তরাংশের অনেকানেক খালবিলের মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছে; বহুসংখ্যক সুরম্যহর্ম্ম্যরাজি ও প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপ একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া লোকলোচনের অন্তরাল হইয়াছে। ঐ ভূকম্পের ফলে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেললাইন্ ভাঙ্গিয়া গিয়া প্রায় দুই সপ্তাহকাল রেলের চলাচল বন্ধ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। বস্তুতঃ এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত ভূমিকম্পের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের কোনটীরই ধ্বংসকার্য্য ও বিস্তৃতি এই ভূমিকম্প অপেক্ষা অধিক ছিল না (১)।

"১০৭১—১০৭২ সনে ঢাকা হইতে ৭ দিন ব্যবধান, এমন একটী স্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। এই কম্প ৩২ দিন সংঘটিত হইয়াছিল; এই ভূমিকম্পের স্থান ও তারিখসমূহের স্থিরনির্দ্দেশ নাই"।

১১৬৮ সনের ১৮ই চৈত্র সোমবার বঙ্গদেশে ও ব্রহ্মদেশে যে একটী ভূকম্প অনুভূত হয়, তাহা ঢাকা পর্য্যন্তও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। মনিষীগণ এই কম্পের কেন্দ্রস্থল বঙ্গোপ-সাগরের নিলাম্বুরাশিমধ্যেই স্থির করিয়াছেন। এই ভূকম্পের ফলে ঢাকাতে হঠাৎ এরূপ বেগে জল বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাহাতে বহু সংখ্যক তরণী ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত ও অসংখ্য নরনারী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল (২)।

১২৫৩ সনের ২রা কার্ত্তিক শনিবার হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ঠা কার্ত্তিক সোমবার পর্য্যন্ত ময়মনসিংহে অন্যূন বিংশতিবার ভূকম্প হইয়াছিল। এতন্মধ্যে ৩রা কার্ত্তিক রবিবার দিবা ২।১৫ মিনিটের

---

(১) Rec. G. S. I. Vol XXX., Mem G. S. I. Vol XXIX, Vol XXX Pt. I. and Vol XXXV Pt II.

(২) Taylor's Topography of Dacca.

সময় একটী অতি ভীষণ কম্প হয়। এই কম্পের ফলে ঢাকাস্থ বহুসংখ্যক অট্টালিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়।

১২৫৭ সনের ২৫শে পৌষ বুধবার চট্টগ্রামে ২০ সেকেণ্ড কাল স্থায়ী একটী কম্প হইয়াছিল; এই কম্পও ঢাকাতে বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

১২৫৯ সনের ২৭শে শ্রাবণ মঙ্গলবার প্রাতে ৪।৩৭ মিনিটের সময় ঢাকাতে ১৫ সেকেণ্ডকালস্থায়ী একটী কম্প হইয়াছিল।

১২৭০ সনের ২২শে পৌষ মঙ্গলবার ঢাকাতে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে একটী কম্প অনুভূত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত ১১৩৮, ১১৮১, ১২১৮, ১২৭৮, ১২৯৭ সনেও এতদঞ্চলে ভূকম্প হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়; এতন্মধ্যে ১১৮১ ও ১২১৮ সনের ভূমিকম্পই একটু গুরুতর রকমের হইয়াছিল।

জলকম্প—ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে অথবা কোন কোন সময়ে স্বতন্ত্র ভাবেও জলকম্প হইয়া থাকে। ১৩০৯ সনের ৬ই ভাদ্র হইতে প্রায় সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত এতদঞ্চলে যে জলকম্প হইয়াছিল, তাহাই একমাত্র উল্লেখ যোগ্য।

জলপ্লাবন।

সাময়িক জলপ্লাবনে মধ্যে মধ্যে এই জেলার ভীষণ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। ১৭৮৭—৮৮ খৃঃ অব্দে যে ভীষণ বন্যাস্রোত এই জেলার বক্ষোদেশ প্লাবিত করিয়াছিল, তাহার বিবরণ মিঃ টেইলার তদীয় "টপোগ্রাফি অব ঢাকা" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মেঘনাদের মোহানার সান্নিধ্যবশতঃই জলপ্লাবনে এই জেলার বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। এই জলপ্লাবনে দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা

দিয়াছিল। ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে বর্ষার প্রারম্ভেই মেঘনাদের উচ্ছলিত বারিরাশি সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়াছিল। ফলে, বহু লোকের বাড়ী ঘর এবং শস্যাদি ধ্বংসমুখে পতিত হয়। এই প্লাবনের ফলে ১২০ খানা পরগণা ও তালুক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিল (১)। ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট ডে সাহেব এই জলপ্লাবন এবং উহার সহচর দুর্ভিক্ষের যে বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎপাঠে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন, "এই জলপ্লাবনে শুধু শস্যাদির অনিষ্ট ঘটিলে তাহার ক্ষতিপূরণ অনতিবিলম্বে করা সাধ্যায়ত্ত ছিল, কিন্তু জনসাধারণের যাবতীয় দ্রব্যাদি ও পশ্বাদি ধ্বংসমুখে পতিত হওয়ায় তাহারা বাড়ীঘর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ফলে সমগ্র দেশ জনশূন্য হইয়া পড়িল, ভূমিকর্ষণ করিবার লোকের অভাবে প্রায় সমুদয় জমীই পতিত অবস্থায় পড়িয়াছিল"।

১৭৮৭-৮৮ খৃঃ অব্দের বন্যার বিষয় ডাক্তার টেইলার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এবারকার বন্যাস্রোতঃ ভীষণতর মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন "মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভেই বারিপতন আরম্ভ হয়, এবং জুলাই মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বরুণদেব মুষলধারে বর্ষণকার্য্য করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করেন। ফলে, নদীজল অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উচ্ছ্বসিত প্রবাহে তটভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলে। ঐরূপ ভীষণ জলপ্লাবন অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিরাও পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করেন নাই। অন্যান্য জলপ্লাবনে ঢাকাসহর ভেনিসের আকার ধারণ করে। কিন্তু এই বন্যাস্রোতঃ সহরের বক্ষোদেশের উপর দিয়াই চলিয়াছিল। ফলে, সহরের রাস্তার উপর দিয়াই তরণী-

(১) See Dr. Taylor's Topography of Dacca, Page 301.

সমূহ চলাচল করিতে থাকে। অধিবাসীগণ, বাড়ীঘর সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া বংশনির্ম্মিত মঞ্চ প্রস্তুতপূর্ব্বক বাস করিত"।

"এই প্লাবনে দক্ষিণ ঢাকাস্থিত গ্রামসমূহেরই অনিষ্ট অধিকতর-রূপে সংসাধিত হইয়াছিল। রাজনগর, কার্ত্তিকপুর ও রসুলপুর এই তিনটী পরগণাতেই ক্ষতির মাত্রা কিছু অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল। মিঃ ডে ঐ সমুদয় স্থানে তৎকালে উপস্থিত হইয়া জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন। এই জলপ্লাবনের ফলে দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। প্রায় ৬০০০০ ষষ্ঠি সহস্র নরনারী প্রবল বন্যাস্রোতে এবং দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল (১)। ১৭৬৯-৭০,১৭৮৪,১৮৩৩-৩৪, ১৮৭০ ও ১৮৭৬ খৃঃ অব্দেও ভীষণ বন্যাস্রোতের দ্বারা এতদঞ্চল প্লাবিত হইয়াছিল। শেষোক্ত জলপ্লাবন ১২৮৩ সনের ১৬ কার্ত্তিক সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উহা "তিরাসী সনের বন্যা" নামে সাধারণ্যে পরিচিত। ২৯শে অক্টোবর তারিখে বঙ্গোপসাগরের বক্ষোস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সন্নিকটে ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত আরম্ভ হয়। এই বায়ুপ্রবাহ বঙ্কিমপথে প্রবাহিত হইয়া মেঘনাদের মোহানায় উপস্থিত হইয়াছিল। এই ঝটিকাবর্ত্ত ও জলপ্লাবনের ফলে প্রায় একলক্ষ লোক কালগ্রাসে পতিত হয় (২)।

বর্ষার প্লাবনসময়ে কখনও কখনও প্রচণ্ড বায়ুপ্রবাহ এবং উচ্ছ্বসিত বারিরাশি এতদুভয়ের সম্মিলিত শক্তিপ্রভাবে নদীস্রোতের গতি সংহত হইয়া থাকে। ফলে, ভীষণ জলপ্লাবন উপস্থিত হয় (৩)।

---

(১) Dr. Taylor's Topography of Dacca.

(২) Handbook of Cyclone &c. by Elliot.

(৩) Lyell's principles of Geology, chap. XIX, page 266

নদীবহুল প্রদেশে জলপ্লাবন অবশ্যম্ভাবী। এই জেলার তিন দিক তিনটী বৃহৎ নদীদ্বারা পরিবেষ্টিত। দুইটী অনল্পপরিসর স্রোতস্বতী এবং আরও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী এই জেলার বক্ষোদেশ ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহপরিবর্ত্তন সংসাধিত হওয়ায় দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভূভাগের ভূমি যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হইয়াছে। জেলার নিম্নভাগ প্রতি বৎসর বর্ষায় জলপ্লাবনে নিমজ্জিত হইয়া যায়, ফলে পলিমাটি সঞ্চিত হইয়া ঐ সকল স্থান ক্রমশঃ উচ্চতা-লাভ করিতেছে। আলমনদী এই প্রকারে জলপ্লাবিত নিম্নভূমির উচ্চতাসাধনে সহায়তা করিতেছে।

তুর্ণড ও ঝটিকাবর্ত্ত।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দের ৭ই এপ্রিল তারিখে শনিবার সন্ধ্যা ৭॥ টার সময় ঢাকায় যে ভীষণ তুর্ণড হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি আজিও অনেকের মন হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। সমগ্র বঙ্গদেশে ইহা "ঢাকার তুর্ণড" বলিয়া যেরূপ পরিচিত, বিক্রমপুরে তদ্রূপ ইহা "হাসাইলের ঝড়" বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। এই বাত্যা প্রথমে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার দিক হইতে ঢাকা সহরের দিকে আসিয়াছিল। প্রথমে ঈশানকোণে লোহিতবর্ণের মেঘ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ক্রমশঃ ঐ মেঘখানা সমুদয় আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে; এবং মুহূর্ত্তমধ্যে উক্ত ঝটিকাবর্ত্ত আরম্ভ হইয়া প্রলয়ের ধ্বংসের ন্যায় অট্টালিকা এবং গৃহাদি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলে। বিক্রমপুরান্তর্গত হাসাইল, ভরাকর, শৈলকোপা, বিদৈল প্রভৃতি কতিপয় গ্রামেও এই ভীষণ ঝটিকাবর্ত্তের প্রকোপ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ঢাকা সহরের ৩৫২১ খানা গৃহ এই তুর্ণডের ফলে ধরাশায়ী হয়। ঢাকার নয়নমনোরম "আসান-মঞ্জিল" প্রাসাদ, ইতিহাস-

প্রসিদ্ধ হুসনীদালান এবং রমনার কালীর মঠ প্রভৃতি ১৪৮ খানা ইটকালয় ভগ্ন হইয়া যায়। বস্তুতঃ এই তুর্ণডে ঢাকার প্রায় সমুদয় অট্টালিকারই অল্পাধিক পরিমাণে অনিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ১৩০ জন লোক হত এবং ১৫০০ লোক আহত হইয়াছিল। প্রায় ১২১ খানা নৌকা ও পুলিস ষ্টিমার জলমগ্ন হইয়া যায়। বিক্রমপুর অঞ্চলেও প্রায় ৭০ জন লোক এই ঝটিকাবর্ত্তের প্রবল তাড়নায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে শীতের প্রাখর্য্য অধিক অনুভূত হইয়াছিল না। গিরিমালার শিখরদেশ এবং পার্ব্বত্যস্থানসমূহেও তুষারপতনের মাত্রা অতি অল্প পরিমাণেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ফলে, প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নীতির ব্যতিক্রম হইয়া মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভেই বায়ুরতাপ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এপ্রিল ও মে মাসে দারুণ গ্রীষ্ম আরম্ভ হইল। এই গ্রীষ্মাতিশয্য এবং বায়ুর বাষ্পাভাব প্রায় সমগ্র বঙ্গদেশেই অনুভূত হইয়াছিল (১)।

এপ্রিল ও মে মাসের দারুণ গ্রীষ্মাতিশয্যহেতু বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ, গাঙ্গেয় সমতলপ্রদেশে ঘন ঘন উষ্ণ ঝটিকাপ্রবাহ, ঝঞ্ঝাবাত, শিলাবৃষ্টি, বালুকাবৃষ্টিও তুর্ণড আরম্ভ হইল (২)। ঢাকাতে প্রথমতঃ এই ঝটিকাবর্ত্ত সাধারণ উত্তরপশ্চিমদিকস্থ বায়ুপ্রবাহরূপে আরম্ভ হইয়া ভীষণ তুর্ণডের আকার ধারণ করিয়াছিল। ৪ মাইল দৈর্ঘ্য

---

(১) See Bay of Bengal and Arabian Sea Cyclone Memoirs by J. Elliot, Page 13.

(২) Ibid.

এবং ১০০ হইতে ১৫০ গজ পর্য্যন্ত প্রশস্ত স্থানসমূহে এই তূর্ণডের ধ্বংসকার্য্য সীমাবদ্ধ ছিল *।

১৯০২ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে (১৩০৯ সন, ১৯শে বৈশাখ) শুক্রবার সন্ধ্যার সময় ঢাকায় দ্বিতীয়বার তূর্ণড হয়। এই বার পারজোয়ারের দিক হইতে বায়ুপ্রবাহ প্রবলবেগে আসিয়া ঢাকা সহর অতিক্রমকরতঃ বক্রগতিতে পূর্ব্বাভিমুখে ১৬ মাইল পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। এই ১৬ মাইল পথের কোন কোন স্থানে ২০০ হাত কোথাও বা অর্দ্ধমাইল ব্যাপিয়া বাত্যা প্রবাহিত হইয়াছিল; এবং বহুসংখ্যক গৃহাদি ভগ্ন এবং বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়াছিল। ফলে ৩৮ জন লোক হত এবং ৩৩৮ জন আহত হইয়াছিল।

১৩১০ সনের ৫ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭॥০ টার সময়ে এতদঞ্চলে বিদ্যুৎপিণ্ড পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

অনাবৃষ্টি।

১৮৬৫ খৃঃ অব্দে এই জেলায় অনাবৃষ্টি হয়। সমুদয় বৎসরে গড়ে ২৯.০২ ইঞ্চি পরিমাণ বারিপতন হইয়াছিল। ফলে তৎপরবর্ত্তী বৎসরে ঢাকায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

অনাবৃষ্টির ফলে এই জেলার শস্যহানির বিষয় খুব কমই অবগত হওয়া যায়। বর্ষার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ভূমির শৈত্য অক্ষুণ্ণ থাকে। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে অনাবৃষ্টি হইয়া অতি শীঘ্র নদীজল স্ফীত হইলে শস্য হানির সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

---

* See Bay of Bengal and Arabian See Cyclone Memoirs by J. Elliot, page 13.

পঙ্গপাল।

১২৭৬ সনের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বেলা ২টার সময়ে এই জেলায় পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। দক্ষিণদিক হইতেই সময়ে সময়ে পঙ্গপালের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদিগের উৎপাত সমুদয় জেলামধ্যে পরিব্যাপ্ত হয় না। উৎপাতের মাত্রাও যৎসামান্য মাত্র।

১৮৬৬ খৃঃ অব্দে নারায়ণগঞ্জ, ফুলবাড়িয়া, সুয়াপুর প্রভৃতি অঞ্চলে, কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্রকায় পঙ্গপালকর্তৃক শস্যহানির বিষয় অবগত হওয়া যায় (১)।

দুর্ভিক্ষ।

সপ্তদশ শতাব্দীতে নবাব সায়েস্তাখাঁর শাসনসময়ে ঢাকায় চাউল এক টাকায় আট মণ বিক্রীত হইত। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঢাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিসের "ফাত্ইয়া ইব্রাইয়া" নামক গ্রন্থে এই দুর্ভিক্ষের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, যে ১৬৬৪ খৃঃ অব্দেই উহা সংঘটিত হইয়াছিল। নবাব মীরজুম্লার মৃত্যু হইলে সম্রাট ঔরঙ্গজেব বিহারের সুবাদার দায়ুদখাঁকে, স্থায়ী সুবাদার নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঢাকার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। দায়ুদখাঁর ঢাকায় আসিতে কিয়ৎকাল বিলম্ব ঘটিলে, সেনাপতি দিলিরখাঁ দায়ুদের স্থানে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করিতে থাকেন। ১৬৬৩ খৃঃ অব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর দায়ুদখাঁ ঢাকার সন্নিকটে আগমন করিয়া খিজিরপুরে তদীয় বাসস্থান মনোনীত করেন। এই সময়েই ঢাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা

---

(১) Mr. A. C. Sen's Report.

দিয়াছিল। দায়ুদখাঁ সম্রাটের অনুমতিগ্রহণের অপেক্ষা না করিয়াই দুর্ভিক্ষ দমনের জন্য শস্যের জাকত আদায় পরিত্যাগ করেন *।

১৭৬৯—৭০ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশব্যাপী যে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তাহার কবল হইতে ঢাকা জেলাও অব্যাহতি লাভ করিতে পারে নাই। এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত। ঐ দুর্ভিক্ষের সময়ে টাকায় ১২ সের করিয়া চাউল বিক্রীত হইয়াছিল; তাহাতেই এ জেলায় বহুলোক অন্নাভাবে স্ত্রীপুত্র ও আত্ম-বিক্রয় করিয়া উদরপালনের চেষ্টা করিয়াছিল। মিঃ. এ, সি, সেন লিখিয়াছেন "ঐ দারুণ দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে হঠাৎ ভীষণ প্লাবন উপস্থিত হইয়া জেলার সমুদয় শস্যের হানি জন্মাইয়াছিল। এই জলপ্লাবন দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই জলপ্লাবনের পরেই আবার মার্ত্তণ্ড ও পবনদেবের কৃপা কিছু অধিক মাত্রায় দেখা দিয়াছিল। ফলে এক বিন্দুও বারি পতন হইয়াছিল না"।

পুষ্করিণী ও কূপ জলশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল; ফলে, গ্রামে গ্রামে বৃক্ষাদির শাখাপ্রশাখা এবং বংশদণ্ডের ঘর্ষণে অগ্ন্যুদগম হইতে লাগিল। দুঃস্থ জনসাধারণ সাক্‌লা, জলপদ্মের মৃণাল প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। ফলে বহুলোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। বঙ্গের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলস্থিত স্থানসমূহ হইতে যে ঢাকা জেলায় এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম পরিলক্ষিত হইয়াছিল, শ্রীহট্ট জেলার সান্নিধ্যই তাহার একমাত্র কারণ। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে বঙ্গের একমাত্র শ্রীহট্ট অঞ্চলেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল।

---

* Shihabuddin Tallsh's Fathyia Ibrayia, page 110b. (manuscript translation by Prof. Jadunath Sarkar.)

১৭৮৪ খৃঃ অব্দে মেঘনাদের জলরাশি হঠাৎ স্ফীত হইয়া উঠে, ফলে, ভীষণ জলপ্লাবন উপস্থিত হইয়া আউস ও হৈমন্তিক এই উভয়বিধ ধান্তই নষ্ট হইয়া যায়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তাহার ফলে এতদঞ্চলের শস্য তথায় প্রেরিত হয়; সুতরাং পরবর্ত্তী বৎসরে এই জেলার ফসল নষ্ট হওয়ায় দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। অক্টোবর মাসেই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অধিক বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

১৭৮৭।৮৮খৃঃ অব্দের জলপ্লাবনের ফলে এতদঞ্চলে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে টাকায় ⁄৪সের করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ৬০০০০ লোক অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। রাজনগর ও কার্ত্তিকপুর পরগণাতেই এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অধিক পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কোনও কোনও পরগণায় প্রায় বার আনা রকম শ্রমজীবি লোকের অভাব হইয়া পড়িল। ফলে আবাদের অভাবে স্থানসমূহ ভীষণ অরণ্যসঙ্কুল হইয়া শ্বাপদ জন্তুর ক্রীড়ানিকেতনে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। শস্যের মূল্য প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ ডে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে এই জেলায় শস্য আমদানী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করেন। কিন্তু এপ্রিল মাস পর্য্যন্তও শস্যের আমদানী হইয়াছিল না। পরে, ৭২৫০ মণ শস্য মাত্র সহরে আসিয়া উপনীত হয়।

এই সময়ে আবার সহরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া প্রায় ৭০০০ খানা গৃহ এবং খুচরা ব্যাপারীদিগের সঞ্চিত শস্যাদি ভস্মীভূত হইয়া যায়; ফলে প্রায় শতাধিক লোক এই অগ্নিকাণ্ডে প্রাণত্যাগ করে।

১৮৩৩।৩৪ খৃঃ অব্দের জলপ্লাবনের ফলেও শস্যহানি হইয়া দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল।

১৮৬৫ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যা প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বঙ্গের অন্যান্য জেলার ন্যায় এই জেলায়ও অন্নকষ্ট হইয়াছিল। ঐ বৎসরে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল না। যৎকিঞ্চিৎ যাহা হইয়াছিল তাহাও দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত প্রদেশেই প্রেরিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী বৎসরে মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধিকাংশ স্থানে, লাক্ষ্যাতীরবর্ত্তী পল্যাসের সন্নিকটে এবং বিক্রমপুরের কোনও কোনও স্থানে শস্য কম জন্মিয়াছিল। জুন মাসে অতিবৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে এক বিন্দুও বারিপতন হয় নাই। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষের ইহাও অন্যতম কারণ। আবার, নারায়ণগঞ্জ, ফুলবাড়িয়া, এবং সূয়াপুর, প্রভৃতি স্থানে একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ পঙ্গপালের উপদ্রবে শস্য নষ্ট হইয়া যায়। ফলে শস্যের মূল্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময়ে বহুলোক অর্দ্ধাশনে বা অনশনে কালযাপন করিয়াছিল। কৃষকগণ সামান্য পরিমাণ চাউলের সহিত চিনা ও কাঐন মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিত। এই দুর্ভিক্ষসময়ে জেলার জমিদারগণ অকাতরে অন্নদান করিয়া বহুলোকের আহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। *

১৮৭০ খৃঃ অব্দে বর্ষার জলপ্লাবন কিছু বেশী হইয়াছিল। সুতরাং জেলার নিম্নভূমিগুলি জলমগ্ন হইয়া যায়। ফলে জেলায় শস্যহানি হইয়া দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছিল না।

---

* ঢাকার অবদানকল্পতরু প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় নবাব খাজে আবদুলগণি দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখিয়া ভিখারীদিগকে অন্নদান করিবার জন্য "পুরব দরজা" মহল্লায় একটী "লঙ্গরখানা" স্থাপন করেন। এই লঙ্গরখানায় বহু দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোক প্রতি-পালিত হইয়াছিল।

১৮৭৩ খৃঃ অব্দে বিহার প্রদেশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইলে এই জেলার কোনও কোনও স্থানে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে ধামরাই, সুয়াপুর, এবং মাণিকগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমার কোনও কোনও স্থানে সাহায্য প্রদান করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

১৯০৭ খৃঃ অব্দে বর্ষাকালে অত্যধিক পরিমাণে জলবৃদ্ধি হওয়ায় ঐ বৎসরও দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়। এই সময়ে ১০৲।১২৲ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রীত হইয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে উহা বেশী দিন স্থায়ী হইয়াছিল না।

দুর্ভিক্ষের কারণ—পূর্ব্বোল্লিখিত দুর্ভিক্ষগুলির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে সাধারণতঃ জলপ্লাবন, অনাবৃষ্টি ও পঙ্গপালের উপদ্রব এই তিনটী কারণই প্রধান বলিয়া মনে হয়। এই তিনটী বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

জেলার কোন্ কোন্ স্থানে শস্যহানির সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আমরা এই জেলাকে নিম্নলিখিত ৫টী বিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব।

১। কাশিমপুর ও ভাওয়াল পরগণা।

২। লাক্ষ্যা ও আরিয়লখা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ।

৩। মেঘনাদ, পদ্মা, যমুনা এবং ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদনদীর দিয়ারা।

৪। মুন্সীগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ মহকুমা এবং সদর মহকুমার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানার স্থানসমূহ।

৫। একদিকে বংশী নদী এবং অপরদিকে গাজীখালি নদী এবং রাবরাবণের খাল, এই সীমাবচ্ছিন্ন ভূভাগ।

১। এই বিভাগে সমুদয় বিভিন্ন প্রকারের ধান্যই উৎপন্ন হয়। পাট ও আউস ধান্য উচ্চভূমিতে, রোয়া আমন ধান্য ক্রমনিম্ন ভূমিতে,

এবং বোরো ধান্য ঝিলের কিনারায় জন্মিয়া থাকে। লম্বা ডাটযুক্ত আমন ধান্য ঝিলসমূহের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে এবং ভূরাগ, সালদহ, লবনদহ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর তীরবর্ত্তী স্থানেও উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে এই অঞ্চল হইতে জেলার অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে চাউল প্রেরিত হইত। কিন্তু এক্ষণে পাটের চাষ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়,উৎপন্ন শস্য এই অঞ্চলের অভাব বিমোচন করিয়া উদ্‌বৃত্ত হইতে পারে না; সুতরাং জেলার অন্যান্য স্থানে পূর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে। উচ্চভূমিতেজাত পাট এবং আউস, ও রোয়া ফসলের অবস্থা বৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। মে অথবা তাহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণ বারিপতন হইলেই এই সমুদয় শস্য যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। জুন মাস পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হইলে আউস ধান্য ও পাট বপন করা যায় না; এবং জুলাই মাসেও যদি পর্জ্জন্যদেবের কৃপা না হয়, তবে আমন শস্য রোপণেরও আশা থাকে না।

২। জেলার মধ্যে এই অঞ্চলেই অধিক পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়। এখানকার জমিও অপেক্ষাকৃত উন্নত, সুতরাং জলপ্লাবনদ্বারা শস্যহানির আশঙ্কা খুব কম। বৎসরের প্রথমে বৃষ্টি না হইলেও তেমন অনিষ্টদায়ক হয় না। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে মধ্যে মধ্যে, বারিপতন হইলে সুশস্য জন্মিয়া থাকে। জেলার মধ্যে এখানকার চাষীগণের অবস্থাই খুব ভাল।

৩। পাটও আউস ধান্যই এই অঞ্চলের প্রধান শস্য। এই অঞ্চলের জমি অল্পাধিক পরিমাণে জলপ্লাবনের অধীন। যথাসময়ের পূর্ব্বে নদীজলের স্ফীতি হইলে শস্যহানির সম্ভাবনা; বপনকার্য্যে কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিলে উহা আরও বেশী অনিষ্টদায়ক হয়। সুতরাং

এই অঞ্চলে সুশস্য উৎপাদন পক্ষে বৎসরের প্রথম ভাগেই বারিপতন হওয়া আবশ্যক। কারণ তাহা হইলে বপনকার্য্য যথাসম্ভব শীঘ্রই আরম্ভ হইতে পারে এবং জলপ্লাবন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রাবণ মাসেই শস্য কর্ত্তিত হইতে পারে। এই অঞ্চলে ডাল, সরিষা ও তিলের চাষ হইয়া থাকে। সুতরাং আউস ধান্য ও পাট ফসলের অনিষ্ট হইলেও উক্ত ফসল দ্বারাই ক্ষতিপূরণ হইতে পারে। রায়পুরা থানার অন্তর্গত কতিপয় স্থানে রোয়া ধান্যের চাষই অধিক পরিমাণে হয়; অনাবৃষ্টির ফলে এই ফসলের অনিষ্ট খুব কমই সংঘটিত হইয়া থাকে।

৪। এই অঞ্চলে লম্বা ডাটযুক্ত আমন ধান্যই মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। চৈত্র, বৈশাখও জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হইলে এই ফসল ভাল জন্মে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের পরেই এই ফসল জলপ্লাবনে নিমগ্ন হইয়া যায়; সুতরাং সুশস্য উৎপাদনপক্ষে বৃষ্টির আবশ্যক হয় না। জলপ্লাবনহেতু হঠাৎ জলবৃদ্ধি হইলে চারা নিমগ্ন হইয়া যায়; সুতরাং তাহাতে শস্য হানি হইতে পারে। রবিশস্য খুব কমই জন্মে; সুতরাং শস্যহানি জন্মিলে রবিশস্য দ্বারা ক্ষতিপূরণ হইবার আশা নাই।

৫। এই অঞ্চলে লম্বা ডাটযুক্ত আমন ধান্য এবং প্রচুর মটর উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলেই জলপ্লাবনদ্বারা অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে জলপ্লাবনের ফলে ধান্যাদি শস্য একেবারে ভাসাইয়া নেয়। এই অঞ্চলে লোকসংখ্যা কম, কৃষকগণ মটর বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইয়া থাকে। আলমনদী দ্বারা এই অঞ্চলের অনেক পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা আছে।

সুতরাং দেখা যায় যে চৈত্রও বৈশাখ মাসের বারিপতনের উপরই ঢাকা জেলার শস্যাদি নির্ভর করিয়া থাকে। এই দুই মাসে বৃষ্টি না হইলেই গবর্ণমেন্টের চিন্তার কারণ জন্মে। এই জেলা মধ্যে মাণিকগঞ্জ

ও মুন্সীগঞ্জ মহকুমাদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ স্থান গুলি, এবং সদর মহকুমার অন্তর্গত :নবাবগঞ্জ থানার গ্রামসমূহেই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতে পারে। গ্রীষ্মকালের শেষভাগে এই অঞ্চলের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াতের সুবিধা নাই ; এই সময়ে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে জনগণের কষ্ট বর্ণনাতীত হয়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিবিধ।

মিউনিসিপালিটি; জলের কল; আলো; ঠিকাগাড়ী; জেলাবোর্ড; লোকেল বোর্ড; পাউণ্ড; গুদারা; রেল ও ষ্টীমার পথ; ডাকও টেলিগ্রাফ; চিকিৎসালয়; পাগলাগারদ; হাসপাতাল; জেল; প্রভৃতি।

মিউনিসিপালিটি—"১৮৬৪ খৃঃ অব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে ঢাকায় স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ১১ই আগষ্ট তারিখে কমিশনরগণের প্রথম সভা আহূত হইয়াছিল। ঐ সভায় নগরের গৃহাদির উপর এবং ভূমির উপর আয় ধরিয়া ঐ আয়ের উপর শতকরা ৭॥৹ টাকা হারে টেক্স ধার্য্য হয়। ঐ সময়ে সমগ্র ঢাকা সহরে করদাতার সংখ্যা হইয়াছিল ১৬০৬০ জন। কার্য্যের সুশৃঙ্খলা বিধান জন্য সহরটিকে ১৬৬ মহল্লায় বিভক্ত করিয়া, কর আদায় জন্য ১৪ জন তহসিলদার নিযুক্ত করা হইয়াছিল। পরে তহসিলদারের সংখ্যা কমাইয়া ১০ জন করা হয়।

"১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর মদনগঞ্জ বন্দরকে নারায়ণগঞ্জের অন্তর্ভূক্ত করিয়া নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয়। নারায়ণগঞ্জই এই প্রদেশমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মিউনিসিপালিটি।"

জলের কল—"১৮৭৪ সনের আগষ্ট মাসে রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক কর্ত্তৃক ঢাকায় জলের কলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে ১৭৫০০০৲ টাকা ব্যয়ে জলের কলের কার্য্য শেষ হয়। জলের

কল প্রতিষ্ঠার জন্য অবদানকল্পতরু স্বর্গীয় নবাব স্যার আবদুলগণি লক্ষ টাকা প্রদান করেন; বক্রী ৯৫০০০৲ টাকা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। নগরবাসীদিগকে করভারে প্রপীড়িত না করা হয়, এই সর্ত্তেই নবাব বাহাদুর টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে সহরে জলের কল খোলা হয় এবং ফিলটার না করিয়াই সহরবাসীদিগকে কলের জল প্রদান করা হয়। পরবর্ত্তী বৎসরে সহরের কেবল মধ্যভাগে পরিষ্কার জল প্রদান করা হয় এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর হইতে "লোহারপুল" পর্য্যন্ত বড় বড় রাস্তাগুলিতে পরিষ্কার জল প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তায় জল প্রদানের বন্দোবস্ত ছিল না।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ঢাকার মিউনিসিপাল কমিটি ৫০০০০৲ টাকা ঋণগ্রহণ করিয়া কলবৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। ঐ সময়ে "ডিউক অব কনট" কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। তদীয় শুভাগমন চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ঢাকার স্বনামধন্য স্বর্গগত নবাব স্যার আসানুল্লা বাহাদুর ১১০০০৲ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ঐ অর্থে সহরের উত্তর অংশে—নবাবপুর হইতে ঠাটারীবাজার এবং দেলখোস-বাগ পর্য্যন্ত জলপ্রদানের বন্দোবস্ত হয়। ঐ লাইন "Cannaught-Extension" নামে অভিহিত হইবে, নির্দ্ধারিত হয়।

১৮৯১ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট হইতে ১২৫০০০৲ টাকা ঋণগ্রহণ করিয়া ঢাকার মিউনিসিপালিটি সহরের সর্ব্বত্র জলপ্রদানের সুবিধা করেন।

বঙ্গ বিভাগের পরে ঢাকায় প্রাদেশিক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলে, প্রতি বাড়ীতে জলেরকল প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ প্রদান করা হয়।

জলেরকলে সহরের সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নত করিয়াছে। পূর্ব্বে

কলেরার প্রকোপ অত্যন্ত অধিক পরিলক্ষিত হইত। কিন্তু জলেরকল প্রতিষ্ঠার পর হইতে তাহা অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

১৯০৪।০৫ খৃঃ অব্দে নারায়ণগঞ্জে জলের কল স্থাপনের প্রস্তাব হয় ও ১৭৯০০০৲ টাকা ব্যয়ে সহরের দুইটী মহল্লায় unfiltered জল-প্রদানের ব্যবস্থা হয়। এখন নারায়ণগঞ্জে জলেরকলের বন্দোবস্ত হইয়াছে।

বৈদ্যুতিক আলো।

১৮৭৭ খৃঃ অব্দে নবাব স্যার আব্দুলগণি বাহাদুর K. C. S. I উপাধি পাইলে, নবাব স্যার আসানউল্লা বাহাদুর তাঁহার স্মরণার্থে ঢাকা নগরে অলোকপ্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। পরে সহরটিকে বৈদ্যুতিক আলোক মালায় বিভূষিত করিবার জন্য তিনি ২ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করেন। ঐ টাকায় তাড়িতালোকের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আলোকপ্রদানের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ নবাব বাহাদুর আরও দুই লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই আলোক উপভোগের জন্য সহর-বাসীকে কোনও টেক্স প্রদান করিতে হয় না।

ঠিকাগাড়ী।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে মিঃ সিরকোর নামক কোন আমেরিকান বণিক এই জেলায় সর্ব্বপ্রথম ঠিকাগাড়ী আমদানী করেন। দেখিতে দেখিতে চারি বৎসরের মধ্যে বহু ঠিকাগাড়ী আমদানী হয়। দশ বৎসরের মধ্যে ঠিকাগাড়ীর সংখ্যা ৬০ খানা হয়। এখন ঢাকায় অসংখ্য ঠিকাগাড়ী হইয়াছে।

জেলাবোর্ড।

১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ১লা অক্টোবর ঢাকা জেলায় "স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইন" প্রবর্ত্তিত হয়। তদনুসারে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে ১লা এপ্রিল ঢাকা জেলাবোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলার কালেক্টর জেলা-বোর্ডের সভাপতি। সদস্যগণের মধ্য হইতে একজন সহকারী সভা-পতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ঢাকা জেলাবোর্ডে সভাপতিসহ মোট সদস্যের সংখ্যা ২৯ জন। সদস্যদিগের মধ্যে ১৪ জন লোকেল বোর্ডের সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত এবং ১৫ জন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হন। গবর্ণমেণ্টের মনোনীত ১৫ জন সভ্যের মধ্যে ৮ জন রাজকর্ম্মচারী (ex-officio)।

জেলাবোর্ড সাধারণতঃ শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যোন্নতি, পশুচিকিৎসা, রাস্তা, জলাশয় প্রভৃতি সাধারণের উপকারজনক কার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। ঢাকা জেলাবোর্ডের পরিমাণফল ২৭৭১ বর্গ মাইল।

লোকেলবোর্ড।

"জেলাবোর্ডের কার্য্যসৌকর্য্যার্থে সদর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ও মাণিকগঞ্জ এই চারিটী লোকেলবোর্ড আছে। জনসাধারণের মতে লোকেলবোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। লোকেলবোর্ড-গুলির সভ্যসংখ্যা ও বোর্ডের পরিমাণফল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	মেম্বরের সংখ্যা	পরিমাণ ফল
সদর লোকেল বোর্ড	১২	১২৫৯.৫
নারায়ণগঞ্জ ,,	১০	৬৩৬.৫
মুন্সীগঞ্জ ,,	১৩	৩৮৬.০
মাণিকগঞ্জ ,,	৯	৪৮৯.০

গুদারা।

"গুদারা ঘাটে পূর্ব্বে ভূম্যধিকারীর স্বত্ব ছিল। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট গুদারা স্বত্ব নিজে গ্রহণ করেন। জেলাবোর্ড স্থাপিত হইলে গুদারার বন্দোবস্ত জেলাবোর্ডের হস্তে ন্যস্ত হয়।

নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জের মধ্যে একটী ষ্টিমারদ্বারা পারাপারের কার্য্য পরিচালিত হয়। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে ১৬০০০৲ ব্যয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এই ষ্টিমার ক্রয় করেন। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে "ট্রাফিক বিভাগ" ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের হস্ত হইতে ইহার পরিচালনাভার গ্রহণ করে। ১৮৮৯-৯০ খৃঃ অব্দে বোর্ড পুনরায় তাহা নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে হইতে এই ষ্টিমারগুদারা ইজারা বিলির বন্দোবস্ত হইয়াছে।

কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল নারাণয়গঞ্জ হইতে ঢাকাও সাথপুরে দুইখানা ষ্টিমার গুদারা চলিতেছে।

পাউণ্ড।

"ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের অধীন এই জেলায় ১৯৬টি পাউণ্ড আছে। গুদারা ঘাটের ন্যায় পাউণ্ডগুলি ও প্রতি বৎসর প্রকাশ্য ডাকে নীলাম হইয়া সর্ব্বোচ্চ ডাককারীর সহিত ম্যাদি বন্দোবস্ত করা হয়। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের পাউণ্ড ব্যতীত মিউনিসিপালিটীর অধীনেও পাউণ্ড আছে। গুদারা ও পাউণ্ডের আয় শিক্ষাকার্য্যে ব্যয়িত হয়। মাণিক-গঞ্জ ব্যতীত জেলার অন্যান্য স্থানের যাবতীয় পাউণ্ডগুলি ১৮৭৯ খৃঃ অব্দ হইতে নিলামে বিলি হইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। ১৮৮১ খঃ অব্দ হইতে মাণিকগঞ্জের পাউণ্ডগুলিও ডাকে বিলি হইতেছে।

পাগলা গারদ।

সহরের পশ্চিমাংশে চক্‌বাজারের সন্নিকটে ১৮১৯ খৃঃঅব্দে পাগলা গারদ প্রস্তুত হয়। ঢাকার প্রথম মোগল সুবাদার ইসলামখাঁর নির্ম্মিত দুর্গের নিকটেই ইহা অবস্থিত (১)। ১৮৬৬ খৃঃঅব্দে এই গারদে ৫টী সুপ্রশস্ত আঙ্গিনা, চারিজনের অবস্থানোপযোগী ৭টী কক্ষ এবং নির্জ্জন বাসোপযোগী ৩২টী কক্ষ ছিল (২)। এক্ষণ এখানে ২১৭ জন পুরুষ ও ৪৫ জন স্ত্রীলোকের বাস করিবার উপ-যোগী স্থান আছে। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছার, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, পাবনা, বগুরা, কুচবিহার এবং আসাম প্রদেশের রোগীও এখানে প্রেরিত হইত।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দ হইতে ১৮৬৮ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত প্রতিবৎসরে গড়ে ৯৫ জন করিয়া রোগী গৃহীত হইত। ইহার মধ্যে গঞ্জিকাসেবন জন্য বিকৃতমস্তিষ্কের সংখ্যাই অধিক (৩)। গারদের বার্ষিক ব্যয় প্রায় ২৬০০০৲ টাকা। এই সমুদয় ব্যয় গবর্ণমেণ্টই বহন করেন। ঢাকার সিভিলসার্জ্জন গারদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং উচ্চপদস্থ কতিপয় রাজকর্ম্মচারী ও কয়েকজন দেশীয় সভ্রান্তলোক ইহার সম্মানিত পরিদর্শক (Honorory visitors).

টাকশাল।

পাঠান শাসনসময়ে "হজরৎজালাল" সোনারগাঁও, হজরৎ মোয়াজ্জমাবদ, নামুদাবাদ প্রভৃতি স্থানে টাকশাল প্রতিষ্ঠিত ছিল।

(১) Khan Bahadur Syed Aulad Hussain's Antiquities of Dacca and Tarikh-i-Dacca.

(২) Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. V.

(৩) Ibid.

মোগলশাসনসময়ে নবাবী টাকশাল চক্‌বাজারের সন্নিকটবর্ত্তী ইস্‌লামখাঁর দুর্গমধ্যে স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ঐ স্থানে জেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মোগলরাজত্বের অবসানের পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ১৭৭২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঢাকার টাকশালে কোম্পানীর মুদ্রাদি প্রস্তুত হইত। ঐ সনেই ঢাকা, পাটনা ও মুরসিদাবাদের টাকশাল উঠিয়া যায়। ১৭৯২ খৃঃ অব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখ হইতে ঢাকার নবপ্রতিষ্ঠিত টাকশাল হইতে পুনরায় কোম্পানীর টাকা মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয় (১)। কিন্তু ১৭৯৭ খৃঃ অব্দের ৩১ জানুয়ারীর পরে ঢাকার টাকশালে আর কোম্পানীর টাকা মুদ্রিত হয় নাই (২)। ঐ সময়েই টাকশালের কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়।

হাসপাতাল।

পাগলাগারদ, মিটফোর্ড হাসপাতাল, জেল হাসপাতাল, দৈনিক চিকিৎসালয়, লেডি ডফারিণ জেনানা হাসপাতাল প্রভৃতি ঢাকার প্রধান চিকিৎসালয়।

মিটফোর্ড হাসপাতাল—১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ১লা মে রবার্ট মিটফোর্ড সাহেবের নামে মিটফোর্ড হাসপাতাল স্থাপিত হয়। মিঃ মিটফোর্ড ঢাকার প্রথম কালেক্টর ও শেষ প্রাদেশিক আপিল আদালতের (Provincial court of Appeal) জজ ছিলেন।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে মিঃ মিটফোর্ড প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তদীয় প্রায় ৮ লক্ষ টাকা আয়ের বিপুল সম্পত্তি ঢাকার

(১) "The earliest weekly account of the new Dacca mint which I have been able to find is dated 11th August, 1792."—E. Thurston on History of the East India Company Coinage,

(২) J. A. S. B. Vol, LXII, Pt. 1, Page 62.

জনসাধারণের উপকার ও উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়া যান। কিন্তু এই মহাত্মার মৃত্যুর পরে উক্ত দানপত্র সম্বন্ধে আপত্তি উপস্থিত হইলে বিলাতে সেই আপত্তির বিচার হইয়া ১৮৫০ খৃঃ অব্দে তাহার মীমাংসা হয়। ফলে বিলাতের চেন্‌সেরি কোর্ট বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে আংশিক ডিক্রি প্রদান করেন। ডিক্রির বলে দাতার এই সাধুসংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রায় ১৬৬০০০৲ টাকা প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে হাসপাতালের দালানের কার্য্য আরম্ভ হয়। কাটরা পাকুরতলার * (বাবুরবাজার) যে স্থানে ওলন্দাজদিগের বাণিজ্য কুঠী বিদ্যমান ছিল, তথায় এই হাসপাতালের দালান প্রস্তুত হইয়াছে।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দে মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইলে গবর্ণমেণ্টের দেশীয় হাসপাতাল (১) ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায় এবং দেশী হাসপাতালের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট যে অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহা মিটফোর্ড হাসপাতালে প্রদত্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্টের উক্ত সাহায্যে এবং মহাত্মা মিটফোর্ডের দানের টাকার সুদ হইতে এই হাসপাতালের খরচ পরিচালিত হইতেছে (২)।

---

* বাবুরবাজারের নাম পূর্ব্বে কাটেরা পাকুরতলী ছিল; পরে ভূকৈলাসের বাবুদিগের বসবাসহেতু ঐ স্থান বাবুরবাজার আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(১) ১৮০৩ খৃঃ অব্দে কলিকাতার দেশী হাসপাতালের শাখা স্বরূপে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট ইহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থে মাসিক ১৫০৲ টাকা এবং ঔষধাদি প্রদান করিতেন। জনসাধারণ ও কতিপয় ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকের নিকট হইতে চাদা তুলিয়া ২২০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ টাকার সুদ হইতে ইহার অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।—

(২) "১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ১৬৬০০০৲ টাকার সুদ ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য এরূপ ছিল—

১৮৬৬ খৃঃ অব্দে এই হাসপাতালে ৯২ জন রোগীর স্থান হইত। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে এখানে ১০৭৬ জন রোগী চিকিৎসিত হইবার জন্য আসিয়াছিল। তন্মধ্যে ৮৬৫ জন আরোগ্য লাভ করে; ১৭৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ৩৩ জন বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত হাসপাতালে অবস্থান করে।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে এই হাসপাতালে একটী ইউরোপীয়ান ওয়ার্ড খুলিবার প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করেন।

১৮৮৯-৯০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার ধনকুবের ভাগ্যকুলনিবাসী রাজা শ্রীনাথ রায় মহোদয় তদীয় স্বর্গগতা জননীর স্মৃতিসংরক্ষণ কল্পে এই হাসপাতালের সংশ্রবে একটী চক্ষু চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য ত্রিংশৎ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলে একটী Eye ward স্থাপিত হইয়াছে।

১৮৮২ খৃঃ অব্দে ফিমেল ওয়ার্ড স্থাপিত হয়। স্বর্গীয় নবাব স্যার আসানউল্লা বাহাদুর এবং ভাওয়ালের মহানুভব রাজা ৺ রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ওয়ার্ডের স্থান ক্রয় করিবার জন্য যথাক্রমে ২৭০০০৲ এবং ২০০০০৲ টাকা প্রদান করেন।

লেডি ডফারিন জেনানা হাসপাতাল।—১৮৮৮-৮৯ খৃঃ অব্দে রাজ প্রতিনিধি লর্ড ডফারিনের ঢাকায় আগমন চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত নবাব আসানউল্লা বাহাদুর ৫০০০০৲ টাকা ব্যয়ে লেডি ডফারিনের নামানুসারে লেডি ডফারিন জেনানা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেন।

মাসিক সুদ ৫৭৭৸৫ পাই।

মাসিক গবর্ণমেণ্ট সাহায্য ৪৫৩৸০ (দেশী হাসপাতালের জন্য)
মোট ১০৩১৷৫

তখন এই মাসিক ব্যয়ে হাসপাতাল চলিত। ঢাকার বিবরণ—শ্রীকেদারনাথ মজুমদার প্রণীত।

জেল হাসপাতাল—এই হাসপাতালে জেলের কয়েদীদিগের চিকিৎসা হয়। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে প্রাচীন নবাবী টাকশালে এই জেল স্থাপিত হইয়াছে।

মফঃস্বলের ঔষধালয়—১৮৭০ খৃঃ অব্দে মাণিকগঞ্জ, জয়দেবপুর, জৈনসার, ভাগ্যকুল, ও কালীপাড়া এই পাচটী গ্রামে পাঁচটী ঔষধালয় ছিল। ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের ১লা আগষ্ট মাণিকগঞ্জ ডিসপেন্সেরী স্থাপিত হয়। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে জয়দেবপুরের জমিদার ৺কালীনারাণ রায় জয়দেবপুরে ডিসপেন্সেরী স্থাপন করেন। ঐ সনের ১৬ই নবেম্বর জৈনসার নিবাসী ছোট আদালতের জজ স্বনাম ধন্য ৺অভয়কুমার দত্ত নিজ গ্রামে ডিসপেন্সেরী স্থাপন করেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে ভাগ্যকুল ও ১৮৭০ খৃঃঅব্দে মে মাসে কালীপাড়ার ডিসপেন্সেরী স্থাপিত হয়। এই পাচটি ডিসপেন্সেরীর ডাক্তারের বেতন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইত। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে নারায়ণগঞ্জ ও মালুচী ডিসপেন্সেরী স্থাপিত হয়। ৺ বাবু ঈশানচন্দ্র রায় মৃত্যুকালে তাঁহায় রঙ্গপুরের এক সম্পত্তি মালুচি ডিসপেন্সেরীর ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতেই এই ডিস্‌পেন্সেরীর ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দে মুন্সীগঞ্জ ও বালীয়াটী ডিস্পেন্সেরী স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে কালীপাড়া ডিস্পেন্সেরী সিমুলিয়াতে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৮৮২ খৃঃ অব্দে সিমুলিয়ার ডিস্পেন্সেরী উঠাইয়া দেওয়া হয়। জুবিলী উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল ও ১৮৯০—৯১ সনে নাগরী মিশন ডিস্পেন্সেরী স্থাপিত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে এই জেলায় ২৩টী ডিস্পেন্সেরী ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত আছে। এই ২৩টীর ৮টী ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও লোকেল বোর্ডের,

২টী মিউনিসিপালিটীর, ১টী মিসনারীদিগের, ও ১২টী স্থানীয় ভূম্যধিকারীদিগের ব্যয়ে পরিচালিত। এই ২৩টী ডিস্পেন্সেরীর মধ্যে যে ১৫ টীতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রদত্ত হয়, তাহার নাম প্রদত্ত হইল।

(১) ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল, (২) নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল, (৩) বলধরা, (৪) বনখুরা, (৫) মূলচর, (৬) মহাদেবপুর, (৭) তেঘরিয়া, (৮) চুরাইন (৯) রায়পুরা, (১০) মনোহরদী (১১) জৈনসার (১২) মাণিকগঞ্জ, (১৩) মুন্সীগঞ্জ, (১৪) নাগরী (১৫) ঢাকা লেডি ডফারিন্ হাসপাতাল।

জয়দেবপুর, ভাগ্যকুল, বালিয়াটি, ষোলঘর, প্রভৃতি স্থানের ডিস্পেন্সেরীগুলি স্থানীয় ভূম্যধিকারীগণের অর্থে পরিচালিত হয়।

রেল।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাস হইতে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে রেল চলিতে আরম্ভ করে। অতঃপর ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে জয়-দেবপুর পর্য্যন্ত রেল চলে এবং ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন বঙ্গেশ্বরের ময়মনসিংহ গমন উপলক্ষে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ খোলা হয়। এই জেলায় মোট ৫২ মাইল রেললাইন।

নারায়ণগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহের মধ্যে এই জেলার অধীন ১১টী ষ্টেশন। (১) নারায়ণগঞ্জ (২) চাসারা (৩) দোলাইগঞ্জ, (৪) ঢাকা (৫) কুর্ম্মিটোলা, (৬) টঙ্গী (৭) জয়দেবপুর (৮) রাজেন্দ্রপুর (৯) শ্রীপুর (১০) সাতখামাইর (১১) কাওরাইদ।

ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল লাইনের পথ-নির্ব্বাচনে কর্ত্তৃপক্ষের ত্রুটি হইয়াছে। লাক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণতীরভূমি দিয়া এই লাইন

চলিলে ঢাকা ও ময়মনসিংহ এই উভয় জেলারই পাট উৎপাদনোপযোগী স্থানসমূহ রেলপথের অনতিদূরে থাকিত। পক্ষান্তরে, লাক্ষ্যা-তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের জলবায়ু অতিউত্তম; নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যগৌরবে এই স্থান নিম্নবঙ্গের শীর্ষস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; বহুসংখ্যক নদী নালা এই স্থান দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় জলপথে যাতায়াতেরও খুব সুবিধা। এই স্থানের সন্নিকটেই স্বাধীন পাঠানরাজগণ বহুকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া গিয়াছেন; ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঢাকার মসলিন এই স্থানেই প্রস্তুত হইত। যৎসামান্য চেষ্টাতেই লাক্ষ্যানদীর উভয় তীরবর্ত্তী স্থানসমূহকে উন্নত বন্দরে এবং নিকটবর্ত্তী বনভূমিকে তূলা ও ইক্ষুক্ষেত্রে পরিণত করা অনায়াসসাধ্য ছিল। রেল কর্তৃপক্ষ প্রকৃতির এই অযাচিত দান উপেক্ষা করিয়া মধুপুর অরণ্যানীর অন্তর্গত কর্ষণের অনুপযোগী পরিত্যক্ত ভূমি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সুতরাং এই রেললাইনের আয় আশানুরূপ হইতেছে না।

জাফরগঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘিয়র, বেউথা, কায়রা, কলা-কোপা, নবাবগঞ্জ, করিমগঞ্জ, শেখরনগর, তালতলা, মীরকাদীম, হইয়া মুন্সীগঞ্জ পর্য্যন্ত একটী রেললাইন হইলে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, এবং আয়ের পরিমাণও যথেষ্ট হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়।

পূর্ব্ববঙ্গের ন্যায় নদীবহুল দেশে রেলপথের আবশ্যকতা অতি সামান্য মাত্র। খালগুলির সংস্কারসাধন এবং ক্ষীণতোয়া নদ-নদীর পঙ্কোদ্ধার করিলেই বাণিজ্যব্যবসায়ের উন্নতিসাধন হইতে পারে। এতদুদ্দেশ্যে তালতলার খাল ও হরিশকুলের খালের সংস্কার এবং প্রাচীন ইছামতী নদীর পঙ্কোদ্ধার করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে।

ষ্টিমার।

সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে গবর্ণমেণ্ট ঢাকা, কলিকাতা ও আসামের সহিত ষ্টিমারসম্বন্ধ স্থাপন করেন। তৎকালে নিয়মমত ষ্টিমার চলিত না।

১৮৬২ সনের ১৫ই নবেম্বর কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত রেল লাইন বিস্তৃত হইলে, ঢাকার তদানীন্তন কমিশনর মিঃ বাক্‌লেণ্ডের যত্নে ঢাকা হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত ষ্টিমার চালিত হয়। পরে ঐ রেল-পথ গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইলে ষ্টিমার নারায়ণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে জেলার দুই পার্শ্বে ২টী প্রধান ষ্টিমার লাইন আছে। একটী পদ্মা ও মেঘনাদে; অপরটি যবুনায়। এই উভয় লাইনেই "রিভার ষ্টিম্ নেভিগেসন কোম্পানীর" ও "ইণ্ডিয়ান জেনারেল ষ্টিম্ নেভিগেসন কোম্পানীর" ষ্টিমার চলিয়া থাকে। নিম্নে ষ্টিমার লাইন গুলির পরিচয় ও যাতায়াতের পথ প্রদত্ত হইল।

"গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জ ডেইলি এক্‌সপ্রেস" ও "কাছার-নারায়ণ-গঞ্জ-গোয়ালন্দ ডেইলি ইণ্টারমিডিয়েট ডেস্‌প্যাচ সার্ভিস্"—গোয়ালন্দ হইতে প্রথম দিন :—কাঞ্চনপুর, জেলালদী, হরিরামপুর চর, মৈনট, নারিশা, কাদিরপুর, মাওয়া, তারপাশা, পদ্মা জংশন, সুরেশ্বর জংশন, বহর, সাত-নল, কমলাঘাট, নারায়ণগঞ্জ। দ্বিতীয় দিন :—মীরকাদিম, বৈদ্যেরবাজার, বারদী, শ্রীমদ্দি, বিষনন্দী, ডাঙ্গারচর, নরসিংদী, মণিপুরা, মাণিকনগর হইয়া ভৈরববাজার।

"কাছার-সুন্দরবন" ডেইলি ডেস্‌প্যাচ্ (৫ম দিন)—মীরকাদিম,

নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ষ্টিমারঘাট। (৬ষ্ঠ দিন) মীরকাদিম, বৈদ্যের-বাজার, বারদী, শ্রীমদ্দি।

"আসাম ডেইলি মেল সার্ভিস্"—কলিকাতা জগন্নাথঘাট হইতে ষ্টিমার ছাড়ে। এই ষ্টিমার বরিশাল ও মাদারীপুর হইয়া পদ্মায় পড়ে; পরে "আসাম মেল সার্ভিসের" সঙ্গে যোগ হয়।

"নারায়ণগঞ্জ-ভৈরব ডেইলি ডেস্প্যাচ"—ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ ট্রেন আসিলেই ষ্টিমার ছাড়ে। নারায়ণগঞ্জ, মীরকাদিম, বৈদ্যেরবাজার, বারদী, শ্রীমদ্দি, প্রভৃতি।

চাঁদপুর ডেইলি এক্সপ্রেস মেল সার্ভিস্"—কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ; তথা হইতে ষ্টিমার কাদিরপুর, তারপাশা, বহর, সুরেশ্বর হইয়া চাঁদপুর পৌছে

"কো-অপারেটিভ নেভিগেসন কোম্পানী" (১)—কলিকাতা হইতে ছাতক, ভায়া বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জ। (২) বরিশাল হইতে সিরাজগঞ্জ, ভায়া মাদারীপুর ও গোয়ালন্দ।

"দি বেঙ্গল ষ্টিম নেভিগেশন্ কোম্পানী লিমিটেড্—"কলিকাতা হইতে মাদারীপুর লৌহজঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ, ভৈরব ও মধ্যবর্ত্তীস্থানে যাতায়াত করে।

"ধলেশ্বরী সার্ভিস"—রবিবার ব্যতীত প্রতি সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার ঢাকা হইতে বেলা ৭ টার সময় ছাড়িয়া রামচন্দ্রপুর, সাভার, সিঙ্গেরহাট, আলডোনগঞ্জ, বেতিলাঘাট, ও হেমগঞ্জ হইয়া সন্ধ্যা ৬ টায় ললিতগঞ্জ পৌছে।

যমুনা লাইন সাধারণতঃ "আসাম লাইন" বলিয়া পরিচিত। এই লাইনের ষ্টিমার গোয়ালন্দ হইতে জেলার পশ্চিম সীমা দিয়া যমুনা নদী বাহিয়া আসাম যাতায়াত করে।

গহেনা।

জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্ব্বদা যাতায়াত করিবার জন্য গহেনার নৌকাই প্রশস্ত। গহেনার নৌকা প্রত্যহ নিয়মমত এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াত করিতেছে।

কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থান পর্য্যন্ত প্রসিদ্ধ গহেনাগুলি যাতায়াত করিয়া থাকে, তদ্বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(ক)	ঢাকা	হইতে	মাণিকগঞ্জ	পর্য্যন্ত।
(খ)	,,	,,	ধামরাই	,,
(গ)	,,	,,	তালতলা	,,
(ঘ)	,,	,,	বহর	,,
(ঙ)	,,	,,	লৌহজঙ্গ	,,
(চ)	,,	,,	শ্রীনগর	,,
(ছ)	,,	,,	কলাকোপা	,,
(জ)	,,	,,	নবাবগঞ্জ	,,
(ঝ)	,,	,,	হোসনাবাদ	,,
(ঞ)	নারায়ণগঞ্জ	,,	কালীগঞ্জ	,,

ঢাকা লালকুঠির ঘাট হইতে প্রাতে ৭টা ও রাত্রি ৮টার সময় কয়েকখানা গহেনা ছাড়িয়া থাকে। বর্ষাকালে সেরাজদিঘা পর্য্যন্ত যাতায়াতকারী গহেনার ভাড়া /১০ ; এবং অন্যান্য সময়ে প্রাতে প্রথম গহেনা /১৫। দ্বিতীয় গহেনা /৫। রাত্রিকালে, প্রথম ও দ্বিতীয় গহেনার ভাড়ার তারতম্য নাই। উভয়ের ভাড়াই ৵০। তালতলা /১০, শ্রীনগর ৶০, ষোলঘর ৵১০, হাসারা ৵০, লৌহজঙ্গ ।০,

মীরকাদীম ৵০, বহর ।৵০, টঙ্গিবাড়ী ৵০ কলমা ।৵০, তস্তর, সিঙ্গপাড়া ৵০, ইছাপুর ৵০।

পুনরায় ঢাকা লালকুঠীর ঘাট হইতে বেলা ২ ঘটিকার সময় তালতলা ও সেরাজদিঘা যাতায়াত করে।

ঢাকা ফরাসগঞ্জ হইতে প্রাতে ফতুল্লা ৴১০, তালতলা ৴০, মীরকাদীম ।৵০।

ঢাকা চান্নিঘাট হইতে প্রাতে ৭টা ও রাত্রে ৮টার সময় ছাড়ে। ফুলবাড়ীয়া, সাভার ৵০, সিঙ্গার ৵১০, মাণিকগঞ্জ ।০, গোয়ালন্দ ॥০, ধামরাই ৵০, নবাবগঞ্জ ৴৫, চর নবাবগঞ্জ ৶০।

বাবুরবাজার ঘাট হইতে রাত্রি ৭টার সময় ছাড়ে। কলাকোপা ৵০, যন্ত্রাইল ৵১০, বান্দুরা ৵০।

ঢাকা-দয়াগঞ্জ হইতে বর্ষাকালে ছাড়ে। ডেমরা ৴০, মুড়াপাড়া ৵০, ডাঙ্গা ।৵০, কালীগঞ্জ ।০।

কাওরাইদ হইতে নাইনন্দ ।৴০, চোরেরহাট ৴০ উলুসারা ৵০, টোকেরঘাট ।৵০, মঠালা ।০, রামপুর ৴০, কাঠিয়াদি ৵০।

নারায়ণগঞ্জ হইতে দিবা ১০ টার সময় ছাড়ে। দাউদকান্দি ।৵০, আইলারগঞ্জ ।০, কুমিল্লা ॥০, বিবাগর ৵০, উচিৎপুরা ।৵০, গোপালদি ।০, ডাঙ্গা ।৵০, কালীগঞ্জ ।০, চরসিন্দুর ৴০, লাখপুর ৴০, হাতিরদি ৵০, কমলাঘাট ৴১০, মুন্সীগঞ্জ ৴১০, চাঁদপুর ।০, লোহজঙ্গ ।০, মীরকাদিম ৵০, টঙ্গিবাড়ী ৵০।

মুন্সীগঞ্জ হইতে লোহজঙ্গ ধানকুনিয়া, হলদীয়া কনকসার ।০।

ডাক।

জেলা সংস্থাপনের পূর্ব্ব হইতেই এই অঞ্চলে ডাকের বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতা হইতে

৫ দিনে ঢাকায় চিঠিপত্র আসিত। গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত বরকন্দাজগণ চিঠী বিলি করিত। তৎকালে চিঠির মাশুল স্থানীয় দুরত্বহিসাবে ধার্য্য করা হইত। কলিকাতা হইতে ঢাকার ডাক আসিয়া পৌছিলে এখান হইতে লোকদ্বারা প্রত্যেক থানায় উহা প্রেরিত হইত। মফঃস্বলবাসী ইয়োরোপীয়গণ ডাকের প্রতীক্ষায় ঢাকায় লোক রাখিতেন।

১৭৯১ খৃঃ অব্দের ১৫ই জুলাই ঢাকা হইতে ময়মনসিংহের ডাক বিলি করিবার জন্য টঙ্গী ও বরদিপুর নামক স্থানদ্বয়ে ডাকঘর সংস্থাপিত হয়। ক্রমে ডাকের আবশ্যকতা অনুভূত হওয়ায় ডাকঘরের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

১৮৬৬ খৃঃ অব্দে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, মাণিকগঞ্জ, শ্রীনগর বহর, ধামরাই, সোনারং, রূপগঞ্জ ও পশ্চিমদি এই এগারটি স্থানে গবর্ণমেণ্টের ডাকঘর ছিল। জৈনসার ও কাঠাদিয়া Experimental ডাকঘর ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে এখানে ২টী "প্রধান" ডাকঘর, ৬২টী সব্ পোষ্টাফিস ও ১৬৮টী ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস সংস্থাপিত আছে। নিম্নে ডাকঘরগুলির নাম প্রদত্ত হইল।

সবআফিস	ব্রাঞ্চআফিস
ঢাকা—	আমদিয়া, আটি, বংশাল, বংশীবাজার, বিরাব, ব্রাহ্মণকীর্ত্তি, চৌধুরীবাজার, ডাঙ্গাবাজার, ডেমরা, ইস্‌লামপুর, কলাতিয়া, কাওরাইদ, কোণ্ডা, লক্ষ্মীবাজার, নবাবপুর, নিমতলী, পশ্চিমদী, পীলখানা, পোস্তা, পুবাইল, রাজফুলবাড়িয়া,

রোহিতপুর, শাক্তা, শুভাড্যা, সংগ্রামপুর, তেঘরিয়া, তেতুলঝোড়া, বাবুরবাজার শঙ্খনিধি।

আগলা—মাসাইল।

বৈদ্যেরবাজার *—আমিনপুর, বারদী, লক্ষ্মীবারদী,

বায়রা *—আটিগ্রাম, বলধর, বঙ্খুরা, হাটিপাড়া, খাবাসপুর, ভগবানগঞ্জ।

ভাগ্যকুল *—বাঘরা, কাটিয়াপাড়া, নারিশা।

চকবাজার *।

ঢাকা রেলওয়েষ্টেশন।

ধামরাই—।

ধানকোড়া—কুশরা, কাটিগ্রাম, সানোরা, সাহাবেলিশ্বর।

ফরিদাবাদ।

ঘিয়র—চক-মীরপুর।

হাসারা—কেওটখালী।

জাগীর *

জয়দেবপুর *—আগুলিয়া, বলধরা, বোয়ালী, গাছা, কাশিমপুর।

জয়মণ্টপ *—বানিয়ারা, চান্দর, নান্নার, রোয়াইল।

জাফরগঞ্জ—খলসী, নয়াবাড়ী।

কালীগঞ্জ—ব্রাহ্মণগাঁ (ভাওয়াল), ঘোড়াশাল।

কাঞ্চনপুর—ঝিটকা, মালুচি, নবগ্রাম, বামাদিয়া নালী।

কেরাণীগঞ্জ।

---

* চিহ্নিত ডাকঘরে টেলিগ্রাফ আফিস ও আছে।

কুমারভোগ—গ্রামওয়ারী।

লাখপুর—চক্রধা, একদুয়ারিয়া।

লেছরাগঞ্জ—লক্ষীকূল, নটাখোলা।

মদনগঞ্জ *।

মহাদেবপুর *—বুতুনী।

মহম্মদপুর—দেবীনগর, দোহার।

মানিকগঞ্জ *—বানিয়াজুরি, বেতিলা, গরপাড়া, মত্ত, ছনকা, তরা, তিল্লি।

মেদিনীমণ্ডল।

মীরপুর *—বিরুলিয়া।

নবাবগঞ্জ—দাউদপুর, গোবিন্দপুর, হোসনাবাদ, জয়কৃষ্ণপুর।

নারায়ণগঞ্জ—বারপাড়া, হরিহরপাড়া, নবীগঞ্জ, শীতললাক্ষ্যা, টানবাজার।

নরসিংদী—আমিরাবাদ, রামনগর, রায়পুরা।

পাঁচদোনা—গয়েশপুর, নওপাড়া, পারুলিয়া, সিলমদ্দি।

রাজখাড়া।

রূপগঞ্জ—আড়াইহাজার, দুপতারা, গোপালদি, মুড়াপাড়া, পনিবাজার শম্ভুপুর।

সাভার *।

সাতুরিয়া *—বালিয়াটি, চৌহাট, দড়গ্রাম, দিঘলিয়া, গ্রাম আমতা।

শেখরনগর—বারৈখালি, চুরাইন, রাজানগর।

শিবালয় *—নালী, তেওতা।

সিমুলিয়া—বালিয়াদি, কালিয়াকৈর।

সিঙ্গৈর *।—

যোলঘর।

শ্রীনগর *—বেলতলি, আটপাড়া, দোগাছি, কুকুটিয়া, মাইজপাড়া, শ্যামসিদ্ধি।

শ্রীপুর—বরিশাব, বেলাব, গোতাদিয়া, কাপাসিয়া, মনোহরদী, নরেন্দ্র পুর, উলুসারা।

সুয়াপুর।

টঙ্গী।

উথুলী—বারাঙ্গাইল, বরাটিয়া।

উয়ারী *।

মুন্সীগঞ্জ * (দ্বিতীয় শ্রেণী)—ফিরিঙ্গিবাজার, গজারিয়া, ঘাসির-পুকুরপাড়, কেওয়ার, মুলচর, পঞ্চসার।

বহর—ভরাকৈর, কলমা।

বজ্রযোগিনী *।

বারুণী।

বিদগাঁও।

হাসাইল—বানরী।

ইছাপুরা *—চন্দনধুল, খিদিরপাড়, কুচিয়ামোড়া, রমুনীয়া, সিরাজ-দিঘা, সিয়ালদি, তেজপুর, টোলবাসাইল, মধ্যপাড়া।

জৈনসার *—পশ্চিমপাড়া।

কাঠাদিয়া-সিমুলিয়া—রাউৎভোগ, যশোলঙ্গ।

কোলা *—বেলতলি, রোষদী।

লৌহজঙ্গ *—বেজগাঁ, ব্রাহ্মণগাও, গাউদিয়া, গাউপাড়া, হলদিয়া, কনকসার, কোরহাটী।

মাল্খানগর *—কৈচাল, মালপদিয়া, পাত্রৈলদিয়া, সিলিমপুর।

মীরকাদিম *—পাইকপাড়া।

রাজাবাড়ী।

সোনারং *—আড়িয়ল, বালিগাঁ, বেত্কা, আউটসাহি, পুরাপাড়া, টঙ্গীবাড়ী।

স্বর্ণগ্রাম—বাঘিয়া, নয়না।

বিংশ অধ্যায়।

জমি ও জমা।

প্রাচীন হিন্দুদিগের জমিজমাপদ্ধতির মূল ভিত্তিই গ্রাম। পুরাকালে কর্ষিত ভূমিতে কৃষকেরই স্বত্ব ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু স্থল-বিশেষে এরূপও নির্দ্দেশ আছে যে ভূমির স্বত্ব রাজারই হওয়া উচিত। ফলতঃ ভূমিতে কাহার স্বত্ব ছিল, মনুতে স্পষ্টতঃ তাহার উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় না।

জমির উৎপন্ন শস্যের অংশ চাষী, গ্রাম-শাসনসংরক্ষণের ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও রাজা, সকলেই পাইতেন; সকলেরই জমিতে স্বত্ব ছিল। মনুর সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, ভূমির উর্ব্বরতা ও কর্ষণ-ব্যয়ের তারতম্যানুসারে ধান্যাদি শস্যের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশাংশ রাজার প্রাপ্য; আবশ্যক হইলে তাঁহার চারি অংশের একাংশ লইবারও ব্যবস্থা ছিল।

শস্যবিশেষে উৎপন্নের অর্দ্ধেক অথবা তিন ভাগের দুই ভাগ কৃষকেরা, তদবশিষ্ট কর্ম্মচারীরা পাইতেন। কৃষকদিগের মধ্যে তিন শ্রেণী ছিল :—

(১) গ্রামের আদিম বাসিন্দা।

(২) স্থায়ী বা অস্থায়ী নূতন বাসিন্দা।

(৩) গ্রামান্তরের কৃষক।

এই তিন শ্রেণীর লোক হইতেই খোদকস্ত ও পাইকস্ত কৃষকের উৎপত্তি হইয়াছে। অধিপতি (মাতব্বর), নিকাশনবীশ, চৌকিদার,

পুরোহিত, শিক্ষক, গণক, কর্ম্মকার, সূত্রধর, কুম্ভকার, রজক, ক্ষৌরকার, গোরক্ষক, চিকিৎসক, গায়ক, গাথক, প্রভৃতি কর্ত্তৃক গ্রামের শাসন-সংরক্ষণ সম্পন্ন হইত।

যোগ্যতানুসারে পূর্ব্বাধিপতির বংশধরদিগের মধ্যে কোনও না কোন ব্যক্তিকে এই পদে মনোনীত করা হইত। পুরাকালের গ্রামাধিপতিগণই জমিদারদিগের আদি।

মোসলমান শাসনসময়ে পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া পরগণাদারী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয়। পরগণাদারগণ প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিয়া রাজস্ব প্রদান করিতেন। রাজস্ব প্রদান করিয়া যাহা উদ্‌বৃত্ত হইত, তাহা পরগণাদারগণের নিজস্ব ছিল। কাল-ক্রমে ঐ পরগণাদারগণই জমিদার বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠেন।

জমিদারদিগের হস্তে দেওয়ানী, ফৌজদারী উভয়বিধ ক্ষমতাই ন্যস্ত ছিল।

আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে রাজা তোডরমল্ল মোগল সাম্রাজ্যের যে একটী হিসাব প্রস্তুত করেন, উহা "ওয়াশীল তুমার জমা" নামে পরিচিত। ইহাতে বঙ্গদেশকে ১৮টী সরকার এবং ৬৮২ মহালে বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ভূমি পরিমাপ করিয়া দেশের রাজস্ব নির্দ্ধারণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি "এলাকাগজ" নামক মান-দণ্ড প্রচলিত করেন এবং ভূমির উৎপাদিকাশক্তি অনুসারে উহা পুলি, পরবতী, চেঞ্চর ও বঞ্জর এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। তাঁহার এই বন্দোবস্ত প্রথমতঃ এক বৎসরের জন্য হয়, কিন্তু বৎসর বৎসর নূতন বন্দোবস্ত অসুবিধাজনক বোধে দশ বৎসরের মধ্যে উহার আর কোন পরিবর্ত্তন করা হয় না।

১৬৫৭ খৃঃ অব্দে সাহসুজা বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার নতন হিসাব প্রস্তুত

করেন; উহাতে বঙ্গভূমি ৩৪টী সরকার ও ১৩৫০ মহালে বিভক্ত হইয় পূর্ব্বাপেক্ষা উহার রাজস্ব বর্দ্ধিত হয়।

অতঃপর ১৭২২ খৃঃ অব্দে মুর্শিদকুলিখাঁকর্ত্তৃক বঙ্গদেশের রাজ আরও বর্দ্ধিত হয়। তিনি বঙ্গভূমিকে ১৩টী চাকলা, ৩৪টী সরকার এব ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত করেন।

১৭৩৫ খৃঃ অব্দে নবাব সুজাউদ্দিনখাঁ পুনরায় বাঙ্গলার রাজ বন্দোবস্ত করেন।

অতঃপর ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে কাসিমআলিখাঁ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে পরগণা ওয়ারী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হয়।

ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে জমিদারদিগের উপরই পরগণার রাজ প্রদানের ভার অর্পিত ছিল। তৎকালে জমির উপরে তাঁহাদিগে কোনও স্বত্ব ছিল না। রাজস্বপ্রদানে অসমর্থ জমিদারগণ জমিদারী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেন। ভূমিতে জমিদার এবং প্রজাসাধারণে বিশেষ স্বত্ব না থাকায় ভূমির উৎকর্ষসাধনপক্ষে প্রজা বা জমিদা কেহই বিশেষ যত্ন লইতেন না।

১৭৭২ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ দেশের শাসনভা আপনাদের হস্তে গ্রহণ করিয়া হেষ্টিংস সাহেবকে বঙ্গের গবর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি রাজস্বসংগ্রহের জন্য জেলায় প্রথম কালেক্টর নিযুক্ত করেন এবং কলিকাতা কৌন্সিলের চারিজন সদস্যকে জমিদারদিগে সহিত ৫ বৎসরের জন্য খাজনার বন্দোবস্ত করিতে প্রেরণ করেন।

উক্ত বন্দোবস্তে হার বৃদ্ধি করিয়া রাজস্ব ধার্য্য হওয়ায়, অনেক জমিদারের খাজনা বাকী পড়িয়া যায়। এইজন্য গবর্ণমেণ্টকে অনেক টাক পরিত্যাগ করিতে হয়। অনন্তর ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে বৎসরের অবস্থা বুঝিয় বার্ষিক বন্দোবস্তের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, রাজস্ববৃদ্ধি ভয়ে জমিদারগ

কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিষয়ে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়েন। এই সমুদয় কারণে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ ক্রমে ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া দশবৎসরের জন্য জমিদারদিগের সহিত একটী বন্দোবস্ত করেন। ইহাতে এইরূপ কথা থাকে যে, ডাইরেক্টরদিগের অনুমোদিত হইলে, উহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া গণ্য হইবে। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে ২২শে মার্চ্চ ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইবার অনুমতি প্রদান করেন। ইহাতে জমিদারেরা নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করিয়া অধিকৃত ভূমি পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ঢাকার জমিদারদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ ডে লিখিয়াছেন "এখানে ধনশালী বা বিশ্বাসস্থাপনযোগ্য একটী লোকও নাই।" (১) দশশালা বন্দোবস্তের কার্য্য এই জেলায় ১৭৯১ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হইয়া ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল (২)।

ভূমির উপর জমিদার ও তালুকদারদিগের নানাপ্রকারের স্বত্ব এ জেলায় প্রচলিত আছে।

নিম্নে ঢাকা জেলার মহাল ও জোতের একটী বিবরণ প্রদত্ত হইল (৩)।

---

(১) "There was not a man of wealth or credit among them at that time."

(২) Mr. A. C. Sen's Report on Land tenures &c.

(৩) List of the estates and tenures existing in the district, arranged in the way proposed by Mr. O'Donnell for the revised edition of Dr. Hunter's Statistical Account of Bengal, mentioned by Mr. A. C. Sen.

১ম। প্রধান মহাল ঃ—

(ক) গবর্ণমেণ্টের অবিক্রীত মহাল :—

(১) বাজেয়াপ্তি লাখেরাজ।
(২) খরিদা মহাল।
(৩) পয়স্তী জমি।
(৪) চর।
(৫) অন্যান্য খাস মহাল।
} খাস মহাল।

(খ) গবর্ণমেণ্টের করপ্রদ বন্দোবস্তী মহাল :—

(১) চিরস্থায়ীবন্দোবস্তীমহাল—জমিদারী, খারিজা হুজুরী তালুক।

(২) অস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল—খাস ইজারা।

(গ) নিষ্কর মহাল :—

(১) রাজস্ব-মুক্ত।
(২) দেবোদ্দেশ্যে সৃষ্ট—দেবোত্তর।
(৩) ব্রাহ্মণোদ্দেশ্যে সৃষ্ট—ব্রহ্মোত্তর।
(৪) স্বেচ্ছায় সৃষ্ট—লাখেরাজ।

২য়। অধীন মধ্য স্বত্ব ঃ—

(ক) প্রথম শ্রেণী :—

(১) বংশপরম্পরাগত ও হস্তান্তরের যোগ্য,—

নির্দ্দিষ্ট করপ্রদ :—সামিলাত, পত্তনী, সিকিমি, মিরাস, মুসকসি।

অনির্দ্দিষ্ট করপ্রদ :—হাওলা।

(২) বংশপরম্পরাগত ও হস্তান্তরের অযোগ্য ;—

নির্দ্দিষ্ট করপ্রদ :—বন্দোবস্তী, কায়েমী।

(৩) অস্থায়ী ও হস্তান্তরের যোগ্য—ইজারা।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণী :—

(১) বংশপরম্পরাগত ও হস্তান্তরের যোগ্য :—

নির্দ্দিষ্ট করপ্রদ :—দরপত্তনী, দরমিরাস, নিমহাওলা।

(২) অস্থায়ী—দর ইজারা।

৩য়। করমুক্ত জোত :—

(ক) ধর্ম্মোদ্দেশ্যে সৃষ্ট,—

হিন্দুগণ কর্ত্তৃক—দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর।

মোসলমানগণ কর্ত্তৃক—চেরাগান।

(খ) সাধারণের উপকারার্থে সৃষ্ট,—

হিন্দুগণ কর্ত্তৃক—ভোগোত্তর।

(গ) কর্ম্মোদ্দেশ্যে সৃষ্ট,—

(১) জমিদারের অনুচরগণভোগ্য—পাইকান।

(২) ব্যক্তিগত অনুচরগণভোগ্য—নফরান, চাকরান, মহাত্রাণ।

উপরোক্ত জোত মধ্যে কতকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

(১) খাসমহাল—গবর্ণমেণ্ট খাসমহালগুলির মালিক। এই মহালগুলির কতক গবর্ণমেণ্টের নিজ তত্ত্বাবধানে আছে; এবং অবশিষ্ট-গুলি অস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত গুলিকেই প্রকৃত খাসমহাল বলা যাইতে পারে। শেষোক্তগুলি প্রকৃত পক্ষে খাস ইজারা মাত্র।

(২) খারিজা হুজুরী তালুক এবং সামিলাত তালুক—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে যে সমুদয় তালুক বিদ্যমান ছিল, তাহা খারিজা তালুক ও সামিলাত তালুক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল।

ঐ বন্দোবস্তের সময়ে কতকগুলি তালুক গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক জমিদারী হইতে খারিজ হইয়া স্বত্বাধিকারীগণের সহিত একা এক বন্দোবস্ত হয়। তাহারা নিজেই গবর্ণমেণ্টের কর দিতে থাকেন। তৌজিতেও ঐ সকল তালুকের পৃথক নম্বর ধার্য্য হয়। এই প্রকার তালুকই খারিজা বা হুজুরী তালুক নামে উক্ত।

দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে যে সমুদয় তালুকদার, জমিদারের অধীন থাকিয়া কর আদায় করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের তালুক, এবং কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তি ও ১৭৯০ খৃঃ অব্দের ১লা ডিসেম্বর, এই সময়ের মধ্যে প্রদত্ত একশত বিঘার অনধিক যে সমুদয় নিষ্করভূমি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া জমিদারীর সামিল হইয়াছে, তাহাই সামিলাত তালুক নামে পরিচিত।

(৩) বাজেয়াপ্তি তালুক—দেওয়ানী প্রাপ্তির পরে এবং ১৭৯০ খৃঃ অব্দের ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে প্রদত্ত একশত বিঘার অধিক যে নিষ্কর ভূমি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত ও নম্বরযুক্ত হইয়াছে এবং যাহার রাজস্ব গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয়, তাহা বাজেয়াপ্তি তালুক বলিয়া অভিহিত।

(৪) রাজস্বমুক্ত মহাল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত :—

(ক) যে সমুদয় মহাল আইনানুসারে রাজস্বমুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

(খ) বাদশাহী ও জমিদারী সনন্দক্রমে প্রাপ্ত যে সমুদয় নিষ্কর মহাল ১৭৯৩।১৯ রেগুলেসন দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

কোম্পানীর দেওয়ানীপ্রাপ্তির পূর্ব্বে প্রদত্ত যে সমুদয় ভূমি চূড়ান্তরূপে নিষ্কর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা লাখেরাজ নামে খ্যাত। এতদ্ব্যতীত দেওয়ানী প্রাপ্তির পরের এবং ১৭৯০। ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বকার, যে সমস্ত নিষ্কর গবর্ণমেণ্টের (সহিত মোকদ্দমায়) সিদ্ধ, তাহাই সিদ্ধনিষ্কর বলিয়া পরিচিত। পক্ষান্তরে যে সমস্ত নিষ্কর দেওয়ানী প্রাপ্তির পূর্ব্বে দখলে আইসে নাই,—আসিলেও ঐ সময়ে যাহার উপরে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কর ধার্য্য হইয়াছে, তৎসমুদয় "খেরাজ" বা "মালের জমি" বলিয়া গণ্য। অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার খুচরা নিষ্কর ভূমি জমিদারী ও তালুকের অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমানে ঐ সমুদয় খুচরা লাখেরাজও এক একটী মহাল বলিয়া গণ্য।

বাদশাহী সনন্দক্রমে প্রাপ্ত নিষ্কর (আলতামগা, জায়গীর, আয়মা, মদৎমাস) প্রভৃতিও পূর্ব্বোক্তরূপে সিদ্ধাসিদ্ধ হইয়াছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নিষ্কর ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত। যথা:—দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, মহাত্রাণ, নফরান, চাকরান, ভোগোত্তর (ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালনার্থে সৃষ্ট) পিরান, চেরাগান (মস্‌জিদে আলো দিবার জন্য)।

(৫) পত্তনী, দরপত্তনী—জমিদার তাঁহার জমিদারী কি তাহার অংশ, এবং তালুকদার তাহার তালুক কি তাহার কোন অংশ, দানবিক্রয় ও পুরুষানুক্রমে ভোগদখলের স্বত্ব অর্পণে লভ্য রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক খাজনায় কাহারও সহিত চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করিলে, তাহাকে পত্তনীতালুক বলে। ১৮১৯।৮ ধারা মতে ইহার বিধান হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্তনী দরপত্তনী বলিয়া পরিচিত।

অর্থাৎ পত্তনীদার তাহার স্বত্ব কাহারও সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বন্দো-বস্ত করিলে তাহাকে দরপত্তনী বলে।*

(৬) সিকিমি তালুক—পঞ্চসনা বন্দোবস্তের সময়ে পরগণার তালুকদারগণ যে সমুদয় তালুকের জমাজমির হিসাব জেলা কালেক্টরের নিকটে দাখিল করেন নাই, তাহা গবর্ণমেণ্টের তৌজীভুক্ত হয় নাই; উহা জমিদারেরই অধীন থাকিয়া যায়। এতৎসমুদয়ই সিকিমি তালুক বলিয়া পরিচিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে যে সমুদয় সিকিমির অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহার স্বত্ব চিরস্থায়ী এবং উহা হস্তান্তরের যোগ্য বলিয়া গণ্য। উহার রাজস্বও অপরিবর্ত্তনীয়।

(৭) মিরাস—প্রায় সিকিমির ন্যায়; কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মিরাসের নাম দরমিরাস।

মৌরসী দুই প্রকার, যথাঃ—(ক) কায়েমী, (খ) কায়েমী মকররী।

(ক) বংশানুক্রমে ভূমি ভোগ করিবার অধিকারসহ পরিবর্ত্তনীয় হারে বা খাজনায় যে বেমেয়াদী বন্দোবস্ত করা হয়, তাহার নাম কায়েমী মৌরসী।

(খ) অপরিবর্ত্তনীয় হারে বা খাজনায় চিরকালের জন্য পুত্র পৌত্রাদি-ক্রমে ভূমি ভোগ করিবার অধিকারসহ যে বন্দোবস্ত করা হয়, তাহার নাম কায়েমী মকররী মৌরসী।

মৌরসীদার তাহার স্বত্ব কাহারও সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বন্দোবস্ত করিলে, তাহাকে দরমৌরসী বলে।

(৮) হাওলা—অধীন তালুকের অন্তর্গত ক্ষুদ্র তালুকের নাম হাওলা তালুক। হাওলার অধীন তালুক "নিমহাওলা"। হাওলার

---

* পত্তনী বন্দোবস্ত সর্ব্বপ্রথমে বর্দ্ধমানের রাজার জমিদারীতে সৃষ্ট হয়; পরে অন্যান্য জমিদারীতে প্রচলিত হইয়াছে।

স্বত্ব ও ধার্য্যরাজস্ব চিরস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয়। নিমহাওলার স্বত্ব দলিল অনুযায়ী হইয়া থাকে।

জঙ্গল আবাদের জন্য যে হাওলার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার খাজনার কম বেশী হইতে পারে।

(৯) বন্দোবস্তী—জমিদারের নিকট হইতে গৃহাদি নির্ম্মাণজন্য কোনও জমি গ্রহণ করিলে, অথবা সাধারণ প্রজা পুষ্করিণী প্রভৃতি খননজন্য জমি লইলে, কিম্বা জঙ্গল আবাদজন্য জমি প্রদত্ত হইলে, উহা বন্দোবস্তী জমি বলিয়া পরিচিত। ইহার স্বত্ব বংশানুক্রমিক স্থায়ী হইলেও, ইহা হস্তান্তরের অযোগ্য। দলিলের লিখিত উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে এই জমি ব্যবহৃত হইলে জমিদার ইহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন।

ভাওয়ালের জমিদারের অধীনে "জঙ্গলবুড়ী" তালুক আছে। জঙ্গল আবাদ করিবার সর্ত্তে যে তালুক গ্রহণ করা যায়, তাহার নাম জঙ্গল বুড়ী তালুক। *

(১০) মূশকমী—জমিদারের অব্যবহিত অধীনে নির্দ্দিষ্ট জমার যে মধ্যস্বত্বের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা মূশকমী বলিয়া পরিচিত। বংশানুক্রমে স্থায়ী হইলেও ইহা হস্তান্তরের অযোগ্য।

(১১) ভোগোত্তর—বংশানুক্রমিক হইলেও ইহা হস্তান্তরের অযোগ্য।

---

* মোগল শাসন সময়ের প্রারম্ভে জেলার উত্তরাংশস্থিত অনেকানেক জমি জঙ্গল আবাদের জন্য নিষ্কর প্রদত্ত হইয়াছিল। ঢাকা হইতে মুরসিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হইলে ডিপুটী গবর্ণরগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া অনেক প্রজা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। Vide Taylor's Topography of Dacca, P., 122-23.

জেলার দক্ষিণাংশে গোগ্রাসের জমি নাই। ভাওয়াল অঞ্চলে এখনও অনেক গোগ্রাসের জমি আছে।

বাঘমারা—এতদঞ্চলের কোনও স্থানে ব্যাঘ্রের প্রাদুর্ভাব থাকায় ব্যাঘ্রশিকারজন্য অনেক ভূমি নিষ্কর প্রদত্ত হইয়াছিল। ঐ সমুদয় ভূমি "বাঘমারা" তালুক নামে অভিহিত হইত। ১৭৭১ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট ঐ সমুদয় তালুক বাজেয়াপ্ত করেন।

নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজা এই জেলায় বর্ত্তমান আছে।

(ক) উঠবন্দী বা ইচ্ছাধীন প্রজা—পদ্মা, যমুনা ও ধলেশ্বরীর দিয়ারা অথবা নূতন উদ্ভূত চরাজমির চাষী প্রজা এই শ্রেণীভুক্ত।

(খ) মকররী রাইয়ত—যাহাদের খাজনা বা খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহাদিগকে মকররী রাইয়ত কহে। জেলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা মুন্সীগঞ্জ মহকুমাতেই এই শ্রেণীর প্রজা অধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণীর প্রজার সংখ্যানুসারে ইহাদিগের সংখ্যা অল্প।

(গ) দখলিস্বত্ববিশিষ্ট-রাইয়ত :—যে রাইয়তের ভোগকৃত ভূমিতে দখলি স্বত্ব আছে, তাহাকে দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত কহে।

কোন ব্যক্তি কোন গ্রামের জমি ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর কাল রাইয়তস্বরূপ ভোগ করিলে, তাহাতে তাহার দখলি স্বত্ব জন্মে। এক গ্রামের একখণ্ড জমি ২ বৎসর, একখণ্ড ৪ বৎসর, একখণ্ড ৬ বৎসর, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন জমি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দখল দ্বারা দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইলেও ঐ সমস্ত জমিতে দখলি স্বত্ব জন্মে। দখলিস্বত্ববিশিষ্ট রাইয়তকে স্থিতিবান্ রাইয়ত বলা যায়। পূর্ব্বে যাহারা খোদকস্ত রাইয়ত বলিয়া অভিহিত হইত, বর্ত্তমান খাজনার আইনে তাহাকে স্থিতিবান্ বলা হইয়াছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, স্থিতিবান্ প্রজাকে নিজ গ্রামের কোন একখণ্ড

জমি দ্বাদশ বৎসর কাল ভোগ করা আবশ্যক। খোদকস্ত প্রজা-সম্বন্ধে ঐ নিয়ম নাই। খোদকস্ত রাইয়ত হইলে দুইটী বিষয় আবশ্যক:—(১) এক গ্রামে বাস করা ও (২) সেই গ্রামের অন্তর্গত জমি ভোগ করা। ইহাভিন্ন দশশালা বন্দেবস্তের সময়ে রাইয়তদিগকে পাইকস্ত নামে আরও এক শ্রেণীতে বিভাগ করা হইত।*

পূর্ব্বোক্তরূপে যাহার দখলি স্বত্ব বর্ত্তে নাই, তাহাকে দখলিস্বত্ব-শূন্য রাইয়ত বলে।

বর্গাহিসাবে জমি বন্দোবস্ত করিবার প্রথা এই জেলায় প্রবর্ত্তিত আছে। এই প্রথানুযায়ী মালিকের খামার জমি চাষ করিয়া প্রজা যে ফসল অর্জ্জন করে, তাহার অর্দ্ধাংশ মালিককে প্রদান করে। বীজের খরচ ক্ষেত্রস্বামী দিয়া থাকেন। এই প্রথা আধিবর্গা নামে পরিচিত। যে ফসলে আধিদারকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়, সেই সকল ফসলে প্রজা দুই ভাগ রাখে এবং ভূম্যধিকারী এক ভাগ পান। এইরূপ বন্দোবস্ত তেভাগী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ভূম্যধিকারী ন্যায্য খরচ বহন করিলে প্রজা অর্দ্ধাংশ পাইয়া থাকে।

খাজনার আইন অনুসারে জেলার শতকরা প্রায় ৯০ জন প্রজা-রই দখলি স্বত্ব জন্মিয়াছে।

(ঘ) অধীন রাইয়ত বা কোর্ফাপ্রজা—রাইয়তের অব্যবহিত অধীন বা তদধীন রাইয়তকে কোর্ফাপ্রজা বলে। কোর্ফা প্রজার সংখ্যা এই জেলায় কম।

---

* কেহ এক গ্রামে বাস করিয়া অন্য গ্রামের জমি ভোগ করিলে তাহাকে পাইকস্ত রাইয়ত বলা হইত। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে উক্ত প্রথা রহিত হইয়া যায়। রাইয়তি স্বত্ব, জোত স্বত্ব ও ম্যাদি স্বত্ব ভেদে বর্ত্তমান সময়ে এই জেলায় চাষের স্বত্ব ত্রিবিধ।

দখলিস্বত্বসম্বন্ধীয় কয়েকটী কথা—

(১) জোত স্বত্ব হস্তান্তরিত করা :—এই জেলায় প্রজাগণের দানবিক্রয়দ্বারা জোতস্বত্ব হস্তান্তরিত করিবার অধিকার নাই। প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে এবম্বিধ প্রথা এই জেলায় প্রচলিত ছিল না। আইন প্রণয়নের পরে ঐরূপে কোনও কোনও জোতস্বত্ব হস্তান্তরিত করা হইলেও উহা জমিদারগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় নাই।

(২) ফলবান বৃক্ষের ছেদন :—ফলবান ও মূল্যবান বৃক্ষের ছেদন করিবার ক্ষমতাও ঢাকাজেলার প্রজাগণের নাই। উহা করিতে হইলে জমিদারের অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক।

খাজনার হার :—জমির রকম অনুসারে জমা ধার্য্য হইয়া থাকে। জেলার বিভিন্ন অংশে একই প্রকার জমির খাজনার হারেরও তারতম্য আছে। ঢাকা সহরের সমীপবর্ত্তী স্থানসমূহে এবং মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় এই হার সর্ব্বাপেক্ষা কম। মধুপুর বনাঞ্চলে খাজনার হার কম নহে। জমির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে কর ধার্য্য হইয়া থাকে। অবস্থান (সহর, বন্দর এবং নদীর নিকটবর্ত্তিতা), মৃত্তিকার রকম (ফসল উৎপাদনের উপযোগিতা), ফলবান বৃক্ষাদির সংখ্যা, ভিটী জমির উচ্চতা প্রভৃতির প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়।

সাধারণতঃ বঙ্গের অন্যান্য প্রায় সমুদয় জেলা অপেক্ষাই এই জেলায় খাজনার নিরেখ কম।

দশশালা বন্দোবস্তসময়ে এই জেলার অনেক স্থান জঙ্গলময় এবং ঝিলসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ঢাকা-জালালপুরের অনেক স্থানেই বহুসংখ্যক ঝিল বা জলাভূমি ছিল। এক্ষণে ঐ সমুদয় স্থান মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাংই ঐ অঞ্চলস্থিত জমির খাজনার নিরেখ কম করিয়া ধরা হইয়াছিল।

জেলার বিভিন্ন অংশে খাজনার হার।

স্থানের নাম।	বিঘা প্রতি খাজনার হার।
১। ঢাকার সন্নিকটে—	৬৲
২। মিরপুর (বোরো জমি)—	২৲ হইতে ৪॥০
৩। রামপাল—	৩৲
৪। কাশিমপুর পরগণা—	॥০ হইতে ২৲
৫। ভাওয়াল পরগণা—	
ক) ভিটি—	
(১) বাস্তু জমি—	২৲
(২) পালান অর্থাৎ রাইয়তের কুটীরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান, যেখানে কলা, কাঁটাল, আম্র প্রভৃতি জন্মে—	॥০ হইতে ১৷০
(৩) ছোলা অর্থাৎ পালান জমির চতুঃপার্শ্বস্থিত স্থান, যথায় সরিষা, পাট, করলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়—	৸০ ,, ১॥০
(৪) ছাট পালান অর্থাৎ বাস্তু জমির নিকটবর্ত্তী পশ্বাদি চড়াইবার স্থান—	।০ ,, ৸০
খ) নাল—	
(১) বর্ষার অর্থাৎ জলপ্লাবনে নিমজ্জমান ভূমি—	
পুরদার অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী—	১৵০ হইতে ১৷০
কামদার ,, ২য় শ্রেণী—	১৲ ,, ১৷০
সেদার ,, ৩য় শ্রেণী—	৸০ ,, ১৲

(২) থামা অর্থাৎ যে জমিতে বর্ষা কালে বর্ষার
জমি অপেক্ষা কম জল উঠে,—

পুরদার অর্থাৎ	১ম শ্রেণী—	১।০
কামদার ,,	২য় শ্রেণী—	১৲
সেদার ,,	৩য় শ্রেণী—	৸৵০—৸৶০

(৩) তিত অর্থাৎ থামা অপেক্ষা উচ্চতর ভূমি,—

পুরদার ,,	১ম শ্রেণী—	১৲
কামদার ,,	২য় ,,	৸০—৸৶০
সেদার ,,	৩য় শ্রেণী—	॥৶০

(৪) রোয়াইচা অর্থাৎ উচ্চ ভূমি,—

এই জমি বর্ষার প্লাবনে নিমগ্ন হয় না;
কিছু বৃষ্টি হইয়া জল জমিলে তথায়
ধান্য রোয়া হয়।

পুরদার অর্থাৎ	প্রথম শ্রেণী—	১।০ হইতে ২॥০
কামদার ,,	২য় শ্রেণী—	৸৶ ,, ১৶০
সেদার ,,	৩য় শ্রেণী—	৸০ ,, ১৲

(৫) আউস—	৸৶—১।০
(৬) বোরো—	৸০—১৲
৬। কালীগঞ্জ—	॥৶০—১॥০
৭। বন্দখোলা—	১৸০—
৮। বাগিয়া—	৸০—১॥০
৯। কাওরাইদ—	॥০—১॥
১০। টোক—	৸০—২৲

১১।	আরালিয়া—	১৵—২৷৹
১২।	উজিলাব—	১৲—১৷৷৹
১৩।	নরসিংদী—	৷৷৴—১৲
১৪।	তুনিগাও—	১৷৹
১৫।	তেওতা—	৷৷৹
১৬।	মাণিকগঞ্জ—	৷৶—৷৷৹
১৭।	কালিয়াকৈর—	১৵—১৷৷৵৹
১৮।	বাঘের—	৷৷১০—৷৷৵১০
১৯।	পাটালি (মুন্সীগঞ্জ)—	৩৷৷৹—৪৲
২০।	বারৈখালি—	১৷৷৹—৩৲

ভূমির স্থানীয় মাপ।

এই জেলায় ভূমির পরিমাপ সর্ব্বত্র সমান নহে। কোনও স্থানে দ্রোণ, কোনও স্থানে খাদা, কোনও স্থানে বিঘার মাপে জমির পরিমাপ হইয়া থাকে। "কাগুরী" (কাঁচি) ও "সাহী" (পাকি) মাপভেদে জেলার কোন কোন স্থানে দুই প্রকার মাপ প্রচলিত আছে। কাঁচি বা কাগুরী মাপে জমীর খাজনার হিসাব এবং সাহী বা পাকি মাপে জমির ক্রয়বিক্রয়াদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভূমির পরিমাপ সর্ব্বত্রই নলদ্বারা হয়। এই নলের পরিমাণও সকল স্থানে একরূপ নহে। দ্রোণের মাপের নল ৭ হাত হইতে ৯ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। এই নলের ২৪ নল দীর্ঘ × ২০ নল প্রস্থ = ১ গা। খাদার মাপের নল ৬ হাত হইতে ৮ হাত দীর্ঘ। এই নলের ৬ নল দীর্ঘ ৫ নল প্রস্থ = ১পাখি।

দ্রোণের মাপের হিসাব :—

৩ ক্রান্তিতে ... ...১ কড়া।

৪ কড়ায় ... ...১ গণ্ডা।

৫ গণ্ডায় ... ...১ কুণি।

৪ কুণিতে বা ২০ গণ্ডায় ... ...১ কাণি।

১৬ কাণিতে ... ...১ দ্রোণ।

থাদার মাপ :—

৪ কাগে ... ...১ কড়া।

৪ কড়ায় ... ...১ গণ্ডা।

৭॥ গণ্ডায় ... ...১ পাখী।

১৬ পাখীতে ... ...১ থাদা।

বিঘার মাপ :—

৪ কড়ায় ... ...১ গণ্ডা।

২০ গণ্ডায় ... ...১ ধারা।

২০ ধারায় ... ...১ কাঠা।

২০ কাঠায় ... ...১ বিঘা।

এই বিঘার সহিত গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত বিঘার কোনও সামঞ্জস্য নাই।

একবিংশ অধ্যায়।

তীর্থস্থান।

লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাট—কথিত আছে, ভগবান জামদগ্ন্য মাতৃবধজনিত পাপবিমোচনার্থে পিতার উপদেশঅনুসারে ব্রহ্মপুত্র-কুণ্ডে স্নান করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি শীতললাক্ষ্যার সহিত এই নদের সংযোগ সাধন করিয়া ইহাকে তীর্থরাজরূপে জগতে শ্রেষ্ঠ করিবেন, এরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন (১)। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র পরশুরামের অজ্ঞাতে শীতললাক্ষ্যার দর্শনাভিলাষে গমন করেন। এদিকে শীতললাক্ষ্যা আগন্তুকের আগমনশ্রবণে বৃদ্ধাবেশে বসিয়া ছিলেন। ব্রহ্মপুত্র বৃদ্ধাকে দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়াই সহসা বলিলেন, "মাতঃ! শীতললাক্ষ্যা কত দূরে"? বৃদ্ধা বলিলেন, "আমা-রই নাম শীতললাক্ষ্যা ; আমি আপনার ভীষণ রবে ভীতা হইয়া বৃদ্ধার রূপ ধারণ করিয়াছিলাম"। অপ্রস্তুত হইয়া ব্রহ্মপুত্র লাঙ্গলবন্ধে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে পরশুরাম এসমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ব্রহ্মপুত্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তৎপর ব্রহ্মপুত্র অনেক অনুনয় বিনয় করায় জামদগ্ন্য প্রসন্ন হইয়া এই বলিলেন যে, প্রত্যহ তীর্থরাজ

---

(১) কেহ কেহ বলেন যাদববংশাবতংস মহানুভব বলরাম তীর্থ পর্য্যটনকালে পুণ্যতোয়া ব্রহ্মপুত্রনদে অবগাহন করিয়া, ইহাকে লোকলোচনের গোচরী-ভূত করিবার জন্ত স্বীয় লাঙ্গলদ্বারা এইস্থান পর্য্যন্ত আনয়ন করেন। এখানে তাঁর লাঙ্গল আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া এই স্থান লাঙ্গলবন্ধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

না হইয়া বৎসরের মধ্যে এক অশোকাষ্টমীতে তীর্থরাজ হইবে। তদ্ব্যতীত গঙ্গায় অবগাহন করিলে যেরূপ পুণ্যসঞ্চয় বা পাপক্ষয় হয়, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমকূলে স্নান করিলেও তাহাই হইবে (২)।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে :—

"চৈত্রে মাসি সিতাষ্টম্যাং যো নরো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
চৈত্রন্তু সকলং মাসং শুচিঃ প্রযতমানসঃ॥
স্নাতি লৌহিত্যতোয়ে তু স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্।
লৌহিত্যতোয়ে যঃ স্নাতি স কৈবল্যমবাপ্নুয়াৎ"॥

কালিকাপুরাণম্ ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে, "পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে বৃষলগ্নে ব্রহ্মপুত্রনদের জলে স্নান করা আবশ্যক। পৃথিবীতে যত তীর্থ, নদী বা সাগর আছে, তাহারা সকলেই ঐ তিথিতে ব্রহ্মপুত্র নদে আসে।" স্নানের মন্ত্র যথা :—

"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাদয়ঃ।
সর্ব্বে লৌহিত্যমায়াস্তি চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্॥
ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনো কুলনন্দনঃ।
অমোঘা গর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥"

তিথিতত্ত্ব।

প্রতি বৎসর বহু দূরদেশান্তর হইতে অসংখ্য হিন্দু নরনারী লাঙ্গলবন্ধে সমাগত হইয়া অশোকাষ্টমীতে তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্রে স্নান-দানাদি করিয়া থাকেন। অনেকে আবার তৎপর দিবস এই স্থানে রামনবমীর স্নানও করেন।

---

(২) "লৌহিত্যে পশ্চিমে ভাগে সদা বহতি জাহ্নবী"।

ব্রহ্মপুত্রতীরে লাঙ্গলবন্ধে এই সময়ে একমাসকালপর্য্যন্ত অনেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তীর্থবাসও করিয়া থাকেন।

লাঙ্গলবন্ধের জয়কালী জাগ্রত দেবতা।

লাঙ্গলবন্ধের ন্যায় পঞ্চমীঘাটেও বাসন্তী অষ্টমীতে তীর্থরাজ ব্রহ্মপুত্রে অবগাহন করিবার জন্য অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হয়। কথিত আছে যুধিষ্ঠি· রাদি পঞ্চপাণ্ডব বনবাসকালে লৌহিত্যতীর্থ সন্দর্শনার্থে এখানে আগমন করেন। তাঁহারা যেস্থানে স্নান ও তর্পণাদি করিয়াছিলেন, তাহা পঞ্চপাণ্ড-বের এতদঞ্চলে আগমনের স্মৃতিস্বরূপ পঞ্চমীঘাট বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আজও যাত্রীগণ আগমনপূর্ব্বক তত্তৎস্থান দর্শন ও তথায় স্নানতর্পণাদি করিয়া থাকে। বস্তুতঃ লাঙ্গলবন্ধের ন্যায় পঞ্চমীঘাটও পবিত্র তীর্থস্থান।

শিমুলিয়া তীর্থঘাট—বংশী নদীর তীরবর্ত্তী শিমুলিয়া গ্রামে একটী তীর্থঘাট আছে; তথায় অশোকাষ্টমী উপলক্ষে বহু নরনারী সমবেত হইয়া তীর্থস্নান করিয়া পবিত্রতা লাভ করে। কথিত আছে, ভক্ত রামজীবন দ্বিজপঞ্চকের সাহায্যে ৺যশোমাধব বিগ্রহ আনয়ন করিবার সময়ে এই স্থানে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া ৺যশোমাধবের স্নান-কার্য্য ও অর্চ্চনাদি সমাধা করিয়াছিলেন। ৺যশোমাধবের সংশ্রবহেতু এই স্থান তদবধি তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। এই অতীত স্মৃতিটুকু একটী মেলার অধিবেশন দ্বারা অদ্যাপি জনসাধারণের নিকটে জাগরূক রহিয়াছে। আজ পর্য্যন্তও প্রতি বৎসর অশোকাষ্টমীর স্নান উপলক্ষে এই স্থানে একটী মেলা জমিয়া থাকে।

হীরা নদীতীর্থ—কেইলা ও জয়পুরার মধ্যবর্ত্তী হীরা নদীতে চৈত্রবারুণী উপলক্ষে বহুহিন্দুনরনারী তীর্থস্নান করিয়া পবিত্রতা

লাভ করে। ধামরাই অঞ্চলে এই তীর্থস্নান উপলক্ষে যে একটী সংস্কৃতবাঙ্গলামিশ্রিত বিদ্রূপাত্মক ছড়া প্রচলিত আছে, তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল (১)। বৃদ্ধাদিগের উদ্দেশ্যে আজও ঐ অঞ্চলে উহা প্রয়োগ করা হয়।

"কেইলা জয়পুরা মধ্যে হীরা নদী তীর্থং।
দে বুড়ী ডুব দে পাঁচ গণ্ডা কড়িদে।
* * * * লড় দে"॥

কাউয়ামারা স্নান—প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমীতে তীর্থ স্নান করিবার জন্য নানাস্থান হইতে এখানে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। স্নানউপলক্ষে এখানে একটী মেলারও অধিবেশন হয়। ইহাও একটী তীর্থস্থান বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কাউয়ামারা ও রাজনগর এই গ্রামদ্বয় ভেদ করিয়া যে পয়ঃপ্রণালী প্রবাহিত হইয়াছে, তথায়ই এই স্নানানুষ্ঠানক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কুশাগাড়ার বারুণীস্নান—বুড়িগঙ্গাতীরবর্ত্তী বাছিলা নামক স্থানে মাঘীপূর্ণিমার স্নানউপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হয়। ঢাকা অঞ্চলের অসংখ্য হিন্দুনরনারী তীর্থস্নান করিবার জন্য এখানে আগমন করিয়া থাকে। ইহা "কুশাগাড়ার বান্নি" (বারুণী) বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত। প্রবাদ এই যে, অতি প্রাচীনকালে এই স্থানে মুনিপঞ্চক সমাগত হইয়া অতি কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তপস্যান্তে উঁহারা এই স্থানে "কুশা" গাড়িয়া (পুতিয়া) রাখিয়াছিলেন বলিয়া ইহা "কুশাগাড়ার বান্নি" নামে অভিহিত হইয়াছে।

---

(১) ধামরাইনিবাসী কলিকাতার স্বনামপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস, মহোদয় এই ছড়াটীর বিষয় আমাকে বলিয়াছেন।

বুতুনীর বারুণীস্নান—বুতুনী গ্রামের নিকটবর্ত্তী ক্ষীরাই নদীতে বারুণীগঙ্গাস্নান উপলক্ষে বিস্তর লোকসমাগম হইয়া থাকে। এই স্থানে ক্ষীরাই নদীতে অবগাহন করিলে গঙ্গাস্নানের তুল্য ফল লাভ হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

গঙ্গাসাগর দীঘি—বারভূঞার অন্যতম ভূঞা খিজিরপুরের ঈশাখাঁমসনদআলিকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীশ্বর আকবর কর্তৃক মহারাজ মানসিংহ পূর্ব্ববঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ঢাকাতে মোগলরাজের একটী থানা মাত্র সংস্থাপিত ছিল। মহারাজ মানসিংহ বিপুল বাহিনীসহ ঢাকাতে উপনীত হইয়া ডেমরা নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন এবং ঢাকার উত্তরপূর্ব্বদিকে কমলাপুর নামক স্থানে একটী প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করিয়া তাহাতে বারতীর্থের জলনিক্ষেপকরতঃ উহাকে "গঙ্গাসাগর" নাম প্রদান করেন। মহারাজ মানের অবস্থান হেতু এই স্থান রাজারবাগ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তীর্থজ্ঞানে এখনও অসংখ্য হিন্দু নরনারী এই দীর্ঘিকায় মাঘীপূর্ণিমায়, মাঘীসপ্তমীতে ও অষ্টমী তিথিতে স্নান করিয়া থাকে। এই সময়ে এখানে মেলা জমিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে এই দীর্ঘিকাটীর প্রায় তৃতীয়াংশ তাড়াদামে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহার পূর্ব্বতীরে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার দক্ষিণতীরবর্ত্তী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে বহু নরনারী মানস করিয়া চাঁচর প্রদান করিয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত ইছামতী নদীরতীরবর্ত্তী তীর্থঘাট, আগলা, সোলপুর, বারুণীঘাট এবং যোগিণীঘাট নামক পঞ্চ তীর্থঘাটেও কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে অসংখ্য হিন্দুনরনারী অবগাহন করিয়া পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে।

লালবাগ দুর্গ-প্রাকার।
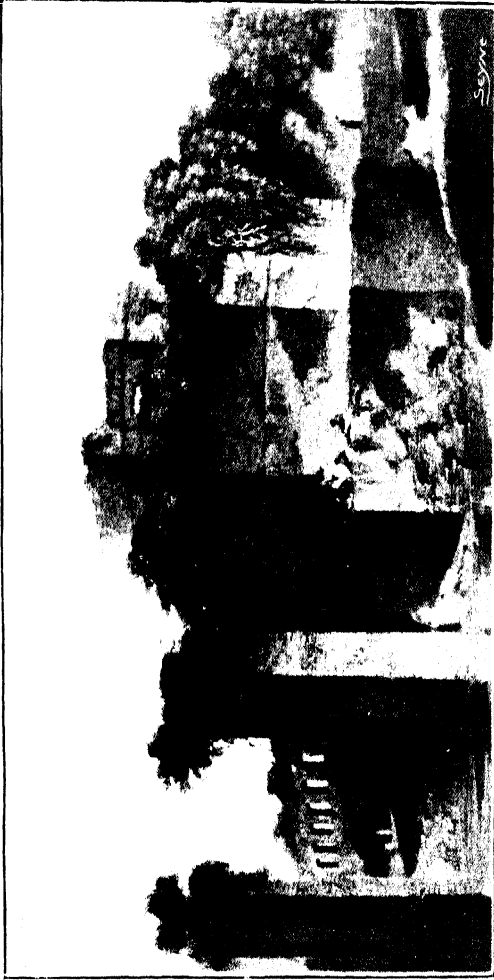
দ্বাবিংশ অধ্যায়।

প্রাচীন কীর্ত্তি।

লালবাগের কেল্লা, ও বিবি পরির সমাধি।

লালবাগের কেল্লাকে কেহ কেহ আরঙ্গাবাদের কেল্লা বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকেন (১)। যে স্থানে এই কেল্লাটী অবস্থিত তাহার নাম ঔরঙ্গাবাদ বা আরঙ্গাবাদ। দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম ঔরঙ্গাবাদ বা আরঙ্গাবাদ হওয়া অসম্ভব নহে। কেল্লাটী নগরীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। দক্ষিণে ক্ষীণতোয়া বুড়িগঙ্গা বালুকা-স্তূপমণ্ডিত বিশাল চর বক্ষে ধারণ করিয়া মৃদুমন্থরগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বুড়িগঙ্গা কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে সরিয়া যাওয়ায় নদীটী কেল্লা হইতে প্রায় সিকি মাইল ব্যবধানে পড়িয়াছে। দ্বিশতাব্দী পূর্ব্বে কেল্লাটী এরূপভাবে অবস্থিত ছিল যে, বোধ হইত যেন উহার মূলভাগ নদীগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ দক্ষিণদিকের কতকাংশ কালক্রমে বুড়িগঙ্গার কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে নদীপ্রবাহ এই স্থান হইতে কিয়দ্দূরে সরিয়া পড়ে (২)।

হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন "দুর্গের বহির্ভাগ, কয়েকটী তোরণদ্বার, দরবারপ্রকোষ্ঠ এবং স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ মাত্র ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে

---

(১) Khan Bahadur Syed Aulad Hussein's Antiquities of Dacca.

(২) "The south face of the enclosure was formery washed by the river ; but the stream has now receded some distances".—Cunningham's Report on the Archaelogical Surveyof India, VolXV

অতীত গৌরবের সাক্ষীস্বরূপে বিদ্যমান ছিল। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের পর হইতেই ধ্বংসের কার্য্য অধিক মাত্রায় আরম্ভ হইয়াছে”(১)।

এক্ষণে দুর্গের একেবারে ধ্বংসাবস্থা, কোনও প্রকারে কয়েকটী তোরণদ্বার ও কতিপয় স্তম্ভ অচিরে কালের কবলে পতিত হইবার জন্যই যেন ভগ্নচূড় হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোনও স্থানে অট্টালিকার নিম্নতল পাতালোদ্দেশে গমন করিয়া চর্ম্মচটিকা ও অজগরের আশ্রয়স্থল হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে গবর্ণমেণ্ট তদুপরি একটী পোলিস সেক্‌সন স্থাপিত করিয়াছেন।

দুর্গের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার ২০০০X৮০০ ফিট; দুর্গাভ্যন্তরে ২৩৫ ফিট সমচতুষ্কোণাকার একটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর চারি ধার ইষ্টকনির্ম্মিত পোস্তায় বাঁধান; ইহার প্রত্যেক কোণৈকদেশ হইতে দুই দুইটী ঘাট পুকুরের তলদেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে। এই পুকুরটীর ২৭৫ ফিট পশ্চিমে যে সুন্দর একটী মকবেরা লোকলোচনের গোচরীভূত হয়, তাহাই নবাবনন্দিনী পরিবিবির সমাধি সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া আছে (২)। এই মকবেরাটী পঞ্চগুম্বজপরিশোভিত এবং নব কক্ষে বিভক্ত। মধ্যের গুম্বজটী তাম্রপাতবিমণ্ডিত বলিয়া সূর্য্য-কিরণসংস্পর্শে ঝক্‌মক্ করিতে থাকে। মসজিদের ঠিক মধ্যস্থলের প্রকোষ্ঠমধ্যে বিবি পরির সমাধি সুরক্ষিত। এই প্রকোষ্ঠটী ১৯½´ ফিট সমচতুষ্কোণাকার। এই প্রকোষ্ঠের চারি কোণে চারিটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠ চতুষ্টয় (১০´—৮″½) সমচতুষ্কোণাকার।

---

(১) Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol V.

(২) পরিবিবির মকবেরার পশ্চিমে উমরাহসেনতনয় মহম্মদ আজিমের নির্ম্মিত একটী খাতিমুর মসজিদ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

কেন্দ্রস্থ বৃহত্তম প্রকোষ্ঠের চারি পার্শ্বে (২৪´—৮½´´) দৈর্ঘ্য ও (১০´-৮½´´) প্রস্থবিশিষ্ট চারিটী বারেন্দা আছে। এই শেষোক্ত কক্ষচতুষ্টয় এবং কেন্দ্রস্থ প্রকোষ্ঠের শীর্ষদেশেই পঞ্চ গুম্বজ শোভা পাইতেছে।

মকবেরাটীর ছাদের নির্ম্মাণকৌশলে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহা অষ্টকোণসমন্বিত পিরামিডের ন্যায় গ্রথিত করা হইয়াছে। কেন্দ্রস্থ প্রকোষ্ঠের প্রাচীরগুলি ১৪ ফিট ৪ ইঞ্চি পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ত্রয়োদশটী সমান্তরাল প্রস্তরখণ্ড শিরোদেশে ধারণপূর্ব্বক ১৯ ফিট ১১ ইঞ্চি পর্য্যন্ত উচ্চতা লাভ করিয়াছে। পিরামিডের বহির্ভাগে ১০ ফিট ব্যাসসমন্বিত অষ্টকোণাকার ক্ষুদ্র গুম্বজ মকবেরার শীর্ষদেশ অলঙ্কৃত করিতেছে। অন্যান্য প্রকোষ্ঠগুলির ছাদও এইরূপেই নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাদের প্রাচীরগুলি ৭ ফিট ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া সপ্ত-সংখ্যক সমান্তরাল প্রস্তরখণ্ড মস্তকে বহনপূর্ব্বক ১৩ ফিট ৬ ইঞ্চি পর্য্যন্ত উচ্চতা লাভ করিয়াছে।

ছাদের এবম্বিধ নির্ম্মাণকৌশল প্রাচীন হিন্দুস্থাপত্যের অনুরূপ বলিয়া কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন (১)।

ভিত্তিগাত্রে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরের নানাপ্রকার কারু-কার্য্য পরিলক্ষিত হয়। দেওয়ালে শ্বেত প্রস্তরের নয়নলোভন আড়ম্বর-হীন বাদশাহী আমলের স্থাপত্যকলার আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে। কোণসংস্থিত প্রকোষ্ঠচতুষ্টয়ের দেওয়ালে পীতবর্ণ ভূমির উপরে নীল, সবুজ, রক্তিম ও হরিদ্রাবর্ণ দ্বারা রঞ্জিত করা হইয়াছে এবং প্রান্তভাগে

---

(১) "But the most curious part of this tomb is its roof, which is built throuhout in the old Hindu fashion of overlapping layers". Cunningham's Archaelogical Reports of India, Vol XV.

লতাপুষ্পাদি অঙ্কিত বিবিধ কারুকার্য্য দর্শকের চিত্ত বিনোদন করিতে সমর্থ হয়।

সমাধির প্রস্তরখণ্ডগুলির কোনও কোনও স্থান ভগ্ন হইয়াছে। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দের ৭ই নবেম্বর এবং ১৮৪৬ খৃঃ অব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে, লোকেল কমিটীর সেক্রেটারী, ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, এইচ, কুপার সাহেবের নিকটে এই বিষয়ে যে দুই খানা লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে ছোট-কাটরা-নিবাসী আলোয়ার খাঁন কর্ত্তৃক এই কার্য্য সমাধা হয়। মজহরআলি খাঁনের সহিত এই মকবেরার স্বত্ব লইয়া উহার যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ফলেই আলোয়ার খাঁন এই কার্য্য করিয়াছিলেন।

মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে উহাকে একটী শান্তির আগার বলিয়া বিবেচিত হয়। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর পার্শ্বস্থ দেওয়ালে যে তিন খানা শ্বেতপ্রস্তরবিনির্ম্মিত গবাক্ষ আছে তাহার কারুকার্য্য অতি চমৎকার। প্রত্যেকটি গবাক্ষ দৈর্ঘ্যে ৫ ফুট ও প্রস্থে ৩ ফুট হইবে। ইহার নির্ম্মাণজন্য চুনার হইতে বিভিন্ন প্রস্তরাদি, গয়া হইতে সুদৃঢ় কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরও জয়পুর হইতে শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তরাদি আনীত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে কোনও কোনও স্থানে শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরখণ্ডগুলি উৎপাটিত, স্থানে স্থানে বিকৃত, স্থানে স্থানে বিলুপ্ত হইয়াছে। আবার কোথাও বা আসল প্রস্তরের স্থানে কৃত্রিম প্রস্তরও বসাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। এমন কি, সমাধির শ্বেত প্রস্তরও কোনও স্থানে ভগ্ন করা হইয়াছে। চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত বিবিধ কারুকার্য্যসমন্বিত কবাটগুলিও হিন্দু শিল্পিগণের করপ্রসূত (১)।

---

(১) "The sandal wood door of the tomb are also of Hindu designs, as the panels form regular Swastikas or mystic crosses."—Cunningham.
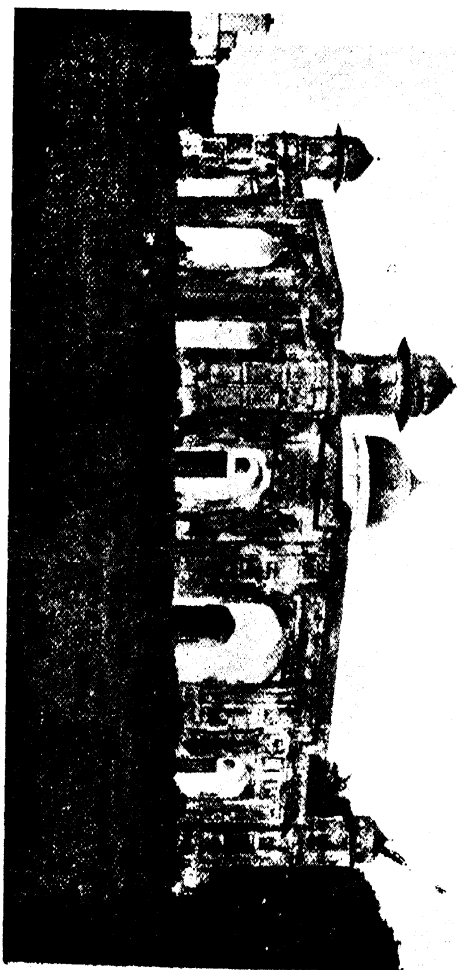
পরি বিবির মকবেরা

সমাধির সন্নিকটস্থ প্রস্তরফলকে তুগ্রা আরবী (Tugra Arabic) অক্ষরে একটী কবিতা লিখিত আছে। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রশংসা-বাদেই শিলালিপিখানি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কবিতাটী পাঠ করিলেই উহা আংশিক বলিয়া বিবেচিত হয়। শিলাখণ্ডের অপরার্দ্ধ যে কোথায় তাহা জানা যায়না। নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিত আছে।

"আহ্ ছেন্‌তো আরে সাহেন্ শাহে আকাথ্ রোথ্‌নে দিন্
কো ওয়াবেহে মমালেকে সিন্দ্‌তো হেন্দো চিন্॥
সাহেন্ শাহে ইয়ে মুলক্ বাতাইদে আস্‌মান্।
কোরা রসিদ আজ্ পেদেরো যদ্ দরি জেমিন্॥
ওয়ানি সোদেস্তে রুই তামামি এমুলক্‌রা।
আজ্ হোস্‌নে আ-হ্‌দে খিস্ চোরথ্ ছার হুরেইন॥
দার আহ্‌দে মুল্‌কো সলতানাতে ইচুঁনি সাহে।
দানায়ে হার জামানা হামি গোয়েদ্ আফেরি * * *॥"

*   *   *   *

*   *   *   *

"হে পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর এবং দীন ধর্ম্মের রক্ষক, যিনি সিন্ধু প্রদেশ, হিন্দুস্থান ও চীন দেশের বংশানুক্রমিক অধিপতি, ঈশ্বরানুগ্রহে পিতৃপিতামহ হইতে দেশের শাসনভার যাঁহার প্রতি ন্যস্ত হইয়াছে, যিনি অপ্সরাকুলের বদনানুরূপ অনিন্দ্যসুন্দর শাসনদ্বারা নিখিল প্রাণীবৃন্দের অধিরাজ হইয়াছেন আমি তোমার প্রশংসা করিতেছি। এ হেন নৃপতির এবম্বিধ শাসনে সমুদয় প্রদেশের জ্ঞানী ব্যক্তিই তোমার স্তুতিবাদ করিতেছে * * * *

যে সময়ে মোসলমানকুলধুরন্ধর অমিততেজা ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে ভারতের শাসনদণ্ড পরিচালন

করিতেছিলেন, সেই সময়ে সম্রাটের তৃতীয় পুত্র সুলতান মহম্মদ আজিম বঙ্গের ভাগ্যবিধাতৃরূপে অল্পকালের জন্য ঢাকায় অবস্থিতি করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইতিহাসে দৃষ্ট হয়, আজিম ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে লালবাগের কেল্লা ও রাজপ্রাসাদের নির্ম্মাণ-কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু তদীয় শাসনসময়মধ্যে তিনি উহা সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। সম্রাটতনয়ের পরে নবাব সায়েস্তা খাঁর হস্তে বঙ্গের শাসনভার দ্বিতীয়বার অর্পিত হয়। তিনি সম্রাটকুমারকর্ত্তৃক আরব্ধ অসম্পূর্ণ দুর্গটীকে সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ তদীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা দুহিতা বিবিপাইরী (১) এই সময়ে কাল-গ্রাসে পতিত হয়। আমির-উল-ওমরা সায়েস্তাখাঁর নিকটে তদীয় দুহিতার তীব্র শোকজ্বালা অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি বড় সাধ করিয়া অদম্য উৎসাহে দুর্গের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্নিবার কাল ওমরার বাসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে দিল না। প্রবল শোকবন্যায় উৎসাহ উদ্যম একেবারে ভাসিয়া গেল। বিশেষতঃ দুহিতার অকালমৃত্যুতে তাঁহার মনে এক সংস্কারের সৃষ্টি হইল যে লালবাগের কেল্লায় আর হস্তক্ষেপ অথবা সুসম্পন্ন করিবার প্রয়াস পাইলে যেন তাহার পক্ষে শুভজনক হইবে না। যতদিন তিনি ঢাকায় ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত তদীয় হৃদয় হইতে এই সংস্কার আর দূরীভূত হইল না। বস্তুতঃ একমাত্র প্রিয়তমা দুহিতার শোকই দুর্গনির্ম্মাণের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। স্বীয় দুহিতার শেষ স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ তদীয় মকবেরার উপরে একটী মনোরম মসজিদ নির্ম্মাণ

(১) ইহার অপর নাম "ইরাণ দুখ্‌ৎ"।

করিয়া আমির-উল-উমরা তদীয় দুহিতার মৃত্যুজনিত শোকের বেশ কিঞ্চিৎ লাঘবতা অনুভব করিয়াছিলেন। এক সময়ে এই মসজিদটী পূর্ব্ববঙ্গের নয়নাভিরাম দর্শনীয় বস্তুমধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া পরিগণিত ছিল।

কোনও কোনও ঐতিহাসিক বিবি পরীকে সম্রাটতনয় সুলতান মহম্মদ আজিমের পত্নী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু উহা ভুল। আমরা সায়েস্তাখাঁর বংশীয় ছোট-কাটরানিবাসী রমজানআলি খাঁর নিকট এক সময়ে এতৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি উহা অস্বীকার করেন।

লালবাগের কেল্লা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বিস্তৃর্ণ ভূমিখণ্ড সায়েস্তাখাঁর জায়গীর মধ্যে ছিল। ১৮৪৪ সনে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সুবিধার জন্য তদানীন্তন লোকেল কমিটীর মেম্বর, মিঃ কুক্, মিঃ ওয়াইজ, ডাঃ টেইলার, মিঃ আরাটুন, খাঁজে আলিমুল্লা সাহেব, মীর্জ্জা গোলাম পীরসাহেব, মিঃ এজিংসিংহ, মুন্সী নন্দলালদত্ত প্রভৃতি, বাবু হাকিমান, নবাব সায়েস্তা খাঁর ওয়াক্ফ্ সম্পত্তিভুক্ত লালবাগের ভূমিখণ্ড নবাবের বংশধর মীর্জ্জা মজহর আলিখাঁন ও বিবি সালেহা খানম হইতে বার্ষিক মবলক ষষ্ঠীতম রজতখণ্ড পুষ্পমূল্যে মোকররি পাট্টা লইয়া এক দলিল সম্পাদন করিয়া দেন। তাহাতে লিখিত আছে, "মোতালক সহর ঢাকার লালবাগ মহল্লা মধ্যগত চাকলায় অর্থাৎ বিবি পরির মকবেরায় ও মহজিদের চৌতবকি চৌদেওয়ার মধ্যস্থিত ভূমি যাহার চৌহদ্দি এই লালবাগ হাতার জমির ও বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তরের কেল্লার পোস্তা দেওয়ারের লাগ উত্তর ময় দেওয়ার ও বড় সরকের লাগ দক্ষিণ ও বুড়িগঙ্গার ও হাতার জমীর লাগ পূবের পোস্তা দেওয়ারের লাগ পূর্ব্ব মর দেওয়ার ও আওরঙ্গাবাদের হাম্মাম যাহা পাদরী সাহেব নীলাম খরিদ করিয়াছেন তাহার ও ঐ আওরঙ্গবাদের জমির ও মৃত্তিকার

নীচে যে উত্তরদক্ষিণ দীর্ঘাকার পোক্তা নেউ আছে তাহার লাগ পশ্চিম মায় ঐ নেউ ঐ চতুঃসীমাবস্থিত দরোবস্ত ভূমি ও তন্মধ্যগত কেল্লা ও হোজরা ও পোক্তা মোকালাত ইত্যাদি যে তৌলিয়তের হকিয়াতে আপনাদিগের দখলে আছে তাহার মধ্যে বিবি পরির মকবেরা ও মসজিদ সেওয়ায় বাকি সমস্ত ভূমি ও তন্মধ্যগত কেল্লা ও হোজরা ইত্যাদি পোক্তা মোকালতে আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মঃ ৬০৲ টাকা কোম্পানী বার্ষিক জমাতে ই ১৮৪৪ সনের প্রথমাবধি হামেস পীর নিমিত্ত মোকররি পাট্টা লইলাম” ইত্যাদি। এই স্থানে গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ ঢাকা কলেজ স্থাপন ও একটী পার্ক প্রস্তুতের সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। সায়েস্তাখাঁর বংশধরগণ মধ্যে মীর্জ্জা রমজানআলি খাঁ সাহেব এই ভূমিখণ্ডের বাবদে ওয়ারিশি সূত্রে বার্ষিক ৬০৲ টাকা এখনও প্রাপ্ত হইতেছেন।

হাম্মাম্ ও দেওয়ানী আম্।

ইহা লালবাগ কেল্লার মধ্যস্থিত একটী দ্বিতল অট্টালিকা। ইহার স্তম্ভগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত হওয়াতে অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। নিম্নতলস্থ একটী প্রকোষ্ঠে নবাবের স্নানাগার (হাম্মাম্) ছিল। বিভিন্ন পাত্রে কবোষ্ণ জল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শীতলতর জলরাশি সঞ্চিত থাকিত। সম্রাটকুমার মহম্মদআজিমকর্ত্তৃক লালবাগদুর্গনির্ম্মাণসময়ে এই স্থান দেওয়ান-ই-আম্ রূপে ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রকোষ্ঠে মলমুত্রত্যাগের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন! নবাবী আমলের দেওয়ানী-ই-আমের যে এই অবস্থা ঘটিবে, তখন স্বপ্নেও কেহ কল্পনায় আনিতে পারে নাই।

লালবাগের কেল্লার ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বিবৃত করিতে করিতে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন, "যে সময়ে সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী টেভারণিয়ার ঢাকায় আগমন করেন, সেই সময়ে তিনি সায়েস্তাখাঁকে লালবাগস্থ এক কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে অবস্থান করিতে দেখিয়াছিলেন"। লালবাগের প্রাসাদ তখনও অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছিল বলিয়াই নবাব কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, এরূপ লিখিয়াছেন। কিন্তু হাণ্টার সাহেবের উক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। টেভারণিয়ার ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে ঢাকায় আগমন করেন (১)। সেই সময়ে সায়েস্তাখাঁ দুই বৎসর যাবৎ ঢাকার সুবাদারী পদ গ্রহণ করিয়া আগমন করিয়াছেন মাত্র। লালবাগের রাজপ্রাসাদ বা দুর্গনির্ম্মাণের কল্পনাও তখন কাহারো মনে স্থান পায় নাই। ইতিহাস আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, লালবাগের রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের নির্ম্মাণকার্য্য ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে আরম্ভ হয়। সুতরাং ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে টেভারণিয়ার সায়েস্তাখাঁকে লালবাগে কেন দেখিবেন? টেভারণিয়ার নির্দ্দিষ্ট করিয়া কোন স্থানের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "নবাব বুড়িগঙ্গানদীর তীরদেশে কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহে অবস্থান করেন"। তারিখ-ই-নসরৎজঙ্গ-ই গ্রন্থে লিখিত আছে "সায়েস্তাখাঁ কাটরা পাকুর-তলীতে বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে তৎকালে অবস্থান করিতেন। রেঙ্কিন সাহেবের মতে বর্ত্তমান মেডিক্যাল স্কুলের নিকটেই সায়েস্তাখাঁ অবস্থান করিতেন। ঐ স্থানের একটী মসজিদে, পারস্থ ভাষায়, নবাব সায়েস্তাখাঁর স্বহস্তলিখিত কতিপয়পংক্তি, একখানা শিলালিপিতে প্রাপ্ত হওয়া

---

(১) টেভারণিয়ারের বিবরণ পাঠে মনে হয় তিনি দুইবার ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন। একবার ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে এবং আর এক বার ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে।

গিয়াছে। এই স্থানের নদীর ধারে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত পোস্তার ভগ্নাবশেষ এক্ষণেও দৃষ্ট হয়। অনেকে উহা নবাব সায়েস্তাখাঁর নির্ম্মিত গৃহের অংশবিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই সমুদয় কারণে আমরা হাণ্টার সাহেবের উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। আমাদের বিবেচনায় হাণ্টার সাহেব স্থাননির্ণয়ে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন।

কেল্লার গুম্বজ বহুল যে অংশ এখনও ভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, উহা কেল্লার নহবৎখানা ছিল।

ছোটকাটরা ও বিবি চম্পার সমাধি।

সাহসুজা নির্ম্মিত বড়-কাটরা হইতে প্রায় ১০০ গজ পশ্চিমে বুড়িগঙ্গাতীরে নবাব সায়েস্তাখাঁর নির্ম্মিত ছোট-কাটরার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সোয়ারীঘাটার উভয় পার্শ্বে এই দুইটী কাটরা নির্ম্মিত হওয়ায় ঢাকায় নবাগত লোকদিগের সুখসাচ্ছন্দ্য শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৮৪০ খৃঃ অব্দের ১৭ই জুলাই তারিখের একটী তালিকা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, উভয় কাটরার ব্যয়নির্ব্বাহার্থে বার্ষিক ১২০৭৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। যথা :—

মহালের নাম	অধিবাসীর নাম	আনুমানিক স্থিত।
পাকুরতলী—	দুর্গাপ্রসাদ তেওয়ারী ও মৃত জয়নারায়ণ বাবুর ওয়ারিশ—	২৭৫৲
চম্পাতলি বা ছোট কাটরা (ইমামগঞ্জসহিত)	হায়তন্নেছা খানম… মিঃ ওয়াইজ এবং সালেহা খানম—	২৫০৲
পাথরহাটা এব্রাস কাটারা—	আহম্মদ হাজি ও মজফর হোসেন—	৫০৲
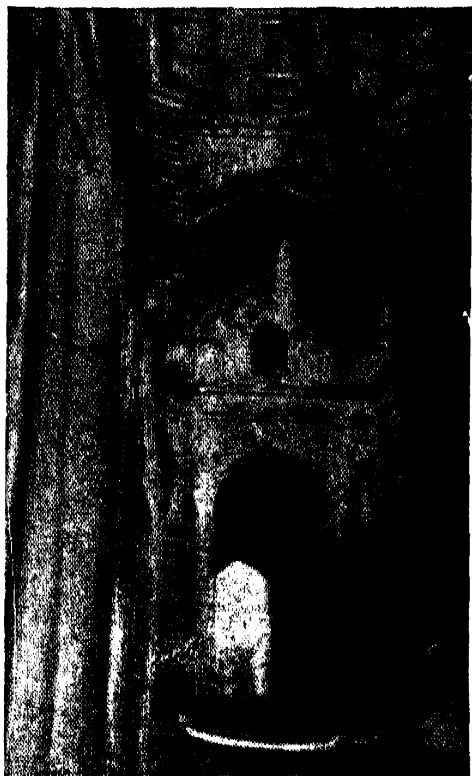
ছোট কাটরার তোরণদ্বার।

চক নিকাশ—	গবর্ণমেণ্ট	১১০৲
মহম্মৎগঞ্জ—	মজহর আলি খান, পুটী খানম, সালেহা খানম	৩০০৲
খাবেৎ দেউন –	ইমাম বকুল	৫০৲
ভাইব্রাজ খান—	মজহর আলি খান	২৲
বড় কাটরা—	উদয়চাঁদ পসরি ও শঙ্কর পুনম	১৫০৲
		১২০৭৲

কাটরার সম্পত্তি গুলি ওয়াকৃফ্ বলিয়া মিঃ ক্লিনার তদীয় রিপোর্টে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

হিঃ ১০৮৮ সনে (১৬৭১ খৃঃ অঃ) ছোট-কাটরার নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্ত হয় (১)। সায়েস্তাখাঁ ঢাকাতে আগমন করিয়াই এই কাটরাটী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। প্রকাণ্ড প্রাচীরপরিবেষ্টিত এই সুবৃহৎ অট্টালিকাটী প্রায় ২৫০ বৎসর কাল যাবৎ সর্ব্ববিধ্বংসি কালের সহিত সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া আজিও যেন গর্ব্বোন্নত মস্তকে নির্ম্মাতার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে (২)। ১৮৪০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে এই কাটরাদ্বয়ে প্রস্তাবিত নূতন স্কুল ও ডিস্পেন্সেরী প্রভৃতি সংস্থাপন করিবার জন্য প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত

(১) খান বাহাদুর আওলাদ হোসেনের মতে উহা ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু সিহাবুদ্দিন তালিসের "ফাতইয়া ইব্রিয়া" গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সায়েস্তাখাঁ ১৬৬৪ খৃঃ অব্দের ১৩ই ডিসেম্বর রাজমহল হইতে ঢাকায় প্রথম পদার্পণ করেন। দক্ষিণাপথ হইতে বাঙ্গলার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ঐ সনের ৮ই মার্চ্চের পূর্ব্বে তিনি রাজমহলে আসিয়াছিলেন না।

(২) আমির-উল-উমরার বংশধরগণ অদ্যাপি এই স্থানে বাস করিতেছেন।

হয় নাই। প্রাচীরপরিবেষ্টিত আঙ্গিনার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বিবি চম্পার সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। বিবি চম্পার নামানুসারে এই স্থান চাঁপাতলি বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, এই প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশের উপরিভাগে একখানা শিলালিপি বর্ত্তমান ছিল। উহা ১৬৮৩ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হয় বলিয়া শিলালিপিতে লিখিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে শিলালিপি থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বিবি চম্পা কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন ইনি সায়েস্তাখাঁর জনৈক দুহিতা; আবার কেহ কেহ ইহাকে সায়েস্তাখাঁর বাঁদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (১)। যিনিই হউন, এই রমণী যে বিশেষ সৌভাগ্যবতী ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চক মসজিদ।

চকবাজারের পশ্চিমপ্রান্তে তিনটী গুম্বজসমন্বিত একটী প্রকাণ্ড মসজিদ সায়েস্তাখাঁ নির্ম্মাণ করেন। এখানে তিনি স্বয়ং নমাজ পড়িতেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। ঈদ উপলক্ষে এই মসজিদটী আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয়। এই মসজিদটী ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল (২)।

ঢাকার প্রাচীনদুর্গ ও নবাবীপ্রাসাদ।

ঢাকার প্রথম মোগল সুবাদারকর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গের চিহ্নও বর্ত্তমান নাই। বর্ত্তমান সময়ে ঐ স্থানে জেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত

(১) বলা বাহুল্য যে এই সমুদয় প্রবাদের মূলে কোনই সত্য নাই।

(২) D. Oyle's Antiquities of Dacca.

চক বাজার ও তন্মধ্যস্থিত কামান ও সায়েস্তা খাঁর মসজিদ।
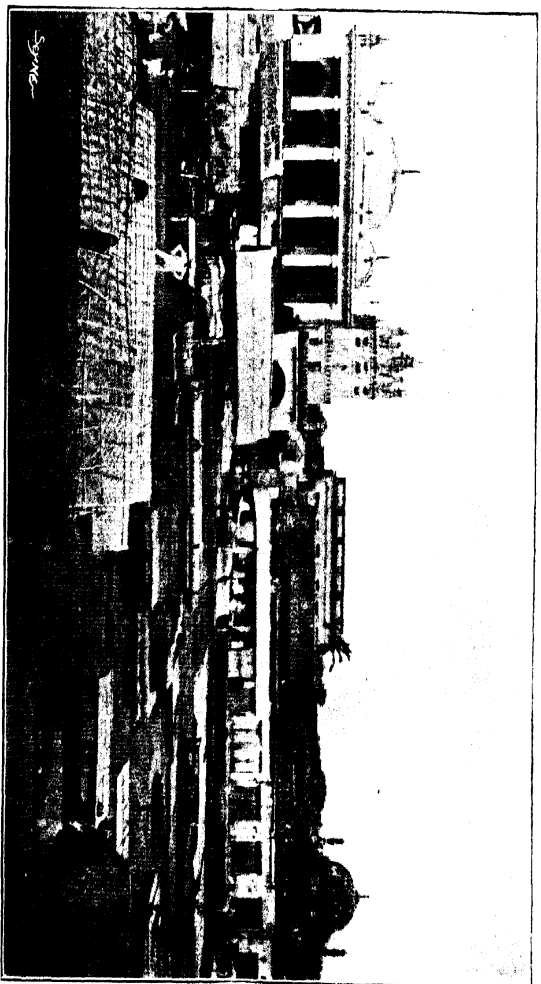
হইয়াছে। নবাব ইব্রাহিমখাঁ ফতেজঙ্গ এবং ইসলামখাঁ মেসেদী এই দুর্গের সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। ১৬৩৮ খৃঃ অব্দে ইসলামখাঁ এই স্থানে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। এই দুর্গের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে যে দুইটী প্রকাণ্ড তোরণদ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা "পূরব দরজা" ও "পশ্চিমদরজা" নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন কেল্লার সন্নিকটবর্ত্তী স্থান অদ্যাপি "গড়কেল্লা" বা "গির্দ্দিকেল্লা" বলিয়া পরিচিত। এই দুর্গের নিকটে "পাদশাহী বাজার" প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহা "খোলা নিকাশ", "চক নিকাশ," "উর্দ্দু বাজার" বলিয়া কথিত হইত (১)।

সায়েস্তাখাঁর সুশাসনগুণে বঙ্গদেশে আট মণ চাউল বিক্রীত হইলে মহোল্লাসে তিনি পূরবদরজায় তোরণদ্বারে লিখিয়া যান যে, যে রাজার রাজত্বকালে পুনরায় এইরূপ সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি না পাওয়া যাইবে, তিনি যেন ঐ দ্বার উদ্ঘাটন না করেন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে, সর্ফরাজখাঁর সময়ে, যশোবন্ত রায়ের সুশাসনগুণে ঢাকা প্রদেশে টাকায় আট মণ চাউল বিক্রীত হইলে তিনি মহা সমারোহে উল্লিখিত আবদ্ধ তোরণদ্বার মুক্ত করেন।

এই স্থানে নবাব জেসারৎখাঁকর্ত্তৃক খনিত একটী পুষ্করিণী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। পলাসীর যুদ্ধাবসানে নবাব জেসারৎখাঁ এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বড়-কাটরাতে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়াছিলেন; পরে নিমতলীর প্রাসাদ নির্ম্মিত হইলে সমুদয় অনুচরবর্গসহ তথায় যাইয়া বাস করিতে থাকেন (৩)।

---

(১) Vide Para 5 of the Report of Mr. R. M. Skinner, offg. Magte. to Mr. J. H. young, Dy. Secy. to the Govt. of Bengal.

(২) Dr. Taylor's Topography of Dacca.

(৩) Khan Bahadur S. A. Hussein's Antiquities of Dacca.

বড়-কাটরা।

১৬৪১ খৃঃ অব্দে (হিঃ ১০৫৫) সাহ সুজা বুড়ীগঙ্গাতীরে একটী প্রকাণ্ড সরাইখানা নির্ম্মাণ করেন (১)। সুজার আদেশক্রমে মীর-ই-ইমারৎ আবুদুল কাসেমকর্ত্তৃক উহার নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই অট্টালিকা ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ "বড়-কাটরা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অদ্যাপি ইহার ভগ্নাবশেষ লোকলোচনের গোচরীভূত থাকিয়া কীর্ত্তি-কর্ত্তার নাম জাগরূক রাখিয়াছে। কথিত আছে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে উহা সম্রাটতনয়ের মনোমত না হওয়ায় তিনি এই বৃহৎ কাটরাটি আবদুল কাসেমকে দান করিয়াছিলেন। মোগল শাসনসময়ে শত শত যাত্রী এখানে আশ্রয়লাভ করিত এবং আহার্য্য ও পানীয় প্রাপ্ত হইত। এই অট্টালিকাটির নির্ম্মাণকৌশল অতি সুন্দর এবং সুদৃঢ় (২)।

List of Ancient monuments এ এই অট্টালিকাটি কুমার আজিম উশ্বানের আদেশক্রমে নির্ম্মিত হয় বলিয়া লিখিত আছে। কিন্তু উহা ভুল। ১৬৪১ খৃঃ অব্দে সম্রাটতনয় সুলতান সুজা বঙ্গের সুবাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আজিম উশ্বান সম্রাট ঔরঙ্গজেবের

---

(১) Report of R. M. Skinner Esqr., Offg. Magistrate to G. H. Young Esqr., Dy. Secretary to the Government of Bengal.

হাণ্টার প্রভৃতি সকলে ১৬৪৫ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) বুড়ীগঙ্গার সম্মুখস্থিত প্রকাণ্ড তোরণদ্বার এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী অপেক্ষাকৃত অল্পায়তনবিশিষ্ট প্রবেশদ্বারগুলি, ও অষ্টকোণসমন্বিত উচ্চ চূড়াদ্বয় আজিও অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া ঢাকার প্রাচীন সমৃদ্ধিগৌরব ঘোষণা করিতেছে।

লালবাগের মসজিদ (ফেরোখসয়েব নির্ম্মিত)।
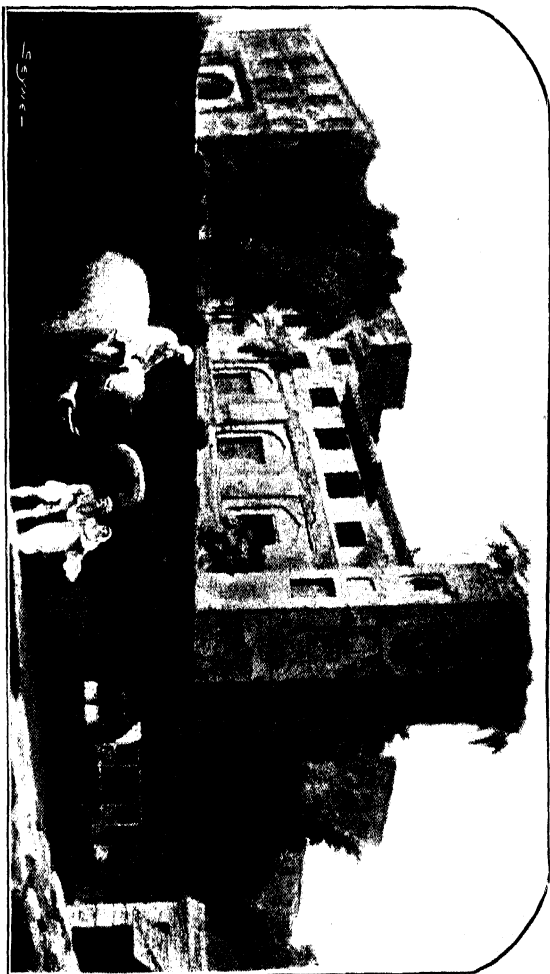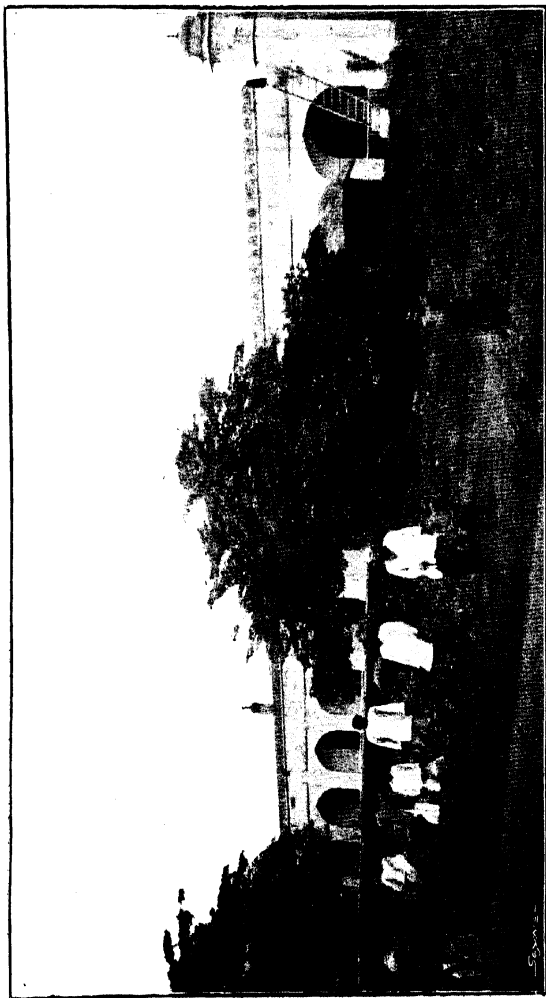
পৌত্র। এই সময়ে তিনি জন্মগ্রহণও করেন নাই। সুতরাং তাহার আদেশক্রমে এই অট্টালিকার নির্ম্মাণ কিপ্রকারে সম্ভবপর হয়!

বুড়ীগঙ্গার গর্ভ হইতে ইহার প্রশস্ত তোরণদ্বার এবং উন্নত ও সুদৃঢ় প্রচীরের সুবিশাল দৃশ্য একখানা চিত্রপটের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

সুবাদার মীরজুমলা বড়-কাটরায় স্বীয় বাসস্থান মনোনীত করেন; ইহার তোরণদ্বারে তিনি প্রকাণ্ড দুইটী কামান সজ্জিত রাখিতেন।

পাড়ুবিবির প্রকোষ্ঠ।

বর্ত্তমান মেডিক্যালস্কুল যথায় অবস্থিত, সেখানে সায়েস্তাখা-নন্দিনী পাড়ুবিবির সমাধি বিদ্যমান ছিল। তৎকালে এই মসজিদটি একটী নয়নমনোরম অট্টালিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। মেডিক্যাল স্কুলের ভিত্তিসংস্থাপন সময়ে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব পাড়ুবিবির সমাধিস্থান খননপূর্ব্বক নবাবনন্দিনীর শেষ চিহ্ন, অস্থিপঞ্জরাদি নিক্ষেপ করিয়া ফেলেন। কথিত আছে একটী রৌপ্য গোলাবপাশ ও Lurbander তথায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। পাড়ুবিবির অপর নাম সাজাদা খানম বলিয়া জানা যায়।

বেগম-বাজারের মসজিদ।

বেগম-বাজারের মসজিদটি দেওয়ান মুর্শিদকুলিখাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এত বড় মসজিদ ঢাকাতে আর নাই। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল অতি চমৎকার।

লালবাগ মসজিদ।

এই মসজিদটী কেল্লার সংলগ্ন দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত। ঐ স্থানের নাম ছিল রাকবগঞ্জ বা মসজিদগঞ্জ। মসজিদটীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের

পরিমাণ প্রায় ১৬৪'×১৫০' হইবে। প্রায় ১৫০০ শত লোক একত্র বসিয়া এই মসজিদে নমাজ পড়িতে পারিত। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র কুমার আজিমউশ্বান ঢাকা হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবার সময়ে তদীয় পুত্র ফেরোখ্‌সয়েরকে ঢাকার প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ফেরোখ্‌সয়ের অচিরেই জনসাধারণের প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। লালবাগের এই মসজিদটী ফেরোখ্‌-সয়েরকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১৭১৭ খৃঃ অব্দে মুর্শিদকুলিখাঁ এই মসজিদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী কতকস্থান এবং মবলক মাসিক ২২৷৷ টাকা হিসাবে মাসহারা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন।

সাতগুম্বজ মসজিদ।

ঢাকা সদরঘাট হইতে ৬ মাইল পশ্চিমে জাফরাবাজার বাঁশবাড়ী নামক স্থানে নবাব সায়েস্তাখাঁর নির্ম্মিত সপ্তগুম্বজপরিশোভিত নয়ন-মনোরম একটী মসজিদ বিদ্যমান থাকিয়া নির্ম্মাতার অতীত কীর্ত্তিকাহিনী অদ্যাপি বিঘোষিত করিতেছে। সৌন্দর্য্যে লালবাগের পরিবিবির সমাধির পরই এই মসজিদটীর নাম উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে বুড়ীগঙ্গা নদী এই মসজিদটীর দক্ষিণপ্রান্ত দিয়াই প্রবাহিত হইত। এক্ষণে নদীপ্রবাহ প্রায় একমাইল দক্ষিণদিকে সরিয়া পড়িয়াছে। দৃশ্যটী বড়ই সুন্দর ও তৃপ্তিকর। সন্নিকটে দুইটী অতি প্রাচীন দরগা আছে। উহা সায়েস্তাখাঁর কন্যা বেগমবিবি ও গুলজার বিবির সমাধি বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

এই মসজিদটীর অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ৪৮'×১৬' ফিট। অভ্যন্তরে চারিটী অষ্টকোণসমন্বিত দ্বিতল প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান আছে। এই চারিটী

সাত গুম্বজ মসজিদ।

প্রকোষ্ঠের শীর্ষদেশে চারিটী গুম্বজ পরিশোভিত। মসজিদের ঠিক মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠটীর শীর্ষদেশে তিনটী সুবৃহৎ গুম্বজ আছে।

নবাব স্যর আবদুলগণি এই মসজিদটীর সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। তিনি একজন মোল্লার মাসহারাও প্রদান করিতেন। প্রায় বারপাখী নিষ্কর জমির উপস্বত্ব এই মোল্লার উপভোগ্য।

নারিন্দা বিনটবিবির মসজিদ।

নারিন্দার এই মসজিদটী ঢাকা সহরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। খোদিতলিপিপাঠে জানাযায় যে ইহা পাঠানরাজ নাসরুদ্দিন মহম্মদ সাহের সময়ে ১৪৫৬ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র হইলেও এই মসজিদটীর গঠন অতিশয় দৃঢ়, কিন্তু শিল্পচাতুর্য্য তেমন প্রশংসনীয় নহে।

এখানে এই মসজিদটীর অবস্থানহেতু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ঢাকানগরে অন্ততঃ ১৪৫৬ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই মোসলমানগণ বাসস্থাপন করিয়াছিল। এই সৌভাগ্যবতী মহিলার পরিচয় অতীতের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত রহিয়াছে। ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সৈয়দ আও-লাদ হোসেন খান বাহাদুর বলেন "ইনি যে উচ্চকুল সম্ভূতা ছিলেন না, তাহা উঁহার নামেই সূচিত হইতেছে"।

গির্দ্দিকেল্লার মসজিদ।

উপরোক্ত মসজিদটী নির্ম্মাণের ঠিক দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৫৮ খৃঃ অব্দে ২০শে শাবণ নবাব ইসলামখাঁর নির্ম্মিত প্রাচীন কেল্লার সন্নিকটে আর একটী মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা গির্দ্দকেল্লার মসজিদ বলিয়া পরিচিত। এই মসজিদের ভগ্নাবশেষ মাত্র অতীতের সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান

আছে। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ভূমিকম্পে এই প্রাচীন মসজিদটী ভূমিসাৎ হইয়াছে, কেবল মাত্র প্রাচীরগুলি অবশিষ্ট রহিয়াছে।

গির্দ্দকেল্লাস্থিত মাসওয়ালা গলির প্রাচীন মসজিদের শিলালিপি-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই মসজিদটী হিঃ ৮৬৩ সনের ২০ শে শাবন তারিখে, নাসিরউদ্দিন আবুল মোজফর মহম্মদশাহের রাজত্ব-কালে মোবারকবাদের প্রত্যন্ত প্রদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ডাঃ ওয়াইজ বলেন এই শিলালিপিখানা অন্ত কোনও প্রাচীন নগরীস্থ মসজিদ হইতে ঢাকাতে নীত হইয়া থাকিবে। কিন্তু মসজিদটী যে স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহাতে উক্ত মত আমাদের নিকটে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। হিজরী ৭৩১ সনে বাহাদুরশাহের মৃত্যু হইলে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলক বাহাদুরখাঁকে সুবর্ণগ্রামে এবং কদরখাঁকে লক্ষ্ণৌতীরে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন। হিঃ ৭৩৯ সনে বহরমখাঁর মৃত্যু হইলে ফখরউদ্দিন মোবারক সোনারগাঁয়ের সিংহাসন অধিকার করেন। মহম্মদ তোগলক এই সংবাদ অবগত হইয়া উঁহাকে দমন করিবার জন্ত কদরখাঁকে আদেশ প্রদান করেন। ফখরউদ্দিন কদরখাঁর নিকটে পরাজিত হইয়া অরণ্যমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কদরখাঁর সেনাদিগকে উৎকোচদ্বারা বশীভূত করিয়া পরে তাহার বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঘটনা হিঃ ৭৪১ সনে সংঘটিত হয়। ফখরউদ্দিন ৭৫০ সন পর্য্যন্ত সোনারগাঁয়ে প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। রেণেলের দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্রপৃষ্ঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ফকরউদ্দিন কদরখাঁর নিকটে পরাজিত হইয়া লাক্ষ্যানদী অতিক্রমকরতঃ টঙ্গী ও তুরাগ নদী অথবা দোলাইখাল বাহিয়া ঢাকার অরণ্যমধ্যেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে উত্তম সফল হইলে তদীয় আশ্রয়স্থানকে স্বীয় নামে
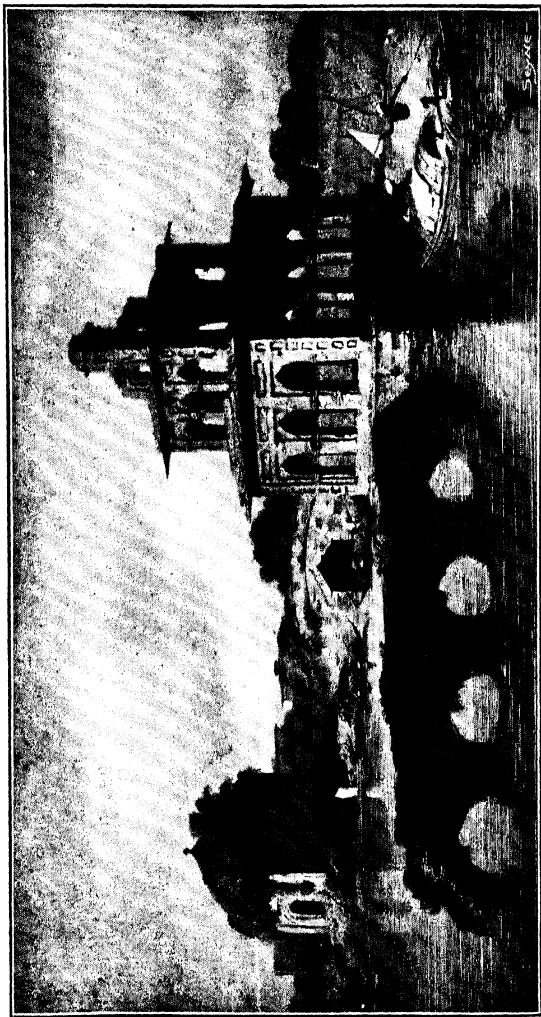
পুস্তা প্রাসাদ (আজিম উশ্বানের নির্ম্মিত)।

অভিহিত করিয়া থাকিবেন। জেরেটের অনূদিত আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে মোবারকউজিয়াল, সরকার বাজুহারের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও ঢাকা জেলায় মোবারক উজিয়াল পরগণায় বর্ত্তমান আছে।

পুস্তা প্রাসাদ।

এই প্রাসাদ লালবাগকেল্লার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। ইহার প্রায় সমুদয় অংশই বুড়ীগঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়া যায় (১)। ডাঃ টেইলার এই প্রাসাদের সামান্য চিহ্ন মাত্র অবলোকন করিয়াছিলেন। ১৭০২ খৃঃ অব্দে ঢাকার তদানীন্তন সুবাদার, ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উশানকর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল (২)। ফেরোখ্‌সেরের ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিবার সময়ে এই প্রাসাদমধ্যেই বাস করিতেন। বিশপ হিবার ইহার গঠনপ্রণালীর অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া ইহাকে মস্কোনগরস্থ Kremlin এর সমকক্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৩)।

---

(১) "Of the Pooshta residence the greater part has been carried away by the river, within the last twenty years, another is now only a small portion of it standing." Dr. Taylor's Topography of Dacca, page 96.

(২) Dr. Taylor's Topography of Dacca.

(৩) "The Castle which I noticed, and which used to be the palace, is of brick, yet showing some traces of the plaster which has covered it. The architecture is precisely that of the Kremlin of Moscow."—Bishop Heber's Journey. Part I. Page 190.

নিমতলীর কুঠী, বারদুয়ারি ও নৌবৎখানা।

নিমতলীর প্রাসাদ এবং তন্নিকটবর্ত্তী বারদুয়ারি ও নৌবৎখানা ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে নবাব জেসারৎখাঁর সময়ে নির্ম্মিত হয়। এই প্রাসাদই ঢাকার নায়েব-নাজিমদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। নবাব জেসারৎখাঁ, আসমৎজঙ্গ, নসরৎজঙ্গ, সমসেদ্দৌলা, কমরেদ্দৌলা ও গাজী-উদ্দিন হায়দর প্রভৃতি ঢাকার শেষ নায়েব-নাজিমগণ এই স্থানেই বাস করিতেন। যে প্রকাণ্ড জলাশয় এখন ঢাকা কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল সংসৃষ্ট ছাত্রাবাসের প্রাঙ্গনমধ্যে অবস্থিত, তাহা ঐ সময়ে বেগমদিগের জন্য খনিত হইয়াছিল।

নৌবৎখানার প্রকাণ্ড তোরণোপরি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সামরিক বাদ্য বাজিয়া উঠিত। বিশপ হিবার নবাব সমসেদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এই নৌবৎখানা অতিক্রমকরিয়াই প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিলেন। প্রাসাদমধ্যস্থিত অষ্টকোণসমন্বিত একটী প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠের গঠনপ্রণালীর তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। বারদুয়ারির দরবার প্রকোষ্ঠেই ঢাকার শেষ নায়েব-নাজিমগণের নবাবী-লীলা প্রকটিত হইত।

খান মুধার মসজিদ।

মুরশিদকুলীর শাসনসময়ে ঢাকার তদানীন্তন প্রধান-কাজীর আদেশানুসারে এই মসজিদটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঢাকায় রাজধানী থাকা সময়ে, নবাবী আমলে, এই অট্টালিকার পরে আর কোনও অট্টালিকা নির্ম্মিত হয় নাই; সুতরাং এইটীই ঢাকায় মোগলস্থাপত্যের শেষ নিদর্শন।

কাটরা পাকুরতলীর প্রাসাদ ও নৌবৎখানা।

বাবুরবাজার মসজিদের উত্তরপূর্ব্বদিকে, যেখানে বর্ত্তমান মেডিক্যাল স্কুল ও জেনানা হাসপাতাল সংস্থাপিত, তথায় এই প্রাসাদ ও নৌবৎখানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক্ষণে এই প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী বাবুরবাজারের ঘাট, নৌবৎখানার ভিত্তির ভগ্নাবশেষ এবং একটী ক্ষুদ্র মসজিদ মাত্র বিদ্যমান আছে। মসজিদগাত্রস্থিত শিলালিপিতে পারস্য ভাষায় লিখিত নবাব সায়েস্তাখাঁর রচিত কতিপয় পংক্তি উৎকীর্ণ আছে। এই মসজিদটী সায়েস্তাখাঁর প্রথম বারের শাসনসময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। শিলালিপির অনেক স্থান অগ্নিদেবের কৃপায় বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় উহার পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব।

ভ্রমণকারী টেভারনিয়ার ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে এই প্রাসাদমধ্যেই নবাব সায়েস্তা খাঁকে অবস্থান করিতে সন্দর্শন করিয়াছিলেন।

হাজি খাজে সাহাবাজের মসজিদ।

রমনার মাঠের দক্ষিণপশ্চিম কোণৈকপ্রান্তে দুইটী প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান আছে। উহার একটী হাজি খাজে সাহাবাজের মসজিদ এবং অপরটী উক্ত মহাত্মার সমাধি স্থান। এই মসজিদটী ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইনি কাশ্মীরাঞ্চল হইতে বাণিজ্য-ব্যপদেশে ঢাকা নগরীতে আগমন করেন এবং টঙ্গীতে স্বীয় আবাস-স্থান মনোনীত করেন। টঙ্গী হইতে ইনি প্রতিদিন সান্ধ্যনমাজের জন্য এই স্থানে আগমন করিতেন।

এই সমচতুষ্কোণাকার মসজিদটীর বাহ্যাকৃতি ৬৭'×২৬' ফিট এবং ইহা তিনটী গুম্বজসমন্বিত। ছাদের চারিকোণ আটটী উচ্চ

চূড়ায় পরিশোভিত। প্রাঙ্গণভূমি কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত। দরজার কবাটগুলিও প্রস্তরময়। পূর্ব্ব, উত্তর এবং দক্ষিণ এই তিনদিকে তিনটী দ্বার আছে।

বেচারামের-দেউরীনিবাসী জগ সা সাহেব ইহার তত্ত্বাবধায়ক। তিনিই এই মসজিদে আলোকপ্রদানের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

সাহাবাজের সমাধিও ঐ সময়েই তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং পরে তাহার মৃত্যু হইলে শবদেহ এই মসজিদমধ্যে সমাধিস্থ করা হয়। এই মসজিদটী সমচতুষ্কোণাকার। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ২৬' ফিট। একটী গুম্বজ এবং চারিটী উচ্চচূড়ায় পরিশোভিত।

চুড়িহাট্টার মসজিদ।

চুড়িহাট্টায় অতি প্রাচীন একটী মসজিদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে এই মসজিদটী অত্যন্ত জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার শিলালিপিপাঠে অবগত হওয়া যায়, একদা ঢাকার জনৈক নবাব একটী ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণার্থে কতক অর্থ তদীয় হিন্দু কর্ম্মচারীগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। হিন্দুকর্ম্মচারীগণ নবাবপ্রদত্ত অর্থে একটী দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া মন্দিরমধ্যে বাসুদেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে নবাব, কর্ম্মচারীগণের এবম্বিধ আচরণে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া ঐ বিগ্রহের বিনাশসাধনকরতঃ ঐ স্থানে এই মসজিদটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল এই মসজিদের কোনও স্থান খনন করিবার সময়ে একটী ভগ্ন বাসুদেব মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, টি, রেঙ্কিন মহোদয় ঐ মূর্ত্তিটী সংগ্রহ করিয়া কালেক্টরীর সম্মুখে রাখিয়াছেন।

গিয়াস-উদ্দিন আজমশাহের সমাধি।

পাঁচপীরের দরগার প্রায় ৫০০ শত গজ দক্ষিণপূর্ব্বদিকে, তারা-দামপূর্ণ নানাবিধ আবর্জ্জনাসম্পূরিত মগ দীর্ঘিকার তীরে (১) পারসী কবি হাফেজের সমসাময়িক (২) ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্যোৎসাহী পাঠানরাজ গিয়াসউদ্দিন আবুল মুজঃফর আজমশাহের (সুলতান গিয়াস্‌উদ্দিন) সমাধি বিদ্যমান আছে। সমাধিটীর এক্ষণে ভগ্নাবস্থা। সুনীল মর্ম্মর-প্রস্তরের লৌহের বন্ধনীগুলি (খিলান) অতিশয় মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রস্তর ভেদ করিয়া সুবৃহৎ বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া উহার প্রাচীনত্ব বিঘোষিত করিতেছে। পূর্ব্বে এই সমাধির কেন্দ্রস্থলে একখানা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তর এবং উহার চতুর্দ্দিকে পাঁচ ফিট উচ্চ অনেক গুলি স্তম্ভ বিদ্যমান ছিল। এই প্রস্তরগুলি আরব্যস্থপতিবিদ্যার অনুযায়ী নয়নমনোরম বিবিধ কারু-কার্য্যখচিত। অতি সুকৌশলে প্রস্তরগুলির বক্রতা সম্পাদন করা হইয়াছে। উহার প্রান্তদেশ এবং প্রস্তরোপরি উৎকীর্ণ কাল্পনিক বিবিধ লতাপুষ্পাদি অদ্যাপি নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দুর্জ্জয় কালের ধ্বংসনীতির প্রবল তাড়নায়ও উহার প্রাচীন কারুকার্য্য বিনষ্ট হয় নাই।

---

(১) মগদীঘিটী ইসলামধর্ম্মানুমোদিত পূর্ব্বপশ্চিমদীর্ঘে খনিত। মগদিগের খনিত দীঘি পূর্ব্বপশ্চিমদীর্ঘ দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ মগের দৌরাত্ম্য সময়ে উহারা সহর সোনারগাঁর এই সকল দীর্ঘিকার পারে অবস্থান করিয়াছিল বলিয়াই পরবর্ত্তী সময়ে উহা মগদীঘি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

(২) কথিত আছে গিয়াসউদ্দিন্ হাফেজকে স্বীয় রাজধানী সুবর্ণগ্রামে আনয়ন করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কবি এত দূরদেশে আসিতে সম্মত হন নাই।

সুসংস্কৃত হইলে চতুর্দ্দশ শতাব্দের পাঠানস্থাপত্যের একটী অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন লোকলোচনের অন্তরাল হইবার আশঙ্কা থাকে না। গিয়াস-উদ্দিনের সমাধি পূর্ব্ববঙ্গের মোসলমানগণের গৌরবের জিনিষ।

মগড়াপাড়ার নহবৎখানা ও "তহবিল"।

মহম্মদ ইউসুফের সমাধির সন্নিকটে একটী প্রাচীন ফটকের ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। সাধারণ্যে উহা "নৌবৎখানা" বলিয়া সুপরিচিত। পাঠানশাসনকালে, বিশ্রামস্থলের সান্নিধ্যপরিজ্ঞাপনার্থ প্রত্যহ প্রভাত-সময়ে এবং সায়ংকালে এই নৌবৎখানা হইতে অনবরত তানলয়সংযোগে বংশীবাদন করা হইত। পথশ্রমে ক্লান্ত নবাগত পথিক এবং পীর-পয়গম্বর ও ফকিরগণ দূর হইতে এই সুমধুর বংশীরব শ্রবণ করিলেই আশ্বস্ত হইয়া এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক বিশ্রম্ভালাপনে শ্রম অপনোদন করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইত। মসজিদের পশ্চাদ্ভাগে যে একটী প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা "তহবিল" Tahwil ধনাগার নামে পরিচিত। মসজিদের মতউল্লি অভ্যাগত-গণকে এই স্থানে সাদরে আহ্বানপূর্ব্বক পানাহার প্রদান করিয়া যে তাহাদিগের চিত্তবিনোদন করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেন, তাহা ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবের সময়েও অনেক প্রাচীন ব্যক্তির স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল (১)। বর্ত্তমান মতউল্লির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

---

(১) At the back of the mosque are the ruins of a house called the "Tahwil", or treasury, where, within the memory of many living, feasts were given by the Superintendent, or Mutawalli, of the mosque". Dr. J. wise—Notes on Sunargaon, East Bengal,

গোয়ালদীর প্রাচীন মসজিদ।

প্রাচীনত্বের হিসাবে এই মসজিদটী সোনারগাঁয়ের মধ্যে প্রাচীনতম। উৎকীর্ণ শিলালিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইহা আলাউদ্দিন হোসেনশাহের সময়ে হিঃ ৯২৫ সনে (১৫১৯ খৃঃ অব্দঃ) মোল্লা আকবরখাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই মসজিদের ইষ্টকগুলি অতিশয় রক্তবর্ণ। বহির্ভাগ বিবিধ কারুকার্য্যসমন্বিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে তৎসমুদয়ই প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মসজিদটী ১৬½ ফিট সমচতুষ্কোণাকার। সমচতুষ্কোণাকার দেওয়ালগুলি কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া অষ্টভুজাকারে পরিণত হইয়াছে। অর্দ্ধ গোলাকার তোরণের ন্যায় চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোলঙ্গ ইহার চারি কোণৈক প্রান্তদেশ হইতে উত্থিত হইয়াছে। মধ্যদেশ গুম্বজ-ত্রয়ে পরিশোভিত। কেন্দ্রস্থ গুম্বজটী আরব্যস্থাপত্যের অনুকরণে সুনীল মর্ম্মর প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত। অপর দুইটী ইষ্টক নির্ম্মিত। দ্বারদেশের স্তম্ভগুলি কোনও হিন্দু দেবমন্দির হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব অনুমান করেন। হিন্দুমোসলমাননির্ব্বিশেষে সোনার-গাঁও অঞ্চলের সকলেই এই মসজিদটীকে সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। শেষ খাদিমের মৃত্যুর পরে ইহা নিতান্ত অযত্নে রক্ষিত হইতেছে। হোসেনশাহের নির্ম্মিত এই প্রাচীন মসজিদটী এক্ষণে একরূপ পরিত্যক্ত; দীনধর্ম্মানুমোদিত নমাজের উচ্চ ধ্বনি এক্ষণ আর এখানে শ্রুত হওয়া যায় না। হিঃ ১১১৬ (১৭০৫ খৃঃ অব্দে) সনে নির্ম্মিত আবদুল হাকিমের মসজিদেই নমাজসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

Dr. Wise on Sunargaon.

বাড়ী মথলস্।

হবিবপুর গ্রামের অনতিদূরে কোম্পানীগঞ্জের পুলের সন্নিকটে একটী প্রাচীন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উহা সাধারণ্যে "বাড়ী মথলস্" নামে পরিচিত। সেখ মরিবুল্লা নামক ইংরেজ কোম্পানীর অনৈক বাচনদার হিঃ ১১৮২ (১৭৬৮ খৃঃ অব্দে) সনে এই সুবৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করেন। সোনারগাঁয়ে মলমলখাসকুঠী নির্ম্মিত হইলে দারোগার অধীনে বাচনদারগণ কার্য্য করিতেন। মসলিনের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া উহার উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করা বাচনদারের কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

বাড়ী মথলসের গঠনপ্রাণালী সাধারণ মসজিদ হইতে ভিন্ন শ্রেণীর। "বিদেশীয় গথিক (Gothic style) প্রণালীর অস্পষ্ট আভাস এই সুবৃহৎ ভবনের সহিত বিজড়িত" বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন (১)। ইহার চূড়াগুলি মৃণ্ময় হইলেও অত্যন্ত মসৃণ এবং চাকচিক্যবিশিষ্ট।

বল্লালের প্রস্তরময় রথ।

যোগড়াপাড়ার অনতিদূরে, পবিত্রব্রহ্মপুত্রতটে, পোড়ারাজার (দ্বিতীয় বল্লাল সেন) প্রস্তরময় রথের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। কথিত আছে, মহারাজ দ্বিতীয় বল্লালসেন প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া এই রথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রস্তরগুলির উপরে উৎকীর্ণ বহুবিধ চিত্র অদ্যাপি হিন্দুভাস্কর্য্যের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেছে। প্রবাদ এই যে, রথদ্বিতীয়ার দিন একশত ব্রাহ্মণ এই প্রকাণ্ড রথটী টানিয়া স্থানান্তরিত

---

(১) ঐতিহাসিক চিত্র, অগ্রহায়ণ ১৩১৮।

লস্কর দীঘির শিবমন্দির।

করিত, কিন্তু রথদ্বিতীয়া অতিক্রান্ত হইলে শত শত বলশালী পুরুষের সমবেত চেষ্টাতেও উহাকে স্থানচ্যুত করা সম্ভবপর হইত না। কালু নামক কোনও হিন্দু ফকির মোসলমানধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া এই রথের চূড়া ও কারুকার্য্যময় প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির বিনাশ সাধন করেন।

লস্কর দীঘার শিবমন্দির।

বাঘিয়াগ্রামে লস্করদীঘী নামে একটী প্রকাণ্ড জলাশয়ের পূর্ব্বতীরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহা ১১১২ বঙ্গাব্দে রূপরাম রায় (লস্কর) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। "মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ ইষ্টকগাত্রে লোলরসনা দিগম্বরী কালিকামূর্ত্তি, মহিষাসুরমর্দ্দিনী দশভুজামূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণের লীলালেখ্য আভীরপল্লীর সুন্দরচিত্র, প্রসাধননিরত সুন্দর রমণীমূর্ত্তি প্রভৃতি অঙ্কিত থাকিয়া দ্বিশতবৎসর পূর্ব্বে এতদঞ্চলের শিল্পকলার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কথিত আছে, এই মন্দিরের ভিত্তিতলে কতিপয় সহস্র মুদ্রা প্রোথিত আছে।

রাজাবাড়ীর মঠ।

এই মঠটী প্রায় ৮০ ফিট উচ্চ; নিম্নাংশের বেষ্টনও প্রায় ১২০ ফিট হইবে। রাজাবাড়ী থানার দেড় মাইল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মঠটী অবস্থিত। মঠের অভ্যন্তরে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে; নিম্নাংশ বহুপরিমাণে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। উত্তালতরঙ্গময়ী পদ্মা ইহার অনতিদূরে প্রবাহিত। বহুদূরবর্ত্তী পদ্মাবক্ষ হইতেও এই মঠটী দর্শকের নয়নরঞ্জন করিতে সমর্থ হয়। এতবড় মঠ ঢাকা জেলায় আর দ্বিতীয় নাই। প্রবাদ, কেদার রায় মাতৃশ্মশানোপরি এই মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের ধনকুবের ভাগ্যকুলের স্বনামধন্য রাজা

শ্রীনাথ রায়ের অর্থানুকূল্যে এই মঠটীর সংস্কার এবং উপরের চূড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই মঠের চূড়া ছিল না।

এই মঠটীর নির্ম্মাণসম্বন্ধে নানাবিধ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ বলেন চাঁদমিঞা নামক জনৈক খ্যাতনামা মোসলমান হিন্দু-পদ্ধতি অনুসারে স্বীয় জননীর সমাধির উপরে ইহা নির্ম্মাণ করেন। আবার কেহ কেহ ইহা পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণের একতম কীর্ত্তি বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই মঠটী পূর্ব্বদ্বারী বলিয়াই এসমুদয় অলীক কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ অনেকের বিশ্বাস হিন্দুর নির্ম্মিত মঠমন্দিরাদি পূর্ব্বদ্বারী হইতে পারে না। পূর্ব্বদ্বারী মঠ কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা হিন্দু-শাস্ত্রবিরোধী নহে। মঠ বা মন্দির সর্ব্বদ্বারীই হইতে পারে। মন্দির-দ্বারনির্ণয়ে শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত আছে :—

"হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে—প্রাঙ্মধ্যে চ পূর্ব্বে চ প্রত্যগ্‌দ্বারং প্রকল্পয়েৎ।
বিদিশাসু চ সর্ব্বাসু, তথা প্রত্যঙ্মুখং ভবেৎ॥
দক্ষিণে চোত্তরে চৈব পশ্চিমে প্রাঙ্মুখংভবেৎ॥"
শব্দকল্পদ্রুম, ১৪০৮ পৃঃ (বসুমতী-সংস্করণ)।

আদমসাহিদ মসজিদ।

আদমসাহিদ মসজিদ বা বাবা আদমের (১) মসজিদের অবস্থান সম্বন্ধে ডাক্তার ওয়াইজ, ডাঃ হোয়াইট ও মিঃ ব্লকম্যান প্রভৃতি মনীষিবর্গ ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন। ডাক্তার ওয়াইজ ও ব্লকম্যানের মতে এই মসজিদটী বল্লালবাড়ীর দুই মাইল দূরে কাজি-কসবা গ্রামে

(১) বাবা আদম হজরৎ আদম নামেও পরিচিত।
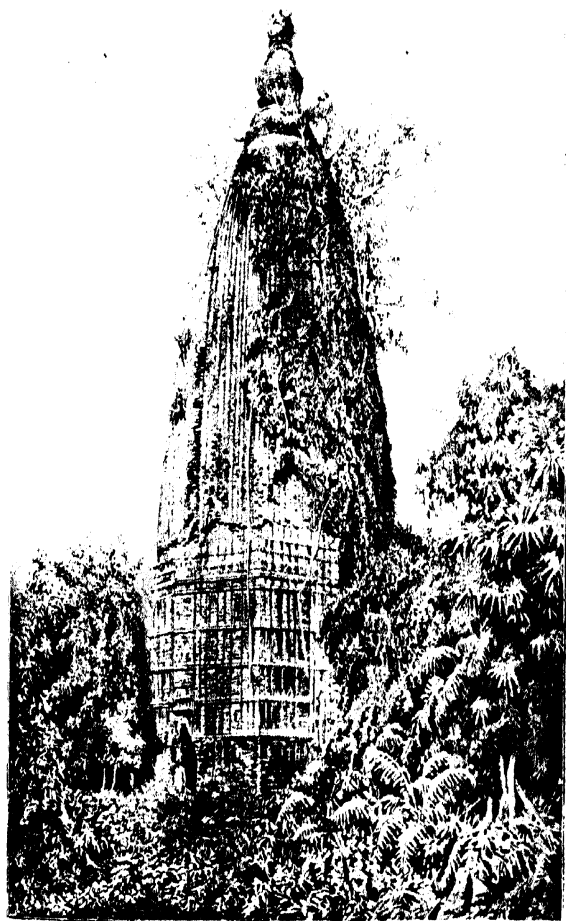
রাজা বাড়ীর মঠ।

অবস্থিত (১)। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা বড়ালবাড়ীর প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। মিঃ ক্যানিংহামের Archaelogical Survey Report পাঠেও ইহা অবগত হওয়া যায় (২)।

কাজি-কসবা গ্রামে অথবা তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে চারিটী প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান আছে এবং এই সমুদয় স্থানকেই লোকে সাধারণতঃ কাজি-কসবা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সুতরাং এই মসজিদচতুষ্টয় লইয়া অনেককেই অল্পাধিকরূপে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। এই ভ্রমনিরাসনের জন্য আমরা উক্ত চারিটী মসজিদেরই বিবরণ এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিব।

প্রথমটী :—রিকাবিবাজারের মসজিদ। এই মসজিদটীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় পঞ্চদশ হস্তপরিমিত হইবে। ইহা একটী মাত্র গুম্বজবিশিষ্ট। ইষ্টকগুলি অত্যন্ত মসৃণ এবং ঈষৎ বক্র; প্রান্ত ভাগ এরূপ সুমার্জ্জিত যে, দূর হইতে প্রস্তরখণ্ড বলিয়া প্রতীতি হয়। সাধারণ সুরকী ও চূণের প্রলেপদ্বারা উহা গ্রথিত করা করা হয় নাই। প্রলেপের শুভ্রত্ব-দর্শনে অনুমিত হয় যে উহা চূর্ণীকৃত প্রস্তর এবং চূণ অথবা তৎ অন্য কোনও পদার্থের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়াছে।

মসজিদের গাত্রে কোনও শিলালিপি বিদ্যমান নাই। কিন্তু অনু-সন্ধানে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, এই মসজিদমধ্যের প্রস্তরফলকটী নিকটবর্ত্তী অপর একটী মসজিদের গাত্রে সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ শিলালিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় যে ইহা হিঃ ৯৩৬ সনের জেলকদ্দ মাসে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

---

(১) Dr. Wise on Sunargaon and Mr. Blochman's History and Geography of Bengal.

(২) Arch. Surv. Rep., Vol X. P. 134.

দ্বিতীয়টী ঃ—এই শেষোক্ত মসজিদটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমোক্ত মসজিদের শিলালিপিখানা স্থানান্তরিত করিয়া দ্বিতীয় মসজিদের গাত্রে সংযোজিত করিয়া দেওয়ায় অনেকেই ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। ইহা ত্রিগুম্বজসমন্বিত।

তৃতীয়টীঃ—বাবা আদমের মসজিদের অনতিদূরে কাজি-কসবা গ্রামে তৃতীয় মসজিদটী অবস্থিত। ইহা কাজীরমসজিদ বলিয়া পরিচিত। বাবা আদমের মসজিদের অনেক পরে এই মসজিদটী নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার গাত্রে কোনও শিলালিপি নাই। কিন্তু বারান্দায় একটী হিন্দুদেবমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হওয়ায় মনে হয়, দীন-ধর্ম্মের জয়স্তম্ভস্বরূপেই উহা মসজিদের দ্বারদেশে রক্ষিত হইয়াছে। মসজিদের বর্ত্তমান কাজীর নিকটে আলমগীর বাদশাহের প্রদত্ত ফারমান আছে। তাহাতে এই মসজিদের ব্যয়সংকুলানের জন্য ভূমি-দানের কথা লিখিত আছে। এই মসজিদটী ত্রিগুম্বজসমন্বিত।

চতুর্থটীঃ—রামপালের অর্দ্ধমাইল উত্তরে দুর্গাবাড়ী নামক স্থানে আদমসাহিদ মসজিদ অবস্থিত। এক্ষণে এই মসজিদটীর ভগ্নাবস্থা। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫ হাত এবং প্রস্থ প্রায় ২৮ হাত হইবে। অভ্যন্তর-স্থিত কুঠারের পরিমাণ ২৬ × ১৯ হস্ত। এই মসজিদের গাথুনী এবং ইষ্টক-গুলির কারুকার্য্য ভিকারিবাজারের মসজিদেরই অনুরূপ। ইষ্টকগুলি ক্ষুদ্র এবং বক্রতাবাপন্ন।

এই মসজিদটী ষড়গুম্বজসমন্বিত ছিল (১)। মসজিদে প্রবেশ করিবার দ্বারের দুইপার্শ্বে দুইটী প্রস্তর স্তম্ভ অভ্যন্তরের ছাদের সহিত সংলগ্ন
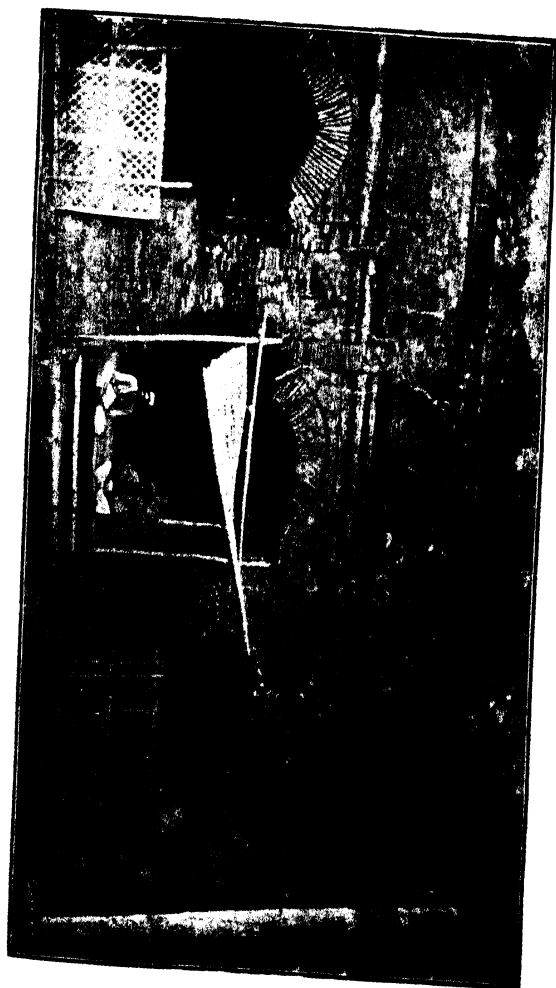
(১) ডাক্তার ওয়াইজ এর মতে তিনটী এবং মৌলবী আবুলখয়ের এর মতে দুইটী গুম্বজ অবশেষ হইয়াছে। ক্যানিংহামসাহেবের বিবরণীতে গুম্বজ-

রহিয়াছে। স্তম্ভের উচ্চতা প্রায় ৭ হাত হইবে; পরিধিও প্রায় ৩॥ হস্ত। এই স্তম্ভদ্বয় ঈষৎ শ্বেতবর্ণ একটী অখণ্ড প্রস্তর খণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত। এই স্তম্ভদ্বয়ের একটী হইতে অনবরত ঘর্ম্মাকারে জল নিঃসৃত হইত বলিয়া উহা স্পর্শ করিলে শীতল বোধ হইত, এইরূপ প্রবাদ শ্রুত হওয়া যায়। ঘর্ম্মশীল বারুণ প্রস্তরের বিষয় অবগত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ ঐরূপ একখানা প্রস্তর স্তম্ভগাত্রে অলক্ষ্যভাবে স্থাপিত ছিল। স্তম্ভদ্বয় হিন্দু ও মোসলমান রমণীগণদ্বারা সিন্দূরাপ্লুলিপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

মসজিদগাত্রস্থিত শিলালিপিতে হিজরি সবৎ ৮৬৮ সন খোদিত আছে। ঢাকা জেলার মসজিদগুলির মধ্যে এইটীই প্রাচীনতম।

মসজিদের অভ্যন্তরস্থিত দেওয়ালগাত্রে বারখানি বহুমূল্য প্রস্তর-খণ্ড সংলগ্ন ছিল; মগগণকর্ত্তৃক এতদঞ্চল লুণ্ঠিত হইবার সময়ে ঐ প্রস্তরখণ্ডগুলি অপহৃত হয় বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে কৈজদ্দিন খন্দকার, বদিরুদ্দিন দেওয়ান, এবং আইনদ্দিন খন্দকার প্রভৃতি এই মসজিদটীর স্বত্বাধিকারী।

See page 132 to 135 of Vol. XV. of the Archaeological Survey Report.

পাথরঘাটার মসজিদ।

শ্রীনগর থানার অন্তর্গত পাথরঘাটা নামক স্থানে আনোয়ার নামধেয় ঔরঙ্গজেবের জনৈক সভাসদকর্ত্তৃক হিঃ ১১০২ সনে এই মসজিদটী

অংশের বিষয় অবগত হওয়া যায় না। মিঃ ওয়াইজ এই মসজিদটীকে এক গম্বুজবিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তিনি কিলাবিবাড়ীর মসজিদকেই বাবা আদমের মসজিদ মনে করিয়া এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ভূমিকম্পে এই মসজিদের ছাদ বিধ্বস্ত হওয়ায় বাঙ্গালায় একটী মাত্র গম্বুজ ব্যতীত অপর কয়টী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার পরিমাপ ৩৪'×২০' ফিট। এই মসজিদটী ক্ষুদ্র বৃহৎ তিনটী গুম্বজে পরিশোভিত। দুই খণ্ড পীরোত্তর লাখেরাজ জমির উপসত্ব এবং বার্ষিক মঃ ১২৵০ টাকা খাজানা এই মসজিদের ব্যয়সঙ্কুলনের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। জিকনখাঁ নামক জনৈক মোল্লা এই মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক। নবাব আসানউল্লা বাহাদুর ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। স্থানীয় মোসলমানগণ এই স্থানে দৈনিক নমাজ পড়িয়া থাকে।

List of Ancient Monuments.

শ্রীনগরের বুরুজ।

শ্রীনগরের জমিদার বংশের স্থাপয়িতা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ৺লালা কীর্ত্তি-নারায়ণের নির্ম্মিত চারিটী বুরুজ অষ্টাদশ শতাব্দীর উন্নত স্থাপত্যের জলন্ত নিদর্শন। কীর্ত্তিনারায়ণ শ্রীনগর পত্তন করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে পরিখা খননপূর্ব্বক সুদৃঢ় বাসভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বিপৎ-কালে আত্মরক্ষার্থ স্বীয় আবাসভূমির চতুর্দ্দিকে যে চারিটী বুরুজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী মাত্র ধ্বংসচিহ্ন লইয়া অতীতের সাক্ষীস্বরূপে বিদ্যমান আছে। সংস্কারাভাবে বোধহয় ইহাও কাল-গর্ভে বিলীন হইবে। এই বুরুজটী গোলাকার; উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফিট হইবে। অভ্যন্তরীণ ব্যাসও প্রায় ৭ ফিট। এই বুরুজে দিবা-রাত্রি সান্ত্রী প্রহরী নিযুক্ত থাকিত।

চুরচুরিয়ার দুর্গ।

খালার নদীর তীরে চুরচুরিয়ার দুর্গ অবস্থিত। ডাঃ টেইলারের সময়ে এই স্থানে নদীর পরিসর প্রায় ৩০০ গজ এবং গভীরতা ৪০ ফিটেরও বেশী

শ্রীনগরের বুরুজ

ছিল। তীরভূমি রক্তবর্ণ কঙ্করপরিপূর্ণ; এবং নদীর ধার হইতে উহার উচ্চতাও প্রায় ৫০ ফিট। দুর্গটী নদীতীরে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুর্গের বহির্দ্দিগস্থ প্রাচীর কর্দ্দমও রক্তবর্ণ কঠিন মৃত্তিকার সংমিশ্রণে নির্ম্মিত। ডাঃ টেইলার এই প্রাকারের উচ্চতা ১২।১৪ ফিট সন্দর্শন করিয়াছিলেন। দুর্গের পরিধি ২ মাইলেরও উপর। চতুর্দ্দিকস্থ পরিখা প্রায় ৩০ ফিট প্রশস্ত। এক্ষণে এই পরিখার অধিকাংশ স্থানই ভরাট হইয়া গিয়াছে। দুর্গের পাঁচটী দ্বার ছিল; ইষ্টকনির্ম্মিত কোনও তোরণদ্বারের চিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। দুর্গাভ্যন্তরে এই বহির্দ্দিকস্থ প্রাচীরের কিছু দূরে আর একটী পরিখার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এই পরিখা অতিক্রম করিয়া দুর্গাভ্যন্তরে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ নয়নগোচর হইয়া থাকে। দুর্গের বহির্ভাগের ন্যায় ইহাও অর্দ্ধচন্দ্রাকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ পরিখা বানার নদীর সহিত সংযুক্ত ছিল। অভ্যন্তরস্থিত এই বেষ্টনটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য তিনটী দ্বার নির্দ্দিষ্ট আছে। বেষ্টনমধ্যে দুইটী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। এই অট্টালিকাদ্বয় উচ্চস্থানে নদীর সন্নিকটে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকস্থ অট্টালিকাটী ইষ্টকনির্ম্মিত উচ্চচূড়াসমন্বিত ছিল। প্রাচীর-পরিবেষ্টিত চারিটী বুরুজের ভিত্তির অংশগুলি এক্ষণেও বিদ্যমান আছে।

উত্তরদিকস্থ অট্টালিকাটীতে দুইটী সমচতুষ্কোণাকার উচ্চস্তূপ পরিলক্ষিত হয়। এই স্তূপের অনতিদূরে একটী পুষ্করিণী ছিল। এই পুষ্করিণী দুর্গের বহির্দ্দিকস্থ পরিখার সহিত একটী পয়ঃপ্রণালী দ্বারা সংযোজিত ছিল। দুর্গাভ্যন্তরে অনেকগুলি জলাশয় ছিল; তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। অট্টালিকাগুলির অধিকাংশ স্থান বানার নদীর কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে।

এই দুর্গটি রাণীবাড়ী বলিয়া অভিহিত হয়। রাজা যশোপালের বংশীয় রাণী ভবানী এতদঞ্চলে মোসলমান আগমনের প্রাক্কালে এই স্থানে বাস করিতেন। আমাদিগের বিবেচনায় এই দুর্গটি রাজা যশোপালের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধ নরপতিগণের সময়ে দুর্গাদি কি প্রকার সুরক্ষিতভাবে নির্ম্মিত হইত, তাহা এই দুর্গটি দৃষ্টে কতক হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

হাজিগঞ্জের দুর্গ।

এই দুর্গ সুবাদার মীরজুমাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মগেরা সাধারণতঃ ব্রহ্মপুত্র বাহিয়া শীতলক্ষ্যা অতিক্রমকরতঃ ঢাকা নগরীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিত। ঢাকা নগরীকে জলদস্যুগণের হস্ত হইতে সুরক্ষিত করিতে হইলে হাজিগঞ্জ এবং ইদ্রাকপুর স্থানদ্বয় হইতেই শত্রুপক্ষের গতির প্রতিরোধ করা আবশ্যক, এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াই [illegible] সুবাদার এই স্থানদ্বয়ে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এই দুর্গটির পরিধি প্রায় দেড় মাইল হইবে। চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের উচ্চতাও প্রায় দশ হাত। গঠনপ্রণালী ইদ্রাকপুরের দুর্গের প্রায় অনুরূপ। ইদ্রাকপুরের দুর্গের ন্যায় এই দুর্গেও একটী স্তূপ বিদ্যমান ছিল।

এক্ষণে এখানে ঢাকার নবাব বাহাদুরের বাগানবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমান নবাব বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত খাঁজে হাফেজুল্লার নামানুসারে এই বাগানবাড়ীর নাম "হাফেজমঞ্জিল" রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার প্রাচীরমধ্যস্থলের হইয়া রাজপথ চলিয়াছে।

ইদ্রাকপুরের কেল্লা।

এই দুর্গটি পূর্ব্বে ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। কালক্রমে ইছামতীর খরস্রোতে নদীতীরবর্ত্তী প্রাচীরাবলী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া

ইদ্রাকপুরের কেল্লা।

যায়। পরে নদীতে চর। পড়িয়া দুর্গের কিয়দংশ রক্ষা পাইয়াছে এবং নদীও এক্ষণে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে সরিয়া গিয়াছে।

দুর্গের ভিত্তিভূমি গোলাকার ছিল ; ভিত্তিভূমির পশ্চিমাংশ সমচতুষ্কোণ এবং পূর্ব্বদিকের অংশ অসমান্তরাল চতুর্ভুজের ন্যায়। পশ্চিমাংশ হইতে পূর্ব্বাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ। একটী প্রাচীরদ্বারা এই উভয় অংশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে। দুর্গের কতকাংশ যে পরিখাবেষ্টিত ছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বদিকস্থ পরিখা নাতিদীর্ঘ একটী জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে এবং এই জলাশয়ের মধ্যহইতে পূর্ব্বদিকের প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ; প্রাচীর গাত্রে কামান সজ্জিত করার ছিদ্র বর্ত্তমান আছে। প্রাচীরগুলি মৃত্তিকানিম্নে প্রোথিত হওয়ায় উহার উচ্চতা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। দুর্গের চারি কোণে বৃত্তাকার চারিটী উচ্চতর বহির্ন্ন প্রাচীর আছে। পূর্ব্বাংশে উত্তরপূর্ব্ব কোণেও ঐরূপ একটী গোলাকার প্রাচীর আছে। চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর ৩ ফিট পুরু এবং উপরিভাগ সমতল না হইয়া অর্দ্ধবৃত্তাকারে সংবদ্ধ হইয়াছে। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার একটীমাত্র তোরণদ্বার। এই দ্বারটী পশ্চিমাংশের উত্তরদিকস্থ প্রাচীরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত।

দুর্গাভ্যন্তরে একটী গোলাকার সুবৃহৎ স্তূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার উচ্চতা অদ্যাপি প্রায় ৪৫ ফিট হইবে। এই স্তূপের উপরিভাগ খিলানের উপরে রক্ষিত। স্তূপের অভ্যন্তর পূর্ব্বে ফাঁপা ছিল ; উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার একাধিক দ্বার ছিল না। দুর্গের মধ্যে, পশ্চিমাংশে, একটী জলাশয় আছে এবং এই জলাশয় হইতে স্তূপটীর উপরিভাগ পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত সিঁড়ি আছে। এই সোপানাবলীর বামপার্শ্বে, নিম্নে একটী কুঠরী পরিদৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ উহা বারুদাগাররূপে ব্যবহৃত হইত।

এই দুর্গটী সুবাদার মীরজুম্নাকর্ত্তৃক ১৬৬০ খৃঃ অব্দে আসাম অভিযানের প্রাক্কালে মগদস্যুগণের আক্রমণ হইতে ঢাকা নগরীকে সুরক্ষিত করিবার জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহাকে "মগের কেল্লা", "কেহ বা পর্ত্তুগীজের কেল্লা" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

আবদুল্লাপুরের পুল।

এই পুলটী মীরকাদীমের খালের উপরে সংস্থাপিত। প্রবাদ এই যে কৌলিন্যমর্য্যাদাসংস্থাপক মহারাজা বল্লালসেন কর্ত্তৃক এই পুলটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনটী মাত্র খিলানের উপরে ইহা রক্ষিত। মধ্যস্থিত খিলানের প্রসারত্তা প্রায় ৯॥০ হাত; খালের গর্ভ হইতে এই খিলানটির উচ্চতা প্রায় ১৯ হাত। পারিপার্শ্বিক খিলানদ্বয়ের প্রত্যেকটী প্রায় ৫ হাত প্রশস্ত ও প্রায় ১১॥০ হাত উচ্চ। স্তম্ভগুলি প্রায় ৪ হাত পুরু। সমুদয় সেতুটীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১১৬ হাত। নির্ম্মাণকৌশলদৃষ্টে ইহা সেনরাজগণের কীর্ত্তির অন্যতম নিদর্শন বলিয়াই মনে হয়। পুলটী দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর; কিন্তু একেবারে ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। খিলানের অবলম্বনের অংশগুলি ফাঁটিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত কতকাংশও ভূমিসাৎ হইয়াছে; দুইদিকের অপ্রশস্ত প্রাচীরের উপর দিয়া এখনও লোক যাতায়াত করিয়া থাকে। List of Ancient Monuments of Dacca Division নামক গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় যে, ঢাকার পূর্ব্বতন জনৈক কালেক্টর সাহেব বলিয়াছিলেন, "আট সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া সংস্কৃত হইলে ইহা পঞ্চাশ সহস্র টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত পুলের সমতুল্য হইবে।" কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল, স্থানীয় জনসাধারণের সমবেত চেষ্টার ফলে এই পুলটীর মেরামতকার্য্য একপ্রকার সম্পন্ন হইয়াছে।

তালতলার পুল।

তালতলার পুল।

এই পুলটীও মহারাজা বল্লাল সেনের অন্যতম কীর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। প্রাচীন হিন্দু নরপতিগণের রাজধানী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রামপালনগরী হইতে যে সুপ্রশস্ত প্রাচীন বর্ত্ম কোদালদহের উত্তরতীর স্পর্শকরতঃ পশ্চিমবাহিনী হইয়া পদ্মাতীর পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছে, তাহার বক্ষোদেশ ভেদ করিয়া যে পয়ঃপ্রণালীদ্বয় সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত, তদুপরিই আবদুল্লাপুর ও তালতলার সেতুদ্বয় সংস্থাপিত।

তালতলার সেতুটীর অবস্থা পূর্ব্ববর্ণিত সেতুটীর অপেক্ষাও শোচনীয়। তিনটী খিলানের উপরে তালতলার পুলটী অবস্থিত ছিল। দুই পার্শ্বের খিলান দুইটীর পাশ ৬ হাত ও উচ্চতা বর্ত্তমান সময়ে খালের তলদেশ হইতে ১০।১২ হাত। মধ্যস্থিত খিলানের পাশ ৮।৯ হাত, উচ্চতা প্রায় ২০ হাত। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সময়ে কলিকাতা হইতে ঢাকায় সংবাদ প্রেরণের সুবিধাকল্পে এবং পূর্ব্বসীমান্ত প্রদেশে ও ব্রহ্মযুদ্ধে প্রেরণ করিবার জন্য সৈন্য ও রসদাদিসহ প্রকাণ্ড নৌকা এই সেতুর নিম্নদেশ দিয়া যেন অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে, এজন্য মধ্যের বৃহত্তম খিলানটী বারুদসংযোগে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

ইহার স্থানে স্থানে ফাঁটিয়া যাওয়ায় যাতায়াতের বড়ই কষ্ট হইয়াছে; তবে এখনও অতিকষ্টে জন সাধারণ একখণ্ড কাঠের সাহায্যে ইহার উপর দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে।

পানাম দুলালপুরের পুল।

পানাম হইতে যে একটী গ্রাম্যপথ হাজিগঞ্জ বৈদ্যেরবাজারের রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে, ঐ রাস্তায় একটী খালের উপরে পাঠান আমলের কীর্ত্তিচিহ্নস্বরূপে এই পুলটী বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনটী

খিলানের উপরে এই পুলটী সংরক্ষিত। মধ্যস্থিত খিলানটী পারিপার্শ্বিক খিলানদ্বয় অপেক্ষা উচ্চ; সুতরাং ঐ স্থান দিয়াই পণ্যবাহী তরণীসমূহ গমনাগমন করিতে পারে। পুলের উপরিভাগের রাস্তা অত্যন্ত ঢালু। পাঁচ ফিট পরিধি ব্যাপিয়া চক্রাকারে ইষ্টকগুলি সজ্জিত করা হইয়াছে। এই সমুদয় ইষ্টকচক্র পুলের পাদদেশস্থ প্রকাণ্ড প্রস্তরস্তম্ভের সাহায্যেই যথাস্থানে রক্ষিত হইয়াছে।

পুলের রাস্তাটীর প্রান্তদ্বয়ের অনেক স্থান বসিয়া গিয়াছে। পুলের কোনও কোনও স্থানে নোনা ধরিয়াছে। পানামের সুবিখ্যাত ধনী রামচন্দ্র পোদ্দার ও গুরুচরণ পোদ্দার মহাশয়েরা এক্ষণে ইহার স্বত্বাধিকারী। তাঁহারা সচেষ্ট হইলে এই প্রাচীন কীর্ত্তিটী রক্ষা পায়।

এই পুলের উপর দিয়াই কোম্পানীর কুঠিতে যাইতে হয়। এই পুলটীর সন্নিকটে যে অপর একটী সেতু পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার গঠনপ্রণালীও পূর্ব্বের সেতুটীর অনুরূপ।

টঙ্গীর পুল।

ঢাকা হইতে ১৪ মাইল দূরে টঙ্গীর পুল অবস্থিত। খান খানান মোয়াজ্জমখাঁ (মীরজুম্লা) কর্ত্তৃক টঙ্গীর পুলটী নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়; কিন্তু কেহ কেহ বলেন গাজী নামক জনৈক ফকির নবাব ইব্রাহিমখাঁর সময়ে এই পুল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মীরজুম্লার প্রস্তুত পাগলার পুলটীর গঠনপ্রণালী টঙ্গীর পুলেরই অনুরূপ বলিয়া শেষোক্তটী মীরজুম্লাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়াই আমরা মনে করি।

সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে ঢাকার তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কার্ণাকের আদেশানুসারে এই পুলের কতকাংশ ভগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু Sir Charles D'Oyly's Ruins of Dacca গ্রন্থ পাঠে অবগত
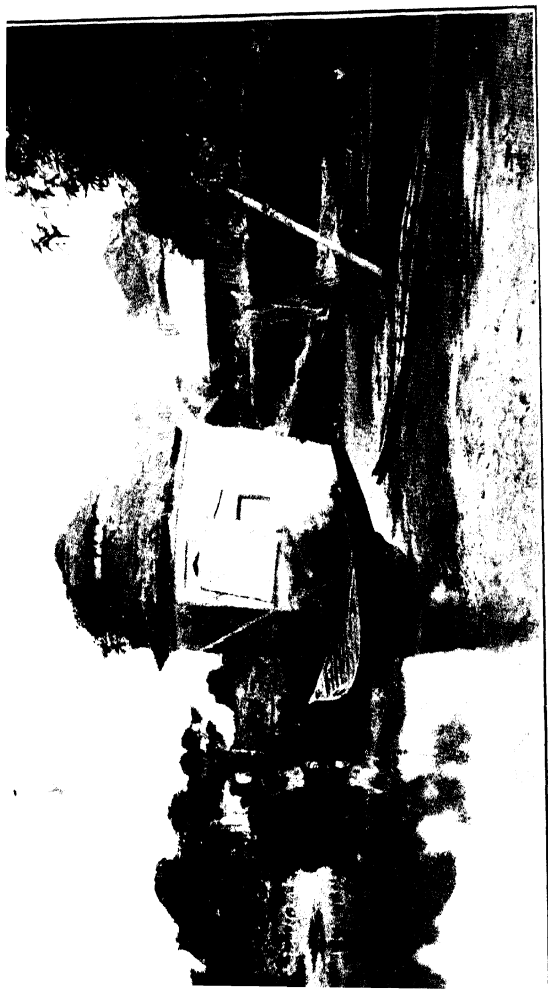
পাগলার পুল

হওয়া যায় যে এই পুলটীর একটী খিলান বহুপূর্ব্বেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পরে যে একটী লৌহনির্ম্মিত সেতু এই স্থানে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা ১৮৯০ খৃঃ অব্দের প্রবল বন্যাস্রোতে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পাগলার পুল।

ঢাকা হইতে ৫ মাইল দূরে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রাস্তার উপরে পাগলার পুল অবস্থিত। এই পুলটী সৈন্যাদি গমনাগমনের সুবিধার জন্য সুবাদার মীরজুম্লাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিশপ হিবার এই পুলটী এতদ্দেশীয় শিল্পিগণের হস্তপ্রসূত বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ। তিনি ইহাতে Tudor Gothic শিল্পের নিদর্শন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তদীয় নৌকার মাঝিগণ হইতে এই পুলের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে তিনি যে প্রবাদবাক্য পরিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহাতে উহা জনৈক ফরাসীকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় (১)। Charles D'Oyly's Ruins of Dacca গ্রন্থে ইহার একটী অতি সুন্দর চিত্র সন্নিবিষ্ট আছে।

চাঁপাতলীর পুল।

আকালের খালের উপরে সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত চাঁপাতলী গ্রামে প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড সেতু বিদ্যমান আছে। খিজির-পুর হইতে এক রাস্তা এই পুলের উপরদিয়া ঢাকা পর্য্যন্ত গিয়াছে।

---

(১) "It is a very beautiful specimen of this richest Tudor Gothic, but I know not whether it is strictly to be called an Asiatic building, for the boatmen said the tradition is, that it was built by a Frenchman.—Bishop Heber's Journal". Vol. I. Page 202.

এই পুলের উত্তর দ্বারে যে প্রস্তরফলক রক্ষিত আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায়, হিজিরি ১১০২ সনে লালা রাজমলকর্ত্তৃক এই পুল নির্ম্মিত হইয়াছিল *। এই কায়স্থকুলতিলক লালা রাজমল ঈশাখাঁর অনন্তরবংশ্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মনোয়ারখাঁর রাজস্ববিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। চাঁপাতলীর অন্তর্গত লালাখাঁর বাগান বলিয়া একটী আম্রোদ্যান এতদঞ্চলে সুপরিচিত।

---

* "মাদ্‌মূল্ আক্‌জাল লালা রাজমল হাথ্‌তারাহে খোদা.
বাহারে নাজাৎ ওয়ার ছেলো চস্‌মূ গোফ্‌ৎ তারিখাস্।
গো পোল্‌ছেরাত্তে চস্‌মারে আবেহায়াৎ ॥"
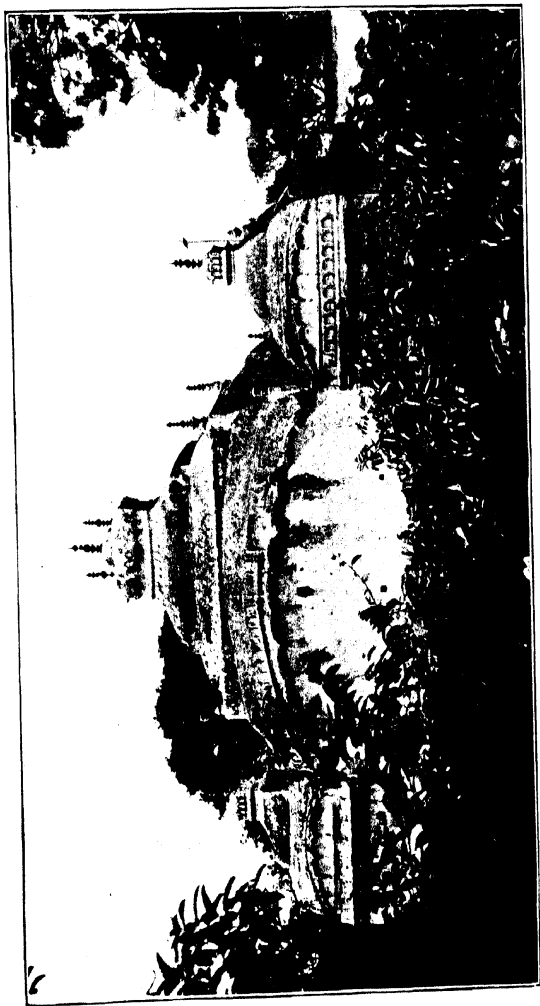
ঢাকেশ্বরীর মন্দির (পশ্চাদ্ভাগের দৃশ্য)।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

প্রসিদ্ধ দেবতা, দেবালয়, পুণ্যস্থান, দেবাধিষ্ঠিতস্থান, ধর্ম্মমন্দির।

ঢাকেশ্বরী।

বর্ত্তমান ঢাকানগরীর পশ্চিম প্রান্তে ৺ ঢাকেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। ঢাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়াই ইনি ঢাকেশ্বরী নামে অভিহিত হইতেছেন, অথবা ঢাকেশ্বরী দেবীর নামানুসারেই ঢাকার নামকরণ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ৺ ঢাকেশ্বরী কতকাল যাবৎ জনসাধারণের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাহা জানা যায় না। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের উনবিংশ অধ্যায়ে ঢাকেশ্বরীর উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। তাহাতে লিখিত আছে,—

"বৃদ্ধ গঙ্গা তটে বেদ বর্ষ সাহস্র ব্যত্যয়ে
স্থাপিতব্যঞ্চ যবনৈ র্জাঙ্গিরং পত্তনং মহৎ।
তত্র দেবী মহাকালী ঢক্কাবাদ্যপ্রিয়া সদাঃ
গাস্যন্তি পত্তনং ঢক্কা সজ্ঞকং দেশবাসিনঃ"॥

প্রবাদ এই যে, সতীদেহ ছিন্ন হইয়া তদীয় কিরীটের "ডাক"* এই স্থানে পতিত হইলে, এইস্থান একটি উপপীঠ মধ্যে গণ্য হয়।

---

* ডাক উজ্জ্বল গহনার অংশ বিশেষ (Reflector)। জড়াও কাজের নীচে "ডাক" দেওয়া হয়; তাহাতে কারুকার্য্য প্রতিফলিত হইয়া উজ্জ্বলতর দেখায়। "ডাক" দেশজ শব্দ, স্থানীয় কর্ম্মকারগণের নিকট এই শব্দটী সুপরিচিত।

"ডাক" পতিত হওয়াতেই এই স্থানের নাম ঢাকা এবং অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঢাকেশ্বরী নামে সুপরিচিত হইয়াছে।

দুর্গামঙ্গল গ্রন্থে মহারাজ বল্লালের জন্মসম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায়, ঢাকেশ্বরী বাড়ীর নিকটস্থ কোনও উপবনে তদীয় জননীকে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় বনবাস দেওয়া হইলে, বল্লাল-প্রসূতি ঢাকেশ্বরীর আরাধনা করেন। এই সময়েই বল্লালের জন্ম হয়। বনে লালিত হইয়াছিলেন বলিয়া মাতা পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন বনলাল বা বল্লাল। মহানুভব বল্লাল ভূপতি রাজসিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বনাকীর্ণ আবর্জ্জনাসম্পূরিত উক্ত স্থানটী জনসাধারণের বাসোপযোগী করিয়াছিলেন। দেবীর মন্দিরটীও বল্লালের আদেশেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজাদেশে দেবীর সেবার জন্ত পূজারি নিযুক্ত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন †।

আর একটী প্রবাদ এই যে, মহারাজ মানসিংহ বিক্রমপুরাধিপতি বীরাগ্রগণ্য কেদার রায়কে পরাজিত করিয়া গৃহদেবী শিলাময়ী লইয়া ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন। এ সম্বন্ধে প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় তদীয় বারভূঞা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "পরে তত্রত্য কর্ম্মকারগণকে ঠিক ঐ মূর্ত্তির অনুরূপ হিরণ্ময়মূর্ত্তি নির্ম্মাণ জন্ত নিয়োগ করিয়া, তাহারা পাছে কোনরূপে দ্রব্যের অসদ্ব্যবহার বা অপহরণ করে এই জন্ত সর্ব্বদা রক্ষিগণকে তত্ত্ব তালাস লইতে নিযুক্ত করা হয়। কর্ম্মকারেরা নিয়ত শিলাময়ীর নিকট থাকিয়া অন্ত প্রতিমা নির্ম্মাণ করে। যে দিবস কার্য্যশেষ হয়, সে দিবস তাহারা রাজসদনে উপস্থিত হইয়া বলে,

† পাণ্ডা ব্রজলাল তেওয়ারী এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে অনৈক সন্ন্যাসীর হস্তে পূর্ব্বে দেবীর অর্চ্চনার ভার অর্পিত ছিল; তাঁহার পরলোকান্তে তেওয়ারী মহাশয়দিগের

"মহারাজ আমরা একবার এই নবনির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তিকে পুষ্করিণী হইতে স্নান করাইয়া আনিতে ইচ্ছা করি।" রাজা তাহাদের কথায় স্বীকৃত হইলে, নির্ম্মাতারা অলক্ষিতে তাহাদের নির্ম্মিত মূর্ত্তিটীকে দেবীর আসোনোপরি রাখিয়া যথার্থ দেবীমূর্ত্তিকে মাজিয়া ঘষিয়া স্নান করাইয়া লইয়া আইসে, পরে উভয় মূর্ত্তি একত্র হইলে কোনটি বা পূর্ব্ব নির্ম্মিত এবং কোনটি বা নবনির্ম্মিত কেহই তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারিলেন না। পরে কারিকরেরা এই রহস্যজনক ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দিলে মানসিংহ তাহাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিয়া চাঁদরায়ের দেবীকে জয়পুরে লইয়া যান এবং অপর মূর্ত্তিটী ঢাকাতে সংস্থাপিত করেন। উহাই ঢাকে-শ্বরী নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ উভয় মূর্ত্তিই অষ্টধাতু নির্ম্মিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।"

ঢাকেশ্বরীর মন্দির পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইলেও উহার গঠনপ্রণালী এবং ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীন ইষ্টক খণ্ডগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এই মন্দিরটি বৌদ্ধ স্থাপত্যের অনুকরণেই নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রমনার কালী।

ঢাকা সহরের উত্তর প্রান্তে রমনার ময়দানে দশনামী সন্ন্যাসীদের একটী মঠ আছে। শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ের গিরি উপাধিধারী উদাসীনগণ কর্ত্তৃক এই মঠ সংস্থাপিত হয়। এই মঠমধ্যে ব্যাঘ্রাম্বরপরিধানা চতুর্ভুজা পাষাণময়ী কালীকাদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। বর্ত্তমান কালীবাড়ী অপেক্ষাকৃত আধুনিক। পূর্ব্বতন কালীবাড়ীর ভগ্নাবশেষ এই মঠের কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত।

মহারাজ রাজবল্লভ এই মঠটির সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ভীষণ ভূকম্পে মঠের শীর্ষদেশ ফাঁটিয়া গেলে গবর্ণমেণ্ট উহার সংস্কার করেন। নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীটী ভাওয়ালের স্বর্গগতা রাণী বিলাসমণি দেবীর ব্যয়ে খনিত হইয়াছে। প্রতি অমাবস্যায় দেবীর তৃপ্ত্যর্থে বলির ব্যবস্থা আছে।

প্রাঙ্গন মধ্যে একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড পরিলক্ষিত হয়; সাধক প্রবর ব্রহ্মানন্দ গিরির সিংহাসন বলিয়া লোকে এখনও উহা পূজা করিয়া থাকে।

প্রান্তর মধ্যস্থিত এই জনসমাগমশূন্য বিরলবসতি স্থানই সাধনার পক্ষে অনুকূল বলিয়া ব্রহ্মানন্দ এখানেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। ব্রহ্মানন্দের ন্যায় সাধক-শ্রেষ্ঠের পুণ্যস্মৃতি এইস্থানের ধূলি-কণার সহিত ওতঃপ্রোতঃ ভাবে বিজড়িত আছে বলিয়াই ইহা পুণ্যস্থান বলিয়া সমাদৃত। এইস্থান তদীয় গুরুধাম বলিয়া জনশ্রুতি।

অন্তঃস্বত্বাবস্থায় ব্রহ্মানন্দ গিরির জননী দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে এক তিলক্ষেত্রে ব্রহ্মানন্দ প্রসূত হন। নির্দ্দয় দস্যুরা নবজাত শিশুকে তথায় রাখিয়া জননীকে লইয়া প্রস্থান করিল; পরে, শিশুর পিতা এই সংবাদ পাইয়া পুত্রকে ক্ষেত্র হইতে আনয়ন পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ গিরি নিতান্ত দুর্ব্বিণীত, ভ্রষ্টাচারী ও চরিত্রহীন হইয়া পড়েন। কুলত্যাগিনী মাতাও অনন্যোপায় হইয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। কুসঙ্গদোষে একদা ব্রহ্মানন্দগিরি তাঁহার মাতার ঘরেই প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মানন্দ গিরির ললাট দেশে একটী জড়ুল ছিল। সেই নিদর্শন দৃষ্টে জননী পুত্রকে চিনিতে পারিলেন। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া ব্রহ্মানন্দগিরি সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মানন্দ প্রথমতঃ রমনার কালীবাড়ী আসিয়া দশনামী সন্ন্যাসীদিগের দলভুক্ত হন এবং ব্রহ্মানন্দ

রমণার মঠ।
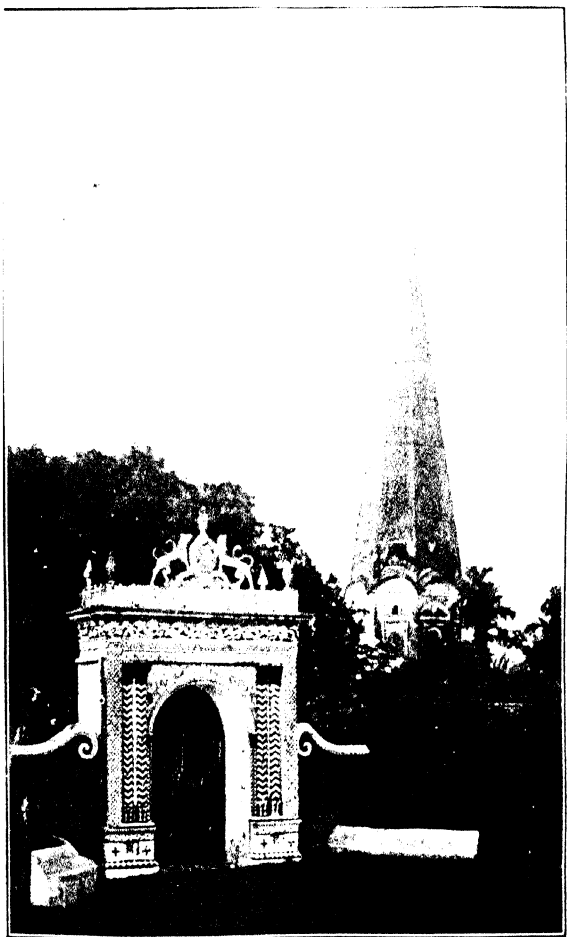
গিরি নাম ধারণ করেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি এইপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তান্ত্রিক সিদ্ধি সাধনে কৃত সঙ্কল্প হইলেন। ব্রহ্মানন্দ বুঝিয়াছিলেন, যে মহাশক্তির প্রেরণায় জগতের তাবৎকার্য্য যন্ত্রচালিতের ন্যায় সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, তদীয় দুষ্কার্য্যও তাঁহারই প্রেরণাসম্ভূত। তিনি এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিশোধ-গ্রহণ-সঙ্কল্প লইয়াই তান্ত্রিক সাধনা আরম্ভ করেন। সেইজন্যই ইষ্টদর্শনে সিদ্ধমনোরথ হইয়াও সাধক বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্মানন্দগিরি গিরীন্দ্র তনয়া বক্ত্রামৃতং বাঞ্ছতি।" ব্রহ্মানন্দের কঠোর সাধনায় দেবী পরিতুষ্ট হইয়া ভক্তের আসন মস্তকে বহন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উমাও তারা এই দুই মূর্ত্তিতে দেবী প্রস্তর বহন করতঃ ভক্তের অনুগামী হইতেন। লোকে দেখিত, প্রস্তরখানা শূন্যের উপর দিয়া ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। কথা ছিল, প্রার্থনার অন্যথাচরণ করিলে দেবী অন্তর্দ্ধান হইবেন। একদা তিনি রমনার মঠে যাইয়া প্রস্তর সহ গুরুধামের প্রাঙ্গন মধ্যে প্রবেশ করা সমীচীন বিবেচনা করিলেন না। তাই দেবীকে পাথর নামাইয়া দ্বারদেশে বিশ্রাম করিতে বলিয়া স্বয়ং মঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, দেবী কহিলেন, "তোমার সঙ্গে কথা ছিল, যখন তুমি পূর্ব্ব প্রার্থনার অন্যথা করিতে বলিবে, তখন আমি প্রস্থান করিব। তুমি আমাকে প্রস্তরবাহক করিয়া তোমার সহিত বিচরণ করিতে বলিয়াছিলে, উহা নামাইতে বলিলে কেন? অতএব আমি চলিলাম।" এই বলিয়া তথায় প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করতঃ দেবী অন্তর্দ্ধান হন। পাথরখানা ওজনে প্রায় ১।॥০ মণ হইবে। প্রবাদের মূলে যাহাই থাকুক, এই প্রস্তরখানার উপরে উপবেশন করিয়াই যে ব্রহ্মানন্দ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন তদ্বিষয়ে মতভেদ নাই। প্রস্তরখানা এক্ষণেও রমনার কালী বাড়ীতে বিদ্যমান আছে।

বর্ত্তমান মন্দিরের কিছু উত্তরে পূর্ব্বোক্ত কালীবাড়ীর ভগ্নাবশেষ

পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ এইখানেই দশনামী সন্ন্যাসীদিগের মঠ ছিল। List of ancient monuments গ্রন্থে রমনার মঠের উল্লেখ আছে।

সিদ্ধেশ্বরী ও মালীবাগের আখরা।

ঢাকা নগরীর উত্তরাংশে, বর্ত্তমান নিউটাউনের সন্নিকটে, মালীবাগ নামক স্থানে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দির অবস্থিত। এই কালীমূর্ত্তি বিক্রম-পুরাধিপতি চাঁদরায়ের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। মন্দিরের প্রাঙ্গনমধ্যে একটী রক্তচন্দনবৃক্ষ স্বীয় গৌরবোন্নত মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মাণ রহিয়াছে। চন্দনবৃক্ষ মন্দিরের সমীপবর্ত্তী অন্ত কোথায়ও আর দৃষ্ট হয় না। সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীর প্রায় সংলগ্ন পশ্চি-মোত্তর দিকে, নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে, একটী বাঁধান পুকুর ও কতকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে, উহা মালীবাগের আখরা নামে পরিচিত। শ্যাম-পত্রপূর্ণ আম্র প্রভৃতি বৃক্ষরাজি আপনাপন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া এরূপ ভাবে আলিঙ্গনসংবদ্ধ হইয়া এখানে শান্তিকুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছে যে, মধ্যাহ্ন ভাস্করের প্রদীপ্ত কিরণজালও ইহা ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারেনা। স্নুতরাং নিদাঘ মধ্যাহ্নেও সুশীতল বায়ুস্পর্শে শরীর শীতল হইয়া যায়। পৌষমাসে ঢাকা নগরীর আমোদপ্রিয় অধিবাসী বৃন্দের আনন্দ কোলাহলে এই স্থানটী মুখরিত হইয়া উঠে। এই সময় এখানে একটী মেলা জমিয়া প্রায় একমাসকাল স্থায়ী হয়। ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে চাঁদরায়ের মৃত্যু হয়। সুতরাং এই সময়ের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে সিদ্ধেশ্বরী স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

প্রবাদ এইযে, সিদ্ধেশ্বরীর জনৈক সেবাইত সৌমারবন গোস্বামী এক জন স্বয়ংসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি এইস্থানেই সিদ্ধি লাভ করেন। একদা এই মহাত্মা দেবীর প্রাঙ্গনমধ্যস্থিত একটী ইন্দারা

সিদ্ধেশ্বরীর মঠ।

মধ্যে লৌহশৃঙ্খল সহযোগে অবতরণ করেন; তিনি পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যদি এই শৃঙ্খল কূপজলের স্ফীতিহেতু নিমগ্ন হইয়া যায়, তবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যতকাল পর্য্যন্ত ইহা জলমগ্ন হইয়া না যাইবে ততকাল পর্য্যন্ত তিনি জীবিত থাকিবেন। বর্ষাকালে স্থানীয় কূপ সমূহে জল বৃদ্ধি হইলেও এই কূপের জলরাশির কিঞ্চিন্মাত্রও স্ফীতি অনুভূত হয় না। এই শৃঙ্খলটী অদ্যাপি একই অবস্থায় কূপমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে।

কথিত আছে, আজিমপুরার সাধকশ্রেষ্ঠ সাআলিসাহেব একদা একটী ব্যাঘ্রের উপর আরোহণ করিয়া সৌমারবন গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে তিনিও প্রাচীরের উপর উঠিয়া তৎসহ প্রত্যুদ গমন করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মোসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ই তাহা-দিগের নিজ জাতীয় সাধুপুরুষদিগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন-জন্য এইরূপ নানা অদ্ভুত গল্পের অবতারণা করিয়াছে।

শারদীয় উৎসবের সময়ে দেবীর সম্মুখে ঘটস্থাপনা করিয়া পূজা দিবার প্রথা বহুপূর্ব্বকাল হইতেই এখানে প্রচলিত আছে। পূজা সমাপনান্তে বিজয়া দশমীতে পূজারিগণ এই ঘট প্রাঙ্গন মধ্যস্থিত পুষ্করিণীতে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। ফাল্গুন মাসের অষ্টমী তিথিতে এই ঘট পুনরায় জাগিয়া উঠে। পরে ঐ ঘট পুনরায় সংস্থাপন পূর্ব্বক দশাহ পর্য্যন্ত পূজা হইয়া বিসর্জ্জিত হয়। প্রতি বৎসরই এইরূপে পূজা হইয়া থাকে।

শঙ্করাচার্য্য সম্প্রদায়ের "বন" উপাধিধারী উদাসীনগণই এই মঠের কার্য্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

নিম্নে দেবীর সেবাইত গণের যথানুক্রমিক নাম প্রদত্ত হইল:—

সৌমার বন গোস্বামী

এৎবার বনগোস্বামী　(চেলা)

রামেশ্বর গোস্বামী (চেলা)

সুমেরু বনগোস্বামী (পুত্র)

নরসিংহ গোস্বামী (জীবিত)

দেবীর বর্ত্তমান সেবাইত নরসিংহ গোস্বামীর বয়স এক্ষণে প্রায় ৫৫ বৎসর।

১২৭২ সনের ৩রা অগ্রহায়ণ তারিখে সুমেরু বনগোস্বামী ঢাকা ফুলবাড়ীয়ার গোপাললোচনমিত্র বরাবরে যে একখানা কবুলিয়ত সম্পাদন করিয়া দেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, খিলগ্রাম মৌজার মধ্যে ৪৪০৸৪।১০ চারিশত চল্লিশ বিঘা উনিশ কাঠা দশ ধুর জমী "শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী ও শ্রীশ্রী৺মহাদেব ঠাকুর বিগ্রহের" দেবোত্তর লাখেরাজ সম্পত্তি ভুক্ত।

List of ancient monuments গ্রন্থে এই মঠ ও আখড়ার উল্লেখ নাই।

বুড়াশিব।

কালিকাপুরাণের অশীতিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে, বৃদ্ধগঙ্গার জলের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে বিশ্বনাথ নামে শিবলিঙ্গ এবং মহাদেবী বিশ্বদেবী অবস্থিত।

যথাঃ— "বৃদ্ধ গঙ্গা জলস্তাশ্চ তীরে ব্রহ্মপুত্রস্য বৈ।
বিশ্বনাথো হরয়ো দেবঃ শিবলিঙ্গ সমন্বিতঃ॥

কালিকা পুরাণোক্ত বিশ্বনাথ এবং এই বুড়াশিব অভিন্ন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। আবার অনেকে বলেন যে এই বুড়াশিব ভগবান শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত। যিনি যাহাই বলুন এই শিবলিঙ্গটী যে অত্যন্ত প্রাচীন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, একদিন আমি ও আমার কয়েকটী বন্ধু ত্রিপুলিঙ্গ স্বামীজীর নিকটে গিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বুড়াশিব সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "পাঁচ বরষ মে চন্দ্রনাথ হো যায়গা"। মহাপুরুষের এই ভবিষ্যদ্বাণী আংশিক সত্য হইয়াছে সন্দেহ নাই।

নবাবপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ, বলরাম, মদনমোহন।

নবাবপুরের যে স্থানে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি বিগ্রহ স্থাপিত আছে, উহা অমরাপুর বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত। নবাবপুরের বসাকগণের পূর্ব্বপুরুষ স্বনামধন্য ৺কৃষ্ণদাস মুচ্ছদি মহোদয় কর্ত্তৃক ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। সুলেখক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসাক মহাশয় কীর্ত্তিকুসুম নামক গ্রন্থে এসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ৺লক্ষ্মীনারায়ণ পূর্ব্বে দ্বাদশভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চাঁদ ও কেদাররায়ের কুলদেবতা ছিল। ৯৮২ বঙ্গাব্দে ইহা কৃষ্ণদাসের হস্তগত হয় (১)।

এই সময়ে কৃষ্ণদাস অশোকাষ্টমীর স্নান উপলক্ষে পঞ্চমীঘাট তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। চক্রবাহীব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসের উদ্দেশে প্রথমতঃ ঢাকানগরীতে, এবং পরে ব্রহ্মপুত্রতীরস্থ পঞ্চমীঘাট তীর্থে উপনীত হইয়া কৃষ্ণদাসের হস্তে এই শালগ্রাম শিলা অর্পণ করে। কৃষ্ণদাসও সানন্দে লক্ষ্মীনারায়ণের ভার গ্রহণ করেন। কথিত আছে তদবধিই কৃষ্ণদাসের সৌভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইল।

---

(১) আমাদের বিবেচনায় কেদাররায়ের অধঃপতনের পরেই এই চক্র কোনও ক্রমে কৃষ্ণদাসের হস্তগত হইয়াছিল।

প্রবাদ এই যে, তিনি নিদ্রাবেশে শ্রীশ্রীবলরাম মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া স্বপ্নলব্ধ অপরিস্ফুট প্রত্যাদেশ বাক্য প্রতিপালনোদ্দেশ্যে ভগবান রেবতী রমণের দারুময় সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে একান্ত অধীর হইয়া উঠেন। অচিরকাল মধ্যেই সর্ব্বজন চিত্তহারী দারুময় মনোহর বলরাম মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল। তদনন্তর গয়াধাম হইতে পাষাণময় মদনমোহন বিগ্রহ আনাইয়া ও অষ্টধাতুময়ী সমুজ্জ্বল কিশোরী মূর্ত্তি গঠিত করিয়া ১০২০ বঙ্গাব্দে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীপাদ বীরভদ্র গোস্বামীর নামে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র ও বিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠা সম্পাদন করিলেন।

কৃষ্ণ মুচ্ছদ্দির অনন্তর বংশ্য ৺কৃষ্ণগোবিন্দ বসাক কর্ত্তৃক ১২৯৪ বঙ্গাব্দে একখানা রথ প্রস্তুত হয়। তৎপরবর্ত্তী বৎসরে সমুদয় সেবাইতগণের অর্থে পঞ্চায়তি বলদেবের রথ প্রস্তুত হয়।

রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা ব্যতীত ৺লক্ষ্মী নারায়ণ চক্র বাহিরে আনয়ন করা হয় না। পুষ্পযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মযাত্রা, গোবর্দ্ধনযাত্রা নিয়মপূর্ণা, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ঢাকার প্রসিদ্ধ জন্মযাত্রার উৎসব কৃষ্ণদাসমুচ্ছদ্দিকর্ত্তৃক নিজ প্রতিষ্ঠিত দেবতা শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মী নারায়ণের প্রীত্যর্থে সূচিতহয়।

কৃষ্ণদাস মুচ্ছদ্দিই ঢাকার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জন্মাষ্টমী ও মিশিলের প্রবর্ত্তক। ৺লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই উৎসবের সূচনা করেন।

অনুমান ১০২০ বঙ্গাব্দের পর ব্রজলীলার সং লইয়া মিশিলের উৎকর্ষ সাধন আরম্ভ হয়। নন্দোৎসব প্রভৃতি কৃষ্ণলীলা সম্পর্কীয় সং ব্যতীত অন্যকিছু জন্মাষ্টমীর অঙ্গভূক্ত করিবার আবশ্যকতা তখনও উপলব্ধি হয় নাই। তৎকালে কৃষ্ণ বলরাম সহ নন্দ যশোদাদি একটী কাষ্ঠ

নির্ম্মিত মঞ্চ মধ্যে স্থাপিত করিয়া বাহির করা হইত। তৎসঙ্গে দধি নবনী প্রভৃতি ভারবাহী ও অন্যান্য নর্ত্তনপর গোপ ও ব্রজবাসিগণ কেহ কেহ অশ্বোপরি ও কেহ বা ভূপৃষ্ঠে থাকিয়া নৃত্য ও বাদ্যাদি করিয়া চলিত। ইহাই প্রথমাঙ্গ নন্দোৎসব বটে। সেই সঙ্গে ভক্তিমান পরম বৈষ্ণব বসুকবৃন্দগণ পীতবসনপরিহিত ও পুষ্পমাল্যাদি ভূষিত হইয়া খোল করতাল যোগে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উহার প্রত্যুদ্গমন করিত। অনন্তর কৃষ্ণদাসের মৃত্যু হইলে ১০৪৫ বঙ্গাব্দের পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিপাদসমন্বিত চৌকিতে ভগবানের অবতারাদির মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইতে লাগিল। তৎসঙ্গে ক্রমশঃ পতাকা নিশানাদি ও বন্দুক বর্ষা প্রভৃতি এবং আশাসটা-বল্লম-ছড়িধারী পদাতিক ও অন্যান্য সাজসজ্জা সহ মিশিলের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহাই মিশিলের পরবর্ত্তী উন্নতাবস্থা।

ক্রমে নবাবপুরের তদানীন্তন অন্যান্য ধনীবসুকগণও নিজ নিজ দেবালয় হইতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সং বাহির করিয়া মিশিল গৌরবান্বিত করিতেছিলেন। এইরূপে প্রায় শতাধিক বৎসর অতিবাহিত হইলে উর্দ্দূবাজারস্থ গঙ্গারাম ঠাকুর নামক জনৈক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বসুকদিগের আদর্শানুকরণে একটী মিশিল বাহির করিয়া উর্দ্দূ হইতে নবাবপুর পর্য্যন্ত লইয়া আসিতেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। তৎকালে মিশিলগুলি নবাবপুর মধ্যেই পর্য্যটন করিত। পরে উহা নবাবপুর অতিক্রম করিয়া বাঙ্গলাবাজার প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করতঃ পুনরায় নবাবপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিত।

বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে পাতিটোলা নিবাসী গদাধর ও বলাইচাঁদ বসুক কর্ত্তৃক ইসলামপুরের মিশিলের আরম্ভ হয়। এই মিশিল উহাদিগের প্রতিষ্ঠিত ৺কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহের প্রীত্যর্থেই বাহির

হইতে থাকে। এই সময়ে বলাইচাঁদ ও গদাধর সহরের মধ্যে সম্পদ গৌরবে যথেষ্ঠ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। তাঁহারা মিশিলের যথেষ্ঠ উন্নতি সাধন করিয়া মহাসমারোহে নবাবপুর পর্য্যন্ত মিশিল আনয়ন করিতে থাকেন। এই প্রতিযোগীতার ফলে মিশিল যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। ক্রমশঃ উভয়পক্ষে নানা পৌরাণিক আখ্যায়িকার মনোরঞ্জন চিত্র প্রভৃতি সং এর অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল। এই সময়েই বড়চৌকি, সোনারূপার চতুর্দ্দোল, হস্ত্যশ্ব সমূহের জন্য সাচ্চার কাজকরা জরীর সাজ মিশিলের সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টের পিলখানার হস্তীসমূহ শোভাযাত্রার অঙ্গীভূত হইল। উভয়পক্ষ হইতে প্রভূত অর্থব্যয় সাধিত হইয়া বিবিধ পাদচারী ও মঞ্চ-স্থাপিত সং মনোরম সাজসজ্জায় জন্মাষ্টমীর উৎসবকে জাঁকাল করিয়া তুলিল। তৎসঙ্গে ঢাকার পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তা নবাবগণ যে প্রকার মিশিল সমভিব্যাহারে অতি সমারোহে নগরে বাহির হইতেন, তাহার ও কতক অনুকরণ করিয়া ঐ নবাব-সোয়ারীরঅংশ মিশিলের কোন কোন স্থানে সন্নিবেশিত হইয়া উহার অবয়ব বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সূচনা হইতে এ পর্য্যন্ত নবাবপুরের মিশিল পাঁচবার স্থগিত রহিয়াছে। (১) বর্গির হাঙ্গামার ভয়ে যখন বঙ্গদেশ সন্ত্রস্ত, সেইবার মিশিল বাহির হয় নাই। (২) বৃন্দাবনীধুম—বৃন্দাবন দেওয়ান রাজদ্রোহী হইয়া যে বৎসর ঢাকা নগরী লুণ্ঠন করেন, সেবৎসর মিশিল বন্ধ ছিল। (৩) ব্রহ্মদেশের প্রথমযুদ্ধের সময় মিশিল হইতে পারে নাই। (৪) সামাজিক দলাদলির ফলে একবার মিশিল বন্ধ হয়। (৫) ১২৬০ সনে ইসলামপুরের প্রতিযোগীতায় বিবাদ বিসম্বাদের আশঙ্কায় মিশিল বন্ধ থাকে।

ইসলামপুরের মিশিল এ পর্য্যন্ত বন্ধ হয় নাই।

নবাবপুরের ধনাঢ্য বসাকগণ নিজ নিজ বাড়ী হইতে মিশিল করিয়া একত্রে নির্দ্দিষ্ট পথে গমন করেন। ইসলামপুরের মিশিল কেবল গড়ু বলাইর বংশধরগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

রাজাবাবুর লক্ষ্মীনারায়ণ।

ঢাকা-লক্ষ্মীবাজার রাজাবাবুর বাড়ীতে এই লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত আছে। ভিখন লাল ঠাকুর এই লক্ষ্মীনারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানীপদ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কথিত আছে জনৈক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক ইনি পাঁচটী নারায়ণচক্র লাভ করিয়া উহা বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

ঢাকার নরসিংহজীর আখরায়, লক্ষ্মীবাজার নামক স্থানে, নারায়ণ গঞ্জ বন্দরে, ইদ্রাকপুরে, এবং পঞ্চমীঘাট নামক স্থানে উক্ত পাঁচটী শালগ্রাম মহাসমারোহে স্থাপিত করিয়া স্বীয় জমিদারীভূক্ত নারায়ণগঞ্জ বন্দরের আয় পূজা ও অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ধার্য্য করিয়াছিলেন। নারায়ণ বিগ্রহের সেবার জন্য এই স্থানের আয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া উহা নারায়ণগঞ্জ আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

পরে গবর্ণমেণ্ট নারায়ণগঞ্জ বন্দর বাজেয়াপ্ত করিবার সংকল্প করিলে ভিখন লাল ঠাকুর ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ ডগলাস এর নিকটে ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করিবার জন্য ১৭৯০ খৃঃ অব্দে যে এক খানা দরখাস্ত লিখিয়া ছিলেন তাহার কিয়দংশ আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়াদিলাম।

"I hold Naryangunge in virtue of a Sanad granted by the Company for the purpose of defraying the expenses of the Takoor, for feeding the poor, and for my support. To this day the gentlemen have not resumed

Debouter, Bermouter, Lackarage, Aymah, Piran and Fakiran lands of ancient establishment and the propritors have been suffered to enjoy them unmolested. I have been an old and faithful servant of the Company and have held Naryangunge these thirty years ; and now that I am worn down with years and infirmities and have no other means of support, I learn that a darogah is appointed to Narayangunge to attach the same. This news have overwhelmed me with grief and as I am too ill and too week to wait on you, I have sent my son to you to represent my miserable situation. He will show you my Sanad. Let me beseech you to give a favourable ear to his representation ; but if you do not, it were better that take away my life, or expel me from a district where I can no longer remain without incurring shame trouble and infinite distress. Hundreds of beggars who are daily fed by me are clamourous for food and you have not only deprived me of the means of supplying their wants but shut the door against my performing my religious rites by taking possession of the Gunge".

ঠাঠারী বাজারের জয়কালী।

ঠাঠারী বাজারের জয়কালীর মন্দির এবং নবরত্ন মঠ প্রায় ২০০।২৫০ বৎসরের প্রাচীন। কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত কালীমূর্ত্তি এই মন্দিরের

অধিষ্ঠাত্রীদেবী। মন্দিরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে ৭০ ও ৫০ ফিট উচ্চ দুইটী মঠ বিদ্যমান আছে। পশ্চিম পার্শ্বের মঠটী পঞ্চচূড় বলিয়া পঞ্চরত্ন নামে সুপরিচিত। মন্দিরের সন্নিকটে একটী নবরত্ন মঠের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রায় ২৮ বৎসর যাবৎ উহা ভূমিসাৎ হইয়াছে। জয়কালীর মন্দির হইতে নবরত্ন মঠটী ৫০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। List of ancient monuments গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

মাধব চালার সিদ্ধিশক্তি।

তুরাগ নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী সাকোসার গ্রামের পশ্চিমদিকে সিদ্ধিশক্তি নামে এক পাষাণময়ী দশভূজামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মূর্ত্তি এবং মন্দিরটি অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। বৌদ্ধ নরপতিগণের অধঃ-পতনের সঙ্গে সঙ্গে এতদঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের জ্যোতিঃ মলিন হইয়া শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়েই বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। মহিষমর্দ্দিনী, সিংহবাহিনী, চুণ্ডারোষিনী প্রভৃতি মূর্ত্তি এই সময়েই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

মিতারার দশভূজা।

ময়মনসিংহ জেলাস্থিত পণ্ডিতবাড়ী গ্রামে প্রায় ১০০০ বঙ্গাব্দে অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক জনৈক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে ভগবতী দশভূজার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে উহা এই জেলার মিতারা গ্রামে আনীত হয়।

উক্ত পণ্ডিতমহাশয়ের জয়দুর্গা নাম্নী কন্যার দেহলতা জন্মকাল হইতেই দ্বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত ছিল*। এই বিচিত্র কন্যার জন্মগ্রহণ অধ্যাপক

* জয়দুর্গার শরীরের কিয়দংশ কৃষ্ণবর্ণ এবং অপরাংশ গৌর বর্ণ ছিল।

মহাশয়ের কতদূর প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল বলিতে পারি না। পক্ষান্তরে প্রতিবেশী-জনগণের নানাবিধ মর্ম্মন্তুদ-উক্তি যে বালিকার বিবাহ বিষয়ের পরিপন্থী হইয়া পড়িয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং অধ্যাপক মহাশয়কে বিষমচিন্তায় পড়িতে হইল; এবং বিবাহের বয়স উপস্থিত হইলেও বরের সন্ধান না করিতে পারিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে মাণিকগঞ্জ মহকুমার নিকটবর্ত্তী মিতারা গ্রামবাসী রাঘবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যার্থী হইয়া অধ্যাপক মহাশয়ের সমীপে আগমন করেন। কার্য্যকলাপ দৃষ্টে অন্যান্য বিদ্যার্থীগণ রাঘবকে নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিয়া মনে করিত। চতুরের নিকটে নির্ব্বোধের যেরূপ অবস্থা দাঁড়ায় এক্ষেত্রেও তাহার বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল না। কাজেই অভাব অসুবিধার বিষম ভার রাঘবের ভাগ্যেই অধিক পড়িত। গভীর রাত্রিতে গৃহে অগ্নির অভাব হইলে, নিকটবর্ত্তী বিভীষিকাময় প্রকাণ্ড ময়দান অতিক্রম করিয়া, সন্ন্যাসীর ধুনী হইতে অগ্নি আনয়ন. অপর কাহারো সাহসে কুলাইত না; সে সময় সকলে, রাঘবকেই সেই বিপদ-সঙ্কুল পথে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত-মনে কালাতিপাত করিত।

সুচতুর পণ্ডিতমহাশয় রাঘবেন্দ্রের বুদ্ধির দৌড় সন্দর্শনে তাহাকেই জয়দুর্গার উপযুক্ত বর স্থির করিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। সুতরাং রাঘব পাঠ সমাপন করিয়া অধ্যাপক সন্নিধানে বিদায়গ্রহণ করিবার জন্য চরণবন্দনা করিলে তিনি গুরুদক্ষিণার প্রস্তাব করিয়া বলিলেন,—"আমার কন্যা জয়দুর্গাকে বিবাহ করিয়া, তুমি আমাকে দক্ষিণা প্রদান কর।" একেত রাঘব বুদ্ধিমান! তদুপরি আবার গুরুদক্ষিণার কথা। কাজেই এই বিবাহ হইতে আর কালবিলম্ব হইল না।

বিবাহান্তে শ্বশুরগৃহে গমন কালে জয়দুর্গা পিতৃগৃহে প্রতিষ্ঠিতা দশভুজা মূর্ত্তি পিতার নিকট প্রার্থনা করিলেন। কন্যার কথা শুনিয়া, পিতা বলিলেন, দেবীর পূজার উপস্বত্বই আমার সংসারের প্রধান সম্বল; তুমি যদি দেবীকে শ্বশুর গৃহে লইয়া যাইবে, তবে আমার সংসার চলিবে কিরূপে? জয়দুর্গা উত্তর করিলেন, "আমার সন্তানগণ আপনার শিষ্য হইবে, এবং তদ্দ্বারাই আপনার সংসার চলিতে পারিবে"। উত্তর শুনিয়া, পিতা জয়দুর্গার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং দশভূজা মূর্ত্তি জয়দুর্গাকে প্রদান করা হইল।

রাঘব ভট্টাচার্য্য সস্ত্রীক মিতারাগ্রামে উপনীত হইলে তদীয় পিতা নববধূর পাকস্পর্শের আয়োজন করিয়া বন্ধুবান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রিত জ্ঞাতি বর্গ ও বন্ধু বান্ধবসহ অপরাপর ব্রাহ্মণগণ সমাগত হইলে পরস্পর কাণাকাণি চলিতে লাগিল। একেত বিদেশী মেয়ে, তদুপরি বধূর শরীরের বর্ণ অত্যদ্ভুত, কাজেই বিশেষ প্রকারে অর্থব্যয় করিয়া মনস্তুষ্টি সাধন না করিতে পারিলে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নববধূর প্রদত্ত অন্ন আহার করিবেন না। সুতরাং রাঘবের পিতা কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এতচ্ছ্রবনে নববধূ, শশুরকে লোকদ্বারা জানাইলেন, "নিমন্ত্রিতগণকে ভোজনাসনে উপবেশন করিতে বলুন, টাকার ব্যবস্থা পরে করা যাইবে"। বধূর কথায় আশ্বস্ত হইয়া শ্বশুর সকলকে ভোজনার্থ আহ্বান করিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসনে উপবেশন করিলে জয়দুর্গা অন্নপূর্ণপাত্রহস্তে তাহাদিগকে পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে হঠাৎ বাতাস লাগিয়া নববধূর মাথার ঘোমটা পড়িয়াগেল। জয়দুর্গার দুইহাত বদ্ধ, কাজেই কি করেন! স্বয়ম্বর স্থলে রাজগণের চক্ষু যেমন ইন্দুমতীর প্রতি পতিত হইয়াছিল, তেমনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ, আগ্রহ সহকারে নববধূর দিকে অনিমেষ লোচনে চাহিয়া

রহিলেন। তখন তাহারা সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে দেখিতে পাইলেন, জয়দুর্গা, স্বীয় দেহযষ্ঠি হইতে অন্য দুইখানি হাত বাহির করিয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া দিতেছেন। ঘোমটা দেওয়া হইলেই, হাত দুইখানি আবার জয়দুর্গার দেহের সহিত মিশাইয়া গেল। সকলে বুঝিলেন, এ সামান্যা মেয়ে নয়, ভগবতী অংশতঃ অবতার গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। দর্শকগণ বিহ্বল; ভক্তিভরে তাহাদের শরীর কণ্টকিত; সুতরাং আর টাকা প্রাপ্তির আপত্তি রহিল না। সকলেই আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তদবধি শরীরের কৃষ্ণ ও গৌর বর্ণের সমাবেশ অনুসারে, জয়দুর্গা "অর্দ্ধ কালী" নামে খ্যাতিলাভ করিলেন।

জয়দুর্গার আনীত দশভূজা এখনও মিতারা গ্রামে আছে। "অর্দ্ধ কালীর" সহিত দশভূজার নাম বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই এই দেবী মূর্ত্তি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

নান্নারের বনদুর্গা।

শ্রীশ্রীবুড়াবুড়ী (বনদুর্গা), নান্নার গ্রামের এক নমঃশূদ্র বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন অনেকেই এই স্থানে মানসিক দিয়া থাকে। বুড়াবুড়ি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। হাঁস, কবুতর, বরাহ, অজশিশু প্রভৃতি বলি দেবীর নিকট প্রদত্ত হয়।

বরাহ বলির রীতি এতদঞ্চলের অন্য কোথায়ও আছে বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গের অন্যান্য স্থানেও বিরল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ইহা বৌদ্ধ তন্ত্রোক্ত বিধান মতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু কালিকাপুরাণে সকল প্রকার পক্ষী, বরাহ, গোধিকা এবং সিংহ ও শার্দ্দূল প্রভৃতি বলির বিধান ও পরিলক্ষিত হয়।

যথা :—

"কৃষ্ণসারস্য রুধিরৈঃ শূকরস্য চ শোনিতৈঃ।
প্রপ্নোতি সততং দেবী তৃপ্তিং দ্বাদশ বার্ষিকীম্॥

ধামরাইর যশো-মাধব।

কথিত আছে, পুরীধামের ৬ জগন্নাথমূর্ত্তির প্রথম কলেবর নির্ম্মাণ করিয়া যে কাষ্ঠ অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইতেই দারুময় মাধবের নয়নাভি-রাম মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। মাধবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"অর্দ্ধ মূর্ত্তি রাখি বিশ্বকর্ম্মা মহামতি।
চ'লে গেল নিজ স্থানে হ'য়ে ক্ষুন্নমতি॥
তার পর শুনহ অদ্ভুত বিবরণ।
যেমনে মাধব মূর্ত্তি হইল গঠন॥
জগন্নাথ নিরমিয়া যে কাষ্ঠ আছিল।
গৃহে আনি যত্নে তারে মূরতি গঠিল॥
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজধারী।
কস্তুরি শোভিত কর মাধব মুরারি॥
পদতলে নিরমিল রক্ত শতদল।
রবি শশি যার তেজে করে ঝলমল॥
ক্ষীরোদসাগরশয্যা অনন্ত আসন।
কিরীট কুণ্ডল আর রত্ন আভরণ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী দোঁহে করে পদ সেবা।
দশ অবতার দিল লীলা বোঝে কেবা॥
কপালে মাণিক দিল সূর্য্য কোন ছার।
(করিয়াছে চুরি যাহা পাণ্ডা দুরাচার)॥

হিরণ্য গর্ভের যেবা বুদ্ধি দিয়াছিল।
সেই মূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মা অভেদ গড়িল॥
গড়িয়া বিরলে মূর্ত্তি সহস্র বৎসর।
পূজা করে মর্ত্ত লোকে, নাহি জানে নর॥"

এই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিটীর পদ্মাসন হইতে দুইটী সর্প ফণা উত্তোলন পূর্ব্বক মাধবের নিম্নদিকস্থ দক্ষিণ ও বাম কর-প্রকোষ্ঠ চুম্বন করিয়াছে। ইহা দ্বারা অনন্ত আসন সূচিত হইতেছে; লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্ত্তির দুইদিকে ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ ও প্রহ্লাদ দণ্ডায়মান। পদ্মাসনের নীচে গজকচ্ছপের দ্বন্দ্ব-মীমাংসাকারী গরুড় বাহন-স্বরূপে অবস্থিত। গরুড়ের দুইদিকে চারিটী রাজহংস উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

চালীর ঊর্দ্ধদেশে বৃষভ-বাহন শম্ভু এবং তাঁহার দুইদিকে ভগবানের দশাবতার মূর্ত্তি ক্রমে নিম্নদিকে বিরাজমান।

এই মাধব পালবংশীয় যশোপাল কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়। কথিত আছে, একদা রাজা যশোপাল একদন্ত শ্বেতকায় গজারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে ধামরাই গ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী শিমুলিয়ার নিকটস্থ গাজীবাড়ীর এক উচ্চ ভিটার সম্মুখে উপনীত হইলে হস্তী আর অগ্রসর না হইয়া পশ্চাৎ দিকে হটিয়া যাইতে লাগিল। বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নরপতি তৎক্ষণাৎ গজ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজাদেশে ঐ স্থান খনিত হওয়ায় মৃত্তিকা মধ্যে একটী মন্দির, ও তন্মধ্যে মাধবের নয়নাভিরাম মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল (১)। যশোমাধব সংবাদে লিখিত আছে :—

---

(১) এইস্থানে একটী প্রকাণ্ড গর্ত্ত আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রবাদ, ঐস্থান হইতেই মাধব পাওয়া গিয়াছে। এজন্যই উহা "মাধবখাইনামে সুপরিচিত"।

"মাটি কাটি শ্রীমন্দির বাহির করিল।
কপাট ভিতরে আটা খুলিতে নারিল॥
অতঃপর মহারাজা ব্যাকুল হইয়া।
তিন দিন অনাহারে রৈল হত্যাদিয়া॥
ভক্তি দেখি ভগবান নারিল থাকিতে।
দৈববাণী আসি তারে কৈল অলক্ষিতে॥
তোর বংশ থাকিবেনা তুলিলে আমারে।
ধন বংশ চাও যদি ফিরে যাহ ঘরে॥
তমোপূর্ণ পৃথিবী দেখিয়া আমি ডরে।
লুকাইয়া আছি হেথা মৃত্তিকা ভিতরে"॥

কিন্তু ভক্ত নরপতি "তুমি মোর ধনবংশ তুমি শিরোমণি" বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মাধব বিগ্রহ স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিলেন। যশোপাল নির্ব্বংশ হইয়াছেন, কিন্তু "বংশগেল যশোনাম মাধবে মিলিল"। মাধবের নামের সহিত পুণ্যাত্মা যশোপালের নাম বিজড়িত হইয়া আজিও সেই মহাপুরুষ অমর হইয়া রহিয়াছেন। যশোপালের পরলোক গমনের পরে উৎকল দেশীয় পাণ্ডাগণের হস্তে মাধবের অর্চ্চনার ভার অর্পিত হইয়াছিল।

পালবংশীয় রাজগণের অধঃপতনের পরে চাঁদপ্রতাপ ও ভাওয়ালে গাজী বংশের অভ্যুদয় হয়। মোসলমানদিগের অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ধামরাই নিবাসী শ্রোত্রীয় ৺রামজীবন মৌলিক কুমরাইল গ্রামে মাধব বিগ্রহকে কিয়ৎকালপর্য্যন্ত রাখিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে এই বিগ্রহ "ঠাকুরবাড়ী পঞ্চাশে" স্থানান্তরিত করা হয়। কুমরাইল ও ঠাকুরবাড়ী পঞ্চাশই আদি ধামরাই; পরে এই বর্ত্তমান স্থানে (এই স্থান পূর্ব্বে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল) বিগ্রহ পুনরায় স্থানান্তরিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

যশোপাল রাজার জনৈক ওয়ারিশ এই বিগ্রহের জন্য রামজীবনের নামে মোকদ্দমা করেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যশোপালের প্রকৃত ওয়ারিশ সাব্যস্ত না হওয়ায় রামজীবন মৌলিকের হস্তেই বিগ্রহের ভার অর্পিত হয়।

মাধবের ভোগের ব্যঞ্জনাদি বিনা সৈন্ধবে পাক হয়। বালিয়াটির জমিদার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মাধবের জন্য একখানা রৌপ্য সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। জনৈক ভক্ত একখানা সুদৃশ্য হিরণ্ময় মুকুট প্রদান করিয়াছেন।

আলমগীর বাদশাহের খানাজাত মহম্মদ মোজহরের দস্তখতি ও মোহরযুক্ত ১০৯২ সনের ১০ই মাঘের তারিখযুক্ত একখানি সনদ দ্বারা রামজীবন ৩৭ বিঘা জমী জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই জমীর উপসত্ত্ব হইতেই মাধবের সেবা কার্য্য সম্পন্ন হইত।

ধামরাই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ব্বে, মাধব, কুমরাইল এবং ঠাকুর-বাড়ী পঞ্চাশে স্থাপিত ছিল তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সেই স্থানে পুরাতনমাধববাড়ীরঘাট বলিয়া একটী স্থান আছে, ঐ ঘাট প্রায় ৮ কাঠা জমী ব্যাপিয়া রহিয়াছে। নবাবী আমলের কাগজপত্রে "মাধব বাড়ীর ঘাট" বলিয়া এই স্থান চিহ্নিত হইয়াছে।

মোসলমান-উপদ্রবে মাধবের স্থানান্তরিত হইবার বিষয় একখানা প্রাচীন কাগজে লিখিত আছে। ঐ কাগজ খানা ৺রামজীবনের অনন্তর-বংশ্য শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্ররায় মহাশয়ের নিকটে আছে। এতৎসম্পর্কীয় যে কয়খানা দলিলের অনুলিপি উক্ত রায় মহাশয় প্রেরণ করিয়াছেন তাহা অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

১নং দলিলের নকল।

শ্রীযুত মহকুব শ্রীযুত যশোমাধব ঠাকুর কুমরাল গ্রামেতে দেবালয়ত আছিলা। রামশর্ম্মা ও ভগীরথশর্ম্মা ও রাধাবল্লভ শর্ম্মা ও গয়রহ

সেবাইতেরা আপনার আপনার ওস্তাদানির সেবা করিতেছিল রাত্রি দিবা চৌকি দিতে ছিল। শ্রীরামজীবনমৌলিক সেবার সরবরাহ পুরুষানুক্রমে করিতেছেন। ইহার মধ্যে পরগণা পরগণাতে দেওতা মুরতি তোড়িবার আহাদেশ হুজুর থানার পরওয়ানা লইয়া আর আর পরগণাতেও দেওতা মুরতি তোড়িতে আসিল এ বার্ত্তা শুনিয়া ঠাকুর ঠাকুর রামজীবনমৌলিকের বাহির বাড়ীতে আসিয়া রহিলা। রামশর্ম্মা ও ভগীরথশর্ম্মা ও গয়রহ ঠাকুরের সেবা ও চৌকি পাহারা রাত্রি দিন নিযুক্ত আছিল তাহারপর ২৬ মহরম মাহে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ঠাকুর দেখিবার পাতকালে সকললোক গেল। ঠাকুর সেখানে না দেখিল রমশর্ম্মা ও ভগীরথ শর্ম্মা গ সেবা করিতে ছিল। তারায় সেখানে নাই তদবধি রামজীবনমৌলিকের বাড়ীতে ঠাকুর ও রামশর্ম্মা ও ভগীরথ শর্ম্মা সেখানে নাই ইতি সন ১০৭৯। ২৭মহরম মাহে ৩০শে জ্যৈষ্ঠ।

রাজীব মিত্র, রামকান্ত বসু, রামজগন্নাথ গুহ, রাধাবল্লভ দাস, জয়রাম সেন, জগন্নারায়ণ দাস, হরিনাথ দাসস্য।

২নং দলিলের নকল।

শ্রীযুত যশোমাধব ঠাকুরের

শ্রীশ্যাম মালাকার তথা ভগিন্দ মালি ও গয়রহ মালিবর্গ ও তথা শ্রীকুলি এত—সুচরিতেষু—আগে তোমরা যে কারণ শ্রীরামজীবণ মৌলিকের ফইরাদ করহ কারণ কি তোমরা তো তোমরা মালীমত পর্ব্ববিত্তি আবদকণ তোমরা ৮দাও অকারণ ও রামজীবম মৌলিক পুরুষানুক্রমেই সেবার অধিকারী মনিব আমরা পূজাহারী ব্রাহ্মণ তোমরা কেন ফৈরাদ করহ শ্যাম মালি তোমাকে দুইবৎসর ধরিয়া চাকর রাখাইয়াছি * * *

তুমি ফৈরাদ করহনাই। আমরা পুরুষানুক্রমেই ৺সেবা করিতেছি। ইতি সন ১০৭৯।২ ১শে আষাঢ়।

রাধাবল্লভ শর্ম্মনঃ ভগীরথ শর্ম্মনঃ শ্রীরাম শর্ম্মা

(মোকাবেলা সাক্ষী)। নরোত্তম মিত্র, রাধাবল্লভ দাস, ঘনশ্যামরায়।

ধামরাইর আদ্যাশক্তি।

ধামরাইর আগ্যাশক্তি নিম্বকাষ্ঠনির্ম্মিত অষ্টভূজা মূর্ত্তি। কথিত আছে, ঠাকুরমাধব ধামরাইতে প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই জনৈক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সন্ন্যাসী ভারতের বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া আগ্যাশক্তি মূর্ত্তিসহ এই গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে, ৺ মাধবের মন্দিরে আগ্যাশক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সন্ন্যাসী ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "মা! যদি এই মন্দিরে প্রকৃত ধর্ম্ম থাকে, তবে তুমি এই স্থানে অবস্থান করিও, নচেৎ এখানেই মৃত্তিকাভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিও"। তদবধি এই মূর্ত্তি যশোমাধবের বাড়ীতেই আছে।

এতদঞ্চলে আগ্যাশক্তির প্রতিপত্তি খুব বেশী। ৺যশোমাধব অপেক্ষা ইহাকে লোকে অধিক ভয় করে (১)।

ধামরাইর বলদেব ও কানাই।

বল দেবের মূর্ত্তি দারুময়। ইহাও জনৈক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। যশোমাধবের প্রতিষ্ঠার অনতিকাল পরেই এই মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

---

(১) কেহ কেহ তন্ত্রচূড়ামণ্যোক্ত "নিতম্বং কালমাধবে" এই শ্লোকাংশ অবলম্বন করিয়া ধামরাই একটী পীঠস্থান বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। ৺যশো-মাধবের চালীর উপরে, ঠিক মধ্যস্থলে, যে মহাদেব মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে উহাকে "অমিতাঙ্গ শিব" বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

স্থানীয় পণ্ডিত অমরসিংহভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক কানাই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দোল ও রথযাত্রার সময়ে বলদেব ও কানাই ঠাকুরের নাচ এতদঞ্চলে এক রমণীয় দৃশ্য।

ধামরাইর রাধানাথ।

ধামরাই নিবাসী দেবীপ্রসাদ বসাক রাঢ় দেশ হইতে এই প্রস্তরময় মূর্ত্তি আনয়ন পূর্ব্বক এই স্থানে স্থাপিত করেন। প্রবাদ আছে, এখানে মানস করিলে চক্ষুঃপীড়ার উপশম হয়।

ধামরাইর বনদুর্গা।

বংশাই ও কাকিলাজানি নদীর সঙ্গমস্থলে, ধামরাই গ্রামে, এতদঞ্চল বাসী প্রত্যেক হিন্দু তাঁহাদের প্রত্যেক শুভকার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে ত্রিমোহনার-পূজা করিয়া থাকেন। ত্রিমোহনা স্থলে বনদুর্গার পূজা হয়। এই পূজায় ছাগ, মেষ, মহিষ, বনাল অর্থাৎ শূকর বলি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। সর্ব্বসাধারণের সংস্কার এই যে, প্রত্যেক শুভকার্য্যের পূর্ব্বে এই পূজা না করিলে অমঙ্গল হয়।

সাভার ও নবাবগঞ্জ থানার প্রত্যেক স্থানেই বনদুর্গা পূজার প্রথা প্রচলিত আছে। যেখানে পুরাতন বট, পাকুর, সেওড়া গাছ আছে, সেই সমুদয় গাছই দেবাধিষ্ঠিত বলিয়া উহারা ঐ পূজা দিয়া থাকে। ধামরাইর অধিবাসীগণ ত্রিমোহনারঘাটই বনদুর্গাপূজার পীঠস্থান বলিয়া মনে করে।

সাধারণতঃ উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতেই এই পূজা হয়। কিন্তু ত্রিমোহনার ঘাটে যে বনদুর্গার পূজা হয় তাহা প্রত্যেক শুভকার্য্যের পূর্ব্বেই সকলে করিয়া থাকে। বর্ষার সময়ে যখন ত্রিমোহনার ঘাট জলমগ্ন হইয়া যায়,তখন ঐ ঘাটের অনতিদূরস্থিত দুইটী বটবৃক্ষতলেই এই পূজা হয়। হিন্দুমাত্রেই

বনদুর্গার নিকটে শূকর শাবক বলি দিয়া থাকে। নিম্নে বনদুর্গার ধ্যান উদ্ধৃত করা গেল।:—

"দেবীং দানবমাতরং নিজ মদাঘূর্ণাং মহালোচনাং।
দংষ্ট্রা ভীমমুখাং জটা বিলসন্মৌলিং কপাল শ্রজাং॥
বন্দে লোক ভয়ঙ্করী ঘনরুচিং নাগেন্দ্রহারোজ্জ্বলাং।
চর্ম্মাবদ্ধ নিতম্ব যুগ্ম বিপুলাং বালানধনুর্ব্বিভ্রতিং॥"

ধামরাইর মদনোৎসব।

ধামরাই গ্রামে তেরাস্তার মধ্যে "কামদেবস্থলীতে" কদলী বৃক্ষ রোপণ করিয়া কামদেবের অর্চ্চনা করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। কামদেবের স্থলী কোথায়ও পাকা বাঁধান আছে,কোথায়ও বা মাটি দিয়া বাঁধিয়া লইতে হয়। চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশীতে কামদেবের পূজা হইয়া থাকে। এই চতুর্দ্দশী "মদনচতুর্দ্দশী" নামে খ্যাত (১)। কামদেব পূজার ধ্যান :—

"চাপেষুধৃক্ কামদেবোরূপবান্ বিশ্বমোহনঃ।"

কামদেব পূজার সময়ে ঢোল বাজাইয়া বহুলোকে সমস্বরে তান লয় সংযোগে যে ছড়ার আবৃত্তি করে তাহা অবিকল এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

"এই থলীতে আয়রে কামা এই থলীতে আয়।
ধবল পাঠা দিমু তোরে এই থলীতে আয়॥

---

(১) "চৈত্রে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং মদনস্য মহোৎসবঃ। জুগুপ্সিতোক্তিভিস্তত্র গীতবাদ্যাদিভির্নৃণাম্। ভগবাংস্তুষ্যতে কামঃ পুত্র পৌত্র সমৃদ্ধিদঃ"॥ ইতি তিথিতত্ত্বম্ "চৈত্র শুক্লত্রয়োদশ্যাং মদনং দমনাত্মকম্। কৃত্বা সংপূজ্য বিধিবদ্বীজয়েদ্ব্যজনেন তু"॥ ইতি ভবিষ্যে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিশ্বকোষে লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশে মদনোৎসব নাই, উহা দোলযাত্রার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা বর্ত্তমানেও ধামরাইতে মদনোৎসব প্রচলিত দেখিতে পাই।

লোচা বাচা দিমু তোরে এই থলীতে আয় ॥
ভাঙ্গ ভুজনা দিমু তোরে এই থলীতে আয় ॥
পূবে বন্দিয়া গামু উদয় হয় ভানু।
যাহার ঘরেরে জন্মেছে রাম কানু ॥
পশ্চিমে বন্দিয়া গামু ক্ষীর নদী সাগর।
যার জাল ভাইসা ফিরে সাহেব সদাগর ॥
উত্তরে বন্দিয়া গামু কৈলাস পর্ব্বত।
শিব আর পার্ব্বতী যথা থাকেন সতত ॥
আরে হাত মেলারে শিবা যোগী, হাত যায় আকাশ।
পা মেলারে শিবা যোগী, পা যায় পাতাল ॥
সোণার খাটে বৈসেন শিব রূপার খাটে পাও।
চতুর্দ্দিকে পরে শিবের শ্বেত চোয়ারের বাও ॥
দক্ষিণে বন্দিয়া গামু ঠাকুর জগন্নাথ।
যাঁহার প্রতাপেরে বাজারে বিকায় ভাত ॥
ডোঙ্গা ভরা ব্যঞ্জন গামছা ভরা ভাত।
যথা তথা নেয় প্রসাদ জাতি না যায় তাত ॥
শূদ্রে রান্ধিয়া ভাত থোয় নিয়া বামন বাড়ী।
লুইটা পুইটা খায় প্রসাদ বলে হরি হরি ॥
হুগলি বন্দিয়া গামু গলি গলি কোঠা।
বৈষ্ণবী বৈরাগী যথা করে তিলক ফোঁটা ॥
ঢাকার সহর বন্দিয়া গামু পাচপীরের মোকাম
সাহেব সুবায় যথা খেলায় চোকাম ॥
বংশাই বন্দিয়া গামু যায় খাইয়ে জল।
কায়েত কুঠী বন্দিয়া গামু যার কলমের ভল ॥

ধামরাই বন্দিয়া গামু মাধবের চরণ।
যথায় হইয়াছে রে ভাই পর্ব্বের জনম ॥
আগন মাসে ভাঙ্গের জন্ম সকসার ক্ষেতে।
হাতে বিষতে ভাঙ্গ ফুল ধইরাছে মাথে ॥
ভাঙ্গ বানাইয়ারে ভাই ভাঙ্গে দিল চিনি।
ভাঙ্গ আনিয়া দিল রসের বিনোদিনী ॥
ভাঙ্গ বানাইয়ারে ভাঙ্গে দিল দই।
ভাঙ্গ আনিয়া দে লো গোয়ালিনী সই ॥
হাইলা ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ পাকে পাকে মই।
জাইলা ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ ডুবাইয়া ধরে কই ॥
কুমার ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ করে তারিতুরি।
কামার ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ সে াসাইয়া মারে বারি ॥
কায়েত ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ আথর কৈল চুরি।
হিসাবের কালে খায় লাথি আর গুড়ি ॥
তাতি ভাইরে খাইয়া ভাঙ্গ মাকু মারে ঝোকে।
মর্কা আন মর্কা আন বলে নিকারিরে ডাকে ॥
পোলাপানে খাইয়া ভাঙ্গ চোক নিট্‌কাইয়া চায়।
মায় বলে আবাগীর পোরে যমে নিয়া যায় ॥
আগে যদি জানিতাম রে ভাঙ্গের এমন গুণ।
ডোল ডালী ভরিয়া থুইতাম ঘরের চারি কোণ ॥
সুধা ভাইজা খোলারে সুধা ভাইজা খোলা।
নিক্তিয়ে তৌল্লায়ে ভাঙ্গ বেজ্‌ব তোলা তোলা ॥

ইতি কামদেব প্রীতে হরি হরি বল ॥

ধামরাইর বাসুদেব।

সায়েস্তাখানি স্থাপত্যের অনুকরণে নির্ম্মিত কেবল মাত্র খিলানের উপর অবস্থিত একটী ইষ্টক বিনির্ম্মিত সুন্দর মন্দির মধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ৺বাসুদেব বিগ্রহ স্থাপিত। এই বাসুদেব মূর্ত্তি উলাইলের বিখ্যাত মিত্র বংশীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক প্রথমে কর্ণপাড়া গ্রামে স্থাপিত হয়; পরে ধামরাই গ্রামে আনীত হইয়াছে। বাসুদেব বাড়ী হইতে লাকুরিয়াপাড়া পর্য্যন্ত প্রায় ½ মাইল দৈর্ঘ্য এবং ২৭।২৮ হাত প্রশস্ত একটী রাস্তা আছে; এই রাস্তা দিয়াই ধামরাইর রথ টানা হয়।

শিববাড়ীর অচল শিবলিঙ্গ।

দাশোড়ার নিকটবর্ত্তী শিববাড়ী গ্রামে একটী অতি প্রাচীন শিব ও শিবমন্দির আছে। এই অচল শিবলিঙ্গ দাশোড়ার বৈদ্যবংশোদ্ভব দত্ত মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠাপিত। যুগী জাতীয়গণ এই শিবের অর্চ্চনা করিয়া থাকে। কথিত আছে, এই যুগীদিগের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ইহার সন্ধান পাইয়াছিল। অদ্যাপি প্রত্যেক যুগী পূজারিকেই দত্ত মহাশয়দিগের অনন্তরপুরুষগণের প্রধানের নিকট হইতে কপালে টীকা গ্রহণ করিতে হয়। উহাই তাহার নিয়োগপত্র বিশেষ।

এই শিববাড়ী একটী প্রসিদ্ধ দেব স্থান। প্রকাণ্ড কুণ্ড মধ্যে শায়িত সুবৃহৎ পাষাণময় অচল শিবলিঙ্গ ও মনোহারিণীবালা ভৈরবী মূর্ত্তি। শিবরাত্রির সময়ে এখানে একটী মেলার অধিবেশন হয়।

থাবাশপুরের নিমাইচাঁদ।

মানিকগঞ্জ থানার অধীন থাবাশপুর গ্রামে নিম্বকাষ্ঠবিনির্ম্মিত মহাদেব মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই বিগ্রহ শ্রীশ্রী৺নিমাইচাঁদ নামে প্রসিদ্ধ।

দৈনিক পূজা ও পার্ব্বনাদির ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বসুরবরুণা নিবাসী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার বসু মহাশয় কতক জমী ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে সেবাইতগণ বিগ্রহ সঙ্গে করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ১লা বৈশাখ তারিখে এখানে একটী প্রকাণ্ড মেলা বসে।

বুতুনীর গোবিন্দ রায়।

ঘিয়র থানান্তর্গত ক্ষীরাই নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী বুতুনী গ্রামের ৺গোবিন্দ রায় বিগ্রহ সুপ্রসিদ্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই গ্রামের চৌধুরী বংশোদ্ভব উমানন্দ, পরমানন্দ, দেবানন্দ, লক্ষ্মীকান্ত ও গৌরী-প্রসাদ ভ্রাতৃপঞ্চক কর্ত্তৃক এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর বারুণী স্নান উপলক্ষে এখানে একটী মেলা জমিয়া থাকে। ইষ্টক নির্ম্মিত নাতি-ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে ৺গোবিন্দ রায় প্রতিষ্ঠিত।

বিরলিয়ার মা যসাই।

সাভার থানার অন্তর্গত তুরাগ নদীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী বিরলিয়া গ্রামের "মা যসাই" জাগ্রৎ দেবতা। যে বৃক্ষের অবলম্বনে দেবীর অধিষ্ঠান উহা সাধারণ্যে "যসাই গাছ" বলিয়া পরিচিত। এজন্য অধিষ্ঠাত্রী দেবী "মা যশাই" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এই প্রাচীন পাদপটীর শাখা প্রশাখা বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকিয়া সমাগত পথশ্রান্ত পথিকবৃন্দের চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। কতকাল যাবৎ "মা যসাই" জনসাধারণের পূজোপচার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাহা সুনিশ্চিতরূপে অবধারণ করা যায় না।

নববৈশাখের প্রথম দিবসে প্রতিবর্ষে মেলা ও পূজা উপলক্ষে দূর-দেশান্তর হইতে এখানে বহুজনসমাগম হয়। এতদ্ব্যতীত দৈনিক

পূজারও ব্যবস্থা আছে। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহুসংখ্যক হিন্দু ও মোসলমান, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে পূজোপচার লইয়া দেবীর নিকটে আগমন করে। মেলার দিন ঢাকার নবাব বাহাদুরের ও বালিয়াটীর বাবুদিগের স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ এবং গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-বর্গ উপস্থিত থাকিয়া দেবীর পূজা যাহাতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেরই "মামলিক" বলি চলিয়া আসিতেছে। মেলার দিন গ্রামবাসীগণ খোল করতাল সংযোগে উচ্চকণ্ঠে মায়ের যশোগান করিতে করিতে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। বিবাহান্তে নবদম্পতি "মা যশাইর" সান্নিকটে উপনীত হইয়া দেবীর প্রসাদ কামনা করিয়া থাকে।

বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সংখ্যক নরনারী এইস্থানে "মানত" করিয়া থাকে এবং স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধি হইলে মায়ের পূজা দিবার জন্য এখানে আগমন করিয়া পূজোপচার প্রদান করিয়া থাকে।

রঘুনাথপুরের বনদুর্গা।

এখানে প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে, প্রতিষ্ঠিত বটপর্কটী বৃক্ষের পাদদেশে, মৃণ্ময়ী বনদুর্গা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া পূজিত হয়। চতুর্ভুজা, ব্যাঘ্রাসীনা, ব্যাঘ্রাম্বরপরিহিতা, নীলজীমূতসঙ্কাশা, দেবীমূর্ত্তি প্রতি বৎসরই নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। গভীর নিশীথে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ছাগ, মেষ, মহিষ, বরাহ, হংস ও কবুতর বলি প্রদত্ত হইয়া থাকে। দেবাধিষ্ঠিত এই বটবৃক্ষটীও অতি জাগ্রৎ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া অনেকে কঠিন ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়। পৌষ সংক্রান্তির পূজা ব্যতিত বৈশাখের যে কোনও শনিবার অমূর্ত্তি পূজা হইতে পারে।

রঘুনাথপুরের শ্মশানকালী।

রঘুনাথপুর গ্রামে শ্মশানকালী প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্মশানকালী প্রায়ই বাড়ীর উপরে স্থাপিত হয় না। প্রবাদ এইযে, স্বর্গীয় কালীনাথ চক্রবর্ত্তীর মাতা একদা স্বপ্নে দেখেন যে, শ্মশানকালী কন্যারূপে আসিয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। তিনি স্বপ্নাবস্থায় ইহা অবৈধ বলিয়া প্রতিবাদ করিলে, দেবী এই প্রতিষ্ঠায় কোনও ক্ষতি হইবে না বলিয়া বলেন। তদনুসারেই এই কালী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে প্রত্যহ পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে। ৺শারদীয় পূজার সময়ে অনেকে এখানে ছাগশিশু ও মহিষাদি দিয়া পূজা দেন। কালী অতি জাগ্রৎ বলিয়া সকলেই বলিয়া থাকেন।

কোণ্ডার মহাপ্রভুর আখরা ও কালীবাড়ী।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের বংশের যে শাখা কোণ্ডাগ্রামে আসিয়া বাস করেন, সেই শাখায় সুরনারায়ণ রায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কোণ্ডার মহাপ্রভুর আখরা সুরনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। দৈনিক কার্য্য ও নিত্যসেবা নির্ব্বাহের জন্য আড়াইখাদা জমি দেবোত্তর ছিল। বর্ত্তমান জমিদারগণ নাকি তাহার অধিকাংশই বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। উপযুক্ত সেবাইতের অভাবে আখরাটী অনাচারদুষ্ট হইয়া পড়িলে ঢাকার কালেক্টর বাহাদুর মহাপ্রভুর স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করেন। পরে এই বংশের ভারতচন্দ্র রায় তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ-প্রদত্ত সম্পত্তি ও সংস্থাপিত আখরার প্রমাণাদি দর্শাইয়া তাহার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কোণ্ডার কালীবাড়ী এতদঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই কালীও পূর্ব্বোক্ত বংশীয়গণেরই অন্যতম কীর্ত্তি। কোণ্ডা গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী

একটী স্থান বুরুজের টেক বলিয়া পরিচিত, এই স্থানে রায়মহাশয়দিগের সান্ত্রী প্রহরী সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত।

শিকারীপাড়ার কালী ও গোপাল-বিগ্রহ।

শিকারী পাড়ার ঘোষমহাশয়দিগের স্থাপিত কালী ও গোপালবিগ্রহ জাগ্রৎ। প্রতিদিন দেবভোগের জন্য যাহা প্রদত্ত হয় তাহাদ্বারাই ইহারা অতিথি সৎকার করিয়া থাকেন। দৈনিক অতিথির সংখ্যাও কম হয় না। ঘোষমহাশয়দিগের সুব্যবস্থায় দেবকার্য্য অতি সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইতেছে।

গোবিন্দপুরের লক্ষ্মীনারায়ণ।

গোবিন্দপুরের চৌধুরী মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ নবাবগঞ্জ থানার মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। লক্ষ্মীনারায়ণের পুষ্পযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, দ্বীপ, রাস, দোলযাত্রা ও বারুণীস্নান ইত্যাদি হইয়া থাকে। ঠাকুরসেবার জন্য দেবোত্তর জমী নির্দ্দিষ্ট আছে। দৈনিক আতপতণ্ডুলের মিষ্টান্ন ভোগের ব্যবস্থা আছে। নিকটবর্ত্তী জনসাধারণ দেবতার উদ্দেশ্যে মানত করিয়া এখানে ভোগ দিয়া থাকে। চৌধুরী মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ জগৎজীবন রায় কর্ত্তৃক এই বিগ্রহাদি স্থাপিত হয়। জগৎজীবন জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে জীবিত ছিলেন। জাহাঙ্গীর ও শাহ আলম বাদশাহের হাতের পাঞ্জার আলতা বিমিশ্রিত ছাপযুক্ত সনদ ১২৫৫ সালের গৃহদাহে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

গোবিন্দপুরের রাজরাজেশ্বর ও রাধাবল্লভ।

দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে এই গ্রামের হরেকৃষ্ণ রায় কোম্পানীর দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনিই এই বিগ্রহদ্বয়ের স্থাপয়িতা।

ঠাকুরের রাস, জন্মযাত্রা, ও দোল উপলক্ষে উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দৈনিক আতপচাউলের ভোগের ব্যবস্থা আছে। দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতেই দেবসেবা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কলাকোপার লক্ষ্মীনারায়ণ ।

কলাকোপা গ্রামে দাতা খেলারামের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ এতদঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। দানশৌণ্ডতার জন্য খেলারাম দাতা উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের অনেক কীর্ত্তিকলাপ কলাকোপা গ্রামে বিদ্যমান আছে ; তন্মধ্যে এই লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের মন্দির অন্যতম একটী। এই স্থানে দূরদেশান্তর হইতে বহু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে।

বর্দ্ধনপাড়ার রসরাজ বাউলের আখড়া।

বর্দ্ধন পাড়ার রসরাস বাউলের অনেক অলৌকিক কথা শ্রুত হওয়া যায়। তৎপ্রতিষ্ঠিত আখরা এতদঞ্চলে সুপরিচিত। এই আখরাতে, রসরাজের মৃত্যুদিনে, নানা স্থান হইতে বহু সাধুপুরুষ আগমন করিয়া থাকে।

কলাকোপার বলাই-বাউলের আখড়া।

কলাকোপার বলাই বাউল একজন দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত আখরাতে যে সমুদয় দরবেশ বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত হইয়া থাকে তাঁহারা কেহই রন্ধন করে না। নানা স্থান হইতে উঁহাদিগের জন্য খাদ্যদ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। বলাই বাউলের যশোগাথা লোকমুখে অনেক শ্রুত হওয়া যায়।

মাসতারার মন্দির।

মাসতারার লক্ষ্মীনারায়ণ।

বিরাটগুহের অধঃস্তন ১২শ পর্য্যায়ের উগ্রকণ্ঠগুহ যশোহর হইতে তদীয় কুলদেবতা ৺লক্ষ্মীনারায়ণ সহ মাসতারা গ্রামে আগমন করিয়া বাসস্থাপন করেন। উগ্রকণ্ঠ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। মোগলযুদ্ধে উগ্রকণ্ঠের পুত্রদ্বয় অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া রণাঙ্গনে জীবনাহুতি প্রদান করিলে, উগ্রকণ্ঠ মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে মোগলের সহিত সন্ধি করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তদীয় অনুরোধ উপেক্ষিত হওয়ায় অবমাননাবোধ করিয়া নিহত পুত্রদ্বয়ের দুইটী শিশুতনয় এবং উক্ত কুলদেবতাসহ রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এতদঞ্চলে আগমন করেন। উগ্রকণ্ঠ এইস্থানে আগমন করিয়া গাজীবংশীয়গণের আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উগ্রকণ্ঠের প্রপৌত্র সুবুদ্ধিখাঁ ১০৩১ সনে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের যে মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহা অতি জীর্ণ অবস্থায় এখনও বিদ্যমান আছে। এই মন্দিরের ইষ্টকাদিতে বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত ছিল।

নায়ারের রক্ষাকালী।

নায়ারের রায় উপাধিধারী জমীদার ৺রূপরাম রায় কর্ত্তৃক প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে রক্ষাকালীর মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের ছাদ কেবল মাত্র খিলানের উপরে অবস্থিত। এতদঞ্চলে এবম্বিধ মন্দির "ঝিকটি" নামে খ্যাত। রথযাত্রার সময়ে রায় মহাশয়দিগের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ এই মন্দির মধ্যে ৭ দিবস অতিবাহিত করেন বলিয়া ইহা "লক্ষ্মী-নারায়ণের শ্বশুরবাড়ী" বলিয়া কথিত হয়। মন্দিরস্থ কালীকাদেবী ৺রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে।

পরশুরামতলা।

পাঁচদোনার উত্তরাংশে, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তার দক্ষিণভাগে অবস্থিত পরশু-রামতলা একটী দেবস্থান। কথিত আছে, রামায়ণোক্ত পরশুরাম মাতৃহত্যা জনিত পাপ বিমোচনার্থে পিতৃ আদেশ ক্রমে ব্রহ্মকুণ্ডে অবগাহণ করিয়া নিষ্পাপ শরীর হইলে, যখন ব্রহ্মপুত্র নদকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণাভিমুখে অর্থাৎ সাগরোদ্দেশ্যে গমন করিতেছিলেন, তখন এইস্থানে বটবৃক্ষমূলে বসিয়া তিনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন। তদবধি উক্ত বটবৃক্ষ দ্বারা আবৃত স্থান পরশুরামতলা নামে অভিহিত হইয়াছে। এখানে পরশু-রামের তৃপ্ত্যর্থে পূজাদি হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত পূজাই বিষ্ণুপদে অর্পিত হয়। তান্ত্রিক মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া এখানকার ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মপুত্র এইস্থান হইতে প্রায় দ্বিশতহস্ত দূরে পশ্চিম-দিকে সরিয়া পড়িয়াছে। এক সময়ে যে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ পরশুরামতলার খুব সন্নিহিত ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কথুনাথের দেবালয়।

রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত লাক্ষ্যা-তীরবর্ত্তী ডাঙ্গাবাজারের সন্নিহিত তালতলা গ্রামে সাধকশ্রেষ্ঠ কথুনাথের সমাধি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত সাধনা-মন্দির অবস্থিত। তালতলা গ্রামের যে স্থানে তিনি সাধনা-মন্দির স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে ভীষণ অরণ্যানীসঙ্কুল উচ্চভূমি ছিল। কথুনাথ ঐস্থানে আগমন পূর্ব্বক গুরু-দত্ত শিঙ্গা-ধ্বনি করিতে থাকেন। সাধকের শিঙ্গার রব শ্রবণ করিয়া অরণ্যের যাবতীয় হিংস্র জন্তু মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বীয় আবাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া

গমন করিলে ক্রমে ক্রমে তথায় জনসমাগম হইয়া প্রসিদ্ধ দেব-স্থানে পরিণত হয়।

দেবালয়ের চারিদিক ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। পূর্ব্বদিকে, প্রাচীরের বহির্দ্দেশে, একটী পুষ্করিণী বিদ্যমান। এই পুষ্করিণীটার পূর্ব্ব-তীরে কথুনাথের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে দুই জনের দুইটী ক্ষুদ্র সমাধি মন্দির অবস্থিত। দেবালয়ের অভ্যন্তরে পূর্ব্ব, পশ্চিম, ও দক্ষিণের ভিটাতে একতল অট্টালিকা এবং উত্তরের ভিটাতে একখানা টীনের ঘর আছে। পূর্ব্বের ভিটার দালানেই কথুনাথের উপাসনা মন্দির। এই উপাসনা মন্দিরের চত্বঃরের সহিত সংলগ্ন পূর্ব্বদিকে যে ক্ষুদ্র দুইটী ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির অবস্থিত তাহার একটীতে কথুনাথের ইষ্টদেবতা ৺রামকৃষ্ণ গোসাইর, ও অপরটীতে কথুনাথের পাদুকা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

প্রায় সার্দ্ধদ্বিশতাব্দী পূর্ব্বে পাঁচদোনার সন্নিহিত শিলমন্দি গ্রামে নাথকুলে কথুনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। সাধুসঙ্গে আসক্তি তদীয় শৈশব অবস্থাতেই জন্মিয়াছিল। ফলে তিনি অল্প বয়সেই বিবেকীর ন্যায় অবস্থান করিতেন। তাঁহার গর্ভধারিণী সংসারের একমাত্র অবলম্বন নয়নের পুত্তলীকে সংসারধর্ম্মে অনাসক্ত সন্দর্শন করিয়া ভীতা ও চিন্তিতা হইয়া পড়েন। পরে আত্মীয় স্বজনের উপদেশমত পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য যথাসম্ভব সত্বর তাহার উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন; কিন্তু দুঃখিনী মাতার মনেরসাধ পূর্ণ হইল না। পুত্র সংসারী হইতে পারিল না। মাতা বহু চেষ্টা করিয়াও যখন পুত্রকে আবদ্ধ করিতে পারিলেন না তখন অনন্তোপায় হইয়া একদা তাহাকে বহু তিরস্কার করেন। তিরস্কৃত হইয়া অভিমানে কথুনাথ গৃহত্যাগী হন। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রথম ঘটনা।

কথুনাথ গৃহত্যাগী হইয়া নানাস্থান পর্য্যটন করেন, কিন্তু কোথায়ও সদ্‌গুরুর সন্ধান মিলিল না। অবশেষে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত

বিথলঙ্গের ৺রামকৃষ্ণ গোসাইর আখড়ায় উপনীত হইয়া উক্ত মহাপুরুষের নিকটে স্বীয় মনোভাব জ্ঞাপন করেন। কথুনাথ উপযুক্ত শিষ্য হইতে পারিবে কিনা ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি একটুক অপেক্ষা কর, আমি ঠাকুরের মন্দির হইতে পাদোদক লইয়া আসি।" এই কথা বলিয়া ৺রামকৃষ্ণ গোসাই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নয়দিন পরে তিনি মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া কথুনাথকে একইস্থানে অবস্থান করিতে দেখিয়া বলিলেন "বাবা, তুমি আজও এখানে দাড়াইয়া আছ?" কথুনাথ দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন, "আপনি আমাকে অপেক্ষা করিবার জন্য আদেশ করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং আপনার আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কি প্রকারে স্থান ত্যাগ করিব?" তরুণ বয়স্ক যুবকের এবম্বিধ একনিষ্ঠতায় রামকৃষ্ণ অত্যন্ত বিস্মিত হন, এবং অচিরে তাহাকে তদীয় শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন; কথিত আছে গুরুর কৃপায় এবং স্বীয় অসাধারণ যোগশক্তি প্রভাবে তিনি গুরুর সহিত নদীগর্ভে ধ্যানস্থ হইয়া যোগসাধনা করিয়াছিলেন এবং অচিরে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

অতঃপর গুরুর আদেশানুসারে তিনি স্বীয় উপাস্য দেবতার মহিমা প্রচার করিবার জন্য গুরুদত্ত শিঙ্গা হস্তে তালতলা গ্রামে আগমন করেন এবং অসাধারণ যোগবলে নানাবিধ অলৌকিক কার্য্যাবলী দ্বারা জনসমাজে স্বীয় দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাধিস্থ হন।

কথুনাথ স্বীয় আসনে পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন পূর্ব্বক যোগ-সাধনা করিতেন এবং ইষ্টদেবতার পাদুকা সন্দর্শন করিতেন। অন্য কোনও বিগ্রহ তিনি পূজা করেন নাই বা মন্দিরে কোনও বিগ্রহ স্থাপন করেন নাই। কথুনাথের ভক্তমণ্ডলী তাঁহার পাদুকা পূজা করিয়া থাকে; কথুনাথকে ইহারা বিষ্ণুর অংশবিশেষ বলিয়া মনে করে।

চিনিশপুরের কালী।

কিঞ্চিন্নূনাধিক ১৫০ বৎসর যাবৎ চিনিশপুর গ্রামে দ্বিজরাম প্রসাদের সিদ্ধপীঠ বর্ত্তমান আছে। দেবীর নাম চীনেশ্বরী। ইহা দক্ষিণাকালীর পীঠ। কিম্বদন্তী, এই রামপ্রসাদ এতদঞ্চলবাসী ছিলেন না। আত্মগোপন করিতেন বলিয়া তাহার সুপরিচয় সকলে জানিত না। প্রবাদ এই যে, রামপ্রসাদ নাটোরের স্বনামখ্যাত রাজারামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। রামকৃষ্ণকে দত্তক দেওয়ার সময়ে তদীয় বিপুল ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া রামপ্রসাদের মনে চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হয়। ভাবিলেন উভয়েই সহোদর, এক্ষেত্রে উপস্থিত কনিষ্ঠের ভাগ্যে এই বিশাল বিভব প্রাপ্তি আর তিনি আজীবন তাঁহারই কৃপাভিখারী কেন? জগ-ন্নিয়ন্তার এই বিচিত্র বিচারে তিনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তদবধিই তাঁহার সংসারে বীতরাগ এবং বৈরাগ্যের সূত্রপাত হইল। এই বৈরাগ্যের পরিণাম দেবীর অনুগ্রহ লাভ এবং আদেশ প্রাপ্তি,—চিনিশ-পুরের বনাকীর্ণ স্থানে অবস্থান, টেঙ্গুরীপাড়া নিবাসী ৺জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যার পানিগ্রহণ, পঞ্চমুণ্ডীআসন প্রস্তুত এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ। বৈশাখ মাসের মঙ্গলবার অমাবস্যা তিথিতে ইনি সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ বীর-সাধক ছিলেন। বীর-সাধনাকে "চীনক্রম" বলে! এই চীন হইতেই রামপ্রসাদের ইষ্টদেবীর নাম, "চীনেশ্বরী" এবং গ্রামের নাম "চীনেশপুর", কালক্রমে চিনিশপুর নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। রামপ্রসাদের জন্ম মৃত্যুর অব্দ নির্ণয়করা সুকঠিন। সম্ভবতঃ ১২০০ সনের পূর্ব্বে ইনি মানব-লীলা-সম্বরণ করেন।

রামপ্রসাদ দেহ রক্ষা করিলে তদীয় শ্যালক শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, ভাগিনেয় শম্ভুচন্দ্র এবং মধুসূদনকে বঞ্চনা করিয়া দেবোত্তর-ভূমি স্বীয়

নামে লিখাইয়া লন। পরে শম্ভুচন্দ্র অশেষ চেষ্টা করিলে, জমীদার-সরকার তান্ত্রিক রামপ্রসাদের উত্তরাধিকারী বলিয়া শম্ভুচন্দ্রকে তন্ত্রধার-স্বত্বের উল্লেখে ৷৷০ আনা, ও পূজা-স্বত্বের উল্লেখে বক্রী ৷৷০ আনা শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে জায়গীর প্রদান করিয়া ১২১২ বঙ্গাব্দের ৩০শে আষাঢ় তারিখে "শ্রীমদ্রাজন মাহাবুদআলী মিরাশ তালুকদার এবং নীলমণি ঘোষ গোমস্তা জোয়ার নন্দীপাড়া" বরাবর এক হুকুম নামা প্রদান করেন ; তদবধি রামপ্রসাদের উত্তরাধিকারিগণ ৷৷০ আনা এবং শ্রীনারায়ণের পরবর্ত্তীগণ ৷৷০ আনা অংশে রামপ্রসাদের সিদ্ধপীঠ সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার উপস্বত্ব ভোগ দখল করিতেছেন।

কালক্রমে গবর্ণমেণ্ট ১৭৯০ সনের পূর্ব্বে স্থাপিত দেবোত্তর বলিয়া এই সকল ভূমি খাস করিয়া ১৪৴৬ পাই সদর জমা ধার্য্যে ৺জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর সহিত বন্দোবস্ত করেন। পরে ঐ তালুক রাজস্বদায়ে নীলাম হইয়া গেলে অপর কতিপয় ব্যক্তি উহা খরিদ করেন।

ওয়াইজ সাহেবের নীলকুঠীর দেওয়ান রামকৃষ্ণ রায় মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

বাবা লোকনাথের আশ্রম।

মেঘনাদতীরে, নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অধীন বারদীগ্রামে স্বয়ং-সিদ্ধ মহাযোগী বাবা লোকনাথব্রহ্মচারীর আশ্রম বিদ্যমান আছে। ইনি "বারদীর ব্রহ্মচারী" বলিয়া সাধারণ্যে সুপরিচিত ছিলেন। এই মহাপুরুষের অন্ত্যলীলা-স্থল বলিয়া বারদী গ্রাম পূণ্য-পীঠের একতম একটীস্থান বলিয়া সমাদৃত। বাবা লোকনাথের সম্বন্ধে নানাবিধ অলৌকিক কাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। যাঁহারা লোকনাথের চরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া তদীয় অমৃত-নিস্যন্দিনী বাক্যাবলী শ্রবণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া-

ছিলেন তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই এখনও জীবিত আছেন; সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

বাঙ্গলা ১১৩৭ সনে, ইংরাজী ১৭৩০ খৃঃ অব্দে, পশ্চিমবঙ্গের কোন পল্লীগ্রামে লোকনাথের জন্ম হয়। তৎকালীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এরূপ সংস্কার ছিল যে, বংশের মধ্যে একটী লোক যদি গৈরিক ব্রহ্মচারী হইয়া বাহির হইতে পারেন তবে সেই কুলের উদ্ধার সাধন হয়। লোকনাথের পিতা এতাদৃশ সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া একাদশ বৎসর বয়সে লোকনাথের যজ্ঞোপবীত সংস্কার সম্পাদন পূর্ব্বক পুত্রকে আচার্য্য গুরুর হস্তে সমর্পন করিয়া জন্মের মত বিদায় দেন। তদবধি লোকনাথ গৈরিক ব্রহ্মচারী হইয়া আচার্য্যগুরু ভগবান গাঙ্গুলির সহিত বহির্গত হন।

১২৭০ বঙ্গাব্দে কি তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাৎ সময়ে তুষার-সমাচ্ছন্ন হিমালয়ের শৃঙ্গ হইতে যে দুই জন মহাপুরুষ বাঙ্গলার পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী পাহাড়ে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে লোকনাথ ব্রহ্মচারী অন্যতম একটী। দীর্ঘকাল তুষারাবৃত স্থানে অবস্থান করা নিবন্ধন তাঁহাদের সর্ব্বশরীরে একরূপ শ্বেতবর্ণের পুরু চর্ম্ম জন্মিয়া ছিল। সেই চর্ম্মের প্রভাবে তাঁহাদের উলঙ্গ শরীরে শীত-জনিত কষ্ট বোধ হইত না। এক দিকে শরীরের এই অদ্ভুত চর্ম্ম-চ্ছদ, অন্যদিকে তাঁহাদের ভূতল-স্পর্শ বিশাল জটাকলাপ, তাঁহাদিগকে অভিনব জীবাকারে পরিণত করিয়াছিল। নিম্নভূমিতে আগমন করিবার সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথের শরীরের শ্বেতচর্ম্মের আবরণটী অদৃশ্য হইতে থাকে; কালে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

ব্রহ্মচারীবাবা জাতিস্মর ছিলেন। তিনি এজন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বজন্মে যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় স্মরণ করিতে সমর্থ

ছিলেন। এমন কি, গত জন্মের মৃত্যু হইতে এ জন্মের ভূমিষ্ঠ হইবার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত যে ভাবে ছিলেন তাহাও স্মরণ ছিল।

তিনি দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ইচ্ছামত কার্য্য সম্পাদন করতঃ পুনরায় দেহেতে আগত হইতেন, যখন দেহ ছাড়িয়া যাইতেন, তখনও আসনে উপবিষ্ট থাকিতেন, কিন্তু তখন দেহটা দেয়ালাদিতে ঠেস দিয়া নিদ্রিত-বৎ পড়িয়া থাকিত। পার্শ্বস্থ পরিচারকেরা বলিত, "গোসাঞি মরিয়াছে, কিন্তু পরেই বাচিয়া উঠিবেন"।

ব্রহ্মচারীবাবা পৃথিবীর নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। মক্কা মদিনা, এমন, কি তিনি যে সুদূর ইউরোপের নানাস্থানে এবং সুমেরু পর্য্যন্তও গমন করিয়াছিলেন এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

লোকনাথের শারীরিক গঠন অন্যান্য মনুষ্যের ন্যায় হইলেও চক্ষুর গঠন এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল; তাহা অতিশয় বিশাল। আমরা স্থির দৃষ্টিতে চাহিলে, আমাদের উভয় নেত্রের তারকা-যুগল চক্ষুর মধ্যস্থলে অবস্থান করে, লোকনাথ চক্ষু স্থির করিলে, তাঁহার উভয় নেত্রের তারকা আসিয়া নাসিকার নিকট সংলগ্ন হইত। তাঁহার চক্ষুর তেজ সাধারণ লোকে সহ্য করিতে পারিত না।

তিনি যে এত দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন এই বিষয়ে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন, "আমি মৃত্যুর সময় অতিক্রম করিয়া বাচিয়া আছি। এ অবস্থায় মোহ (নিদ্রা) আসিলেই আমার পিণ্ডপাত ঘটিবে"। তাঁহার নিদ্রা ছিল না, অথচ রাত্রিতে বিছানায় যাইয়া পড়িয়া থাকিয়া, জাগ্রত্বিশ্রাম করিতেন।

তনুত্যাগ করিবারজন্ত কৃত সংকল্প হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিবার জন্ত দুই তিন বার উঠিলাম, প্রত্যেক বার অকৃতকার্য্য হইয়া নামিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম"। এই সময় গভীর

চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বলিয়া উঠিতেন,—"আমি এ ঘর হইতে কোন্ ঘরে যাইব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না"।

১২৯৭ সনের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তদীয় লীলার অবসান হয়। তিনি যোগস্থ হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

চাচুরতলার কালী বাড়ী।

চাচুরতলার কালী সাধারণতঃ সিদ্ধেশ্বরী কালী নামে সুপরিচিত। এইস্থান ঠাকুরাইনবাড়ী বলিয়া অভিহিত হয়। রাজাবাড়ী মঠের প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরবর্ত্তী চাচুরতলা গ্রামে স্বনামপ্রসিদ্ধ খালের পারে এই কালী মন্দির স্থাপিত। আম্র তিন্তিড়ি বট প্রভৃতি প্রাচীন পাদপ রাজির ঘন সন্নিবিষ্ট শাখা প্রশাখায় শীতল ছায়ায় এই স্থানটীকে শান্তি নিকেতনে পরিণত করিয়াছে। নানাদিগ্দেশ হইতে সমাগত অসংখ্য নরনারী দেবীর দর্শন লালসায় এখানে সমাগত হইয়া থাকে। এখানে মানত করিয়া জন সাধারণ স্বীয় চাচর (কেশ) প্রদান করে বলিয়া ইহা চাচুরতলার কালী বলিয়া পরিচিত। পদ্মানদী ভীষণ সংহারক মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক এই স্থান গ্রাস করিবার জন্য বহুবার প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এইযে, দেবীর মন্দিরের অনতিদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। এ সম্বন্ধে যে একটী প্রবাদ চলিয়া আসিয়াছে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

মনাইফকির নামে জনৈক মোসলমান সিদ্ধ পুরুষের প্রভাব ও খ্যাতির বিষয় এতদঞ্চলে অনেক শ্রুত হওয়া যায়। তিনি প্রায় ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। কীর্ত্তিনাশার ভীষণ সংহারক মূর্ত্তি সন্দর্শনে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এই কীর্ত্তিনাশা

নদীর বিস্তার কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইবে। তদুত্তরে ফকির সাহেব বলেন, তোমরা আমার হস্ত ও পদ বন্ধন করিয়া থলিয়ায় পুরিয়া এ নদীর মধ্যে নিক্ষেপ কর, পরে সপ্তাহান্তে পুনরায় এই স্থানে আগমন করিলেই তোমাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইবে। মহাপুরুষের বাক্যে কাহারো অনাস্থা ছিল না। সুতরাং তাঁহার কথানুযায়ী কার্য্য সমাধা হয় এবং উত্তর প্রার্থীরা পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে যথা সময়ে সমবেত হইয়া ফকিরের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। ফকির তাহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া বলিলেন, তোমরা যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, তৎসম্বন্ধে আমি কতকটা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। "কীর্ত্তিনাশার উত্তর তটে চাচুরতলার ঠারইনবাড়ী ও দক্ষিণ পারে মাঐসারের দিগম্বরীবাড়ী বলিয়া যে দুইটী দেবীস্থান বর্ত্তমান দেখিতেছ, তাহাই এই নদীর উভয় তটে বর্ত্তমান থাকিবে। এতন্মধ্যবর্ত্তী যাবতীয় স্থান নদী গর্ভে বিলীন হইয়া যাইবে। তবে শ্রীপুরের যে "টেক" বর্ত্তমান আছে উহা কোনও কালেই বিলুপ্ত হইবে না। আজ পর্য্যন্ত ঐ সিদ্ধ পুরুষের ভবিষ্যদ্বাণী কতকটা সত্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

পাটাভোগের হরিবাড়ী।

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ মধ্যে অনেকে চিকিৎসক সাহায্যে রোগমুক্ত হইতে না পারিলে হরিঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং হরিভক্ত নাম ধারণ পূর্ব্বক হরিনামের ছাপ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ সুরঞ্জিত করিয়া থাকে। ঠাকুরের আদেশে অসুস্থাবস্থায়ও তিন বেলা স্নান করিতে ক্রুটী করেনা। হরিভক্তিপরায়ণগণ সন্ধ্যায় সময়ে মন্দির প্রাঙ্গনে সমাগত হইয়া মৃদঙ্গ ও করতাল সহযোগে সুকণ্ঠ মিশাইয়া নামকীর্ত্তন করে। পাটাভোগের হরিবাড়ীতে অসংখ্য নরনারীর সমাগম হয়।

হলদিয়ার কালী।

এই পাষানময়ী কালী ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজা রাজবল্লভ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দেবীর জন্য তিনি একটী মন্দিরও নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দৈনিক পূজার জন্য তিনি এই গ্রামের কতক জমী জনৈক ব্রাহ্মণকে বৃত্তি স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। দেবী খুব প্রত্যক্ষের বলিয়া স্থানীয় জন সাধারণের বিশ্বাস।

হাইরামুন্সার কালী।

এই মূর্ত্তিটী চতুর্ব্বিধ ধাতুর সংমিশ্রনে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য কিঞ্চিদধিক এক ফুট হইবে। পূর্ব্বে ইহার পূজাকার্য্য ব্রাহ্মণদ্বারা সম্পন্ন হইত; কিন্তু স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া অধুনা জনৈক বিধবা কায়স্থ রমণী ইহার পূজা করিয়া থাকে।

প্রায় ১৩০ বৎসর পূর্ব্বে কমলা সেন নাম্নী জনৈক বিধবা স্ত্রীলোক কাশিমপুর গ্রামে তাঁহার ভগ্নীর বাড়ী বেড়াইতে যায়; একদা সেখানকার কালী বাড়ীতে বসিয়া তিনি তদ্গত চিত্তে শিবপূজায় ব্যাপৃতা আছেন এমন সময়ে আদিষ্ট হন যে হাইরামুন্সা গ্রামে তাঁহার নিজের বাড়ীর পুষ্করিণীতে যে দেবীমূর্ত্তি সলিলগর্ভে নিহিত আছে তাহা তিনি যেন প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজাদির সুব্যবস্থা করিয়া দেন। দেবাদিষ্ট হইয়া কমলা অচিরকাল মধ্যে বাড়ীতে প্রত্যাগত হন; এবং পুষ্করিণী হইতে এই দেবীমূর্ত্তি উদ্ধার করিয়া নিজবাড়ীতে স্থাপিত করেন।

কলমার জয়কালী।

এই প্রস্তরময় দক্ষিণাকালীমূর্ত্তি কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কলমানিবাসী দেওয়ান নন্দ কিশোরের অনন্তরবংশ্য ৺জয়রামরায় মহাশয়

কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। কথিত আছে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই মূর্ত্তি কাশীধাম হইতে আনয়ন করিয়া ছিলেন। বলরাম একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। তিনি আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই মূর্ত্তি মহা-সমারোহে কলমাস্থিত স্বীয় প্রাচীন বাড়ীতে প্রথমতঃ সংস্থাপন করেন, পরে বর্ত্তমান বাড়ী নির্ম্মিত হইলে এই দেবীও তথায় নীত হয়। ভক্ত বলরামই কালীর মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করেন এবং দেবীর অর্চ্চনার জন্য স্বীয় জমিদারীভুক্ত বরিশাল জেলান্তর্গত হাবিবপুর পরগণা মধ্যে কতক তালুক উৎসর্গ করিয়া যান। এখনও ঐ তালুকের আয় হইতেই ইহার অর্চ্চনাদি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। প্রতি বৎসরই আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি দেবীর জন্মতিথি বলিয়া ঐ তিথিতে মহাসমারোহে পূজা ও উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দৈনিক পূজা এবং আমাবস্যাতে বিশেষ পূজার ব্যবস্থাও আছে।

শ্রীনগরের ৺অনন্তদেব।

শ্রীনগরের স্বনামখ্যাত লালা কীর্ত্তিনারায়ণ ১১৭৫ বঙ্গাব্দে ৺অনন্ত-দেবকে তদীয় কুলদেবতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। লালাকীর্ত্তিনারায়ণ অনন্তদেবের নামেই বিভিন্ন সময়ে নানা সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন।

৺অনন্তদেব জাগ্রৎ দেবতা। শ্রীনগরের লালা বাবুগণ সমুদয় ক্রিয়া কলাপেই ৺অনন্তদেবের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নাম নিয়া অন্যত্র গমনা গমন করিয়া থাকেন।

দৈনিক পূজার নিয়ম ঃ—প্রাতে জাগরণ, পরে স্নানাদি করাইয়া /৭॥ সের তণ্ডুলের নানা উপকরণ সহ ভোগ। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও আরতী, পরে বৈকালী। প্রতি পূর্ণিমা ও একাদশীতে /৫ সের দুগ্ধের মিষ্টান্ন ভোগ প্রদত্ত হয়।

বাৎসরিক নিয়ম ঃ—দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ পুষ্প দ্বারা বিশেষ ভাবে পূজা। বৈশাখে জলধারা ও শীতলভোগ; জ্যৈষ্ঠে আমক্ষীর ও ক্ষীরের ভোগ। ভাদ্রে পিষ্টকাদি দ্বারা ভোগ। আশ্বিন মাসে নানাবিধ দ্রব্যাদি দ্বারা বিশেষভাবে ভোগ প্রদত্ত হয়। কার্ত্তিক মাসে ঘৃতের প্রদীপ ও প্রত্যহ মিষ্ঠান্ন ভোগ দেওয়া হয়। পৌষে পিষ্টকাদি এবং মাঘমাসে কুলের ভোগ হয়। চৈত্রে পুরি ও ক্ষীর দ্বারা প্রত্যহ বৈকালী হয়।

কোমরপুর বা ভাওয়ারের কালী ও দুর্গা।

এই অর্দ্ধ-কালী ও অর্দ্ধ দুর্গা মূর্ত্তি কোমরপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছে। ভাওয়ারের দীন দয়াল চক্রবর্ত্তী স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দীনদয়াল একজন সাধক ছিলেন। বিক্রমপুর অঞ্চলে এই দেবতা অত্যন্ত জাগ্রৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পাইকপাড়ার বাসুদেব।

এই বাসুদেব সম্বন্ধে পরমশ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ-সামধ্যায়ী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশে হরিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (খাসনবীশ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুরাতন বাড়ীতে স্থান সঙ্কুলন না হওয়াতে সেই বাড়ীর উত্তরাংশে তিনি নূতন বাড়ী প্রস্তুত করেন এবং ঐ পুরাতন বাড়ীতে জ্ঞাতিগণের সাহায্য একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনিত হয়। এই পুষ্করিণী খনন কালে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বপ্ন দেখেন যে, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম—ধারী গরুড়বাহন লক্ষ্মী সরস্বতী সমন্বিত বনমালী বিষ্ণু বলিতেছেন যে, তোমরা যেখানে পুষ্করিণী খনন করাইতেছ সেখানে মৃত্তিকার নীচে আমি প্রস্তর মূর্ত্তিতে

অবস্থান করিতেছি, কোদালীর আঘাতে অঙ্গ ভগ্ন না হইতে আমাকে নিয়া পূজা করিবে। তৎপর দিবস অতি সাবধানে পুষ্করিণীর নির্দ্দিষ্ট স্থান খনন করিয়া স্বপ্ন-বর্ণিত মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং ভক্তি বিহ্বল চিত্তে তাঁহাকে উঠাইয়া আনিয়া নূতন বাড়ীতে স্থাপন করেন। দেখিলে দর্শকের মন শীতল হয় এবং পাষাণ হৃদয়ও ভক্তিতে বিগলিত হয়। এরূপ প্রস্তর খোদাই করিবার ভাস্কর ইদানীং সুলভ বলিয়া মনে হয় না।”

সেরাজাবাদের সুধারামের আখরা।

সুধারাম বাউলের নাম বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। সুধারামকেই পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান বাউল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে হয়। বিক্রমপুরের বাউল সম্প্রদায় সুধারামেরই মতাবলম্বী। বাঘিয়া গ্রাম নিবাসী ৺কৃষ্ণনাথ গুপ্ত মহাশয় এবং বৈকুণ্ঠপুর পরগণার তদানীন্তন অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীনগর নিবাসী ৺কৃষ্ণচন্দ্র বসু মহাশয় এই মহাপুরুষকে সেরাজাবাদ নামক স্থানে নিষ্কর ভূমি দান পূর্ব্বক মন্দির তুলিয়া একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই মন্দির ও বাসস্থান এখনও বর্ত্তমান এবং “সুধারামের আখরা” বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে একদা প্রভাত সময় উন্মাদের ন্যায় ভাবে বিভোর হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে সুধারাম সেরাজাবাদে আসিয়া উপনীত হন এবং তথায় বাস করিতে থাকেন। সেরাজাবাদের যে স্থানে তদীয় আখরা নির্ম্মিত হইয়াছিল পূর্ব্বে উহা মুচীখোলা নামে অভিহিত হইত। মুচীখোলা ঘোর অরণ্যানীসঙ্কুল ও নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী কর্ত্তৃক শ্মশানরূপে ব্যবহৃত হইত।

বিক্রমপুর মঠীতালা গ্রামে নমঃশূদ্র বংশে সুধারামের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তিনি সংসারে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতে

ভাল বাসিতেন। লোক সমাজের সহিত মেশা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল। নির্জ্জন প্রান্তরে, বৃক্ষের ছায়ায়, কিম্বা নদীর তীরে বসিয়া অনন্য মনে কি চিন্তা করিতেন তাহা কেহই বলিতে পারিতনা।

সুধারামের নানাবিধ অলৌকিক কাহিনী বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র সুপ্রচলিত (১)। সেরাজাবাদেই তিনি দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাহার রচিত বহু গান এতদঞ্চলে বাউল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গীত হইয়া থাকে। একটি গানে লিখিত আছে, "ঢাকার সহর নিগম্য স্থান অতি যে গোপন। সে স্থানেতে বিরাজ করে মানুষ রতন"॥ ইহাতে বোধ হয় ঢাকা সহরের কোনও এক মহাপুরুষ তাঁহার গুরু ছিল। প্রায় শতাধিক বৎসর অতীত হইল এই মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

তালতলার শিবলিঙ্গ ও আনন্দময়ী।

তালতলার বন্দরের বিপরীত দিকে পঞ্চরত্ন-মন্দিরাভ্যন্তরে মহারাজ রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত একটী শিবলিঙ্গ ও "আনন্দময়ী" নামক এক

---

(১) "এরূপ কথিত আছে যে মনাই ফকির নামক একজন মোসলমান সাধু ব্যাঘ্রা-রোহণে সুধারামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে সুধারাম বলিয়াছিলেন, "ভাই মনাই, জীবিত প্রাণীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সকলেই নানাস্থানে যাইতে পারে, তাহাতে আর বাহাদুরী কি? যদি কাঠের ঘোড়ায় বেড়াতে পারিস্ তবে বুঝবো যে তোর সিদ্ধি হয়েছে বটে। এইরূপ বলিয়া রথযাত্রায় ব্যবহৃত একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত অশ্ব মনাইকে দেখাইয়া দিলেন। মনাই ফকির সুধারামের বাক্যানুযায়ী কাজ করিতে অস্বীকার করায় সুধারাম নিজে সেই কাষ্ঠ নির্ম্মিত অশ্বোপরি আরোহণ করিয়া সর্ব্বত্র পর্য্যটন করতঃ সকলকে বিস্মিত করিলেন। সে কাঠের ঘোড়া এখনও ঢাকা জেলান্তর্গত বাউলের বাজার নামক স্থানে বিদ্যমান আছে"—

প্রতিভা ১৩১৮ সন ৪র্থ সংখ্যা।

পাষাণময়ী কালিকা মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। কথিত আছে যে রাজবল্লভ রাজনগর হইতে রাত্রির শেষাংশে রওয়ানা হইয়া এই স্থানে আসিলেই প্রভাত হইয়া যাইত এবং প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইত। এই ক্ষুদ্র দেবমন্দিরটী মহারাজার সন্ধ্যা বন্দনাদির জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া তাহাদের সেবার নিমিত্ত যে তিন শত বিঘা ভূমি উৎসর্গ করিয়াছিলেন আজ পর্য্যন্ত ও সেই বৃত্তি হইতেই উক্ত দেবতা-দ্বয়ের সেবাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। ফেগুনাসার গ্রামের উত্তর পূর্ব্ব দিকে দীপনগর নামে যে একটী গ্রাম বিদ্যমান আছে ঐ স্থান মহারাজ রাজবল্লভ উক্ত পঞ্চরত্ন মন্দিরে সায়ং কালে সন্ধ্যারতি প্রদান করিবার জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

হুসনী দালান (ইমামবাড়া)।

বর্ত্তমান সময়ে ঢাকা নগরীতে নবাবী আমলের এমারতাদির মধ্যে "ইমামবাড়া" বা হুসনীদালান সুপ্রসিদ্ধ। মহরমেরসময় এই স্থানে বহুলোকের সমাগম হয়। দশাহব্যাপী উপবাসী এবং কঠোর নিয়মাবলীতে আবদ্ধ থাকিয়া, পুত সংযতচিত্তে শোক চিহ্নধারণ করতঃ সিয়া সম্প্রদায়ের মোসলমানগণ হাসেন হুসেনের বিবাদ-স্মৃতি বহুকালাবধি হৃদয়পটে জ্বলন্ত অক্ষরে অঙ্কিত রাখিয়াছেন। চিত্রকরের সুনিপুণ তুলিকায় এই সময়ে মসজিদের অভ্যন্তরস্থিত দেওয়াল এবং বেদীমূল প্রাণীপুঞ্জের মনোরম চিত্রাবলী ও নয়ন মন প্রীতিকর লতাপুষ্পাদিতে পরিশোভিত করা হয়। হাসেনায়েনের প্রতিমূর্ত্তি মসজিদের যে অংশে স্থাপিত করা হইয়াছে সেই স্থানের দেওয়ালটী শোকচিহ্নের আধার স্বরূপ কৃষ্ণবস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখা হয়। মসজিদের ঠিক মধ্যভাগে একটী কৃত্রিম উৎস অম্বুকণারাশি

হুসনী দালান।
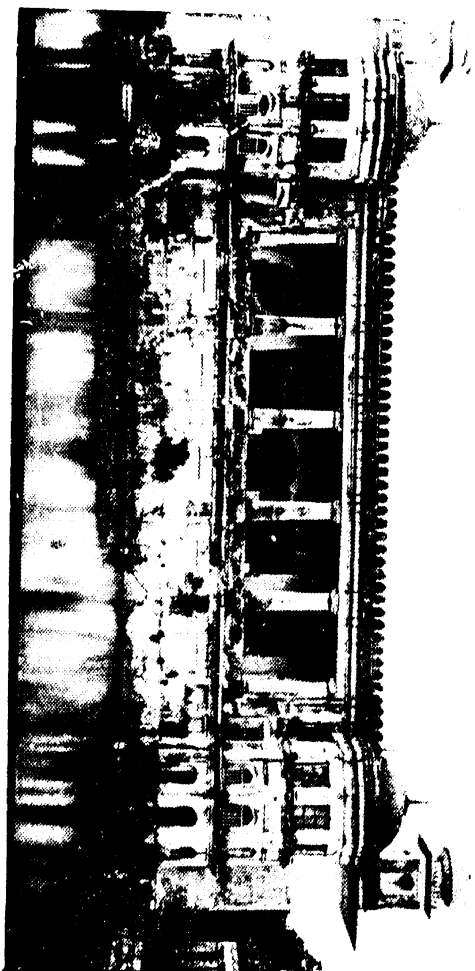
ঊর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দর্শকগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়া থাকে। সুশিক্ষিত গায়ক-সম্প্রদায় "হাসনায়েনের" সদ্‌গুণাবলী বিষাদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে কীর্ত্তন করিয়া, উষ্ণ অশ্রুজলে বক্ষোদেশ প্লাবিত করিয়া, অতীতের বিষাদ-স্মৃতি জাগাইয়া তুলে। গায়ক-সম্প্রদায় উপবাসের রাত্রিগুলি শ্মশান-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়াই কাটাইয়া দেয়। এই সময়ে সমগ্র ইমামবাড়া নীল সবুজ রক্তিম প্রভৃতি বিবিধবর্ণের দীপ-মেখলায় সুসজ্জিত হইয়া দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতে থাকে।

ইমামবাড়া সহরের প্রান্তৈক দেশে সংস্থাপিত; মসজিদের চতুর্দ্দিকস্থ বিস্তীর্ণ কতকস্থান লইয়া ঐ স্থান হুসনী দালান নামে পরিচিত। ইমাম-বাড়ার গঠন কৌশল অতি সুন্দর। গত ১৮৯৭ খৃঃ অব্দের ভীষণ ভূমি-কম্পে হুসনীদালানের অনেকস্থান চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাওয়ায় কীর্ত্তিমান স্বর্গীয় নবাব আসান উল্লা খানবাহাদুর প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইমামবাড়ার সংস্কার সাধন করেন।

সাহাজাদা সুলতান সুজা যে সময়ে বঙ্গের মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে সৈয়দ মীর মোরাদ ঢাকাতে "মীর-ই-বহর" (supdt of the Fleet) পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরে ইনি দিল্লীতে "মীর-ই-ইমারৎ" (supdt of Architecture) পদে উন্নীত হইয়াছিলেন (১)। কথিত আছে, একদা মীর মোরাদ গভীর নিশীথে স্বপ্নে দেখিলেন যেন, ইমাম হুসেন মহরমেরস্মৃতি রক্ষার্থে "তাজিয়া কোণা" (a House of mourning) নির্ম্মাণ করিতেছেন। স্বপ্নেদৃষ্ট হুসেনের সৌম্যমূর্ত্তি এবং তাজিয়া কোণার সুখ-কল্পনা মোরাদের মন হইতে সহজে বিদূরিত হইল না। তিনি সর্ব্বদাই এই বিষয়ের চিন্তা করিতেন। অবশেষে তিনি স্বপ্নানুযায়ী কার্য্য

(১) Almashrag Vol. I, No. 5.

করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। অবিলম্বে বহুলোক "তাজিয়া কোণা" নির্ম্মাণের জন্য নিযুক্ত হইয়া গেল। মীর মোরাদ সর্ব্বদা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া এমারতের গঠন-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। প্রতি বৎসর মহরমের সময়ে দীপমালায় আলোকিত করিবার জন্য তিনি স্বয়ং অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। মীরের মৃত্যুর পর ঢাকার সুবাদারগণ তদীয় সাধু সঙ্কল্পটী সুসম্পন্ন ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য "তাজিয়া কোণা" আলোকমালায় বিভূষিত করিবার সমগ্র ব্যয় ভার বহন করিতেন (১)। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ঢাকার নায়েব নাজিম জেসারৎখাঁ বাৎসরিক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির টাকা কমাইয়া দিতে চাহিলে ঢাকার মোসলমান সম্প্রদায় মুরশিদাবাদে নবাব সিরাজদ্দৌলার নিকটে দরখাস্ত করেন। সিরাজ ঢাকার নিজামত হইতেই পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য জেসারৎখাঁর প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন (২)। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে মিঃ সোর ত্রৈবার্ষিক বন্দোবস্ত করিবার জন্য ঢাকায় আগমন করিলে তিনি নিজামত মহালগুলি হুজুরির সহিত একত্র করিয়া ফেলিলেন (৩)। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হুসনী দালানের বাৎসরিক বৃত্তিরও উচ্ছেদ সাধন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই (৪)। ঢাকার তদানীন্তন নায়েব নাজিম আসমৎজঙ্গ বাহাদুর মিঃ সোরের এই অন্যায় ও অবিচারের বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিলে গবর্ণমেণ্ট ২৫০০ সিক্কা টাকা বৃত্তি স্বরূপ নির্দ্ধারিত করিয়া

(১) Vide Report of Mr. J. G. Dunbar.

(২) Govt. Correspondence in the office of the Commissioner of Dacca Division.

(৩) Governor Generals of India and Taylor's Topography of Dacca.

(৪) Vide Correspondences in the Board of Revenue.

দেন (১)। আজ পর্য্যন্তও গবর্ণমেণ্ট দয়াপরবশ হইয়া নবাবী আমলের এই বৃত্তিটীর উচ্ছেদ সাধন না করিয়া মহত্ত্বেরই পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

১৮০৭ খৃঃ অব্দে গবর্ণমেণ্ট হুসনী দালানের জীর্ণ সংস্কারকল্পে তিন সহস্র এবং ১৮১০ খৃঃ অব্দে চারি সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন (২)। অতঃপর কোর্ট অব ডিরেক্টরের আদেশ অনুসারে, জীর্ণ সংস্কারকল্পে কোন অর্থ প্রদান করা হইবে না বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। এইক্ষণে ঢাকার বর্ত্তমান নবাব পরিবারের বদান্যতার উপরেই হুসনী দালানের অদৃষ্ট-চক্র স্থির রহিয়াছে।

পরগণা হোসনাবাদ, সৈদাবাদ, ময়নামতী এবং অন্যান্য কতিপয় সম্পত্তি হুসনী দালানের ব্যয় সঙ্কুলনার্থে মীর মোরাদ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। মীরের মৃত্যুর পর তদীয় বংশধরগণ প্রায় সমুদয় সম্পত্তি এবং হুসনী দালানের বহুমূল্যবান মণি মুক্তা জহরতাদি হস্তান্তরিত করেন।

রোজাবসানে প্রতিদিন এই স্থানে শত শত লোক এক্‌তার পাইয়া থাকে। সুশৃঙ্খলে কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য একজন দারোগা নিযুক্ত আছেন। হুসনী দালানের মতওল্লির আদেশানুসারে তিনি সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। মহরম উৎসবের সময়ে দারোগা "সিরিণী সিলামতের" অংশ পাইয়া থাকেন।

হুসনী দালানের গাত্রে যে কয়খানা শিলালিপি আছে তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে উহা হিজরী ১০৫২ সনে মীর মোরাদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় এবং হিজরী ১১৩১ সনে মীরের মৃত্যু হয়।

---

(১) Vide Report of Mr. J. G. Dunbar'
(২) Records in the Nawab Bahadur's office.

পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ত শিলালিপিগুলির পারসী কবিতা ও বঙ্গানুবাদ এইস্থানে প্রদত্ত হইল।

"দার জামানে বাদশাহে বাওয়েকার
আঁ-আজীম উশ্বান্ সাহে নামদার।
সাখ্‌তই মাতাম্ সারা সাই ইয়াদ্ মোরাদ্
দারসানে পান্‌জা ওয়াদো-ওয়াবর ইয়াক্ হাজার।
চুঁকে নামি হাস্ত্ জান্তে পাকে পান্‌জেতান
গোপ্ত্ ইঁতারিখে দালানে হোসায়নি য়াদগার" ॥

"সুপ্রসিদ্ধ মহামান্ত প্রতাপশালী বাদসাহের রাজত্ব সময়ে সৈয়দ মীর মোরাদ কর্ত্তৃক এই শোক ভবন নির্ম্মিত হয়। স্মরণার্থ হিজরী ১০৫২ সন হুসনী দালানেই দৃষ্ট হইবে। এই কবিতাটিতে হুসনী দালানের নির্ম্মাণের তারিখ হিজরী ১০৫২ সন, স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত থাকা স্বত্বেও শেষ চরণের "দালানে হোসায়নি" পদ হইতেও ১০৫২ সন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"মীর-ই-ফৈয়াজ চুঁ যে দুনিয়া রাফ্‌ৎ
গ্যাব্‌ত আজ্ রহমৎ-ই-ইলাহি সাদ
বুদ্ আজ্ দেল চুঁ খাদেম-ই-হাসনায়েন
হাক্ জামাস যেজা-ই-এহ্‌সান দাদ্
গুপ্ত্ তারিখে্-ই-ফাউৎ এউ হাতেফ্
বা হাসান ইয়াদ হাশ্‌রে মীর মোরাদ।"

"মীর ফৈয়াজ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া জগদীশ্বরের বিশেষ কৃপা-লাভ করতঃ সন্তুষ্ট হইলেন। কায়মনোবাক্যে হুসেনের দাস ছিলেন বলিয়াই জগদীশ্বরের কৃপাতে অনুগৃহীত হইলেন। স্বর্গ হইতে আদেশ হইল যে, মীরের স্মৃতি বিচারের দিন পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন থাকিবে। তদীয় মৃত্যুর তারিখ হিজরী ১১৪১ সন বলিয়া দিল।"

এই কবিতাটির শেষ চরণস্থিত "ইয়াদ্ হাশ্‌রে" পদ হইতে মীর মোরাদের মৃত্যুর তারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ম কবিতাটি হইতে হুসনী দালানের নির্ম্মাণের তারিখ ১০৫২ হিজরী ধরিলে দৃষ্ট হইবে যে এই উভয় সনের পার্থক্য ৭৯ বৎসর। সুতরাং তাজিয়াকোণা নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিয়াও মীর মোরাদ ৭৯ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে।

ঢাকার সুবাদার ও নায়েব নাজিমগণই হুসনী দালানের মতউল্লী পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে ঢাকার শেষ নায়েব নাজিম গাজী উদ্দিন হায়দর নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে ঢাকার তদানীন্তন কালেক্টর গবর্ণমেণ্টের নিকট মতউল্লী নিযুক্তের জন্য রিপোর্ট করেন। কিন্তু প্রত্যুত্তর আসিবার পূর্ব্বেই মহরম উৎসব সমাগত হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট উক্ত বৎসর বৃত্তি বন্ধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ঢাকার বর্ত্তমান নবাব বাহাদুরের প্রপিতামহ খাজা আলিম উল্লা সাহেব মহরমের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করেন। পরে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খাজে আলিম উল্লা সাহেবই মতউল্লিরূপে মনোনীত হন। তদীয় মৃত্যুর পরে নবাব আবদুলগণি বাহাদুর কে, সি, এস, আই, উক্ত পদে বৃত হন। তৎপরে তদীয় জীবিতাবস্থায়ই সুযোগ্যপুত্র ঢাকার নবাব বংশের কুলপ্রদীপ নবাব খাজে আসান উল্লা বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মহোদয় মতউল্লির কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ঢাকার নবাব পরিবার সুন্নীসম্প্রদায় ভুক্ত হইলেও হুসনী দালানের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন না। প্রতিবৎসর নবাব ষ্টেট হইতে ১২৮৩॥০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে।

ইদ্‌গা।

ঢাকা নগরীর পশ্চিম প্রান্তে পীলখানার সন্নিকটে ইদ্‌গা অবস্থিত। এই ধর্ম্ম মন্দিরটি উচ্চপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত। ১৬৪০ খৃঃ অব্দে শাহাজাদা

সুলতান সুজার আমলে দেওয়ান মীর আবদুল কাসেম কর্ত্তৃক উহা নির্ম্মিত হয়। দীনধর্ম্মানুমোদিত নমাজের সুস্বর অদ্যাপি এই ধর্ম্মমন্দিরে প্রতিনিয়ত শ্রুত হইয়া থাকে। ইদ্‌গাটির অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইয়া পড়ায় নবাব বাহাদুর ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। ঢাকার নবাব ও সুবাদারগণ এই স্থানে আসিয়া নমাজ পড়িতেন।

কদম রসুল।

নারায়ণগঞ্জ বন্দরের অপরতীরে লাক্ষ্যানদীর পূর্ব্বতটে নবীগঞ্জস্থিত কদমরসুল দুর্গ একটী তীর্থস্থান বলিয়া মোসলমানগণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া থাকে। মহম্মদের পদ-চিহ্ন এই দুর্গ মধ্যে একখণ্ড প্রস্তর-খণ্ডোপরি অঙ্কিত ছিল বলিয়া জানা যায়। এক্ষণে উক্ত প্রস্তরখণ্ডের তিরোধান হইয়াছে। দুর্গটী সুসংস্কৃত হইয়াছে। কথিত আছে, দ্বাদশ-ভৌমিকের অন্যতমভৌমিক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঈশাখাঁ মসনদআলির বংশীয় মানোয়ারখাঁ জমিদার, নওয়ারা মহালের রাজস্ব প্রদান করিতে অসমর্থ হওয়ায় সুলতান সুজা কর্ত্তৃক ঢাকা নগরীতে আহুত হইয়াছিলেন। মানোয়ার বহু লোক জন সমভিব্যহারে কোষা নৌকারোহণে খিজিরপুর হইতে ঢাকাভিমুখে রওনা হইলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় নবিগঞ্জের সন্নিকটে নৌকা নোঙ্গর করিয়া রাখা হইল। তথায় রাত্রিযাপন করা স্থিরীকৃত হইলে নৌকার জনৈক মাঝি অগ্নির অন্বেষণে তীরভূমিতে গমন করিলে ঐ ব্যক্তি দেখিতে পাইল যে কতিপয় লোক একখণ্ড শিলা সম্মুখে রাখিয়া অনিমেষ-লোচনে কি যেন নিরীক্ষণ করিতেছে। উহাদের কথোপকথনে প্রকাশ পাইল যে উহা মহম্মদের পদ-চিহ্ন; পূর্ব্ব রাত্রিতে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তাহারা এখানে আসিয়া

দম রসুল
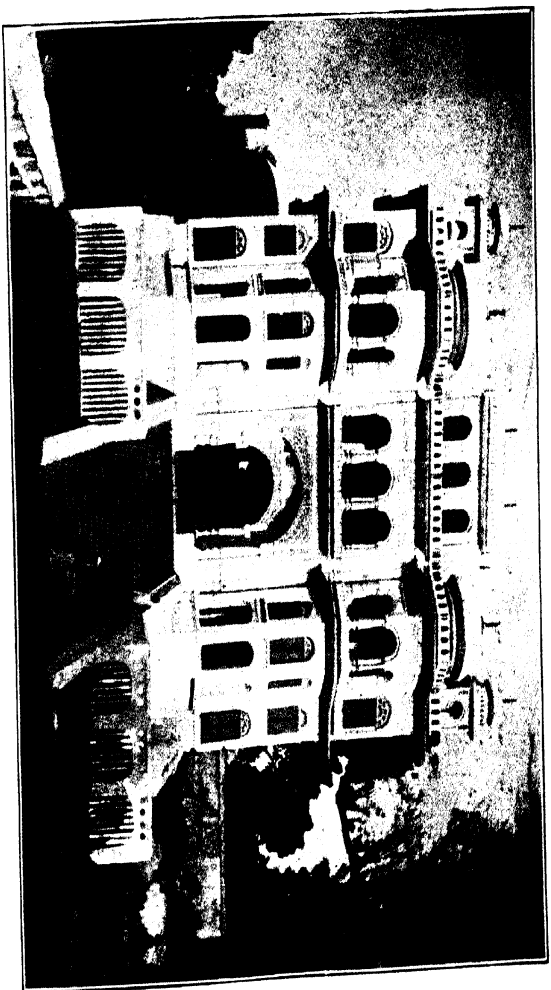
শিলাখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। অতঃপর মাঝি নৌকাতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত মানোয়ারের কর্ণগোচর করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থানে আগমন করেন এবং উহাই যে মহম্মদের পদ-চিহ্ন তাহার প্রমাণ চাহিলেন। তাহাতে তাহারা বলিল "আপনি মানস করুন, আপনার মানস সিদ্ধি হইলেই অবগত হইতে পারিবেন"। তদনুসারে মানোয়ার মানস করিলেন যে তিনি যেন ঢাকা হইতে সসম্মানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। পরে একটী খাগের কলম প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন যদি এই শুষ্ক খাগটি হইতে পত্র অঙ্কুরিত হয় তবেই উহা যে মহম্মদের পদচিহ্ন তদ্বিষয়ে তাঁহার কোনও সন্দেহ থাকিবে না।

অতঃপর মানোয়ার ঢাকায় আগমন করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনার দিবসত্রয় পরে খাগ হইতে কচি-পাতা উৎপন্ন হইবার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই সমুদয় অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া মনোয়ারের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে উহা নিশ্চয়ই "কদমরসুল"। অতঃপর তিনি খিজিরপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নবিগঞ্জ নামক স্থানে একটী মসজিদ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কদমরসুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং কতক ভূমি উহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ঢাকা কালেক্টরীতে সাহাজাদা সুজার দস্তখতি দলিল আছে তাহাতে ভূমি দানের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন জালালউদ্দিন আবুলমুজাঃফর ফতেশাহের সময়ে বাবা সালিহ নামক এক ব্যক্তি এই স্থানে কদমরসুল স্থাপন করিয়া-ছিলেন। ইনি মক্কা ও মদিনা দর্শন করেন। এই দুই স্থানেই মহম্মদের পদচিহ্ন তাঁহার দর্শন হয়। হিঃ ৯১২ সনে বাবা সালিহের মৃত্যু হইয়াছে।

পাচপীরের দরগা।

"মোসলমান শাস্ত্রমতে ধর্ম্মযুদ্ধে জেতার গাজী আখ্যা হইয়া থাকে। সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত মহল্লা বাঘালপুর গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পাচপীর বা ফকিরের শ্রেণীবদ্ধরূপে পাঁচটী দরগার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাহা, গয়েসদি, সমসদ্দি, সিকন্দর, গাজী ও কালু নামক ভীষণযোদ্ধা পঞ্চ পলিটিকেল ফকিরের অবস্থিতি বা নমাজের স্থান বলিয়া হিন্দু ও মোসলমানগণ অতীব সম্মানের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। আজও হিন্দু-মোসলমান পথিকগণ এই স্থানের নিকট দিয়া গমন করিবার সময় সসম্মানে মস্তক অবনত করিয়া উক্ত ফকির পঞ্চকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। মন্দিরগুলির চতুঃপার্শ্বস্থিত কয়েকটী স্তম্ভ দৃষ্টে অনুমিত হয় কোনও সময়ে ছাদ নির্ম্মাণের উদ্যোগ হইয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র এক সময়ে গাজীর গীতের ভূরি প্রচলন ছিল। এখনও হিন্দু-মোসলমান-নির্ব্বিশেষে উহা শ্রবণ করিয়া থাকে। হিন্দু রাজাদিগের গুণ গরিমা যেরূপ চারণ এবং ভাটগণ মুখে দিগন্ত ব্যপ্ত হইত, সুবর্ণগ্রামের মোসলমান অধিপতিদিগের ধার্ম্মিকতা, প্রভূত্বাদি ও সেইরূপে গীতাকারে গৃহে গৃহে শুনানের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

আমরা গাজীর গীতের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"পোড়া রাজা গয়েসদ্দি, তার বেটা সমসদ্দি
পুত্র তার সাই সেকেন্দর।
তার বেটা বরখান গাজী, খোদাবন্দ মুলুকের রাজী
কলি যুগে যার অবতার॥
বাদসাই ছাড়িল বঙ্গে কেবল ভাই কালু সঙ্গে
নিজ নামে হইল ফকির"॥

গয়েস্‌দি, বাদসাহা গয়েসুদ্দিন; সমস্‌দি, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের স্বাধীন পাঠান শাসনকর্ত্তা সমসুদ্দীন; সিকান্দর, বঙ্গের প্রখ্যাতনামা বাদসাহা, যাহার হাতে বঙ্গদেশ প্রথম জরীপ হয়। গাজী, ধর্ম্মযুদ্ধজেতা গাজীসা; কালু, হিন্দুফকির, গাজীর মন্ত্রণাদাতা প্রিয়তম সহচর*। পিতা সিকান্দর বাদশাহ বর্ত্তমানেই গাজীসা ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মটুক রাজ-কন্যা চম্পাবতীকে বিবাহ করেন। পরে তথা হইতে ক্রমশঃ ভাটীর দিকে আগমন করেন। এক দিকে ধর্ম্ম, অন্য দিকে রাজ্য-বিস্তার ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল।

আজও নাবিকগণ নদী উত্তীর্ণ হইবার সময়ে পাচপীর ও বদরের নাম উল্লেখ করিয়া থাকে।

পারুলীয়ার দরগা।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মানোয়ারখাঁর সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেওয়ান সরিফখাঁ দরবেশ হইয়া পারুলীয়া গ্রামে দরগা নির্ম্মাণ করতঃ ধর্ম্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন। ধার্ম্মিক সরিফখাঁ, অতুল ঐশ্বর্য্য, পথপতিত পদদলিত বালুকার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অধুনা তাঁহার পবিত্র ভজনালয় পারুলীয়া গ্রামে বর্ত্তমান আছে। হিন্দু মোসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই এই দরগার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।

পারুলিয়া দরগার শিলালিপি এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল:—

"কায়দা জিনৎ বিস্তে নাছের জেওজা এ দেঁওয়া সরিফ্।

মসজিদে আলি বেণা চু গম্বজে আথ্জর জরিপ্॥

---

* কালু, বিভীষণ শ্রেণীস্থ কোনও হিন্দু ফকির। ইহার কূটমন্ত্রণার বলে মোসলমানগণ সুবর্ণগ্রামের স্বাধীনতা হরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবং তজ্জন্যই কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থ কালুর নামও বন্দনার সর্ব্বশেষে যোজিত হইয়াছে।

সাল তারিখাস্ বগোপ্তা হাতেফ্ আজরুয়ে শুমার।
এক হাজারো একশ দো বিস্ত্ শস্ আজ্ হিজ্‌রে নজিফ্" ॥

অর্থাৎ :—

দেওয়ান সাহেবের বংশীয় নাছের আলীখাঁর কন্যা দেওয়ান সরিফ্‌খান বাহাদুরের স্ত্রী, নীলাকাশ তুল্য সুদৃশ্য প্রকাণ্ড একটী মসজিদ হিজরী ১১২৬ সনে নির্ম্মাণ করাইলেন।

দেওয়ান সরিফখাঁ প্রত্যহ লাখপুর হইতে পারুলিয়া গ্রামে নমাজ পড়িবার জন্য আগমন করিতেন। তাঁহার আসিবার পথে নৌকা যাতা-য়াতের জন্য যে একটী খাল খনিত হইয়াছিল উহার নাম "দেওয়ানখালী"। রায়পুরা থানার উত্তর দিকস্থ সাধার চরের উত্তর ভাগে এই খাল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

সাধু সরিফখাঁ হয়বৎ নগরস্থ পৈত্রিক আবাস স্থান পরিত্যাগ করিয়া পারুলিয়া গ্রামেই অবস্থান করিতেন এবং পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে তাঁহার অংশানুযায়ী কতক ভূসম্পত্তি স্বীয় নামোল্লেখে তৌজিভুক্ত করিয়া লন। তাঁহার জমিদারী নং ৮৬৬৩ তপ্পে সরিফপুর হাজার চৌদ্দ।

সরিফখাঁর সম্বন্ধে বিবিধ অলৌকিক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে (১)।

---

(১) কথিত আছে, একদা জনৈক ক্ষৌরকার দেওয়ান সরিফখাঁর বাম হস্তের কনুই পর্য্যন্ত জলসিক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "হুজুর, আপনার বামহস্ত ভিজা কেন"? সাধু সরিফখাঁ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে "ব্রহ্মপুত্র নদে এক মহাজনের নৌকা জলমগ্ন হইতেছিল, এই সময়ে উক্ত মহাজন আমাকে "মানত" করায় আমি এইমাত্র তাহার নৌকা তুলিয়া দিলাম। সে মানসিক লইয়া আসিতেছে"। এই কথা বলিয়া তিনি উক্ত ক্ষৌরকারকে ইহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এই বৃত্তান্ত অপর কাহারো কর্ণ গোচর হইলে ক্ষৌরকারের অমঙ্গল হইবে ইহাও বলিয়াছিলেন। অনতি বিলম্বে উক্ত মহাজন মানসিক সহ উপনীত হইল।

পাগলা সাহেবের দরগা।

সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত হবিবপুর গ্রামের দক্ষিণে সদর রাস্তার দক্ষিণ-দিকে কুমড়াদি গ্রামে একটি দরগা আছে। ইহা পাগলা সাহেবের দরগা বলিয়া সুপরিচিত। শিশু সন্তানের উৎকট ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ কামনায় হিন্দু-মোসলমান-নির্ব্বিশেষে লোকে পাগলা সাহেবের নামে মানসিক চুল আদায় করিয়া থাকে। এই পীর পাগলা সাহেব নামে কেন পরিচিত হইয়াছিলেন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে ইনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া যাইতেন।

ভগবচ্চিন্তায় একান্ত মনোনিবেশ জন্যই ইহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। ইনি দ্রব্যাদি অপহরণকারীর নাম ধাম সবিস্তারে বলিয়া দিতে পারিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। চোর ধৃত হইলে উহাদিগকে দেওয়ালের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং পরে একে একে তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিতেন। এইরূপে অসংখ্য চৌর্য্যাপরাধির ছিন্ন মস্তক মালাকারে একত্র গ্রথিত করিয়া নিকটবর্ত্তী খাল মধ্যে নিক্ষেপ করিতেন। এজন্য এই খালটী এক্ষণে মুণ্ডমালার খাল বলিয়া এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ।

এতদ্দৃষ্টে নাপিত অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিল; কিন্তু একথা গোপন রাখিতে পারিল না। বলা বাহুল্য যে ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িবা মাত্রই ক্ষৌরকার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

ক্ষৌরকার যে স্থানে বসিয়া দেওয়ান্ সরিফখাঁর সহিত কথোপ কথন করিতেছিল, উহা অদ্যাপি ইষ্টক দ্বারা চতুষ্কোণাকারে বাঁধান রহিয়াছে। এখানে এবং সরিফ ও তদীয় পত্নীর সমাধিস্থলে দুগ্ধ, চিনি, বাতাসা প্রভৃতি দ্বারা জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকই সিন্নি প্রদান করিয়া থাকে।

মহজুমপুরের মসজিদ।

"মহজুমপুরের মসজিদস্থিত একটী স্তম্ভের প্রস্তরখণ্ড হইতে অনবরত ঘর্ম্মাকারে জলনিস্থত হইত। পুত্র কামনায় বন্ধ্যা স্ত্রীগণ, ঐ স্তম্ভ আলিঙ্গন করিত। কিন্তু অপবিত্রতা স্পর্শে নাকি অনেক দিন হইতে ঐ স্তম্ভ গুণ-বিবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। ঘর্ম্মশীল বারুণ প্রস্তরের বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ স্তম্ভগাত্রে ঐ প্রকার একখানা প্রস্তর অলক্ষ্য-ভাবে স্থাপিত ছিল, তাহা হইতেই ঘর্ম্মাকারে জলের উদ্গম হইয়া স্তম্ভের মূলদেশে পতিত হইত। পরবর্ত্তী কোনও সময়ে ঐ বারুণ প্রস্তরখণ্ড অপহৃত হওয়ায় স্তম্ভটি গুণ-বিবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছে।

পীর খন্দকার মহম্মদ ইউসুফের দরগা।

সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত মোগড়াপাড়া বাজারের অনতি উত্তরে দুইটী গোলাকার ছাদবিশিষ্ট সুদীর্ঘ অট্টালিকায় সুপ্রসিদ্ধ পীর খন্দকার মহম্মদ ইউসুফ ও তদীয় পিতা ও পত্নী সমাহিত হন। প্রত্যেকটি সমাধি মন্দি-রের শীর্ষ দেশে দুইটী করিয়া সুবর্ণ পুষ্কল ছিল। হিন্দু-মোসলমান-নির্ব্বিশেষে রোগাদি মুক্তি কামনায় এই মসজিদে মানসিক করিয়া থাকে। স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ প্রত্যেক মোসলমানই এই স্থান দিয়া গমনাগমন করিবার সময়ে দরগায় নমাজ পড়িয়া থাকেন।

কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল কোনও দুষ্ট লোকে সমাধি-শীর্ষস্থিত সুবর্ণ পুষ্কল অপহরণ করিয়াছে।

পীর সাহেবের প্রতি সর্ব্বসাধারণের অচলাভক্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক কৃষকই তদীয় শ্রমলব্ধ ফসলের কিয়দংশ পীরের উদ্দেশ্যে প্রদান না করিয়া গ্রহণ করে না।

ইনি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার সমাধি স্থানের সন্নিকটে যে মসজিদ বিদ্যমান আছে, উহা ১৭০০ খৃঃ অব্দে স্বয়ং খন্দকার সাহেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। মসজিদ গাত্রস্থিত প্রস্তরফলকে হিজরী ১১১২ (১৭০০ খৃঃ অঃ) সন লিখিত আছে। উক্ত মসজিদের সংলগ্ন সমাধি স্থান ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এই সমাধিক্ষেত্রে আরও যে কত অজ্ঞাত নামা পীরের সমাধি আছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে।

এই মসজিদে প্রবেশকালে বামপার্শ্বের দেওয়ালে যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আছে, তাহাতে চূণের প্রলেপ দিলে নষ্ট দ্রব্য পাওয়া যায়, এরূপ বিশ্বাসে লোকে উহাতে চূণের লেপ দিত। ইহাতেই ক্রমে ক্রমে দুই ইঞ্চি পরিমাণ চূণ সঞ্চিত হইয়া যায়। ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব সেই চূণ পরিষ্কার করাইয়া হিঃ ৮৮৯ (১৪৭২ খৃঃ অব্দ) সনে লিখিত একখানা শিলালিপি প্রাপ্ত হন। উহা জালালুদ্দিন আবুল মজঃফর ফাতশাহার বেশরক্ষক মোকরব উদ্দৌলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও খোদিত হয়। ইনি মোয়াজ্জমাবাদ এবং লাউর নামক স্থানদ্বয়ের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। এই শিলালিপিখানা বিক্রমপুরের বাবা আদমের মসজিদের প্রস্তরফলকের এক বৎসর পরে খোদিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রাচীনত্ব হিসাবে ইহা ঢাকা জেলায় দ্বিতীয় স্থানীয়।

মগড়াপাড়া বাজারে মুন্নাসা দরবেশের সমাধিস্থান আছে। এই দরবেশ সম্ভবতঃ পীর খন্দকার মহম্মদ ইউসুফের সমসাময়িক। এই পথে যাতায়াত করিবার সময়ে ধার্ম্মিক মোসলমানগণ এই মসজিদে নমাজ পড়িয়া থাকেন।

দমদমা দুর্গ।

মোগড়াপাড়া ও ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ কয়েকখানা গ্রামসহ কোণ্ডর সুন্দর প্রভৃতি কতিপয় স্থান পাঠান-শাসন সময়ে সহরতলী সহর সোনারগাঁ

বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এইস্থানেই পাঠান ভূপতিগণের রাজপ্রাসাদ ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে বহুতর মসজিদ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। মোগড়াপাড়ার অনতিদূরে একটী প্রাচীন ভগ্ন দুর্গের শীর্ষভাগে প্রকাণ্ড তিন্তিরি বৃক্ষ স্বীয় মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দুর্গের সমুদয় চিহ্নই বিলুপ্ত হইয়াছে। মহরমের সময়ে এখানকার গোলাকার উচ্চভূমি "আসুর খানা" রূপে ব্যবহৃত হইত। মহরমের দশম দিবসে সর্ব্বসাধারণের প্রদর্শনের নিমিত্ত স্থানীয় মোসলমানগণ এখানে তাজিয়াদি রাখিয়া দিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এখানকার মোসলমানগণ ফেরাজী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় পূর্ব্ব প্রথার বিলোপ সাধন করিয়াছে।

J. A. S. B. 1874 : List of ancient monument.

সাহ আবদুল আলা বা পোকাই দেওয়ানের সমাধি।

মোগড়াপাড়া গ্রামের উত্তরাংশে গোহাটা মহল্লায় সুপ্রসিদ্ধ পীর সাহ আবদুল আলার সমাধি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইনি পোকাই দেওয়ান নামে পরিচিত। কথিত আছে ইনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বাদশ বৎসরকাল নিবিড় অরণ্য মধ্যে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এই সময়ে ইহার বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছিল; এমন কি, আহারাদির জন্যও ইনি কোনও সময়ে ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছিলেন না। ইহার অনুচরবর্গ এই পরমযোগী মহাপুরুষের অন্বেষণে বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই স্থানে ইহাকে একটী উইর ঢিপি মধ্যে ধ্যান-মগ্নাবস্থায় প্রাপ্ত হয়। ইনি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কারণ ১৮৬৪ সনে সুবর্ণগ্রামে এরূপ বয়োবৃদ্ধ লোক বিদ্যমান ছিলেন যাহারা এই মহাপুরুষের পুত্র সাহ ইমাম বক্স বা চুলু মিঞাকে তথায় জীবিতাবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন। চুলু মিঞা বৃদ্ধ বয়সে শ্রীহট্ট হইতে পিতার সমাধি স্থান পরিদর্শন করিতে

এখানে আগমন করেন, এবং কতিপয় বৎসর এখানে বাস করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। পিতাপুত্রের সমাধি একই স্থানে পাশাপাশি ভাবে রহিয়াছে। J. A. S. B. 1874: Pt. I.

সাহ আবদুল আলমের সমাধির সন্নিকটে একখণ্ড প্রস্তর অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কথিত আছে, এই প্রস্তর খণ্ডোপরি যোগাসনবদ্ধ হইয়াই ইনি দ্বাদশ বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মৃত্তিকার দেওয়ালের উপরে একখানা খড়ের চালা দ্বারা এই সমাধিটি রক্ষিত হইয়াছে।

পারিলের দরগা।

মাণিকগঞ্জ থানার অন্তর্গত পারিল গ্রামে একটী প্রসিদ্ধ দরগা বর্ত্তমান আছে। দরগার চতুর্দ্দিকে যে সমুদয় প্রস্তরখণ্ড বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যস্থিত কোনও কোনও প্রস্তরফলকে পারশী ও আরবী ভাষায় পারিল গ্রামের উৎপত্তির বিবরণ লিখিত আছে। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে হিজরী ৬১১ সনে শাহ গাজীমুলুক একরামখান নামধেয় জনৈক আউলিয়া দরবেশ এইস্থানে আগমন করিয়া বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। শাহ সাহেব যে স্থানে সমাহিত হন সেইখানেই এই দরগাটী প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। সকলসম্প্রদায়ের লোকেই এই দরগাটীকে অত্যন্ত ভক্তির চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে।

ধামরাইর পাচপীর।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ধর্ম্ম-প্রচারোৎসাহোন্মত্ত দরবেশগণ পশ্চিম এসিয়া হইতে ধর্ম্মপ্রচার ব্যপদেশে ভারতবর্ষে আগমন করিত এবং ভারতীয় মোসলমান রাজন্যবর্গের সহায়তা লাভ করিতে সমর্থ হইত। এই

সময়ে শাহজালাল ৩৬০ জন দরবেশ সহ এতদঞ্চলে আগমন করেন। এই আউলিয়াগণ বঙ্গের বিভিন্নস্থানেই দীন ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন।

উঁহাদিগের মধ্যে মীর সৈয়দালী তেব্রিজি (তেব্রিজ প্রদেশের বাদশা ফকির), মিসরদেশবাসী হাজি মীর মহম্মদ, হাজি মিফ্‌তাউদ্দিন তাইকি, মীর মকদুল সাহেব, সেনাপতি পীর জঙ্গি সাহেব এবং ভগিনী পাগলা বিবি, ধামরাই গ্রামে আগমন করিয়া এতদঞ্চলে মোসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

ইঁহাদিগের মধ্যে মীর সৈয়দালী তেব্রিজি এতদঞ্চলে "সৈয়দালী পাতশা" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। ইঁহার দরগা ধামরাইর পাঠান-টোলায় অবস্থিত। এই দরগাটী "বড় দরগা" নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত হাজি মীর মহম্মদ ও মিফ্‌তাউদ্দিন তাইকির দরগা মোকাম টোলায়, মীর মকদুল সাহেব (ইনি জঙ্গ বাহাদুর নামে খ্যাত) ও সেনাপতি পীর জঙ্গি সাহেবের দরগা মাইফরাসপাড়ায়, এবং পাগলা বিবির দরগা কাইলাগার বাগানগড়ে অবস্থিত।

কোণ্ডা খন্দকারের দরগা।

পালবংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের অনন্তর-বংশ্য তরুরাজ খাঁ মোগল শাসন সময়ে হুগলীর ফৌজদার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তরুরাজের পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে ভাগ্যবন্ত রায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। মোসলমান-সংশ্রব দোষে জাতিপাত বিবেচনা করিয়া তিনি সমাধি-যোগে তনুত্যাগ করেন। তিনি সাভার ও ফুলবাড়িয়ার সন্নিহিত কোণ্ডা নামক নিজ গ্রামেই সমাহিত হন। এই সমাধিস্থ মহাপুরুষ "খন্দকার" এবং সমাধি মন্দির "খন্দকারের" দরগা বলিয়া খ্যাত। হিন্দু-মোসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই দরগার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং সিন্নি

প্রদান করে। দরগায় একজন খাদিম নিযুক্ত আছে। এই দরগা জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ঢাকার নবাব বাহাদুর কর্ত্তৃক সংস্কৃত হয়। ভাকুর্ত্তার রায় বংশ প্রদত্ত বহু জমি "পিরাণ" নানকার ছিল। এইস্থানে কুড়ি বিঘা স্থান ব্যাপিয়া একটি সরোবর এখনও বিদ্যমান আছে। কোণ্ডা গ্রামের ভাগ্যবন্তপাড়া এই ভাগ্যবন্তের নামানুসারেই হইয়াছে।

বাস্তার মাদারি ফকিরের আস্তানা।

বাস্তা গ্রামের মাদারি ফকিরের অনেক অলৌকিক কাহিনী লোক মুখে শ্রুত হওয়া যায়। মাঘীপূর্ণিমার দিন এখনও এই দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় চল্লিস সহস্র লোক সমবেত হইয়া থাকে। রোগমুক্তির জন্য এইস্থানে অনেকে মানত করিয়া সিন্নি প্রদান করে।

মীরপুরের সা আলিসাহেবের দরগা।

ঢাকা সহরের ৮ মাইল উত্তর পশ্চিমে মীরপুর গ্রামের সন্নিকটে সুপ্রসিদ্ধ আউলিয়া সাআলি সাহেবের দরগা অবস্থিত। এই দরগাটি সমচতুষ্কোণ। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রায় ৩৬ ফিট। উচ্চতাও প্রায় তদনুরূপ হইবে। দরগা মধ্যে সাহআলি সাহেবের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে।

কথিত আছে যে প্রায় চারিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে সাহআলি নামে বোগ্দাদের জনৈক রাজকুমার সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া চারিটী শিষ্যসহ নানা দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক এখানে সমাগত হন; এবং একটী ক্ষুদ্র মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ১২ বৎসর কাল অনশনব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক মসজিদের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন;

এবং ঐ সময় মধ্যে কেহ যেন তাঁহার ধ্যানযোগ ভঙ্গ না করে এজন্য শিষ্য-মণ্ডলীকে বিশেষরূপে বলিয়াদিয়াছিলেন। দেড়বৎসর অতীত হইবার একটীদিনমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে শিষ্যগণ মসজিদ মধ্যে অস্পষ্ট শব্দ শ্রবণ করিতে পাইয়া কৌতুহল-পরবশ হইয়া দ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক দেখিতে পাইল যে সাধু তথায় নাই কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে একটী পাত্র মধ্যস্থিত শোণিত রাশি প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সংস্পর্শে উদ্বেলিত হইতেছে। তাহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তদবস্থ চিত্তে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান থাকিলে সাধুর স্বরের অনুকরণে কে যেন ঐ শোনিত রাশি সমাধিস্থ করিবার জন্য আদেশ করিতেছে এরূপ অনুমিত হয়। শিষ্য মণ্ডলী প্রত্যাদেশ অনুযায়ী গুরুর দেহাবশেষ সমধিস্থ করিল। সাধুর শেষ-চিহ্ন বক্ষেধারণ করিয়াছে বলিয়া দরগাটি পুণ্যস্থানের ন্যায় আজও সম্মানিত হইতেছে।

এই ঘটনার কতিপয় বৎসর পরে মীরপুরের জনৈক মোসলমান ব্যবসায়ী, সাহআলী সাহেবের মানস করিয়া কারবারে প্রচুর অর্থলাভ করিয়াছিল। কৃতজ্ঞ ব্যবসায়ী সাধুর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আজও শত শত নরনারী সাহআলি সাহেবের সমাধিস্থান সন্দর্শন করিবার জন্য নানাস্থান হইতে সমাগত হইয়া থাকে।

ঢাকার অবদান কল্পতরু স্বর্গীয় নবাব স্যার আবদুলগণি কে, সি, এস, আই, মহোদয় তথায় আর একটী মসজিদ এবং সাধু ফকির ও দূর দেশান্তর হইতে সমাগত মোসলমান নরনারীর আশ্রয়ের জন্য নাতি-ক্ষুদ্র একটী ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। দরগার সন্নিকটে একটী পুষ্পোদ্যান এবং নাতি-দীর্ঘ একটী পুষ্করিণীও খনিত হইয়াছে। ঢাকার নবাব পরিবারের বদান্যতায় মীরপুরের এই দরগাটীর বাৎসরিক উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। বশপুরেরনদী হইতে এই দরগা পর্য্যন্ত এবং

ঢাক-গোয়ালন্দ রাস্তা হইতে দরগা পর্য্যন্ত দুইটী রাস্তা ও তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন।

আজিমপুরার মসজিদ।

কথিত আছে, পলাসীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, একদা নবাব সিরাজ দ্দৌলার মীরমুন্সী, মহম্মদ দেওয়ান নামক কোনও ব্যক্তি পাল্কীতে আরোহণ পূর্ব্বক মুরসিদাবাদের রাজ-পথ দিয়া গমন করিবার সময়ে হতভাগ্য নবাবের খণ্ড-বিখণ্ডিত-দেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত সন্দর্শন করিলে মহম্মদ দেওয়ানের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি সংসারে নিতান্ত বীতস্পৃহ হইয়া নানাস্থান পর্য্যটন পূর্ব্বক আজিমপুরা নামক স্থানে আগমন পূর্ব্বক ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করেন। কথিত আছে তিনি কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। মহম্মদ দেওয়ানের বংশধরগণ মধ্যে একশাখা বাবুপুরার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেছে। এই বংশীয় বাবু খাঁ দেওয়ানের নামানুসারে স্থানের নাম বাবুপুরা হইয়াছে।

হিন্দু-মোসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলেই আজিমপুরার মসজিদটাকে নিতান্ত সম্মানের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া থাকে।

হাসারার দরগা।

ইহা আলমগাজীর দরগা নামে খ্যাত। রোগমুক্ত হইবার জন্য হিন্দু ও মোসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই পীড়িত হইলে এই দরগায় সিন্নি মানত করিয়া থাকে। বিক্রমপুর অঞ্চলে হাসারার এই দরগাটী বিশেষ প্রসিদ্ধ।

আলম গাজী সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব ছিলেন। তেঘরিয়ার সৈয়দ বংশের হস্তলিখিত প্রাচীন একখানা পারসী পুস্তকে উঁহাদিগের বংশ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই বংশীয় সৈয়দ

আলম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জয়নাল আবেদিনের বংশধর। ঢাকায় বঙ্গের মোগল রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এই সৈয়দ আলমের পুত্র সৈয়দ ইমাম (প্রকাশ্যে সৈয়দ হিঙ্গু) ও সৈয়দ ঝিঙ্গন তেঘরিয়া গ্রামে উপনীত হন। আলম গাজীর পিতৃস্বসার রূপ লাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া সৈয়দ হিঙ্গু এই মহিলার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তেঘরিয়া গ্রামেই অবস্থান করিতে থাকেন। অদ্যাপি ইহাদিগের বংশধরগণ তেঘরিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

কোনও কারণে হাসারার সিংহ চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ দর্প-নারায়ণের সহিত আলম গাজীর মনোমালিন্য ঘটিলে গাজী সাহেব প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া দর্পনারায়ণের বংশীয় স্ত্রীপুরুষ সকলকেই সংহার করিয়াছিলেন; কেবল একটী মাত্র বধূ শিশুপুত্রসহ পিত্রালয়ে ছিল বলিয়া অব্যাহতি পায়। কালক্রমে এই শিশু কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হন। এবং স্বীয় বংশের হন্তারক আলম গাজীকে নিহত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া হাসারা গ্রামে আগমন পূর্ব্বক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তাঁহাকে আহ্বান করেন। কথা হয়, যে ব্যক্তি পরাজিত হইবে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি জেতার হস্তগত হইবে। এই যুদ্ধেরফলে আলম গাজী নিহত হন। আলমের বৃদ্ধামাতা গলদশ্রুনয়নে পুত্রহন্তাকেই পুত্র বলিয়া সম্বোধন করেন এবং আলমের সমুদয় সম্পত্তি তাঁহাকে প্রদান করেন। আলমের সমাধি স্থানেই এই দরগা নির্ম্মিত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্তও হাসারার সিংহ চৌধুরীগণ এই দরগায় সর্ব্বাগ্রে সিন্নি প্রদান করিবার অধিকারী। গাজীর বংশধরগণ কর্ত্তৃক দরগার কার্য্যাদি সুসম্পন্ন হইতেছে। এই দরগার সংলগ্ন উত্তরে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে, তাহার পূর্ব্বপার দিয়া শ্রীনগর হইতে ঢাকায় যাতায়াতের একটী রাস্তা আছে।

নানকপান্থী মঠ।

ইদগার অনতিদূরে রমনার কালীবাড়ীর ঠিক পশ্চিমে একটী প্রাচীন শিখ সঙ্গত আছে। টেইলার সাহেব ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ঢাকায় দ্বাদশটী সঙ্গত সন্দর্শন করিয়াছিলেন। এইস্থানের অনুচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণ মধ্যে মৃত মোহন্তগণের সমাধি বিদ্যমান থাকিয়া ঢাকার প্রাচীন শিখ কীর্ত্তি সজীব রাখিয়াছে। একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে গ্রন্থ সাহেবের পূজা হয়। সম্মুখের উচ্চ বেদীতে কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরোপরি উৎকীর্ণ গুরু নানকের পদ-চিহ্ন স্থাপিত আছে। সঙ্গতের বৈঠকখানাটী সায়েস্তাখানি ধরণে নির্ম্মিত। প্রাঙ্গণ মধ্যে অষ্ট কোণাকার একটী প্রকাণ্ড ইন্দারা আছে। উহা গুরু নানকের ইন্দারা বলিয়া কথিত হয়। প্রবাদ এই যে গুরু নানক এক সময়ে ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন এবং তিনি এই ইন্দারা হইতে জলপান করেন। এজন্যই এই ইন্দারার জল নানাবিধ অলৌকিক গুণ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয় (১)। আবার কেহ কেহ বলেন যে, নবম শিখগুরু তেগ বাহাদুর দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের সময়ে ঢাকা নগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে ঢাকায় তাঁহার বহু শিষ্যমণ্ডলী জমিয়াছিল। তিনিই এই সঙ্গতটীর প্রতিষ্ঠাতা।

এই সঙ্গতকে নথা সাহেবের সঙ্গত বলে। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের সময়ে নথা সাহেব ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন, এজন্য আবার কেহ কেহ নথা সাহেবকেই ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া অনুমান করেন।

---

(১) প্রায় বিংশতিবৎসর অতীত হইল একদা সাধক-প্রবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ব্রহ্মচারী মহোদয় এই কূপ জল দ্বারা রোগ মুক্তির আশ্চর্য্য বিবরণ আমাদিগের নিকটে বলিয়াছিলেন। রোগমুক্তির জন্য অনেকানেক হিন্দু এখান হইতে জল লইয়া যায়।

যাহা হউক ঢাকায় এক সময়ে যে গুরু নানকের প্রতিষ্ঠিত শিখ ধর্ম্মের রশ্মি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং এজন্য যে মধ্যে মধ্যে একাধিকবার শিখ গুরুগণের এই নগরে পদার্পণ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

কূপ মধ্যস্থিত গুরুমুখী ভাষায় লিখিত প্রস্তরফলক পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১০৪৮ খৃঃ অব্দে মোহন্ত প্রেম দাস কর্ত্তৃক এই ইন্দারাটী একবার সংস্কৃত হইয়াছিল।

আরমানি গির্জ্জা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই আরমানিগণ ঢাকাতে বাণিজ্য-ব্যপদেশে আসিয়া বাস করেন। পূর্ব্বে এখানে আরমানিদিগের সংখ্যা অনেক ছিল। এক্ষণে ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। প্রথমতঃ ইহারা একটী ক্ষুদ্র গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন কিন্তু ইহাদিগের প্রধান্য এই নগরে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ১৭৮১ খৃঃ অব্দে আরমানিটোলাতে একটী বৃহৎ গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়।

গ্রীক গির্জ্জা।

আরমানিদিগের আগমনের পরে গ্রীকগণ এখানে আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় গ্রীকগণের দলপতি ধনী শ্রেষ্ঠ Alexis Argyen ১৭৭৭ খৃঃ অব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তদীয় বিপুল ধনরাশি তাহার পুত্রগণ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকাতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৮২১ খৃঃ অব্দে ইহারা ঢাকাতে একটি গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তেজগাঁর গির্জ্জা (পর্ত্তুগীজ)।

১৫১৭ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজগণ বঙ্গদেশে প্রথম আগমন করেন। এই বৎসর John De Silveyra চারিখানা বাণিজ্য পোত সহ বাঙ্গালাতে

উইলফোর্ড টলেমীর লিখিত আহ্লাদনকে আন্তিবলের অপর নাম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঢাকার দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত ফিরিঙ্গিবাজার নামক স্থানকেই তিনি আন্তিবল বলিয়া প্রমাণ করিতে সমুৎসুক।

ডাঃ টেইলার লিখিয়াছেন "টলেমীর লিখিত আন্তিবল ব্রহ্মপুত্র নদেরতীরে অবস্থিত। আটি ভাওয়াল হইতেই যে আন্তিবল নামের উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এই স্থান পূর্ব্বে আস্তোমেলা (সংস্কৃত হাতিমল্ল বা হাতীবন্দ) নামে পরিচিত ছিল। হিন্দু নরপতিগণ এই স্থানে হস্তী ধৃত করিতেন বলিয়া এই স্থানের এবম্বিধ নাম হইয়াছে। বানার এবং লাক্ষ্যা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এক ডালা নামক স্থানেই আন্তিবল অবস্থিত ছিল। এই স্থানে হাতী বন্দ নামে একটী স্থান আছে তথায় পূর্ব্বে রাজা দিগের হস্তী রক্ষিত হইত"।

Vide Mc Crindles Translation of Ptolemy: Asiatic Researches XIV.

Dr. Taylor's Topography of Dacca.

আদমপুর।

বরাব গ্রামের অনতি উত্তরবর্ত্তী, আদমপুর নামক স্থান ঈশাখাঁর নন্দন আদমখাঁর স্মৃতির সহিত বিজড়িত রহিয়াছে। এই স্থানে ঘাটলা সমন্বিত এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনিত আছে। ইহা আদমখাঁর বাগান বাড়ী বলিয়া অনুমিত হয়।

আমিনপুর।

সহর সোনারগাঁয়ের অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে সোনারগাঁয়ের ক্রোড়িয়ান অবস্থিত করিত। আমিনপুরে ক্রোড়ীবাড়ীর একটী ঝিকটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

আড়াইহাজার।

আড়াইহাজারের চৌধুরীদিগের পূর্ব্ব পুরুষ গজেন্দ্র চৌধুরী আদেশ মাত্র আড়াইহাজার সৈন্য উপস্থিত করিবেন বলিয়া আড়াইহাজারী চৌধুরী বলিয়া অভিহিত হইতেন। এই গৌবরাত্মক রাজাদেশ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তদধ্যুষিত সুবিস্তৃত গ্রাম আড়াইহাজার নামে অভিহিত করেন। এই চৌধুরীদিগের অধিকারে মেঘনাদে বর্ত্তমান প্রচলিত কুৎ ও জলকর এই উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত "মাশুলে দরিয়া-ই" বলিয়া একরূপ কর আদায় হইত।

ইদ্রাকপুর।

ঢাকা হইতে ১৪ মাইল ও ফিরিঙ্গিবাজার হইতে ২ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে মেঘনাদ, লাক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী এই নদ নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। মগদিগের অত্যাচার হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য খান-খানান মোয়াজ্জমখাঁ (মীরজুমলা) এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইদ্রাকপুর যেরূপ স্থানে অবস্থিত, তাহাতে ইহাকে ঢাকার প্রবেশ-দ্বার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঢাকা নগরী আক্রমণ করিতে হইলে এই স্থান অতিক্রম করিতে হইত এবং এই পথ ভিন্ন অন্য জল পথ সুগম ছিল না। সুতরাং এই স্থানটীকে সুরক্ষিত করিতে পারিলে মগ এবং পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ঢাকা নগরী এক-

প্রকার নিরাপদ হইবে এই উদ্দেশ্যেই এই দুর্গ ইছামতী নদীর দক্ষিণতীরে নির্ম্মিত হয়।

১৮০২ খৃঃ অব্দে ঢাকার তদানীন্তন জজও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেটার সন সাহেবের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তৎকালেও এই দুর্গটী সুদৃঢ় ছিল।

উদ্ধবগঞ্জ।

সহর সোনারগাঁয়ের এক মাইল দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে মীনাখালী নদী তটে অবস্থিত। ডাঃ বুকানন হ্যামিল্টন সুবর্ণগ্রাম পরিদর্শন উপলক্ষে এই স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। তিনি পরিজ্ঞাত হন যে, সহর সোনারগাঁও ব্রহ্মপুত্র নদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া উহার কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে"। উদ্ধবগঞ্জকেই তিনি সোনারগাঁও বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তিনি যে এই বিষয়ে ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বিবেচনায় মোগড়াপারেই মোসলমান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন ব্রহ্মপুত্র হইতে মেঘনাদ পর্য্যন্ত যে খাল খনিত হইয়াছিল, তাহার নাম "মেনিখাল" বা গাজিনা; এই খালটী পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত আছে। ঈশাখাঁ এই খালটীর সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন।

Montgomery Martins Eastern India Vol. III. P. 43.

Journal of the Asiatic Socety of Bengal 1874. Pt. 1,

এগারসিন্ধু।

ঢাকা হইতে প্রায় ৪২ মাইল দূরবর্ত্তী পূর্ব্বোত্তর প্রান্তিক দেশে নয়ানবাজারের বাঁপরিত দিকে ব্রহ্মপুত্র ও বানার নদওনদী দ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এইস্থান হইতেই বানার নদীর উদ্ভব হইয়াছে।

এখানে একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা সুবর্ণ গ্রামের উত্তর সীমাপরিরক্ষক স্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল।

মোগলবীর তারসুনের হত্যাকাণ্ডের পরে সাহাবাজ খাঁ বিপুল বাহিনী সহ ঈশাখাঁর রাজত্ব আক্রমণ করিলে তিনি এই দুর্গটী সুরক্ষিত করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে সাহাবাজ খাঁ বানার নদীর তীরে অবস্থান করিতেছিলেন; সৌভাগ্যক্রমে এই বৎসর বর্ষার প্রকোপ তত অধিক হইয়াছিল না। সুতরাং মোগল বাহিনী নদীর ধারেই অবস্থান করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। পাঠানেরা তখন এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পঞ্চদশটী খাল খনন করাইয়া মোগল ছাউনীর দিকে বর্ষার জলস্রোত চলাইয়া দিয়াছিল, ফলে তাহাতে মোগল সৈন্যের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল।

এই ঘটনার প্রায় দশবৎসর পরে ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে বীরবর মানসিংহ নন্দন দুর্জ্জন সিংহ প্রাণ পরিত্যাগ করেন। পরে দ্বন্দযুদ্ধে প্রীত হইয়া মান সিংহ ঈশা খাঁর সহিত সখ্য সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। অতঃপর দিল্লীর দরবারে উপনীত হইয়া সম্রাট আকবর হইতে "দেওয়ান মসনদ আলি উপাধি এবং বাইশ পরগণার আধিপত্য লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মিঃ বিভারিজ এগারসিন্ধু ও কোণ্ডরসুন্দর অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। আকবর নামার এইস্থান "বারসিন্ধুর" বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে।

J. A. S. B. 1874. and 1904. Elliot Vol. VI.

একডালা।

চুরচুরিয়ার ৮ মাইল দক্ষিণে বানার ও লাক্ষ্যানদীর সঙ্গম স্থলে এই স্থান অবস্থিত। তারিখ ই-ফিরোজ সাহীর গ্রন্থকার জিয়াউদ্দিন বারুণী

লিখিয়াছেন "দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ রাজধানী পাণ্ডুয়া আক্রমণ করিয়া হাজি ইলিয়াসের পুত্রকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং হাজি ইলিয়াসকে একডালায় দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; অবশেষে একডালার নিকটবর্ত্তী উন্মুক্ত প্রান্তরে একলক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু মোসলমান এই ভীষণ রণযজ্ঞে জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছিল।" দুর্গাবরোধ কালে হাজি ইলিয়াস ছদ্মবেশে দুর্গ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া রাজা বিয়াবনী নামক জনৈক সাধুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ্য দান করিয়াছিলেন।

এই একডালার স্থান নির্ণয় লইয়া অনেকানেক মনস্বী ব্যক্তিই অল্পাধিক পরিমাণে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিয়াছেন। মিঃ ওয়েষ্টমেক্ট ইহাকে প্রথমতঃ দিনাজপুর জেলায়, পরে পাণ্ডুয়ার ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী কোনও স্থানে; মিঃ টমাস পুনর্ভবা নদী তীরবর্ত্তী জগদলা নামক স্থানে, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গৌড়ের নিকটবর্ত্তী সাগরদিঘীর অনতিদূরে ইহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার ডাক্তার টেইলার, মিঃ হাণ্টার, মিঃ বিভারিজ প্রমুখ মনস্বীগণ ইহাকে ঢাকা জেলায় অবস্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

একডালার অপর নাম "আজাদপুর" রাখা হইয়াছিল। পাণ্ডুয়া, দিনাজপুর, এবং ঢাকা জেলার একডালার সন্নিহিত স্থানে আজাদপুর নামে কোনও স্থান আছে কিনা তদ্বিষয়ে কেহই অনুসন্ধান করেন নাই। প্রতিবর্ষে সাধু সন্দর্শনার্থে হোসেন সাহের ঢাকা হইতে পাণ্ডুয়ার পদব্রজে গমন করা সম্ভবপর নহে বলিয়া অক্ষয় বাবু প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ একডালাকে ঢাকা জেলায় অবস্থিত বলিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু পুণ্যস্থান প্রভৃতি দর্শন লালসায় ধার্ম্মিক মোসলমানের পক্ষে দূরদেশে পদব্রজে গমন করা অসম্ভব কেন আমরা বুঝিতে পারি না।

ঢাকার একডালার নিকটে একজন মোসলমান সাধুর সমাধি মন্দির

বিদ্যমান আছে। উহাই ইতিহাসোল্লিখিত "রাজা বিয়াবাণীর সমাধি মন্দির কিনা তাহাও বিবেচ্য বিষয় বটে। কিন্তু পাণ্ডুয়ার একডালার নিকট কোনও সমাধি মন্দির দৃষ্ট হয় না।

বারুণীর লিখিত একডালার বিবরণ পাঠে উহা ঢাকার একডালা বলিয়াই অধিকতর সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

Vide J. A. S. B. 1895 : Dr. Taylor's Topography of Dacca.

কর্ত্তাভু বা কত্রাপুর।

লাক্ষ্যা নদীতীরে অধুনা তপ্পা কাটারব নামে প্রসিদ্ধ খিজিরপুরের বীপরিত দিকে অবস্থিত। এইস্থানে ঈশাখাঁর অস্ত্রাগার ছিল। সাহাবাজ-খাঁ খিজিরপুরের দুর্গ অধিকার করিয়া সোনারগাঁও নগর হস্তগত করেন। পরে এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক ঈশার অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। মিঃ বিভারিজ বলেন "ঈশাখাঁর রাজধানী কর্ত্তাভূতে ছিল, খিজিরপুরে নহে।" আকবর নামায় ঈশাখাঁর সহিত মান সিংহ-তনয় দুর্জ্জন সিংহের নৌযুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্থানের উল্লেখ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই যুদ্ধে দুর্জ্জন সিংহ প্রাণত্যাগ করেন। India office. Mss. No. 236 এ ইহা "কাত্রাব" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ২৩৫ সংখ্যক Mss. এ "কাত্রাভূ" অথবা "কত্রাসু" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। "মাসির-উল-উমরার" গ্রন্থকার বলেন "কত্রাপুর।" ডাঃ ওয়াইজ ইহাকে "কাটারব" বলিয়াছেন। কত্রাবু সরকার বাজুহায়ের অন্তর্গত বলিয়া জঙ্গল বাড়ীর সনদে লিখিত হইয়াছে।

Sebastian Manrique সপ্তদশ শতাব্দের প্রারম্ভ সময়ে Catrabo -এর উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ ওয়াইজ বলেন "ইহা একটী তপ্পা এবং এই

স্থান লাক্ষ্যাতীরে খিজিরপুরের বিপরীত কূলে অবস্থিত। ইহা ঈশাখাঁর বংশধরগণের সম্পত্তির অন্তর্গত। বিভারিজ সাহেব বলেন, "কত্রাব বলিয়া কোনও তপ্পা বা গ্রাম নাই"। আইন-ই-আকবরির "কাটারমলবাজু" এবং কাটারব অভিন্ন। উহার রাজস্ব ধার্য্য ছিল ৭৫০০০৲। Rennel এবং Tiefenthaler লিখিয়াছেন "কাটারবল"। "গোয়াব" বলিয়া একটী স্থান ঢাকার উত্তরে অবস্থিত দেখা যায়। এই স্থান বানার নদীর দক্ষিণ তীরে এবং একডালার কিছু উত্তরে সংস্থিত। বিভারিজ বলেন, সম্ভবতঃ উহাই "কত্রাভূ"। স্থানান্তরে আবার তিনি লিখিয়াছেন, "টেইলারের উল্লিখিত "কাঠীবাড়ী"ই সম্ভবতঃ "কত্রাভূ" হইবে"।

বিভারিজ সাহেবের অনুমান আমাদের নিকটে সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। আকবর নামায় সাহাবাজের অভিযানের যে একটী সুন্দর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তৎপাঠে এই স্থানকে "পনার" বা লাক্ষ্যাতীরে নির্দ্দেশিত করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

J. A. S. B. 1874 and 1904.

Akbar-Namah, Translated by H. Beveridge.

কলাগাছিয়া।

স্বনামপ্রসিদ্ধ নদীর তীরে। এই স্থানে একটী দুর্গের অবস্থান অবগত হওয়া যায়। ইহা সোনারগাঁও হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং শ্রীপুরের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। বুড়ীগঙ্গা নদী এই স্থান এবং দুর্গটী উদরসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটী ভজনালয় ছিল।

ঈশাখাঁ মসনদ আলি চাঁদরায়ের দুহিতা সোণামণিকে লাভ করিবার

আশায় চাঁদ ও কেদার রায়ের নিকট দূত প্রেরণ করিলে, রায়রাজগণ ঈশাখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রথমেই তদধিকৃত কলাগাছিয়ার দুর্গ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন।

Journal of the Asiatic Society of Bengal 1874., Pt. I.

কাজি-কসবা।

এই স্থান বিক্রমপুরের অন্তর্গত এবং রামপালের অনতিদূরে অবস্থিত। কথিত আছে, যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে বোগদাদনিবাসী মহম্মদ মজফিউদ্দিন নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মোসলমান যুবক পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করেন। অবশেষে সেলিমের অনুরোধে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান কাজির পদলাভ করিয়া কাজি মহম্মদ নামে পরিচিত হন। এই কাজিসাহেব কসবা নামক গ্রামে স্বীয় বাসস্থান মনোনীত করিয়া দিল্লীশ্বরসকাশে আবেদন করাতে সেলিমের অনুগ্রহে তিনশত বায়ান্ন দ্রোণ ভূমির সহিত উক্ত গ্রাম নিষ্কর জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি এই স্থান কাজি-কস্‌বা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত আত্মরক্ষার জন্য তিনি একদল মোসলমান সিপাহীও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং তাহাদিগের বাসস্থানের জন্য একটী গ্রাম নিষ্কর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি ঐ গ্রাম সিপাহীপাড়া নামে কথিত হইয়া থাকে। সিপাহীপাড়ায় এখনও উহাদিগের বংশধর বর্ত্তমান থাকিয়া কাজিগণের পূর্ব্ব গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কাজি ইমামুদ্দীনের নিকটে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের পাঞ্জাযুক্ত এক সনদ ছিল। তাহাতে আকবরপ্রদত্ত জায়গীরের স্বত্ব কাজিদিগকে দৃঢ় করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তদতিরিক্ত আরও নূতন জায়গীরদানের বিষয় উল্লিখিত আছে। ইহার পরেও কাজিদিগের বংশ বৃদ্ধি হইলে, পূর্ব্ব জায়গীরের আয়দ্বারা তাঁহাদের সম্যক্ ভরণপোষণ কষ্টকর বলিয়া সম্রাট সাহ আলম্

পুনরায় খালকা গ্রাম জায়গীর দেন। তাহাতেও পূর্ব্বদত্ত জায়গীরের উল্লেখ আছে।

Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889.

ভারতী, ১৩১২, ভাদ্রসংখ্যা।

কেদারপুর।

এই স্থান ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শ্রীপুরের সন্নিকটে অবস্থিত। কেদারপুর নামে একটী পরগণার পরিচয়ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সম্ভবতঃ টেইলার সাহেব এই স্থানকে কেদারবাড়ীর সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন। এই স্থানে দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক চাঁদ ও কেদার রায়ের রাজপ্রাসাদ বিদ্যমান ছিল বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। কেদারবাড়ীর কোনও কোনও স্থান খনন করিবার সময়ে মৃত্তিকাভ্যন্তরে ইষ্টকস্তূপ পরিলক্ষিত হইয়াছে।

সম্রাট ঔরঙ্গজেব তদীয় ধাত্রীতনয়, ঢাকার সুবাদার, ফেদাই খাঁ আজিম খাঁর আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ঢাকা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেদারপুরে অবস্থান করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গের শাসনকর্ত্তার পক্ষে যে ইহা নিতান্তই অসম্মানজনক তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

Taylor's Topography of Dacca.

কোহিস্তান-ই-ঢাকা ও বিলায়তে ঢাকা।

"মখ্জানে-আফগান-ই" গ্রন্থে লিখিত আছে, কতলুখাঁর মৃত্যুর পরে তদীয় ভ্রাতা ঈশা খাঁ লোহিনী আফগানগণের অধিনায়ক হন। নসিব খাঁ, লোদী খাঁ, ও জামাল খাঁ নামে কতলুখাঁর তিন পুত্র ছিল। ঈশাখাঁর খাজে সুলেমান, ওসমান, অলি ও ইব্রাহিম এই কয় পুত্রের

নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশাখাঁর মৃত্যুর পরে প্রথমে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান, তৎপরে ওসমান, আফগানগণের নেতা হন। মানসিংহের সহিত যুদ্ধকালে তদীয় পুত্র হিম্মৎসিংহ সুলেমানহস্তে নিহত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মপুত্রতীরে ইহাদিগের জায়গীর ছিল। মানসিংহের নিকট হইতে ওসমান, উড়িষ্যা, সপ্তগ্রাম ও পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় ৫।৬ লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "কোহিস্তান-ই ঢাকা" অর্থাৎ ঢাকার পার্ব্বত্য প্রদেশ (ভাওয়াল অথবা ধামরাই অঞ্চল ?) এবং বিলায়তে ঢাকা" অর্থাৎ ঢাকা জেলা মর সহর, ঈশাখাঁ ও ওসমানের বাসস্থান ছিল। নেক-উজিয়ালের যুদ্ধে পাঠানদলপতি ওসমান নিহত হইলে ঢাকার প্রথম মোগল সুবাদার ইসলাম খাঁ, অলিখাঁকে প্রথমতঃ নেক-উজিয়াল এবং ঢাকানগরী এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত তদীয় বাসস্থানে এবং পরে ঢাকার দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন"।

কেহ কেহ অনুমান করেন, ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীর পূর্ব্বদিকস্থ খিলগাঁও গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে ঈশাখাঁ লোহিনী অবস্থান করিতেন এবং উহাই "বিলায়তে ঢাকা" বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে।

কোণ্ডরসুন্দর।

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়, সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত "কাটারে সুন্দর" নামক স্থানে যে একটী জলাশয় ছিল, তাহাতে মলিন বস্ত্র ধৌত করিলে উহা অপূর্ব্ব শুভ্রত্ব প্রাপ্ত হইত।

এই দীর্ঘিকা এক্ষণে "খাসনগরের দীঘি" বলিয়া সুপরিচিত। এই বৃহদায়তন দীর্ঘিকার পরিমাণফল প্রায় ১০ একর।

কোণ্ডরসুন্দরের এই স্বচ্ছসলিলা-দীর্ঘিকা এবং মহারাজ দ্বিতীয় বল্লালের রথের ভগ্নাবশেষ আজও আর্য্য রাজধানীর অতীত স্মৃতি জাগরূক

রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। এই স্থানের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংসাবশেষ-দৃষ্টে মনে হয়, এখানেই শেষ হিন্দু রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

আকবর-নামায় এই স্থান "কুমার-সমুন্দর" (বা "কোয়র-সিন্দুর") বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আবুলফজল এই স্থান তোটকের বিপরীত দিকে ব্রহ্মপুত্রের অপর তটে সংস্থিত বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মিঃ বিভারিজ কোঙর-সুন্দর ও এগারসিন্ধু অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। তিনি বলেন, উহা বর্ত্তমানে নিকলি থানার অন্তর্গত। কোঙর-সুন্দর এবং কুমার সমুন্দর দুইটী স্বতন্ত্র স্থান বলিয়া মনে হয়। কোঙর-সুন্দর সহর সোনারগাঁয়ের অনতিদূরে অবস্থিত।

দ্বিতীয় বল্লালের মৃত্যুর পরে, রাজধানী কোঙর-সুন্দর মুসলমানগণের হস্তগত হয় এবং তাহার সংলগ্ন স্থানকে মোগড়াপাড় নাম প্রদানপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে মোসলমানগণের রাজধানী নির্ম্মিত হইয়াছিল।

Gladwin's Translation of Ain-i-Akbari.

J. A. S. B., 1874 & 1904 : Elliot Vol. VI., Page 74.

খিজিরপুর।

নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরপূর্ব্ব দিকে, ঢাকা হইতে প্রায় ৯ মাইল অন্তরে শাক্ষ্যানদীর তীরে অবস্থিত। সোনারগাঁও হইতে এই স্থান প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে সংস্থিত। সুপ্রসিদ্ধ বারভূঞাগণের অন্যতম ঈশাখাঁ মসনদ আলি এই স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; পরে মীরজুমলাকর্ত্তৃক আর একটী দুর্গ এই স্থানে নির্ম্মিত হয়। এই শেষোক্ত দুর্গই খিজিরপুরের কেল্লা নামে প্রসিদ্ধ।

খিজিরপুর নামে যে একটী পরগণা কালেক্টরীর তৌজীতে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার উদ্ভব এই খিজিরপুর হইতেই হইয়াছে। বর্ত্তমান

সময়ে খিজিরপুরান্তর্গত কতক স্থান গবর্ণমেণ্টের খাসমহালের অন্তর্গত। তৌজীর নম্বর ৯৮৭১ ; উহা দুই ভাগে জরিপ হইয়াছে। খিজিরপুরের উত্তর ও পশ্চিম দিকে "ঈশাপুর" নামে একটী তপ্পার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশাখার সহিত এই স্থানের কোনও সম্বন্ধ আছে কি ?

খিজিরপুরের উত্তরে "পাঠানতলী" নামে একটী গ্রাম আছে ; উহা পরগণা নসরৎসাহীর অন্তর্গত।

খিজিরপুর হইতে পশ্চিম দিকে বুড়িগঙ্গাতীরবর্ত্তী ফতুল্লা নামক স্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত একটী প্রাচীন রাস্তার চিহ্ন আজও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই রাস্তা ঢাকার রাস্তার সহিত ফতুল্লার সন্নিকটে মিলিত হইয়াছে।

এই স্থানের প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যানমধ্যে শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত একটী মকবেরা বিদ্যমান আছে ; উহা সম্রাট জাহাঙ্গীরের জনৈক তনয়ার সমাধি বলিয়া এতদঞ্চলে পরিচিত।

খিজিরপুরের দুর্গমধ্যে ইষ্টকনির্ম্মিত সুদৃশ্য একটী মসজিদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই মসজিদের গঠনপ্রণালী ষোড়শ শতাব্দে নির্ম্মিত গোয়ালদী মসজিদের অনুরূপ। মসজিদের দ্বারদেশের শিলালিপিখানা অপহৃত হওয়ায় এতৎসম্বন্ধীয় তথ্য তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইহা জনৈক পীরের সমাধিস্থান বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। লাক্ষ্যার তীরে যে একটী প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা "গোসলখানা" বা "বৈঠকখানার" ভগ্নাবশেষ বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু ওয়াইজ সাহেবের মতে উহা খিজিরপুর দুর্গের উত্তর দিকের অংশবিশেষ মাত্র।

চাঁদরায়ের রূপবতী বিধবা কন্যা সোনামণিকে ঈশাখাঁ কৌশলে হস্তগত করিয়া এই দুর্গে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। চাঁদরায়ের সহিত ই উপলক্ষে ঈশাখাঁর যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে খিজিরপুরের যথেষ্ট

ক্ষতি হইয়াছিল। পরে উহা সংস্কৃত হইয়াছিল। দুর্গাভ্যন্তরে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষস্বরূপ রাশি রাশি ইষ্টকস্তূপ ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

মীরজুম্‌লার আসাম অভিযানসময়ে এহিতিসিমখাঁ এইস্থানে অবস্থান করিয়া তদীয় অনুপস্থিতিসময়ে জাহাঙ্গীরনগরের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

জরাজীর্ণ দেহ লইয়া আসাম অভিযান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে বীরাগ্রগণ্য মীরজুম্‌লা হিঃ১০৭৩ সনের ২রা রমজান, বুধবার, খিজিরপুরের ২ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে নৌকামধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পরে তদীয় শবদেহ খিজিরপুরে আনয়ন করা হয়। এই স্থানেই তদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। তিনি পারস্যের অন্তর্গত সিরাজ নগরে সমাহিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তদীয় শেষ অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিল। মীরজুম্‌লার পরিবারবর্গ, সেনাপতি দিলিরখাঁ ও মীর আবদুল্লার তত্ত্বাবধানে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত খিজিরপুরেই অবস্থান করিয়াছিল।

মীরজুম্‌লার মৃত্যু হইলে বিহারের শাসনকর্ত্তা দায়ুদখাঁর প্রতি ঢাকার শাসনভার অস্থায়ীভাবে অর্পিত হইয়াছিল; তিনি ১৬৬৩ খৃঃ অব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকার সন্নিকটে আগমন করেন; তিনি খিজিরপুরে অবস্থান করিয়াই শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

ইসলামখাঁ মেসেদীর সময়ে আরাকান-রাজার ভ্রাতা ধরম সা মোগলের শরণাপন্ন হইলে মগেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক খিজিরপুর পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিল। এই স্থানে তাহারা একদিন মাত্র অপেক্ষা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে একখানা চিঠি লিখিয়া একটী বৃক্ষশাখাতে বাঁধিয়া রাখিয়া যায়। তাহাতে পরবর্ত্তী বৎসরে ঢাকা লুণ্ঠন করিবে বলিয়া উল্লিখিত ছিল।

মোগল শাসনসময়ে ইহা একটী প্রধান নাবিস্থান ছিল। এই স্থান হইতেই মোগল সুবাদারগণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন।

Stewart's History of Bengal ; J. A. S. B., 1874. ; Elliot, Vol. VI ; Fathiyyah-i-Ibriyyah.

গণকপাড়া, গৌরীপাড়া।

ধামরাইর সন্নিকটে অবস্থিত। পাঠানগণ বঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে বিতাড়িত হইলে ওসমানের অধীনে এই স্থানে সমবেত হইয়া মোগলের বিরুদ্ধে অনেক খণ্ডযুদ্ধ করিয়াছিল। পাঠানদিগের নির্ম্মিত দুর্গাদির ভগ্নস্তূপ এক্ষণেও বিদ্যমান থাকিয়া উহাদিগের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ সজীব রাখিয়াছে।

ঢাকার প্রথম সুবাদার ইসলামখাঁ এই স্থানেই বঙ্গের রাজধানী সংস্থাপন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন ; কিন্তু নিম্নভূমি বলিয়া তদীয় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করেন নাই।

Tarikh-i-Dacca.

Khan Bahadur Syed Aulad Hussen's Antiquities of Dacca.

গোয়ালপাড়া।

পদ্মা ও যমুনার সঙ্গমস্থানের সন্নিকটে এবং জাফরগঞ্জের অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে ১৩৯২ খৃঃ অব্দে সেকেন্দরশাহের সহিত গিয়াস-উদ্দিনের যুদ্ধ হইয়াছিল। গিয়াস-উদ্দিন সেকেন্দরের প্রথম পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। গিয়াস-উদ্দিন অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ ও কর্ম্মকুশল ছিলেন ; কিন্তু তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ তদ্রূপ ছিল না ; এজন্য বিমাতাকে

মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়। একদা গিয়াস বিমাতার ঘোরতর ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইয়া প্রাণভয়ে সোনারগাঁও অভিমুখে পলায়ন করিয়া এখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন। গিয়াস-উদ্দিন রাজ্য অধিকার করিবার কামনায় পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। পিতার-প্রাণনাশ না হয়, গিয়াস-উদ্দিন সেজন্য সেনাগণকে বিশেষ আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই। যুদ্ধস্থলে একটী বর্শা সেকেন্দরের হৃদয়ে বিদ্ধ হয়। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

অশীতি বর্ষ পূর্ব্বেও সেকন্দেরের সমাধি এই স্থানে দৃষ্ট হইত; কিন্তু এক্ষণে উহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

জাফরগঞ্জের পশ্চিমে গোয়ারীয়া গ্রামে সেকেন্দরের দরগা এবং মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতিষ্ঠিত "লঙ্গরখানা"র চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

Vide Riajus-Salatin ; J. A. S. B. 1874 ;

Taylor's Topography of Dacca.

জাঙ্গালীয়া।

মেঘনাদতটে সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত একটী জনপদ। মোগল-শাসনসময়ে জাঙ্গালীয়া একটী নাবি স্থান ছিল।

জিঞ্জিরা।

জিঞ্জিরা একটী ক্ষুদ্র জনপদ। বুড়িগঙ্গা নদী ঢাকা ও জিঞ্জিরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। জিঞ্জিরার প্রাসাদ সা-সুজানির্ম্মিত বড় কাটরার বিপরীত-দিকে বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ তটে অবস্থিত। জিঞ্জিরা ও ঢাকার যাতায়াতের জন্য বড় কাটরার নিকটে বুড়ি গঙ্গার বক্ষোপরি এক ইষ্টকনির্ম্মিত সেতু

নবাবী আমলে বিদ্যমান ছিল। উহার আংশিক চিহ্ন অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। জনসাধারণ ঢাকা নগরী হইতে যেন নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত জিঞ্জিরা ও অন্যান্য স্থানে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই এই সেতু নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে জিঞ্জিরায় দর্শনযোগ্য তেমন কিছুই নাই। নবাবনির্ম্মিত প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ ও ভগ্নচূড় অট্টালিকার অংশমাত্র নয়নপথে পতিত হইয়া অতীতের বিষাদ-স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দেয়। টেইলার সাহেব তদীয় "টপোগ্রাফি অব ঢাকা" গ্রন্থে নবাব ইব্রাহিমখাঁকে জিঞ্জিরার প্রাসাদনির্ম্মাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১)।

জিঞ্জিরার রাজপ্রাসাদের সহিত অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাসের বিষাদস্মৃতি ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। একসময়ে এই প্রাসাদের প্রতি কক্ষ হইতে সরফরাজ-সওকতজঙ্গ-হোসেন-কুলি-আলিবর্দ্দি-সিরাজের পুরমহিলা ও বংশধরগণের ব্যথিতহৃদয়ের তপ্তশ্বাস এবং ক্রন্দনের অস্ফুট রোল বহির্গত হইত। এই মূক প্রাসাদের প্রাচীর ও প্রতি ইষ্টকখণ্ড উহাদিগের গভীর মর্ম্মবেদনার চিরসহচররূপে বিরাজমান ছিল। পিতার জীবদ্দশায় যে প্রতিদ্বন্দ্বী ঘেসিটী বেগম ও আমিনা বেগমের গর্ব্বোন্নত গ্রীবার ঈষৎ আন্দোলনে শত শত অনুচরবর্গ কৃতার্থম্মন্য হইয়া অবিলম্বে আদেশ প্রতিপালনের জন্য ব্যস্ত হইত, অদৃষ্টনেমির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে উভয়ের ভাগ্যসূত্র একত্র গ্রথিত হইয়া এই প্রাসাদের একপ্রান্তে উভয়েই বিষাদক্লিষ্ট বদনে কালযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মতিঝিলের সুসজ্জিত সুরম্য অট্টালিকায়, নানাবিধ

(১) "On the opposite side of the river, there is an old building surrounded by moat, which is said to have been built by the Nawab Ibrahim Khan". Taylor's Topography of Dacca, Page 97.

বিলাসবাসনামোদের মধ্যে অবস্থান যাহার পক্ষে শোভনীয়, জিঞ্জিরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠমধ্যে বন্দী অবস্থায় কালযাপন করা তাঁহার পক্ষে মৃত্যুর অধিক হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যেই হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার নাম আজ-পর্য্যন্তও সর্ব্বসাধারণের নিকটে নানাবিধ প্রবাদবাক্যের সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে, যাহার তর্জ্জনীতাড়নায় একসময়ে ইংরেজ-বণিককুলকেও সন্ত্রস্ত হইতে হইয়াছিল, তাঁহার জননী, প্রিয়তমা মহিষী ও শিশুতনয়া যে সময়ে বুড়িগঙ্গাতীরে তরণী হইতে অবতরণ করিয়া মীরণের বন্দীরূপে জিঞ্জিরার প্রাসাদ অভিমুখে গমন করিয়াছিল, সেই সকরুণ দৃশ্য সন্দর্শন করিবার জন্য বহুলোক নদীতীরে সমবেত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

প্রতিপালক প্রভুপুত্রের শোনিতপাতদ্বারা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া, কতিপয় দিবসমধ্যে, আলিবর্দ্দি, সরফরাজের বেগম ও তদীয় পরিবারস্থ অপরাপর পুরাঙ্গনাগণের সহিত সরফরাজনন্দন হাফেজআলিখাঁ ও আমানি খাকে এই প্রাসাদেই বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। সরফরাজের বংশ-ধরগণকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে আলিবর্দ্দির পাপলব্ধ সিংহাসন সুদৃঢ় এবং কণ্টকপরিশূন্য হয়, এই বিবেচনাতেই দূরদর্শী নবাব উহাদিগকে রাজধানীর নিকটে রাখা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু উহারা যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে পারেন, তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য ঢাকার তদানীন্তন নায়েব-নাজিমদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আবার নবাব সিরাজদ্দৌলা বঙ্গের মসনদে আরোহণ করিয়া সওকৎজঙ্গ এবং হোসেন কুলিখাঁর পরিবারবর্গকেও এইস্থানেই প্রেরণ করেন। পলাসীর রণাভিনয়ের পরে, বিশ্বাসঘাতক মিরজাফরের হস্তে বন্দী হইয়া, সিরাজের মাতা ও শিশুকন্যা এবং বেগম প্রভৃতি এই স্থানেই আশ্রয় প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। এইরূপে বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব-পরিবারবর্গের বিষাদস্মৃতি বহুকাল পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষা করিয়া আজ জিঞ্জিরা একটী ক্ষুদ্র নগণ্য পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। শোকভারাক্রান্ত জিঞ্জিরা বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাবগণের শ্মশানভূমি, ঐতিহাসিকের চক্ষে পুণ্যক্ষেত্র ও পীঠ-স্থানের অন্যতম একটী।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে পলাসীর যুদ্ধের অবসান হইলে, ক্লাইব সেনাপতি মীরজাফরকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। আলিবর্দ্দির সময় হইতে মীরজাফরের সিংহাসনপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ ষোড়শ বর্ষকাল মধ্যে সরফরাজের পুত্রদ্বয়মধ্যে কোন অশান্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল না। অতি দীনভাবেই তাঁহারা এতকাল জিঞ্জিরার প্রাসাদমধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু তথাপি মীরজাফর সুস্থিরচিত্তে কালযাপন করিতে পারিলেন না। মসনদে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি সরফরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র হাফেজআলিকে ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে আনয়ন করিলেন। হাফেজ মুরশিদাবাদ আগমন করিয়া একরূপ বন্দীভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ক্লাইবের নিকটে যে দীনতা ও স্বীয় হীনাবস্থা জ্ঞাপন করিয়া অতি বিনীতভাবে এক সুদীর্ঘ লিপি প্রেরণ করেন, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া মীরজাফর অনেক পরিমাণে সুস্থ হইলেন। কিন্তু সরফরাজের দ্বিতীয় তনয় আমানিখাঁর চরিত্র তদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ উপাদানে গঠিত ছিল। তিনি স্বভাবতঃই কিছু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তেজস্বী ছিলেন। অথবা দীর্ঘকালব্যাপী নৈরাশ্যই তাহাকে শত বিপৎপাতেও নির্ভীক এবং সহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল। যখন দেখিলেন যে, এই সুদীর্ঘ ষোড়শ বৎসর কালমধ্যেও তিনি অদৃষ্টলক্ষ্মীর প্রসাদকণিক-লাভে সমর্থ হইলেন না, বরং উত্তরোত্তর নৈরাশ্যই বৃদ্ধি পাইতেছে,

তখন তিনি মনে করিলেন, একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা করা যাউক, দেখি কি হয়।

এদিকে মীরজাফরের দারুণ অর্থশোষে ঢাকার রাজকোষও একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল; এমন কি, সাম্রাজ্যরক্ষার্থ সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহই কষ্টকর বিবেচনায় কেবলমাত্র দ্বিশত সংখ্যক সৈন্য ঢাকার লালবাগ দুর্গে রক্ষিত হইল। যাহারা রহিল, তাহাদিগকেও অতি সামান্য মাত্র বেতন প্রদান করা হইত; সুতরাং সৈন্যগণের আর উৎসাহ ও উদ্যম রহিল না। সুশিক্ষিত এবং কার্য্যদক্ষ প্রবীণ লোকও ঢাকার সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে রহিল না। এই সমুদয় সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করা আমানিখাঁর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং কতিপয় বিশ্বস্ত বন্ধুর প্ররোচনায়, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে, তিনি নবাব জেসারৎখাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া লালবাগের দুর্গ অধিকার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। জেসারৎখাঁকে নিহত করিতে পারিলেই অন্ততঃ ঢাকার নবাবীপদ তাহারই প্রাপ্য হইবে, এই অমূলক দুরাশা আমানিখা মনোমধ্যে পোষণ করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে, তিনি ২২শে অক্টোবর তারিখে অতি সঙ্গোপনে জিঞ্জিরার বন্দিশালা হইতে বহির্গত হইয়া লালবাগের দুর্গ আক্রমণ করিবেন ইহাই স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু আমানিখাঁর প্রতি বিধাতা নিতান্তই বিরূপ। নির্দ্দিষ্ট দিবসের দুই দিন পূর্ব্বে আমানিখাঁর বিশ্বাসঘাতক জনৈক অনুচর জেসারাৎখাঁর নিকটে সমুদয় বিবরণ প্রকাশ করিয়া ফেলে। জেসারৎখাঁ তৎক্ষণাৎ কতিপয় সৈন্য প্রেরণপূর্ব্বক আমানিখাঁ এবং তদীয় কতিপয় অনুচরবর্গকে ধৃত করিয়া, তাঁহার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দিল। এই সময়ে ঢাকার ইংরেজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ ৬০ জন সৈনিক পুরুষ দ্বারা নবাব জেসারৎখাঁর সাহায্য করিয়াছিলেন। এই বিদ্রোহব্যাপারে মীরজাফরের মনের অশান্তি আরও শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।

ইংরেজকর্ত্তৃক মীরজাফরের রাজ্যচ্যুতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ তাঁহার নিষ্ঠুর চরিত্র এবং অসংখ্য নরহত্যাপরাধের বিষয় উল্লেখ করিলেও সমসাময়িক জনৈক গ্রন্থকার এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন (১)। বস্তুতঃ তিনি যে নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মীরণের যথেচ্ছাচারিতা ও নিষ্ঠুর ব্যবহারের উপযুক্ত শাসন না করায়, জনসাধারণ মীরজাফরকেও মীরণের কার্য্যকলাপে সহকারীই ভাবিত। ১৭৬০ খৃঃ অব্দের জুন মাসের এক গভীর নিশীথে ঢাকায় যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইয়াছিল, তাহাতেও অনেকে মীরজাফরকেই দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন। কিন্তু মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন মীরণের আদেশক্রমেই উহা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আলিবর্দ্দিমহিষী ও তদীয় কন্যাদ্বয় (ঘেসেটী বেগম ও আমিনাবেগম); সিরাজমহিষী লুৎফিন্নেছা-বেগম ও তাহার শিশুকন্যাগণ, লুৎফেন্নেছা বেগম ও তদীয় শিশুকন্যা, এবং নওয়াজিসের পালকপুত্র (বাদশা কুলীখাঁর পুত্র), মোরাদদ্দৌলা, মীরজাফরের আদেশক্রমে জিঞ্জিরায় বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন (২)। উহাদিগকে হত্যা করিতে পারিলেই সিংহাসন কণ্টক-পরিশূন্য হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া কূটনীতিবিশারদ নিষ্ঠুর মীরণ ঢাকার নায়েব জেসারৎখাঁকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন (৩)।

---

(১) Transactions in India from 1756-83. London 1784 (Debreit) P., 38-39.

(২) Translation of Seir Mutaqherin, Vol. II & Long's Unpublished Records.

(৩) Seir Mutaqherin, Vol II. P., 368.

জেসারৎখাঁ অতি ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। মীরণের এই আদেশ প্রতিপালন করিতে কিছুতেই তিনি সম্মত হইলেন না। অনন্তর সংবাদ-বাহক স্বয়ংই এই কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কারণ, মীরণই তাহাকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া প্রেরণ করেন যে, যদি জেসারৎখাঁ আদেশ প্রতিপালন করিতে ইতস্ততঃ করে, তবে যেন সে নিজেই এই কার্য্য সম্পন্ন করে। সংবাদবাহক এক নিশীথ রাত্রিতে মুরসিদাবাদে যাইবার ছল করিয়া নওয়াজিসমহিষী ঘেসেটী বেগম, সিরাজ-জননী আমিনা বেগম, নওয়াজিসের ভাবী উত্তরাধিকারী মৃত একরাম-উদ্দোলার শিশু পুত্র মুরাদদ্দৌলা, সিরাজবেগম সুফিন্নেছা এবং সিরাজের শিশুকন্যা (সুফিন্নেছার গর্ভজাত), এই প্রাণীপঞ্চককে জিঞ্জিরার প্রাসাদ হইতে নৌকাযোগে খরস্রোতা ধলেশ্বরীবক্ষে আনয়ন-পূর্ব্বক ১০ জন অনুচরবর্গসহ জলমগ্ন করিয়া দেয় (১)। এইরূপে আলিবর্দ্দি, নওয়াজিস্ ও সিরাজের বংশ ধ্বংস হইল।

হোসেনকুলি ও সরফরাজের বংশধরগণ কোম্পানীর হস্তে দেওয়ানী-ভার অর্পিত হওয়ার পরেও বন্দীভাবে জিঞ্জিরার প্রাসাদেই অবস্থান করিতেছিলেন। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে লর্ড ক্লাইব তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান করেন এবং বার্ষিক মঃ ৩৪৭৫৫৲ টাকা পেন্সনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। টেইলার সাহেব যে সময়ে ঢাকার ইতিহাস প্রণয়ন করেন, তখনও উঁহাদের বংশধরগণ ইংরেজপ্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন।

---

(১) কথিত আছে, এই সময়ে আমিনা ও ঘেসেটী বেগম "বজ্রাঘাতে মীরণের পাপের শাস্তি হইবে" বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন।

নিম্নে জিঞ্জিরার প্রাসাদস্থিত বন্দীবর্গের পরিচয় প্রদত্ত হইল। কোম্পানীর আমলে তাঁহারা ঢাকার নিজামত হইতে এই হারে মোসাহেরা প্রাপ্ত হইতেন :—

	বন্দীগণের নাম।	পরিচয়।	কোন সনে বন্দী হয়।	কাহাকর্ত্তৃক বন্দী।	মোসাহেরা।
১।	হাফেজ উল্লা—	সরফরাজ খাঁর তনয়—	১৭৪৪	আলিবর্দ্দি খাঁ—	১০০৲
২।	—	হাফেজউল্লার জননী—	,,	,,	২০৲
৩।	—	হাফেজউল্লার ভগ্নী—	,,	,,	৫০৲
৪।	মুদরেনা বেগম—	হাফেজউল্লার তনয়া—	,,	,,	১৫
৫।	ভালু বেগম—	হাফেজউল্লার মহিষী—	,,	,,	৫০৲
৬।	ফুকুরুল্লা খাঁ—	সরফরাজের অন্যতম তনয়—	,,	,,	৫০০৲
৭।	মীর্জ্জা মোগল—	ঐ	,,	,,	৮০৲
৮।	—	মীর্জ্জা মোগলের জননী—	,,	,,	২০৲
৯।	মীর জুই—	সরফরাজের অন্যতম পুত্র—	,,	,,	৮০৲
১০।	—	ঐ মাতা	,,	,,	২০৲
১১।	মীর্জ্জা বুরহেন—	সরফরাজের অন্যতম পুত্র—	,,	,,	৮০৲
১২।	—	ঐ মাতা	,,	,,	২০৲

	বন্দীগণের নাম।	পরিচয়।	কোন সনে বন্দী হয়।	কাহা কর্ত্তৃক বন্দী।	মোসাহেরা।
১৩।	—	সরফরাজের ভগ্নী—	১৭৪৪	আলিবর্দ্দি খাঁ—	৩০৲
১৪। ১৫।	—	আগামীর্জ্জার জননী ও সরফরাজের জনৈক পুত্র	,,	,,	২০৲
১৬।	—	আগা মীর্জ্জার স্ত্রী—	,,	,,	৮০৲
১৭।	মীর আসাদ —	সরফরাজের জামাতা—	,,	,,	৮০৲
১৮।	নাজীবুল ন্নেছা—	মীর আসাদের দুহিতা -	,,	,,	২৫৲
১৯।	কার সোমন্নেছা—	ঐ	,,	,,	২৫৲
২০।	মত্তি বেগম—	সরফরাজ নন্দিনী—	,,	,,	৫০৲
২১।	আজিজ বেগম—	ঐ	,,	,,	৫০৲
২২।	মৌত্তিম বেগম—	ঐ	,,	,,	৩০৲
২৩।	বিবি ঔকিয়ৎ —	সরফরাজের স্ত্রী—	,,	,,	২০৲
২৪।	—	সরফরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র শুজনফা হোসেন খাঁর মাতা	,,	,,	২০৲
২৫।	লাড়লি বেগম—	শুজনফা হোসেন খাঁর স্ত্রী—	,,	,,	১৮০৲

৫০

	বন্দীগণের নাম।	পরিচয়।	কোন সনে বন্দী হয়।	কাহা কর্ত্তৃক বন্দী।	মোসাহেরা।
২৬।	জেসারৎজঙ্গ—	সওকৎজঙ্গের পুত্র—	১৭৫৫	সিরাজদ্দৌলা	১০৲
২৭।	সৈফউদ্দিন মহম্মদ খাঁ—	,,	,,	,,	১০০৲
২৮।	মীর্জ্জা জুব্বা—	,,	,,	,,	৮০৲
২৯।	মীর্জ্জা মেগলু—	,,	,,	,,	৮০৲
৩০।	মীর্জ্জা ভোলা—	,,	,,	,,	৮০৲
৩১।	বুন্নি বেগম—	সওকৎজঙ্গ দুহিতা	,,	,,	৬০৲
৩২।	বুন্নি জি—	হোসেন কুলীখাঁর স্ত্রী	১৭৫৬	,,	১০০৲
৩৩।	উজ্জরন্নেছা—	ঐ	,,	,	৩৬০৲
৩৪।	সাহেবজী—	সওকৎজঙ্গ মহিষী	,,	,,	৬০০৲
৩৫।	সীতারাম উকিল,	সরাইএর জনৈক খোজার প্রতিভূ—	,,	,,	১৫৲
৩৬।	উম্মতুল স্নেছা—	সিরাজদ্দৌলার কন্যা—	১৭৫৭	মীরজাফর	৫০০৲
৩৭।	লুৎফুল স্নেছা—	ঐ *	,,	,,	১০০৲

* লুৎফ লন্নেছা ও লুৎফেন্নেছা স্বতন্ত্র ছিলেন।

টেরা।

ভাওয়ালের অন্তর্গত, কালীগঞ্জের নিকটে লাক্ষ্যানদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এইস্থানে গাজীবংশীয়গণের সুরম্য প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। একখানা প্রাচীন দলিলদৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে, হীরাগাজীর ভ্রাতা দৌলতগাজী হিঃ ১০৫০ সনে দিল্লী হইতে ভাওয়ালের এক নূতন বন্দোবস্তী সনদ প্রাপ্ত হন।

গাজীবংশীয়গণ ভাওয়াল পরগণা প্রথমতঃ ঈশাখাঁর অধীনে থাকিয়া ভোগ করেন। পরে উহারা সবিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে ঈশাখাঁর আনুগত্য পরিত্যাগকরতঃ দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বন্দোবস্ত লইয়া ভোগ করিতে থাকেন। এই সময়ে গাজীবংশীয় পল্লুনসা গাজী ভাওয়ালের সঙ্গে চাঁদপ্রতাপ, কাশীমপুর, তালিপাবাদ এবং সুলতানপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণাগুলিও বন্দোবস্ত লইয়া এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের আধিপত্য করিতে থাকেন।

অধুনা গাজীবংশীয়গণ সামান্য গৃহস্থরূপে টেরা গ্রামে জীবন যাপন করিতেছেন।

ঠাকুরতলা।

ভাওয়ালের অন্তর্গত সাতখামার গ্রামের উত্তরে ঠাকুরতলা গ্রামে একটী প্রাচীন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বাড়ীর সম্মুখে প্রকাণ্ড দীঘিকাযুগল আজও বিদ্যমান থাকিয়া এই স্থানের অতীত গৌরব-গাথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দীর্ঘিকাদ্বয়ের পাড় ইষ্টকনির্ম্মিত। সন্নিকটে একটী অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ প্রায় ৮ পাখী জমি ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছে। স্থানীয় জনসাধারণ দেবাধিষ্ঠিত বৃক্ষ বলিয়া এইস্থানে পূজা দিয়া থাকে।

ডবাক।

প্রয়াগের অশোকস্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিষেণবিরচিত প্রশস্তিতে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়কাহিনী বর্ণিত আছে। এই প্রশস্তিতে তাঁহাকে সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্ত্তৃপুরাদি প্রত্যন্ত প্রদেশের নৃপতিগণকর্ত্তৃক সর্ব্বকরদান, আজ্ঞাকরণ, প্রণাম এবং আগমনের দ্বারা পরিতুষ্ট প্রচণ্ড শাসনকারী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ আধুনিক রাজসাহী বিভাগকে ডবাক রাজ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শত বৎসর পূর্ব্বেও পাবনা, বগুড়া এবং ঢাকা জেলার মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক সীমার অস্তিত্ব ছিল না। প্রায় শতাধিক বৎসর অতীত হইল ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোবেগের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। ফলে যমুনার উদ্ভব হইয়া ময়মনসিংহের পশ্চিমপ্রান্ত বিধৌতকরতঃ অভিনব প্রবাহ ঢাকা ও পাবনা জেলার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। আমাদের বিবেচনায় মিঃ ভিন্‌সেণ্ট-স্মিথ উপরোক্ত বিষয়টী একেবারেই প্রণিধান করেন নাই।

মিঃ ষ্টেপেলটন বলেন, "ব্রহ্মপুত্র নদ গাড়ো পর্ব্বতের যে স্থান হইতে মোড় ঘুড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তথা হইতে দক্ষিণ সাহবাজপুরের উত্তরাংশস্থিত গঙ্গা ও মেঘনাদের প্রাচীন সঙ্গমস্থান এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী গৌড় নগরী হইতে উক্ত সংযোগস্থান পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগই ডবাক রাজ্য বলিয়া কথিত হইত"। বঙ্গ ও ডবাক তিনি অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তাহা হইলে একই সময়ে ডবাক ও সমতট দুইটী পৃথক্ রাজ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইবার কারণ কি?

আমাদের মতে ঢাকা জেলার উত্তরাংশই এক সময় ডবাক রাজ্য বলিয়া কথিত হইত। সমতট ও ডবাক এই উভয় নাম

পাশাপাশি থাকায় আধুনিক ঢাকাকেই ডবাক রাজ্য বলিয়া আমরা মনে করি।

ডাকুরাই।

তালিপাবাদ পরগণার অন্তর্গত তুরাগ নদী তীরবর্ত্তী বোয়ালী পোষ্ট-আফিসের ৩।৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে ডাকুরাই মৌজা মধ্যে ঢোলসমুদ্র নামে বৃহৎ দীর্ঘিকা ও তাহার পাড়ে "মঠের চালা" নামক একটী প্রকাণ্ড উচ্চ ভূমি দৃষ্ট হয়। উহা একটী বৌদ্ধ চৈত্যের চিহ্ন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। এই ভূমিতে ৪।৫ খাদা পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া বহু অট্টালিকা ও মঠের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার সন্নিকটেই কোটামণির পুকুর। ঢোলসমুদ্র অত্যন্ত গভীর। ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৬০০×৩০০ হাত হইবে। কথিত আছে, এই সুবৃহৎ জলাশয়টী খনিত হইলে রাজা উহার গভীরতা পরীক্ষা করিবার জন্য "ঢুলী"দিগকে তলদেশে নামাইয়া দেন। তাহারা খুব জোরে ঢোল বাজাইলেও তীরস্থিত সমবেত জনমণ্ডলীর কর্ণে উহার শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছিল না। এই জন্যই উহার নাম রাখা হয় ঢোলসমুদ্র।

এই স্থানে পালবংশীয় যশোপাল রাজার অন্যতম রাজবাটী প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ডেমরা।

ঢাকার উত্তর পূর্ব্বে, বালু এবং লাক্ষ্যানদীর সঙ্গমস্থলের প্রায় ৬ মাইল অন্তরে অবস্থিত। বিক্রমপুরাধিপতি কেদাররায়কে পরাজিত করিয়া মহারাজ মানসিংহ এইস্থানে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই স্থানে ঈশাখাঁর সহিত মানসিংহের

একটী যুদ্ধ হইয়াছিল; ফলে, ঈশাখাঁ পরাজিত হইয়া এগারসিন্দুর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এইস্থান বস্ত্রবাণিজ্যের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ঢাকা সহরের বস্ত্রব্যবসায়ীগণ ডেমরার হাট হইতে বহু সহস্র টাকার বস্ত্র ক্রয় করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করিয়া থাকে।

ঢাকা।

ঢাকা অতি প্রাচীন সময় হইতে পরিচিত। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদের শিলালিপিতে বর্ণিত আছে তিনি "ডবাক ও সমতট প্রভৃতি প্রত্যন্ত প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন।" সমতটের সহিত পাশাপাশি ভাবে ডবাকের উল্লেখ থাকায় উহা আধুনিক ঢাকাকেই বুঝাইতেছে সন্দেহ নাই। Sir A. Phayre কৃত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ১৪০০ খৃঃ অব্দেও ঢাকা নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমলঙ্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

আইন-ই-আকবরি গ্রন্থে "ঢুথাবাজু" বলিয়া এই স্থান সপ্তম সরকার বাজুহারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

আকবর-নামা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে এইস্থানে একটী রাজকীয় সেনাসন্নিবেশ (Imperial Thanah) সংস্থাপিত ছিল। "ঢাকার থানাদার সৈয়দ হোসেন, মোগল সেনাপতি সাহাবাজ-খাঁর অধীনে অমিতবিক্রমে পাঠানসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। ঈশাখাঁ একবার সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ফললাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু এইবার, বন্দী থানাদার সৈয়দ মহম্মদদ্বারা পুনরায় সন্ধির কথা চালাইয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হন।"

১৬০৮ খৃঃ অব্দে ইসলামখাঁ ঢাকাতে বঙ্গের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নামানুসারে এই স্থানের নাম "জাহাঙ্গীর-নগর" বা "জাঙ্গীরাবাদ" রাখিয়াছিলেন। ১৭১৭ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে মুরশিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয় (১)।

বঙ্গদেশে মোগলপতাকাস্তম্ভ প্রোথিত হইবার পরে মগেরা তিনবার ঢাকা অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়াছিল। নবাব খানজাদখাঁ এরূপ ভীরু স্বভাবের লোক ছিলেন যে তিনি মগের ভয়ে ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেন না। মোল্লা মুরসিদ ও হাকিম হায়দরকে ঢাকায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তিনি রাজমহলে অবস্থান করিতেন। মগেরা সসৈন্যে ঢাকাতে আগমন করিলে প্রতিনিধিদ্বয় নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। মগী সৈন্যের তাণ্ডব নৃত্যে ঢাকা সহর টলটলায়মান হইয়াছিল। উহারা নগর ভস্মসাৎ করিয়া প্রচুর ধনরাশি লুণ্ঠন ও আবালবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে বহুলোক বন্দী করিয়া চট্টগ্রাম প্রদেশে লইয়া যায়।

পলাসীর যুদ্ধাবসানে, ১৭৬২ খৃঃ অব্দে সন্ন্যাসীগণ ঢাকা সহর লুণ্ঠন করিয়াছিল। সার্ভেয়ার রেনেল সন্ন্যাসীগণকর্তৃক আহত হইয়া ৬ মাসকাল ঢাকাতে থাকিয়া চিকিৎসিত হইয়াছিলেন।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ভারতব্যাপী সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ঢাকার

ষ্টুয়াটপ্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ১৭০৩ খৃঃ অব্দে রাজধানী পরিবর্ত্তনের বিষয় লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ঐতিহাসিক ম্যাডিসন উহা ১৭১৭ খৃঃ অব্দে সংঘটিত হয় বলিয়া লিখিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পঞ্চম রিপোর্ট পাঠেও তাহাই অবগত হওয়া যায়। বস্তুতঃ দেওয়ানী বিভাগ মুরশীদকুলীর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা হইতে অন্তর্হিত হইলেও শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য ১৭১৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ঢাকাতেই সম্পন্ন হইত।

সিপাহীগণও ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষীয়গণের কার্য্যতৎপরতায় উহা অচিরেই প্রশমিত হয়।

মোগল শাসন সময়ে ঢাকা নগরীর উত্তরদক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী হইতে টঙ্গী পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ মাইল এবং পশ্চিমে জাফরাবাদ হইতে পূর্ব্বে পোস্তগোলা পর্য্যন্ত প্রায় ১০ মাইল বিস্তৃত ছিল। তৎকালে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল নয়লক্ষ (১)। বিশপ হিবার যৎকালে ঢাকা নগরীতে পদার্পণ করেন, তখনও এখানে ৯০০০০ হাজার গৃহ এবং প্রায় ৩ লক্ষ অধিবাসী ছিল বলিয়া জানা যায়।

ত্রিবেণী।

ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যা এই নদও নদীত্রয়ের সম্মিলনস্থান ত্রিবেণী বলিয়া পরিচিত। এই স্থান নারায়ণগঞ্জের বিপরীত কূলে সোনারগাঁও পরগণায় অবস্থিত।

কথিত আছে, যযাতির পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে মহাবলপরাক্রান্ত তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্য কিরাতভূপতিকে রণে পরাঙ্মুখ করিয়া কোপল (ব্রহ্মপুত্র) নদের তীরে ত্রিবেগ বা ত্রিবেণী নগর সংস্থাপনপূর্ব্বক তথায় স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

লাক্ষ্যানদী হইতে বর্ত্তমান সময়ে যে স্থান দিয়া সুবর্ণগ্রামের মধ্যে ত্রিবেণীর-খাল প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহার নিকটেই একটী দুর্গ অবস্থিত ছিল। মেঘনাদ ও ধলেশ্বরী নদী হইতে যাহাতে বিপক্ষ শত্রু সুবর্ণগ্রাম আক্রমণ করিতে না পারে, এজন্যই এই দুর্গটী দ্বিতীয় বল্লালসেন কর্ত্তৃক

(১) Tarikh-i-Dacca.

নির্ম্মিত হইয়াছিল। বিক্রমপুরাধিপতি বীরাগ্রগণ্য চাঁদরায় এই দুর্গটী অবরোধ করিয়াছিলেন।

তেজগাঁও।

বর্ত্তমান ঢাকা সহরের ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে পর্ত্তগীজদিগের একটী গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত আছে। "হিষ্টরী অব কটন মেনুফেক্‌চার অব ঢাকা" নামক গ্রন্থের অজ্ঞাতনামা লেখকের মতে এই গির্জ্জা ১৫৯৯ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ম্যানরিক এই গির্জ্জার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ১৬১২ খৃঃ অব্দে এতদঞ্চলে আগমন করেন। ঢাকার তদানীন্তন মৌলবীগণ "মগুপায়ী এবং শূকরমাংস-ভোজী" এই "কাফেরদিগকে" এতদঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগের এবম্বিধ আচরণের বিষয় দিল্লীশ্বর আকবরের কর্ণগোচর হইলে, তিনি উহাদিগকে কোনও প্রকারে উৎপীড়ন করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। তেজগাঁয়ের সন্নিকটবর্ত্তী কতক জমি তিনি পর্ত্তুগীজদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। রোমান্ ক্যাথলিক্ খ্রীষ্টিয়ানদিগের বঙ্গদেশে জমিদারীলাভের ইহাই প্রথম সোপানস্বরূপ হইয়াছিল।

ভ্রমণকারী টেভারনিয়ারের সময়ে উক্ত গির্জ্জা একটী সুদৃশ্য অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছিল।

তেজগাঁয়ে পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ ও দিনেমারদিগের বাণিজ্যকুঠী ছিল।

Hisotry of the Cotton Manufacture of Dacca District;
Calcutta Review, 1845 : page 250;
Taylor's Topography of Dacca.

তোটক বা (টোক

তুগমা (Tugma)

টলেমীর উল্লিখিত তুগ্‌মা (Tugma), এল এড্রিসির টোক (Taukhe), প্লিনির আস্তোমেলা এবং নবম শতাব্দের মোসলমান ভ্রমণকারীগণের লিখিত তাফেক্ (Tafek) একই স্থান বলিয়া মনে হয়

উইলফোর্ডের মতে আন্তিবল ও তুগ্‌মা অভিন্ন; সুতরাং তিনি উহা বর্ত্তমান ফিরিঙ্গিবাজার নামক স্থান বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়াছেন।

ডি, এন, ভিল এর মতে তুগ্‌মা ত্রিপুরার পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তরদিকে অবস্থিত।

ডাঃ টেইলার ইহাকে টোক অথবা নয়ানবাজার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই স্থান পালবংশীয় শিশুপাল রাজার নাবি স্থান ছিল। ব্রহ্মপুত্র ও বানার নদনদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া প্রাচীনকালে ইহা একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। এই স্থান উচ্চ এবং জঙ্গলময়। গ্রামটী আয়তনে মন্দ নহে। এই স্থানে প্রতি সপ্তাহে যে হাট বসে, তাহাতে কাষ্ঠাদি প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে। এই হাটে কোচ এবং রাজবংশীয়গণ তুলা, হরিণের শৃঙ্গ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে। টেইলার সাহেবের সময়েও এই স্থানে পয়সার প্রচলন ছিল না। আদান প্রদান কড়িতেই সম্পন্ন হইত।

আকবর-নামায় এই স্থান "কুমার-সমুন্দর" বন্দরের বিপরীত-দিকস্থ নদের তীরপ্রদেশে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঈশার্খা ও মাসুমকাবুলীর বিরুদ্ধে অভিযানকালে মোগল

সেনাপতি সাহাবাজখাঁ। এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বিপক্ষের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

এই স্থানে মোগল পাঠানে জলে ও স্থলে যে কয়েকটি যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে মোটের উপর বাদশাহপক্ষেরই জয়লাভ হয় বটে, কিন্তু বিপক্ষগণও বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

দলৈর-বাগ।

মোগড়াপারের অদূরবর্ত্তী সহর সোণারগাঁয়ের অন্তর্গত দলৈরবাগ নামক স্থানে কায়স্থবংশোদ্ভব রায় রামচন্দ্র দলৈর ভদ্রাসন ছিল। "সাঞ্জেরদলৈ" কথাটী সুবর্ণগ্রামের সর্ব্বত্র আজিও প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ যুদ্ধাধ্যক্ষ। রামচন্দ্র সুবর্ণগ্রাম রাজধানীর সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার অনেক কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইলেও দীঘি, পুষ্করিণী ও অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ তদীয় কীর্ত্তিকলাপের নামতঃ চিহ্ন প্রদর্শন করিতেছে। কাল-স্রোতে বীরবর রামচন্দ্রের ভদ্রাসন নির্দীপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দিঘলীর-ছিট।

শ্রীপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় ১৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বিস্তীর্ণ পরিখাবেষ্টিত এই স্থানের গভীর অরণ্যমধ্যে বিশাল রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকে উহাকে চণ্ডাল রাজার বাড়ী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। আমাদিগের বিবেচনায় এই স্থানে পালবংশীয় বৌদ্ধ নৃপতির রাজধানী বিদ্যমান ছিল।

দুরদুরিয়া।

এই স্থান কাপাসীয়া থানার নিকটে এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একডালার ৮ মাইল উত্তরে বানারনদীর তীরে অবস্থিত। দুরদুরিয়ায় একটী প্রাচীন

দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই স্থানের বিপরীত দিকে বানার নদীর অপর তীরে একটী সমৃদ্ধ নগরীর চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এতদুভয় স্থানই বৌদ্ধ নরপতিগণ কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। স্থানীয় প্রবাদমতে উহা বল্লাল রাজার বাড়ী বলিয়া কথিত হয়। "রাণীবাড়ী" বলিয়াও এই স্থান অভিহিত হইয়া থাকে। ধামরাইর যশোপাল রাজার বংশীয় রাণী ভবানী, মোসলমান আক্রমণকালে এই দুর্গমধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান "রাণীবাড়ী" বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় মহারাজ বল্লাল ভূপতি যে সময়ে বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন, সম্ভবতঃ সেই সময়ে এই স্থানেও তাঁহার একটী সাময়িক রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কেশবসেন গৌড়নগর পরিত্যাগ করিয়া দুর-দুরিয়ার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে রাণী ভবানী এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া উহা "রাণীবাড়ীর দুর্গ" নামে পরিচিত হইয়া পড়ে।

দেওয়ান-বাগ।

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরবর্ত্তী উত্তরপূর্ব্বদিকে, আকাটিয়ার খালের সহিত লাক্ষ্যানদীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে অবস্থিত। এই স্থানে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মানোয়ারখাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিহাবুদ্দিন তালিসের গ্রন্থে মানোয়ারখাঁ জমিদারের নৌযুদ্ধে কৃতিত্বের বিষয় একাধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে। দেওয়ান-বাগের যে স্থান খনন করা যায়, তথায়ই প্রচুর পরিমাণে ইষ্টকাদি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

এই দেওয়ান-বাগের কিছুদূরে পশ্চিম ও উত্তরদিকে গর্জ্জন ও ভবিতরায়ের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মনোয়ারখাঁর বাড়ী সুপ্রশস্ত পরিখায় পরিবেষ্টিত ও সুবৃহৎ দীর্ঘিকায় পরিশোভিত। উত্তরদিকে "মিঠা পুকুর" বলিয়া ইসলামধর্ম্মানুমোদিত পূর্ব্বপশ্চিমদীর্ঘে খনিত একটী পুষ্করিণীদৃষ্টে অনুমান হয়, উহা অন্দর-মহলের পবিত্র জলাশয় ছিল। দীর্ঘিকার দক্ষিণ তটে প্রকাণ্ড মসজিদ আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে স্থানে বসিয়া দেওয়ান সাহেব নমাজ পড়িতেন, তাহা সুনীল প্রস্তরে খচিত।

গত ১৯০৯ সনের ১২ ফেব্রুয়ারী তারিখে এই স্থানের একটী উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ খনন করিবার সময়ে যোড়শ শতাব্দীর ৭টী কামান আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ধাপা।

ঢাকা হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী পশ্চিমদক্ষিণ দিকে, ফতুল্লার সন্নিকটে বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত। মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণের উপদ্রব নিবারণার্থে মোগল সুবাদারগণ কর্ত্তৃক এই স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকস্তূপ ও ভগ্নবাটিকার চিহ্ন এক্ষণেও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ১৮০২ খৃঃ অব্দে ঢাকার তদানীন্তন জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেটারসন, কোম্পানীর অনুজ্ঞানুসারে, জুডিসিয়াল সেক্রেটারী মিঃ ডাউডেস্ ওয়েল এর নিকটে যে রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে ধাপার বিপরীতদিকে বুড়িগঙ্গার উত্তর তীরে অপর একটী দুর্গ সংস্থাপিত ছিল; কিন্তু উহা নদীভাঙ্গনে সলিলশায়ী হইয়া যায়। তিনি ধাপার দুর্গকে "ফুটিশল্লার দুর্গ" বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। রেনেলের মানচিত্রে ইহা "দাপেকা কেল্লা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রেনেল ১৭৬৫ সনের ৫ই মে তারিখে এই কেল্লার একটী নক্সা প্রস্তুত করিয়া কোম্পানীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সিহাবুদ্দিন তালিসের "ফাতইয়া-ইব্রাইয়া" নামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, "ধাপা হইতে সংগ্রাম-গড় পর্য্যন্ত একটী সুপ্রশস্ত "আল" নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই পথে তৎকালে বর্ষাকালেও পদব্রজে বা ঘোটকারোহণে ঢাকা হইতে ১৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী সংগ্রাম-গড়ে উপনীত হওয়া যাইত।"

সায়েস্তাখাঁর সময়ে মগদিগের উপদ্রব নিবারণজন্য মহম্মদ বেগ অবাকশ একশত রণতরীসহ আবুল হাসনের সাহায্যার্থে এই স্থানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তৎকালে ধাপা একটী প্রধান নাবি স্থান ছিল।

Rennel's Memoirs : Papers relating to the East India Affairs: MSS. Translation of Shihabuddin Talish's Fathiy-yah-i-Ibriyyah by Prof. Jadu Nath Sarkar.

ধামরাই।

এই স্থান ঢাকা নগরী হইতে উত্তরপশ্চিমকোণে প্রায় ২০ মাইল অন্তরে, বংশাই নদীর শাখা কাঁকলাজানি নামক নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। এই স্থান সম্ভবতঃ দুই হাজার কিম্বা ততোধিক বর্ষের প্রাচীন ইতিহাস নীরবে বহন করিতেছে। প্রাচীন দলিলাদিতে এই স্থান "ধর্ম্মরাজিয়া" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ধামরাই ধর্ম্মরাজিয়ারই অপভ্রংশ মাত্র। মহারাজ অশোক তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে ৮৪ হাজার ধর্ম্মরাজিকা বা কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। অশোকাবদান হইতে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক যে সমুদয় ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করেন, পুষ্যমিত্র তাহার ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন। ধামরাই গ্রামে এইরূপ কোন ধর্ম্মরাজিকা বিদ্যমান ছিল, তাহা হইতেই এই স্থানের ধর্ম্মরাজিয়া

নামকরণ হইয়া থাকিবে। ধামা এবং রাই নামধেয় কোন এক গোপ দম্পতির নামানুসারে স্থানের নাম "ধামরাই" হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন। এখানে "ধামার হাট" বলিয়া একটী মহল্লা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

দশম শতাব্দীর শেষভাগে কি একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই স্থান পালবংশীয় বৌদ্ধ নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। পরে উহা গাজি-বংশীয়গণের হস্তগত হয়।

ষোড়শ শতাব্দের শেষভাগে এই স্থান পাঠান দলপতিগণের লীলা-নিকেতনে পরিণত হয়। এই স্থানের সন্নিকটবর্ত্তী গণকপাড়া নামক স্থানেই ইসলামখাঁ প্রথমতঃ বঙ্গের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন।

এই স্থান নিম্নলিখিত বিভিন্ন মহল্লায় বিভক্ত, যথা :—ইসলামপুর, ঠাকুরবাড়ী পঞ্চাশ, কায়ারআগ, কাগজিয়াপাড়া, পাঠানটোলা, মীরকীটোলা, বাগনগর, গোন্দাপাড়া, ঝবারবাগ, সদাগরটোলা, ঘড়িদার-পাড়া, দক্ষিণপাড়া, উত্তরপাড়া, মলঘাট, হজুরীটোলা, কাজীপুর, লাকুড়িয়াপাড়া, নয়ানগর, বড়বাজার, সুরিপাড়া, সৈতপুর, মাইকয়াস-পাড়া, ধামারহাট, সোন্দলপুর, মোকামটোলা, কুঞ্জনগর, যাত্রাবাড়ী, বাসাবাড়ী, কামদেবখুলী, কামারখুলী, চাঁদপুর, কায়েতপাড়া, আনন্দনগর, সায়েস্তাপুর, গোয়ালনগর, ঢেতালীপাড়া, রিফুকরপাড়া, সুজনীটোলা, কামারখুলী, রথখোলা, মালীখুলী, গোবিন্দপুর প্রভৃতি।

কাজির দীঘি, থানার পুষ্করিণী, ঈশাই দীঘি, তাড়াগড় দীঘি, কুঞ্জ-নগরের দীঘি, চাঁদপুর দীঘি, আনন্দনগরের দীঘি, রাখালঘাটার দীঘি, বাস্তবাড়ীর দীঘি, জগাই দীঘি প্রভৃতি বহুতর জলাশয় এই স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীন কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ধামরাইর যশোমাধব, আদ্যাশক্তি ও বাসুদেব প্রসিদ্ধ ও জাগ্রত দেবতা।

ধামরাইর রথ অতি প্রসিদ্ধ। সর্ব্বপ্রথমে বাঁশের রথ ছিল। পরে বালিয়াটীর ভক্ত জমিদারগণ একখানা প্রকাণ্ড আয়তনের কাঠের রথ প্রস্তুত করিয়া দেন। ১৩১২ সনে যে রথটী প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা দৈর্ঘ্যে ২১ হস্ত ও প্রস্থে ২০½ হস্ত এবং উচ্চতায় ৪৫ হাত। পূর্ব্বে রথ চালাইবার উপযুক্ত প্রশস্ত রাস্তা ছিল না। একদা কাশিমপুরের জনৈক জমিদার ৺যশোমাধব সন্দর্শনার্থে ধামরাই আগমন করেন। তিনি এই অভাব পূরণ করিতে ইচ্ছুক হন। কিন্তু ধামরাইর ৷৷৴০ আনীর জমিদার ৺অমর রায়, ৺বিনোদ রায়, ৺রামকান্ত রায়, উলাইলের (বর্ত্তমান কর্ণপাড়ার) জমিদার ৺রামশঙ্কর মিত্র মজুমদার ও ৺বিষ্ণুপ্রসাদ মজুমদার এবং ৵০ আনীর জমিদার ৺শ্যাম রায়চৌধুরী, ৺ভবানী চৌধুরী, প্রভৃতি মহোদয়গণ তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় ৺বাসুদেব বাড়ী হইতে লাকুরিয়াপাড়া পর্য্যন্ত প্রায় ½ মাইল দৈর্ঘ্য ও ২৭।২৮ হাত প্রশস্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন।

উত্থান একাদশীতেও মাঘী পূর্ণিমার সময় এখানে মেলা বসিয়া থাকে। প্রতি বৎসর রথযাত্রা, পুনর্যাত্রা, উত্থানৈকাদশী প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোক ধামরাইতে আগমন করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত রথ উপলক্ষে এখানে যে মেলা জমিয়া থাকে, তাহাই ধামরাইর রথমেলা নামে অভিহিত হয়। রথযাত্রার দিন মাধবকে বৃহৎ কাষ্ঠময় রথে আরোহণ করাইয়া গুণ্ডিচা বাড়ীতে এবং পুনর্যাত্রার দিন গুণ্ডিচা বাড়ী হইতে মন্দিরে আনয়ন করা হয়।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যশোপালের বংশ ধ্বংস হইলে মাধব বহুদিন পর্য্যন্ত অজ্ঞাত অবস্থায় জঙ্গল মধ্যে পড়িয়াছিল। পশ্চাৎ

গোবিন্দপ্রসাদ রায় নামক স্থানীয় জনৈক জমিদার উহা প্রাপ্ত হইয়া শিমুলিয়া গ্রামস্থ এক ব্রাহ্মণকে উহা দান করেন। উক্ত ব্রাহ্মণ পর্ব্বোপলক্ষে মাধবকে নিকটস্থ বংশীনদীর যে স্থানে স্নান করাইতেন, বর্ত্তমানে উহা তীর্থঘাট বলিয়া সুপরিচিত। ইনি এই অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তিটী স্বীয় জামাতা রামজীবন মৌলিককে যৌতুকস্বরূপ দান করিয়াছিলেন।

ধামরাই গ্রামে ফরাসী বণিকগণ একটী কুঠী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্তও যে উক্ত বণিকগণ এই স্থানে বস্ত্রব্যবসায় করিয়াছেন, তাহা স্থানীয় প্রাচীন দলিলাদি দৃষ্টেও প্রতীয়মান হয়।

রেণেলের ম্যাপে ধামরাই হইতে কিছুদূরে ঢোলসমুদ্রের অবস্থান চিহ্নিত হইয়াছে। ঢোলসমুদ্র দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬০০ হস্ত এবং প্রস্থে ৩০০ হস্ত হইবে। ইহার উত্তর ও পশ্চিম পারে ইষ্টক নির্ম্মিত সোপানাবলির ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রবাদ এই যে, এই দীর্ঘিকা খনন করিবার সময়ে উহার গভীরতা পরীক্ষা করিবার জন্ম ঢুলিদিগকে তলদেশে নামাইয়া দেওয়া হয়। বাদকগণ অত্যন্ত জোরে ঢোল বাজাইলেও দর্শক-বৃন্দের শ্রবণবিবরে উহার শব্দ একেবারেই প্রবেশ করিয়াছিল না। এ জন্যই এই গভীর জলাশয়ের নাম রাখা হইয়াছিল "ঢোল সমুদ্র"।

ঢোল সমুদ্রের সন্নিকটবর্ত্তী অপর জলাশয়টী "কোটামণির পুকুর" নামে পরিচিত। এই পুষ্করিণীর পার্শ্বে রাজবাটীর বৃহৎ ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ ইষ্টক গ্রথিত বলিয়াই মনে হয়। কূপ খনন করিলে ভূগর্ভে বহু ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইষ্টকগুলি হিন্দুস্থাপত্যের আদর্শে প্রস্তুত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ধামরাই হইতে ৬।৭ মাইল দূরে যশোপালের রাজধানী মাধবপুর, এখন গাজীবাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। আরও উত্তরে কামদেব নামক রাজা রাজত্ব করিতেন।

ধর্ম্মরাজিয়া দলিলের নকল।

স্বস্তি সমস্ত সুপ্রসন্নালঙ্কৃত সতত বিরাজমান মহারাজাধিরাজ বাদশাহক শ্রীযুক্ত আরঙ্গজেব পদানত। * * * শুভ রাজ্যে তন্নিযুক্ত নবাবক শ্রীযুক্ত খানক মহাশয়া নামাধিকারে তন্নিযুক্ত জয়ারীদারক শ্রীযুক্ত ইস্পিঞ্জিয়ার খান মহাশয়া নামাধিকারে তন্নিযুক্ত সিকদারক শ্রীলাল বিহারী মহালস্য বিষয়িনী সুলতান প্রতাপান্তর্গত ধর্ম্মরাজি, পাকিয় কায়েস্থপল্লি গ্রামনিবাসিনঃ শ্রীগোপীনাথ মজুমদারকস্য সভায়ামনেক সমুপস্থিতে পঞ্চ নবত্যধিক পঞ্চদশ শকাব্দে সুলতানপ্রতাপান্তর্গত কায়েস্থপল্লি গ্রাম নিবাসী গোপীনাথ দেবকস্য স্ত্রী শ্রীমতী গঙ্গাদাসী তৎপদে গোপীনাথ দেবকস্য স্বর্গকামনয়া তস্য জল-ভূমি-বৃক্ষ-সমেতং নিজাংশ তালুকং অত্র নিবাসীনে শ্রীরামজীবন মৌলিকায় দত্তবানিতি সন ১০৮২। ২৩শে অগ্রহায়ণ।

শ্রীমতী গঙ্গা দাসী স্বাক্ষরস্য।

উভয়ানুমত্যা শ্রীশিবরাম শর্ম্মণা লিখিত মদিদতি।

অত্রার্থে সাক্ষি

শ্রীগোপীনাথ শর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দাস। শ্রীজগত বল্লভ দেবস্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর দাসস্য। মহেশ শর্ম্মা।

শ্রীগোপীনাথ দেবক।

ধীরাশ্রম্।

ঢাকা হইতে প্রায় ১৪ মাইল উত্তরে জয়দেবপুরের দক্ষিণে অবস্থিত। মোগল শাসন সময়ে ভাওয়াল অঞ্চলের রাজস্ব আদায় এবং শাসন কার্য্যাদি

নির্ব্বাহ করিবার জন্য এই স্থানে একটি থানা প্রতিষ্ঠিত ছিল। অদ্যাপি এখানে নবাবী আমলের থানা বাড়ীর স্থান নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে।

নলখী হাট।

ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত। এই স্থানে নয় দিবস ব্যাপী বাৎসরিক একটী সুবৃহৎ মেলার অধিবেশন হইত। এই মেলায় বিভিন্ন স্থানের তন্তুবায়গণ সমাগত হইয়া সম্বৎসরের মালপত্র খরিদ করিত। বর্ত্তমান সময়ে এই মেলার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

Papers relating to the East Indian Affairs P. 154.

নপাড়া।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে এইস্থান ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুলা পদ্মার সলিলরাশিতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। নপাড়ার চৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ রঘুরাম রায় বিক্রমপুরাধিপ কেদার রায়ের প্রধান আমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রায় রাজগণের অধঃপতনের পরে রঘুরাম রায় বিক্রমপুরের প্রাধান্য লাভ করেন। ইঁহার অনন্তরবংশীয়গণ নপাড়ার চৌধুরী বলিয়া খ্যাত। উত্তরকালে ইহারা অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠেন। বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রণেতা ৺অম্বিকাচরণ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন, উহারা এক রাত্রিতে সার্দ্ধসপ্তশত নফর করিয়াছিলেন।

নাগরী।

ভাওয়াল পরগণায় অবস্থিত। রেণেল এবং ডাঃ টেইলার এই স্থানের অপর নাম ভাওয়াল বলিয়া লিখিয়াছেন। ঢাকা হইতে জল পথে নাগরী যাইতে এক দিন লাগে। এই স্থানে পর্ত্তুগীজদিগের প্রতিষ্ঠিত একটী গীর্জ্জা আছে। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ঐ গীর্জ্জা স্থাপিত হইয়াছে।

নাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমী ঘাট।

এই উভয় স্থানই নারায়ণগঞ্জের পূর্ব্বদিকস্থ প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। বলরাম হল (লাঙ্গল) দ্বারা এই স্থান কর্ষণ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের জল নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম নাঙ্গলবন্ধ হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রতীরবর্ত্তী পঞ্চমী ঘাটে পঞ্চপাণ্ডব তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। নাঙ্গলবন্ধের জয়কালী, অন্নপূর্ণা এবং শ্মশানকালী প্রসিদ্ধ দেবতা। জয়কালী ও অন্নপূর্ণার মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প দৃষ্টে উহা হিন্দু শাসন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

নাঙ্গলবন্ধের একটী অতি প্রাচীন বটবৃক্ষমূল "প্রেমতলা" নামে অভিহিত। অশোকাষ্টমীর সময়ে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব এই স্থানে সমাগত হইয়া খোল করতাল সংযোগে অহোরাত্র হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এজন্যই ইহা প্রেমতলা নামে পরিচিত।

নাজিরপুর।

পার জোয়ারের অন্তর্গত; ঢাকা হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী উত্তরপশ্চিম দিকে বুড়িগঙ্গার শাখা নদীতীরে অবস্থিত। মীরজুমলার আসাম অভিযান সময়ে এহিতিসিমখাঁ তদীয় প্রতিনিধিরূপে ঢাকায় অবস্থান করিতে ছিলেন। রায় ভগবতী দাসের হস্তে দেওয়ানী বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। এই সময়ে মগদস্যুগণ ঢাকার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিতে থাকে এবং এহিতিসিমের পালক-পুত্রকে (ইনি মোগল নৌ-বাহিনীর জনৈক সর্দ্দার ছিলেন) ধৃত ও বন্দী করিয়া নাজিরপুর অভিমুখে প্রস্থান করে এবং নাজিরপুর পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান জল-দস্যুগণের করতল গত হইয়া পড়ে। সায়েস্তাখাঁ

রাজমহল পরিত্যাগ করিয়া ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইলে নওয়ার দারোগা মহম্মদ বেগ কতিপয় রণতরী সহ এই স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

Mss. Translation of shihabuddin Talishe's Fathiyyahi-Ibriyyah, by Prof Jadunath Sarkar : page 125 b.

ফতুল্লা।

ঢাকা হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে বুড়িগঙ্গার উত্তর তটে অবস্থিত কথিত আছে, সা ফতে উল্লা নামধেয় দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের জনৈক "মুরসেদ" এর নামানুসারে এই স্থানের নাম ফতুল্লা হইয়াছে। সা ফতে উল্লার বংশধরগণ অদ্যাপি ফতুল্লাতেই বাস করিতেছেন। এই স্থানের অনতিদূরে অবস্থিত "ধাপা" নগরীতে মোগলের প্রধান নাবি স্থান ছিল। Report on the East Indian affairs নামক গ্রন্থে ধাপার দুর্গকেই "ফুটিশাল্লার দুর্গ" বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

ফতেজঙ্গপুর।

বিক্রমপুরাধিপতি বীরাগ্রগণ্য কেদার রায়কে পরাস্ত করিয়া জয়নিদর্শনস্বরূপ মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক এই স্থানের নাম করণ হইয়াছে। অধুনা এই স্থান দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত। ইলিয়ট কৃত ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডের ১১১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, কেদার রায় মোগল সেনাপতি কিলমককে শ্রীনগর নামক স্থানে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিলমক কেদার রায়ের পঞ্চশত রণতরীর ভীষণ আক্রমণ হইতে অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; পরে মহারাজ মানসিংহ কিলমকের সাহার্য্যার্থে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলে কেদার

রায়ের সহিত ভীষণ রণাভিনয় সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে কেদার রায় পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু রাজসন্নিধানে নীত হইবার অত্যল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ফতেজঙ্গপুরের সংলগ্ন গ্রামটী নগর নামে পরিচিত। এই স্থানের পূর্ব্বনাম শ্রীনগর। এখানেই কিলমক অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাচীন কাগজাদি দৃষ্টে জানা যায়, ফতেজঙ্গপুর হইতে দামাদ সাহেব নামক জনৈক মোসলমান সেনানায়ক রূপলাবণ্যবতী দিগম্বরী নাম্নি হিন্দু বালিকাকে বলপূর্ব্বক মোসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বিবাহ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে ফতেজঙ্গপুরে তৎকালে মোসলমান ভূপতিগণের একটী সেনা নিবাস ছিল।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'কাচকীর দরজা' রায় রাজগন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া লেদামের নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। এই রাস্তা সোজাসুজিভাবে না যাইয়া বক্রভাবাপন্ন হইয়া নগর ফতেজঙ্গপুরের পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। কালীগঙ্গা নদীর একটী শাখা নদীতীরে এই স্থান অবস্থিত ছিল। ঐ নদী কালীগঙ্গা বা "ফতেজঙ্গপুরের বাইদ" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

কতিপয় বৎসর হইল নগর গ্রামে পুষ্করিণী খনন কালে অষ্টধাতুময় একটী বিষ্ণু মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহার চালীতে ব্যাঘ্রমুখাঙ্কিত চিহ্ন রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে অনুমিত হয় এই মূর্ত্তিটী প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন হইবে।

ফিরিঙ্গি বাজার।

ইছামতী নদীতীরে, নারায়ণগঞ্জের বীপরিত দিকে, ঢাকা হইতে প্রায় ১০ মাইল অন্তর এই স্থানটী অবস্থিত। নবাব সায়েস্তাখাঁর সময়ে

চাটিগাঁ। অধিকৃত হইলে তিনি ফিরিঙ্গী বন্দীদিগকে এই স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি এই স্থানের নাম ফিরিঙ্গি বাজার হইয়াছে। মোগল শাসন সময়ে ফিরিঙ্গি বাজার একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদে পরিণত হইয়াছিল। এই স্থানে একটী গির্জ্জাঘর আছে, তথায় রোমান ক্যাথলিক-পাদরী আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিয়া থাকেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই স্থান "সাবন্দর" বলিয়া পরিচিত ছিল।

Shihabuddin Talishe's fath-i-yyah-ibriyyah.
Stewart's History of Bengal.
Dr. Taylor's Topography of Dacca.

বক্তারপুর।

খিজিরপুরের ৩০ মাইল উত্তরে লাক্ষ্যানদীতীরে অবস্থিত। এই স্থানেই ঈশাখাঁ মসনদআলি বাস করিতেন। ১৫৮৩ খৃঃ অব্দে মোগল সেনাপতি সাহাবাজখাঁ পাঠান দলপতি মাসুমখাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে "ভাটি প্রদেশে" বিতাড়িত করেন। অতঃপর তিনি বক্তারপুর ধ্বংস করিয়া সোনারগাঁও অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

J, A. S. B, 1874. Pt, i.

বজ্রপুর।

ঢাকা হইতে প্রায় ৩৪ মাইল দূরবর্ত্তী উত্তরপূর্ব্বদিকে, ব্রহ্মপুত্রের শাখাতটে এইস্থান অবস্থিত। আকবরনামা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তোটক হইতে বজরাপুর যাইবার দুইটী পথ ছিল; একটি নদীতীর ধরিয়া, অপরটী ভাওয়াল পরগরণার মধ্য দিয়া।

মোগল সেনাপতি সাহাবাজখাঁ এই স্থানে পাঠান দলপতি মাসুম কাবুলির অধীনে উহাদিগের এক প্রবল বাহিনী একত্রিত হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অধীনস্থ সেনানায়ক তারসুমখাঁকে তাহাদিগের বিরুদ্ধে

প্রেরণ করিয়াছিলেন। তারসুন ভাওয়ালের পথে বজরাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বজরাপুরের খণ্ড যুদ্ধে বীর তারসুন বন্দী হন।

Elliot Vol. VI, Page 74.

বজ্রযোগিনী।

এই স্থান বিক্রমপুরের অন্তর্গত। ঢাকা হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। এইস্থানেই বৌদ্ধ মহাতান্ত্রিক ও পরম জ্ঞানী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ করেন। তিব্বতে দীপঙ্করের প্রতিষ্ঠিত যে বজ্রযোগিণী মূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহার নামকরণ তদীয় জন্মভূমির নামানুসারেই হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।

যুয়নচঙের সমতটের বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে এই স্থানে তৎকালে একটী সঙ্ঘারাম ছিল। এই স্থানে একটি দেউল বাড়ী ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। দেউলবাড়ীসমূহে সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

পুষ্করিণী খনন করিবার সময় এখনও এখানে বহু প্রাচীন কীর্ত্তি-কলাপের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বন্দর।

মোগল শাসন সময়ে বন্দর একটী প্রধান নাবিস্থান ছিল। মগদিগের অত্যাচারের কবল হইতে উৎপীড়িত দেশবাসীকে রক্ষা করি-বার জন্য আমির-উল-উমরা সায়েস্তাখাঁ। রাজা ইন্দ্রমনের অধীনে শতাধিক রণপোত এই স্থানে সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতেন।

বন্দরের রায়চৌধুরীগণের অধ্যুষিত ভদ্রাসন, রাজা কৃষ্ণদেব-প্রদত্ত বলিয়া, রাজবাড়ী নামে প্রসিদ্ধ। আমাদের মতে উহা ক্রহ্যার

অনন্তরবংশীয় কোনও রাজার বাস হইতে রাজবাড়ী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। রাজার প্রদত্ত বলিয়া রাজবাড়ী নাম হওয়া সম্ভবপর নহে। রাজা কৃষ্ণদেব, অনেক ব্রাহ্মণ, ভদ্র ও আত্মীয় কুটুম্বাদিকেও ভদ্রাসন ও সম্পত্তি প্রভৃতি প্রদান করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও কাহারও বাড়ী রাজবাড়ী বলিয়া খ্যাত হয় নাই।

বর্ম্মিয়া।

ভাওয়ালের অন্তর্গত। ঢাকা হইতে ৩৫ মাইল উত্তর দিকে অবস্থিত। এই স্থানে একটী প্রাচীন বাড়ী, ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর ও ইন্দারা আছে। এই বাড়ী পরানগুরু ঠাকুরের বাড়ী বলিয়া পরিচিত। মৃজাবংশীয় মোগল জমিদারের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া পরানগুরু ঠাকুর ময়মনসিংহ চলিয়া যান এবং তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া দশমহাবিদ্যা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই দশমহাবিদ্যার পূজা অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। মৃজা জমিদারগণের বংশধরগণ এখনও বর্ম্মিয়াতে বাস করিতেছেন।

বাজাসন।

ঢাকা হইতে প্রায় ২১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। সুয়াপুর গ্রামের পূর্ব্বে নান্নার গ্রামের পশ্চিমে বাজাসন নামক মৌজায় কৈকুড়ি বিলের তীরে বহুকালের পতিত "ভিটা ভূমি" দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে এই মৃৎস্তূপ ৫০।৬০ ফুট উচ্চ এবং উহার প্রসারতাও প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যাপিয়া ছিল। উহা বাজাসনের ভিটা বলিয়া পরিচিত। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত প্রথিতযশা শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, বাজাসন শব্দ বজ্রাসন শব্দের অপভ্রংশ। বজ্রাসন বৌদ্ধযোগী ও তান্ত্রিকগণের সুপরিচিত আসন। নাগার্জ্জুন প্রবর্ত্তিত মাধ্যমিক মহাযান

সম্প্রদায়ভুক্ত বজ্রাচার্য্যগণ এক সময় এই "আসন" তান্ত্রিক সাধনের বিশেষ উপযোগা জ্ঞান করিতেন"।

"বাজাসনের ভিটার নিম্নভাগে ৬।৭টী প্রকাণ্ড প্রস্তর স্তম্ভ বিদ্যমান ছিল বলিয়া স্থানীয় বৃদ্ধগণের মুখে অবগত হওয়া যায়। "বাজাসনের ভিটা খুঁড়িতে বহুসংখ্যক ইষ্টক পাওয়া যায়; কিন্তু নানাপ্রকার প্রবাদ শুনিয়া লোকে ঐ স্থান খনন করিতে ভয় পায়। এই প্রবাদগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় বাজাসনের ভিটা এক সময়ে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের আশ্রম ছিল, এই জন্য লৌকিক সংস্কার উহাকে ভূত ও প্রেতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। নিকটবর্ত্তী কয়েকখানা গ্রামের প্রাচীন দলিলপত্রে প্রকাশ যে এই গ্রামগুলি এক সময়ে বাজাসন তালুকের অন্তর্গত ছিল।

বাজাসনের প্রাচীন সমৃদ্ধির আর একটী নিদর্শন এই যে ভিটার সান্নিধ্যে একদা অত্যন্ত বড় রকমের একটী মেলার অধিবেশন হইত। এই স্থানে জিয়াসপুকুর নামে একটী পুকুর আছে; এই পুকুরের জলের অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার জনশ্রুতি শ্রুত হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই মহোদয় সুপ্রসিদ্ধ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের যে জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি দ্বাদশ বৎসর কাল "বজ্রাসন বিহারে" অধ্যয়ন করেন এবং এই বজ্রাসন বিহারের পূর্ব্বস্থিত বিক্রমপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের বিবেচনায় এই "বাজাসন"ই তৎকালে বজ্রাসন বিহার বলিয়া পরিচিত ছিল।

বেঙ্গালা।

ভার্টোমেনাস ১৫০৩ খৃঃ অব্দে বেঙ্গালা নগরীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি এই স্থানকে বহু সম্পদশালী ও

সুশস্যপূর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে এবং সপ্তদশ শতাব্দের প্রারম্ভে ইউরোপীয় ভ্রমণকারিগণ মধ্যে অনেকেই বেঙ্গালা সহরের উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থান গঙ্গার পূর্ব্বদিকস্থ মোহনার নিকটে অবস্থিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ঢাকার একটী মহল্লার নাম "বাঙ্গালা বাজার"। এই স্থান অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাণিজ্যের জন্য সুবিখ্যাত। মিঃ ষ্টেপলটন বলেন, "দোলাইখাল্ দিয়াই পূর্ব্বে বুড়িগঙ্গা নদী প্রবাহিত হইয়া লাক্ষ্যার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই খালের অপর পার্শ্বস্থিত দ্বীপাকার স্থানটী যাহা ইসলামপুর, পাটুয়াটুলী বাঙ্গলাবাজার, ফরাসগঞ্জ, সুত্রাপুর, সাউজিয়াল নগর এবং রুকুনপুর প্রভৃতি স্থান লইয়া গঠিত, তাহাই ভার্টোমেনাসের উল্লিখিত বেঙ্গালা সহর বলিয়া অনুমিত হয়"।

ঢাকার "বাঙ্গলা-বাজার" নামক স্থানই প্রাচীন বেঙ্গালা সহরের বিলুপ্ত চিহ্ন রক্ষা করিতেছে বলিয়া টেইলার সাহেবও লিখিয়াছেন। মন্টি-ব্রান উহা চাটিগার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।

Dr. Taylor's Topography of Dacca.

J. A, S, B. 1910.

Malte Brun's Geography, Vol III, p 122,

ভাটী।

মেঘনাদ নদ ও হুগলী নদী এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ পূর্ব্বকালে ভাটী নামে পরিচিত ছিল। সাধারণতঃ এই ভূভাগের দক্ষিণ এবং সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানই ভাটী নামে প্রসিদ্ধ। মোসলমান ঐতিহাসিকগণ মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রহ্মপুত্রের সহিত পদ্মার এবং লাক্ষ্যার সহিত ব্রহ্ম-পুত্রের সঙ্গম পর্য্যন্ত স্থান ভাটী নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহা

১৮ ভাটী নামে পরিচিত ছিল। আবুলফজল, ঈশাখা মসনদআলীকে ভাটী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা (মরজ্‌বান) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভাটী প্রদেশের যে সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা লইয়া প্রফেসর ডাউসন, মিঃ বিভারিজ প্রভৃতি মনস্বী ব্যক্তিবর্গকেও গোলযোগে পড়িতে হইয়াছে। তাহার মতে "ভাটী প্রদেশের দক্ষিণ সীমা" তাণ্ডা নগরী ও সমুদ্র, এবং উত্তর সীমা তিব্বতের গিরিমালার পাদদেশ"। বিভারিজ সাহেব বলেন, উহা নিশ্চয়ই লিপিকরপ্রমাদ হইবে। তিনি বলেন "তাণ্ডার দক্ষিণ এবং সমুদ্র ও ত্রিপুরার পর্ব্বতশ্রেণীর সীমান্ত প্রদেশের উত্তর এই সীমাবদ্ধ স্থানই আবুলফজল ভাটী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন" অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্য ভাটী প্রদেশের সীমান্ত স্থানে অবস্থিত। বিভারিজ সাহেবের মতে বর্ত্তমান ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাদ্বয় লইয়াই ভাটী প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। এক্ষণে বাখরগঞ্জ ও খুলনার অন্তর্গত দক্ষিণবর্ত্তী স্থানগুলিই ভাটী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আবুলফজল এই ভূখণ্ডের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৩০০ × ২০০ ক্রোশ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

বারভূঞা—শ্রীআনন্দনাথ রায় প্রণীত। Beveridge on Isakhan.

মগবাজার।

ঢাকা সহরের প্রায় ২ মাইল উত্তরপূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইসলাম খাঁ মেসেদীর শাসনসময়ে, আরাকানরাজের মৃত্যু হইলে তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারীর পুত্র তদীয় সিংহাসন হস্তগত করিতে সমর্থ হয়। এই ঘটনায় আরাকান-রাজার ভ্রাতা ধরমসা ঊনবিংশতি হস্তী, চারি পাঁচ সহস্র অনুচর ও তদীয় পরিবারবর্গ সহ ভুলুয়ার ফৌজদারের শরণাপন্ন হইলে, তিনি উঁহাকে স্থলপথে ঢাকাতে প্রেরণ করেন। ইসলামখা এই ধরমসাহকে
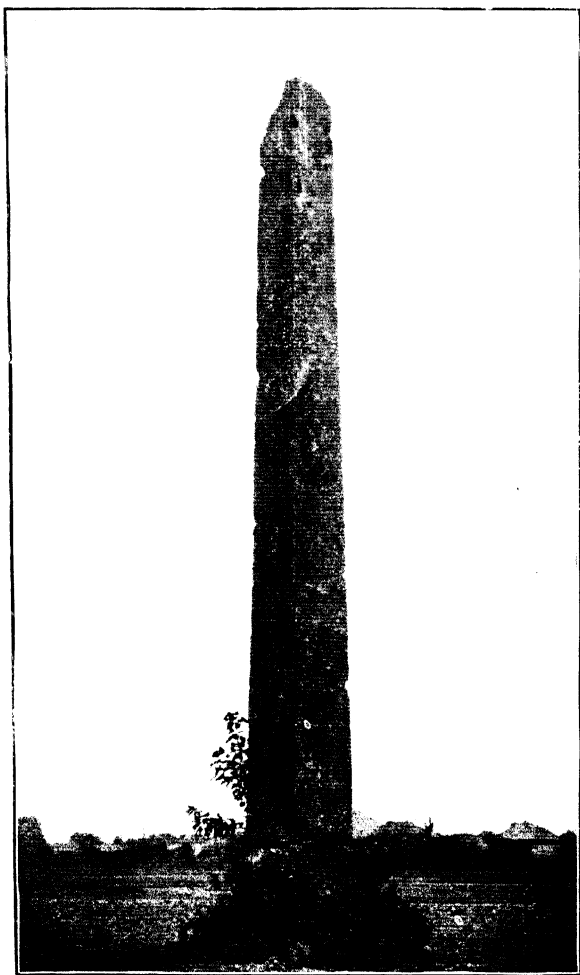
মণিপুরের স্তম্ভ

সাদরে গ্রহণ করিয়া মগবাজার নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং মোগল সরকার হইতে মোসহারার ব্যবস্থা করিয়া দেন। মগদিগের বসবাস-হেতু এই স্থান মগবাজার আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মগড়াপার।

ঢাকা হইতে ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। এই মগড়াপার ও ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ অনেক গ্রাম সহ কোণ্ডরসুন্দর প্রভৃতি কতকগুলি স্থান মোসলমান শাসনসময়ে সমৃদ্ধশালী সহর সোনারগাঁ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হয়। এই স্থানেই মোসলমান ভূপতিগণের রাজ-প্রাসাদ ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে বহুতর মসজিদ আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। দমদমা নামক গোলাকৃতি স্থানে এথানকার মোসলমানগণ মহরমের দশম দিবসে তাজিয়াদি সাধারণের প্রদর্শনের জন্য রাখিয়া দেয়।

মোগড়াপারের রাস্তার সন্নিকটে একখণ্ড প্রস্তরলিপি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহা ১৫০২ খৃঃ অব্দের ৭ই জুন তারিখে, নবাব আলা-উদ্দিন আবুল মজফর হোসেন সাহার সময়ে ত্রিপুরা ও মোয়াজ্জমাবাদের শাসনকর্ত্তা খোয়াসখাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মণিপুর।

ঢাকা হইতে প্রায় ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে মণিপুর-রাজ নরসিংহের মৃত্যু হইলে কীর্ত্তিচন্দ্র মণিপুরের রাজসিংহাসন হস্তগত করেন। নরসিংহের ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহ রাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া বারম্বার মণিপুর আক্রমণ করেন। রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইলে দেবেন্দ্র সিংহ ধৃত হইয়া প্রথমে নদীয়া, পরে মুর্শিদাবাদ এবং তৎপরে ঢাকায় আনীত হন। ১৮৫১ খৃঃ অব্দে মণিপুর-রাজবংশীয় পার্ব্বতী সিংহ, নীলাম্বর সিংহ ও নরেন্দ্রজিৎ

সিংহ, দুইজন হাবিলদার, দুইজন নায়েক এবং বিংশতিজন সিপাহীসহ ঢাকা অভিমুখে রওনা হইলে পথিমধ্যে ধৃত হইয়া এই স্থানে বন্দী অবস্থায় কালযাপন করিতে বাধ্য হন। দেবেন্দ্র সিংহ প্রভৃতি মণিপুররাজ-পরিবারস্থ বন্দীগণ ১২৲ টাকা হইতে ৯০৲ টাকা পেন্সন পাইতেন। ঢাকার এই মণিপুরে পূর্ব্বপশ্চিম দীঘালি একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই দীর্ঘিকার উত্তর পারে বীরেন্দ্র সিংহের সমাধি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই স্থানের অনতিদূরে বর্ত্তমান Agricultural Firm এর চতুঃসীমানার মধ্যে পঞ্চবিংশতি হস্ত উচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত চতুস্কোণাকার একটী ভগ্ন স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ উহাকে মগদিগের বিজয় স্তম্ভ বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। ঢাকা নগরী মগদিগের দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিস লিখিয়াছেন। কিন্তু মোগল সুবাদারগন যে মগদিগের জয়স্তম্ভটীর বিলোপ সাধন করেন নাই, ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হয়। স্তম্ভগাত্রে একখানা শিলালিপি ছিল বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু উহার কোনও সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমাদিগের বিবেচনায় উহা কাহারও সমাধি স্থান হইবে।

মশ্বাদি।

সোণারগাঁয়ের অন্তর্গত। মহেশ্বর নামা জনৈক বৈদ্যবংশীয় এক বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি মশ্বাদিকে মহেশ্বরদি নামে পরিবর্ত্তিত করিয়া একটী পরগণা গঠিত করেন। সোনারগায়ের কতক গ্রাম লইয়া এই পরগণার নামকরণ হয়।

সাহাবাজ খাঁ ঈশাখাঁর অস্ত্রাগার কত্রাপুর লুণ্ঠন করিয়া মশ্বাদি নামক প্রসিদ্ধ নগর অধিকার করেন। এইস্থানে বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সাহাবাজের হস্তগত হইয়াছিল।

Elliot, Vol. vi.

মালথা নগর সেঘরার খোদিত লিপি।

মালখানগর।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত। মীরগঞ্জ হইতে প্রায় ১ মাইল পশ্চিমদক্ষিণ কোণে সংস্থিত। নবাব সায়েস্তাখাঁর সময়ে এইস্থানে বিক্রমপুর পরগণার কাননগুর কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাননগু দেবীদাস বসুর সেঘরার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি এইস্থানে বিদ্যমান আছে। এই সেঘরার মধ্যে তিনখানা ইষ্টক ফলকে দেবীদাস বসুর নিয়োগপত্র অথবা পরিচয় খোদিতছিল। তন্মধ্যে একখানা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; অপর দুইখানা ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ উকিল দেবীদাসের অনন্তরবংশ্য শ্রীযুক্ত রজনীনাথ বসু মহাশয় স্বীয় পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিচিহ্নস্বরূপ সযত্নে রক্ষা করিতেছেন। ইষ্টকফলকদ্বয়ের অনুলিপি এইস্থানে প্রদত্ত হইল।

প্রথম ইষ্টক ফলক

বাদসা * * * আত্তর *
জেব য়ালমগীর আম
লে নওয়াব আহেরূণ
ওমরা দেওয়ান বাদসা
* হাজী সফি খাঁ শ্রী

দ্বিতীয় ইষ্টক ফলক

শ্রীগোবিন্দ চরণ আসবন্দ
শ্রীদেবী দাস বসু কা
নো গোই নাওয়ারা এতমা
ম শ্রী নবাই খাব * স
সন ১০৮৭ বাঙ্গলা মাহে চৈত্র

খোদিত ইষ্টকলিপিপাঠে অবগত হওয়া যায়, দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের সময়ে নবাব আমীর-উল-উমরা সায়েস্তা খাঁ ও বাদশাহের দেওয়ান হাজি সুফি খাঁর আমলে ১০৮৭ বঙ্গাব্দে (১৬৮১ খৃঃ অব্দে) দেবীদাস বসু কাননগু এবং নবাই খাষনবীশ নাওয়ারার এহিতিমাম পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

মাছিমাবাদ।

সুপ্রসিদ্ধ ঈশাখাঁ মসনদ আলীর পৌত্র মাছিমখাঁর নামানুসারে এই স্থান মাছিমাবাদ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মাছিমখাঁ এই স্থানেই স্বীয় বাসস্থান নির্দ্ধারণ করেন। এই স্থানে সুবৃহৎ দীর্ঘিকা ও তন্মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে হাওয়াখানার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। হাওয়াখানার চতুঃপার্শ্বেই দীর্ঘিকা—কি মনোরম দৃশ্য! এই স্থানের কাজীপরিবার আজ ও মোসলমানসমাজে বিশেষ সম্মানিত।

উপরোক্ত মাছিমখাঁর চারিপুত্র—লতিফখাঁ, মহম্মদখাঁ, মনোয়ারখাঁ, সরিফখাঁ। পিতার মৃত্যুর পরে লতিফখাঁ হযরৎনগরে, মহম্মদখাঁ জঙ্গলবাড়ীতে ও মনোয়ারখাঁ দেওয়ানবাগে ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন।

মোয়াজ্জমাবাদ।

সোণারগাঁয়ের ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমদিকে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্রতীরবর্ত্তী মোয়াজ্জমপুর নামক স্থানকেই মিঃ ব্লকম্যান মোয়াজ্জমাবাদ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক। মেঘনাদের তীর হইতে ময়মনসিংহের উত্তরপূর্ব্বভাগ সুরমা নদীর দক্ষিণতীর পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান মোয়াজ্জমাবাদের অন্তর্গত ছিল। মোয়াজ্জমাবাদে পাঠান রাজগণের টাকশাল ছিল। এই স্থান হজরৎ-ই-জালাল বলিয়া অভিহিত হইত।

যাত্রাপুর।

ইছামতীতটে, ঢাকা হইতে প্রায় ৩০ মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এখান হইতে ইছামতীর বাঁক্ ঘুরিয়া ঢাকায় পৌছিতে কিছু বেশী সময় লাগে। টেভারনিয়ার এখান হইতে ঢাকায় যাইবার একটী সোজা পথের কথা লিখিয়াছেন।

সায়েস্তাখাঁ রাজমহল হইতে রওনা হইয়া ঢাকা নগরীতে পদার্পণ করিবার জন্ত শুভদিনের প্রতীক্ষায় এই স্থানে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সায়েস্তা খাঁর তনয় আকিদাৎ এই স্থানে আসিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সায়েস্তা খাঁ তাহাকে এই স্থান হইতে রাজ-মহলের ফৌজদারপদে অভিষিক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। নওয়াব অন্যতম সর্দ্দার মিরাক সুলতানকে নবাব এই স্থান হইতেই হকিকৎ খাঁ উপাধি প্রদান করেন।

সায়েস্তাখাঁর সময়ে মগেরা যাত্রাপুর অঞ্চলে উপদ্রব আরম্ভ করিলে তিনি রুকুন-উদ্দিন নামক জনৈক ব্যক্তির অধীনে স্বীয় নৌসেনা সজ্জিত করিয়া উহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। নবাবী সৈন্যের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া মগেরা ঐ স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া যায়।

Tavernier's Travels in India, Book I.

রঘুরামপুর।

বিক্রমপুরের অন্তর্গত এবং রামপালের দেড়মাইল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত। রঘুরাম রায় নামক জনৈক রাজার নামানুসারে এই স্থানের নাম রঘুরামপুর হইয়াছে। রঘুরাম রায়ের পরেই বিক্রমপুরে চাঁদরায় ও কেদাররায়ের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। বিশালবক্ষা পদ্মার

গর্ভে বিক্রমপুরের যে সমুদয় পল্লী বিলুপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে হরিশপুর একটী বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ পল্লী ছিল। সেখানে রায়দীঘি নামক এক বৃহৎ জলাশয়ের পাড়ে প্রতি বৎসর বিজয়া দশমীর দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তাহব্যাপী একটী মেলা বসিত। কথিত আছে, রঘুরামের সহোদর হরিশ্চন্দ্র ঐ স্থানে সময়ে সময়ে বাস করিতেন। তথায় তিনি প্রতিবৎসর বিশেষ সমারোহ পূর্ব্বক দুর্গোৎসব করিতেন।

রাম মালিক নামে রঘুরায়ের জনৈক সেনাপতির বিষয় অবগত হওয়া যায়। কথিত আছে, শত্রু পক্ষের তীর ও গুলির আক্রমণ হইতে রাম মালিক একমাত্র লাঠীর সাহায্যে আত্ম রক্ষা করিতে পারিত। তাহার সম্বন্ধে যে একটী গ্রাম্যছড়া এখনও প্রাচীন লোকের মুখে শ্রুত হওয়া যায়, আমরা এস্থলে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম।

"রাম মালিকের লাঠি।
রঘু রায়ের মাটী॥
উঠলে লাঠীর ডাক।
দৌড়ে পলায় বাঘ॥
গুলি ফিরে ঝাকে।
রামের লাঠীর পাকে॥
মালিক ধরে লাঠী।
যম যেন সে খাটি"॥

রঘুরামপুরের অদূরে "মানিককান্দার মাঠ" নামে একটী ক্ষুদ্র প্রান্তর দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ রঘুরায়ের লাঠীয়াল সেনার অধিনায়ক রামমালিকের নামে ঐ প্রান্তরের নামকরণ হইয়া থাকিবে।

"রঘুরামপুরে হরিশ্চন্দ্রের দাঘি নামে একটী পুরাতন জলাশয় আছে। এই জলাশয়ের অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে। মধ্যে একটু স্থানে

অল্প জল থাকে, তাহাও জলজতৃণাদিদ্বারা আবৃত থাকে। উক্ত তৃণগুল্ম এরূপ পুরু যে তাহার উপর দিয়া অনায়াসে হাটিয়া যাওয়া যায়। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে ঐ তৃণস্তর একটু একটু করিয়া প্রতিদিন নামিয়া যাইতে থাকে। সপ্তমী অষ্টমী তিথিতে প্রায় সমস্ত তৃণগুল্মই তলাইয়া যায়। তখন পরিষ্কার জল উহার উপরে টল টল করিতে থাকে। ইহার পরে ৭।৮ দিনের মধ্যে আবার পুকুরটী ক্রমে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জলজ উদ্ভিদস্তর পুনর্ব্বার ভাসিয়া উঠে এবং জল রাশি অদৃশ্য হইয়া যায়। এই আশ্চর্য্য দৃশ্য অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু অদ্যাপি ইহার কারণ নির্ণীত হয় নাই।

রঘুরামপুরে ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক প্রাচীন দীঘি, পুষ্করিণী ও ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয়ই রঘুরাম ও হরিশ্চন্দ্রের কীর্ত্তি কলাপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। রঘুরামপুরের অনতিদূরে উত্তরে "দেওসারের দীঘি" নামে একটী বৃহৎ জলাশয় এখনও অর্দ্ধ ভরাট অবস্থায় বিদ্যমান আছে। এই দেওসার নাম সম্ভবতঃ দেবসার নামের অপভ্রংশ। বহুদেব দেবীর স্থান বলিয়াই ঐ স্থানের নাম দেবসার হইয়া থাকিবে।

রঘুরামপুরের অব্যবহিত পশ্চিমে "সুখবাসপুর" নামে একটী গ্রাম বর্ত্তমান আছে। এই গ্রামে যে একটী প্রাচীন দীর্ঘিকা নয়নগোচর হইয়া থাকে তাহা সুখবাসপুরের দীঘি বলিয়া পরিচিত। জনশ্রুতি এই যে, এই দীঘির পূর্ব্বপারে রঘুরামের একটী আরাম বাটী ছিল। তিনি অবকাশের সময় এই বাটীতে অবস্থিতি করিয়া শান্তি সুখ অনুভব করিতেন বলিয়া এই স্থান সুখবাসপুর আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

রঘুরামপুরের অল্পদূর দক্ষিণে "শঙ্করবন্ধ" নামে একটী গ্রাম আছে। এই স্থানে রঘুরামরায়ের সভাপণ্ডিত শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর বাস স্থান

ছিল। রঘুরাম স্বীয় সভাপণ্ডিতকে এই স্থান নিস্কর ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেন। এজন্যই ইহা শঙ্করবন্ধ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত।
ভারতী ১৩১২ ভাদ্র সংখ্যা।

রণভাওয়াল।

ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত একটী তপ্পা। আকবর সাহের সময়ে ভাওয়াল "বাজু" নামে পরিচিত

ষোড়শ শতাব্দে ভাওয়াল পরগণায় বঙ্গীয় দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ফজল গাজীর আবির্ভাব হয়। গাজীবংশ ইহার পূর্ব্ব হইতেই ভাওয়ালে আধিপত্য করিতেছিলেন। ডাক্তার ওয়াইজের মতে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দে পালোয়ান সাহের পুত্র কারফরমাসা দিল্লীর বাদশাহ হইতে ভাওয়াল পরগণার আধিপত্য গ্রহণ করিয়া লাক্ষ্যানদীর তীরে, চৌরাগ্রামে স্বীয় আবাস স্থান নির্দ্ধারিত করেন। অতঃপর আকবরের সময়ে ইহার বংশধর ফজলগাজী বঙ্গীয় অপর একাদশ ভুঞাগণের সঙ্গে সম্রাটের বিরুদ্ধে উত্থান করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঈশাখাঁ এই দ্বাদশ ভৌমিকের নেতাছিলেন।

ভাওয়ালের উত্তরাঞ্চলস্থিত এগারসিন্ধু নামক স্থানে আকবর সেনাপতি মহারাজ মানসিংহের সহিত ঈশাখাঁর রণাভিনয় সংঘটিত হইবার জন্য ভাওয়ালের উত্তরভাগ "রণভাওয়াল" নামে পরিচিত হইয়া পড়ে। ঈশাখাঁর গর্ব্বোন্নত মস্তক মোগল পতাকা মূলে অবলুণ্ঠিত হইলে তিনি স্বীয় "বাইশপরগণার" সঙ্গে ভাওয়াল পরগণার উত্তর অংশ দিল্লীর সম্রাট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া আনেন।

রাজাবাড়ী।

জয়দেবপুরের উত্তর পূর্ব্ব দিকে রাজাবাড়ী নামক স্থানে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে বৌদ্ধ নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। উত্তরকালে এই বংশীয় প্রতাপ ও প্রসন্ন রায় নামক ভ্রাতৃদ্বয় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রায় ভ্রাতৃগণ অতিশয় উৎপীড়ক রাজা ছিলেন। তাঁহাদের অত্যাচারে ভাওয়ালের অনেক হিন্দু ঐ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। উহাদের বাটীর ভগ্ন অট্টালিকা ও সুদীর্ঘ দীঘিকা এবং একটী সুবৃহৎ মঠ ও "বান্দানবাড়ী" নামক বন্দীশালার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। মঠটী বৌদ্ধ স্থাপত্যের অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়।

বিক্রমপুরান্তর্গত পদ্মানদীর তীরে অপর রাজাবাড়ীর পরিচয়। চাঁদরায় ঐ স্থানে মাতৃশ্মশানোপরি একটী মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; উহা রাজাবাড়ীর মঠ বলিয়া সাধারণ্যে সুপরিচিত।

রাজাবাড়ীর এক মাইল উত্তরে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘও পোয়া মাইল প্রশস্ত একটী দীঘী বিদ্যমান আছে। উহা "কেশারমার" দীঘি বলিয়া পরিচিত। এই দীর্ঘিকার পারস্থিত প্রসিদ্ধ হাটটী বিক্রমপুরের "দীঘীর পারের হাট" বলিয়া প্রসিদ্ধ। "কেশারমারদীঘী" সম্বন্ধে বিক্রম-পুরের ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

রাণী-ঝি।

ঢাকা হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে, লক্ষ্মণখলার অনতিদূরে এই স্থান অবস্থিত। "এই প্রদেশের জনসাধারণ বল্লাল জননীকে রাণী-ঝি বলিয়া সম্বোধন করিত। বল্লাল প্রভৃতির নামানুসারেই এইস্থান

রাণী-ঝি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কথিত আছে, এইস্থানে রাণী নির্ব্বাসনকাল অতিবাহিত করিয়া ছিলেন”।

সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস—শ্রীস্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত।

রামপাল।

ঢাকা নগরের ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে এবং মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ৩ মাইল পশ্চিমে এইস্থান অবস্থিত। ইহা যে অতি প্রাচীন স্থান, বর্ত্তমান অবস্থায়ও দর্শন মাত্রেই তাহার প্রতীতি জন্মে। প্রাচীনকালের সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ এইস্থানে প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে।

কৌলিন্যমর্য্যাদাসংস্থাপক মহারাজ বল্লাল সেন রামপালে যে বৃহৎ রাজভবন নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, তাহা এক বৃহৎ পরিখা দ্বারা সমচতুষ্কোণ আকারে পরিবেষ্টিত ছিল। এই পরিখার প্রস্থ অন্যূন ২৫০ হস্ত। বর্ত্তমান সময়ে এই পরিখার অনেক স্থান ভরাট হইয়া ক্ষেত্রের আকারে পরিণত হইয়াছে; তথাপি উভয় পাড়ের সমতল ভূমি হইতে ইহার গভীরতা ১২।১৩ হাত বর্ত্তমান আছে। বাড়ীর দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১২০০ শত হাত; প্রস্থ পূর্ব্ব-পশ্চিমে অন্যূন ১০০০ হাত হইবে। বাড়ীর পূর্ব্বদিকে ইহার এক প্রকাণ্ড প্রবেশ দ্বার দৃষ্ট হয়।

লঘুভারত পাঠে অবগত হওয়া যায়, মহারাজ লক্ষণ সেন রামপালে জন্মগ্রহণ করেন।

বাড়ীর মধ্যে একটী পুকুর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। লোকে তাহাকে অগ্নিকুণ্ড বলে। ঐ স্থানবাসীগণ বলে ইহা খনন করিলে প্রচুর পরিমাণে অঙ্গার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অগ্নিকুণ্ডে মহারাজ দ্বিতীয় বল্লালসেন সমুদয় পরিবারসহ আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন।

বাড়ীর দক্ষিণের পরিখার দক্ষিণ পারে এক বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দৃষ্ট হয়। লোকে ইহাকে রাজার বহির্ব্বাটী বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের দক্ষিণাংশেই সেই ব্রহ্মণাশীর্ব্বাদ-লব্ধ-জীবন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গজারি বৃক্ষ বর্ত্তমান আছে। মল্লকাষ্ঠ সম্বন্ধীয় উপাখ্যান কতদূর সত্য, সত্য হইলেও, এই গজারি গাছটী ব্রাহ্মণ-আশীর্ব্বাদ-সঞ্জীবিত সেই স্তম্ভ কিনা, তাহা নিরূপণ করা সম্ভবপর নহে। বৃক্ষটী বিশালদেহ নহে। ইহার গোড়ার বেড় ৪।৪॥ হাত হইবে। ৫।৬ হাত ঊর্দ্ধে উহা দুইটী মূল শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ঢাকা জেলার মধ্যে ভাওয়াল ব্যতীত অন্য কুত্রাপি শাল বা গাজারি বৃক্ষ দৃষ্ট হয় না।

রাজার বহির্ব্বাটীর দক্ষিণেই প্রসিদ্ধ রামপালের দীঘি। এই দীঘিটী উত্তরদক্ষিণে প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় সহস্র হস্ত প্রশস্ত। ইহার আয়তন দক্ষিণদিকে আরও বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কথিত আছে মহারাজ বল্লাল ভূপতি এই দীঘি কাটী খনন করাইয়া ছিলেন। একটী প্রচলিত কথাও ইহার সমর্থন করিতেছে (১)। এরূপ প্রবাদ কতদূর সত্য তাহা জানি না। শুধু দীঘিটীর নাম রামপাল নহে, একটী বিস্তৃত স্থানই রামপাল নামে অভিহিত।

বল্লাল বাড়ীর পশ্চিমে স্থিত রামপালের দরজার পশ্চিম পার্শ্বে অন্য একটী বৃহৎ জলাশয় পরিদৃষ্ট হয়। ইহাও দৈর্ঘ্যে সহস্র হস্ত, এবং প্রস্থে ৫।৬ শত হস্ত হইবে। ইহা "কোদালদহ" নামে পরিচিত।

বল্লাল বাড়ী ও রামপালের দীঘির পশ্চিম পার দিয়া উত্তর দক্ষিণ দিকে একটী প্রকাণ্ড রাস্তা আছে। উত্তরে ধলেশ্বরী নদী হইতে দক্ষিণে কীর্ত্তিনাশা নদী পর্য্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য ১০।১২ মাইল হইবে।

---

(১) "বল্লাল কাটায় দীঘি নামে রাম পাল"।

ইহার পাশ এখনও কোনও কোনও স্থানে ৩০।৩৫ হাত দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বল্লাল বাড়ীর পশ্চিম পরিখার পশ্চিম পার হইতে কোঁদালদহের উত্তর পার দিয়া পশ্চিমমুখে পদ্মাতীর পর্য্যন্ত আর একটী প্রশস্ত রাস্তারও ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত রামপালের দরজা হইতেই এই রাস্তার আরম্ভ হইয়াছে। এই রাস্তাটীও পদ্মাপার পর্য্যন্ত প্রায় ২৫।২৬ মাইল দীর্ঘ।

রামপাল যে বহুসৌধরাজিসমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ নগর ছিল, তাহার বহু নিদর্শন রামপাল ও তন্নিকটবর্ত্তী পঞ্চসার, দেওভোগ, বজ্রযোগিনী, সুখবাসপুর, জোড়া দেউল প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। রামপালের পূর্ব্বস্থিত পঞ্চসার গ্রাম হইতে পশ্চিমে মীর কাদিমের খাল, উত্তরে ফিরিঙ্গী বাজার ও রিকাবি বাজার হইতে দক্ষিণে মাকহাটীর খাল পর্য্যন্ত প্রায় ২৫ বর্গ মাইল ভূমির নিম্নভাগ ইষ্টকগ্রথিত বলিয়াই মনে হয়।

ভূমি খনন করিয়া সময়ে সময়ে অনেকে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও স্বর্ণ মুদ্রাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রায় ৫০ বৎসর অতীত হইল জোড়া দেউল নামক স্থানে এক মুসলমান, স্বর্ণনির্ম্মিত একটী তরবারের খাপ ও কয়েকটী স্বর্ণ গোলা পায়। রাজপুর নামক স্থানেও একব্যক্তি কয়েকটী প্রাচীন সুবর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। একবার সপ্তি সহস্র মুদ্রা মূল্যের একখণ্ড হীরক এস্থানে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া টেইলার সাহেব লিখিয়াছিলেন।

রামপালের সমৃদ্ধির সময় এখানে তাঁতি, শাখারী প্রভৃতি ব্যবসায়ী-গণের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থান নিরূপিত ছিল। রামপালের সৌভাগ্য অস্তমিত হইলে, পরে যখন জাহাঙ্গীরনগরের প্রতিষ্ঠা হইল, তখন তাহারা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তথায় যাইয়া বাস করিতে
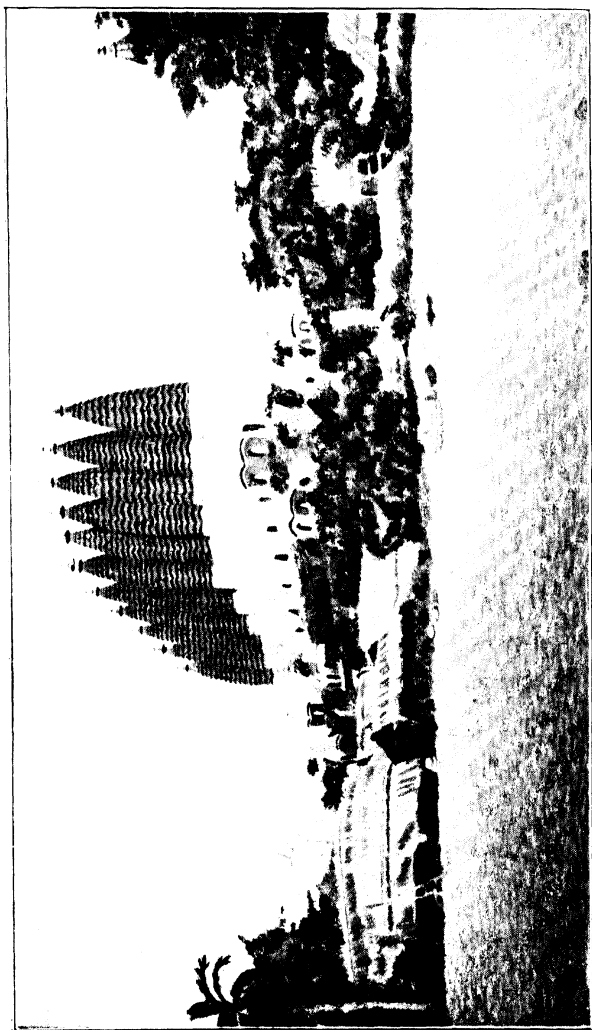
থাকে। এখনও শাখারী বাজার নামক স্থান ও শাখারী দিঘী রামপালের অদূরে দৃষ্ট হয়।

অনুমানিক ৪৪৭ শকাব্দে এই স্থানে অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শীলভদ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ নালন্দা বিহারের অধ্যাপক ছিলেন।

রাজনগর।

এই স্থান ঢাকা হইতে ২৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত ছিল; এক্ষনে উহা কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে। এই স্থানের পূর্ব্বনাম ছিল বিলদাওনীয়া। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ রাজবল্লভ এই স্থানে তদীয় রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া উহাকে রাজনগরে অভিহিত করিয়া ছিলেন। রাজনগরের "রঙ্গমহাল" "নবরত্ন" "পঞ্চরত্ন" "সপ্তদশরত্ন" ও "একুশরত্ন" প্রভৃতি সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি সৌন্দর্য্য ও স্থাপত্য কৌশলে বঙ্গদেশ মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দের মধ্য ভাগে সমগ্র বঙ্গভূমির মধ্যেই ইহার কীর্ত্তি গরিমা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে এই স্থান ধনে, জনে, বিদ্যায়, শিক্ষা, সম্ভ্রমে, দেশের আদর্শস্বরূপ বিবেচিত হইত। রাজবল্লভের অনন্তরবংশীয়গণের অবস্থা হীন হইয়া পড়িলে রাজনগরের গৌরব রামমৃত্যুঞ্জয়ের অধস্তন বংশীয়গণ দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছিল। রাজা রামমৃত্যুঞ্জয় খালসার দেওয়ান পদে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজনগরের প্রাসাদাদির অনুকরণেই শিবনিবাসের হর্ম্ম্যরাজী ঢাকাই শিল্পিগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রাজনগরের পুরাতন দীঘির পশ্চিমতটে চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত যে একটী প্রকাণ্ড

মেলার অধিবেশন হইত, উহা "কাল বৈশাখীর মেলা" বলিয়া বিখ্যাত ছিল। "সুখসাগর", "মতিসাগর", রাণীসাগর" "কৃষ্ণসাগর" "রাজসাগর" প্রভৃতি প্রকাণ্ড সরোবর রাজনগরের শোভা বর্দ্ধন করিত। ১২৭৮ সনে কীর্ত্তিনাশার তরঙ্গপ্রহারে রাজনগর নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে।

মহারাজ রাজবল্লভ স্বীয় প্রতিভা বলে সামান্য মোহরের পদ হইতে ঢাকার ডেপুটীনবাবী ও পাটনার সুবাদারী পদ পর্য্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর সাহ আলমের সহিত মীরজাফরের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাজবল্লভ অমিতবিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক বাদশাহী সৈন্য অযোধ্যা পর্য্যন্ত বিতারিত করিয়াছিলেন বলিয়া মুতাক্ষরীণকার লিখিয়াছেন। মীরণের মৃত্যুর পরে নবাবী সৈন্যের নেতৃত্ব রাজবল্লভের উপরেই ন্যস্ত হয়। ইংরেজ সেনানায়ক কাপ্তান ক্লাডিয়াস উক্ত যুদ্ধে রাজবল্লভের অধীনে থাকিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি "রায় রায়া সালার জঙ্গ" উপাধিতে ভূষিত হন। মীরণের মৃত্যু হইলে দেওয়ানী অথবা ডেপুটী নবাবপদে কাহাকে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে এই বিষয় লইয়া ইংরেজদিগের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। এক পক্ষ মীরকাসিমের পক্ষপাতী অপর পক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবল্লভের পক্ষপাতী হইয়া পড়ে। এই প্রতিদ্বন্দ্বীতার ফল বিষময় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরে মীরকাসিমই প্রথমতঃ দেওয়ানী পদ পরে নবাবী পদ লাভ করেন।

এ সম্বন্ধে মিঃ বিভারিজের উক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। "At this distance of time it is difficult, and perhaps hardly worth while to discuss whether Raj Bullav would not have been a better choice than Mir Kassim. I think, however that probably Hasting, choice was a mistake. Mir jaffir, favoured Raj Bullav and surely he had a right

to be consulted; and Raj Bullav's appointment was after all, more natural than Mir Kassim's. For it was not proposed to give Raj Bullav the power for himself. He was only to exercise it as guardian for Miran's infant son Sidu, who, I suppose was the undoubted heir. Mirjafer, therefore, would have had no jealousy of Raj Bullav, whereas Mir Kassim's appointment to the Dewanship at once made him fear that he would be deposed.

মীরকাসিমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতার ফলেই পরে রাজবল্লভের শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হয়।

লক্ষ্মণখোলা।

সোণারগাঁয়ের অন্তর্গত রাণীঝি নামক স্থানের অনতিদূরে অবস্থিত। এই স্থানে সেনবংশীয় লক্ষ্মণসেন স্বনামে একটী হাট বসাইয়াছিলেন।

সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস—স্বরূপচন্দ্র রায় প্রণীত।

লড়িকুল।

পদ্মা ও মেঘনাদের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে ঢাকা হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত বলিয়া মেজর রেণেল উল্লেখ করিয়াছেন। এই স্থানে একটী পর্ত্তুগীজ গীর্জ্জার ধ্বংসাবশেষ তিনি সন্দর্শন করিয়াছিলেন। এখানে পর্ত্তুগীজগণের লবণের কারবার ছিল। লড়িকুল এক্ষণে কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে।

এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত Rennell's memoirs নামক পুস্তিকার পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে, "The name of this place

may perhaps be Connected with the title of the Marquis of Lourical, who was in 1741 Viceroy of Goa &c &c. অর্থাৎ ১৭৪১ খৃঃ অঃব্দে গোয়ার গবর্ণর মার্কুইস অব লরিকেল এর নামানুসারে এই স্থানের নাম লড়িকুল রাখা হয়। কিন্তু এই অনুমান সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ Ven Den Brouche, De Barros এবং Blaev এর মানচিত্রে আমরা শ্রীপুরের সন্নিকটে "লুরকুলী" নামক স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাই। Blaev এর মানচিত্র ১৫৪১ খৃঃ অব্দে অঙ্কিত De Barros এর মানচিত্র হইতে গৃহিত হইয়াছে, সুতরাং ১৫৪১ খৃঃ অব্দে "লুরকুলি" (লড়িকুল) নামক স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে লুরকুলি লড়িকুলেরই অপভ্রংশ মাত্র; বৈদেশিকগণের হস্তলিখিত পুস্তকে দেশীয় স্থানসমূহের নামের এতাদৃশ বৈষম্য হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে পর্তুগীজগণ এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

মোগল শাসন সময়ে লড়িকুল একটী প্রধান নাবিস্থান ছিল।

নবাব সায়েস্তাখাঁর সময়ে সেখ জিয়াউদ্দিন ইউসুফ লড়িকুল বন্দরের দারোগা পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সাহায্যার্থে আবুল হোসেন (ইনি মীরজুমলার আসাম অভিযানে নৌযুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন) দেড়শত রণতরীসহ শ্রীপুরে অবস্থান করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। এই সময়ে মগেরা ফরিদপুরের পথ হইয়া লড়িকুলের সমীপবর্ত্তী হইলে আবুল হোসেন দেড়শত নৌবহর সহ উহাদিগকে আক্রমণ করেন। সংবাদ পাইয়া খিজিরপুর হইতে মহম্মদ বেগ অবকাশ আবুল হোসেনের সাহায্যার্থে এই স্থানে আগমন করেন।

মোগলের দুর্জ্জয় কামান মেঘমন্দ্রে গর্জ্জন করিয়া অগ্নিময় গোলক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই ভীষণ রণযজ্ঞে অনেক মগবীর জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছিল। ফলে মগেরা বিক্রমপুর অঞ্চল হইতে একেবারে বিতাড়িত হইল।

চট্টগ্রাম অভিযানের প্রাক্কালে এই স্থানের পর্ত্তুগীজ দিগকে স্ববশে আনয়ন করিবার জন্য নবাব সায়েস্তাখাঁ যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে লড়িকুলের দারোগা জিয়াউদ্দিন ইউসুফই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন।

শৈলাট।

ভাওয়ালের অন্তর্গত, শ্রীপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানে পালবংশীয় শিশুপাল রাজার নির্ম্মিত রাজ প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাজবাড়ীর বিস্তীর্ণ ও গভীর জলরাশি পরিপূর্ণ পরিখা, পরিখার মধ্যবর্ত্তী ভগ্ন ইষ্টকালয় সমূহ এবং রাজবাটীর সম্মুখস্থ পুষ্প বাটিকা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাজবাটীর চতুর্দ্দিকস্থ গভীর পরিখা এবং বৃক্ষ বাটিকা এবং বাটী হইতে প্রায় ১৬ হাত পরিমিত প্রশস্ত ইষ্টকনির্ম্মিত রাজপথ ও চতুর্দ্দিকস্থ প্রায় ৫ মাইল ব্যাপী অনেক প্রাচীন বাটীর ভগ্নাবশেষ এইস্থানে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থানের দক্ষিণপার্শ্বে শিশুপালের পুষ্পোদ্যান ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

শাইট হালিয়া।

শৈলাটের প্রায় ২ মাইল পূর্ব্বদিকে এই স্থান অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থান গভীর অরণ্যানি সঙ্কুলছিল। এই স্থানেও একটী প্রাচীন

রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহা দাস রাজার বাড়ী বলিয়া কথিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে রাশিকৃত ইষ্টকস্তূপ এই স্থানে বিদ্যমান আছে। এই স্থান হইতে "মাসের ডোব" নামক স্থান পর্য্যন্ত ইষ্টকনির্ম্মিত একটী সুপ্রশস্ত রাজপথের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থানটী ২ ক্রোশ ব্যাপী পরিখা-বেষ্টিত ছিল। এই স্থানে গোপী রায়ের পুষ্করিণী বলিয়া একটী দীর্ঘিকা আছে, উহার চারিটী পার ইষ্টকনির্ম্মিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫০ গজ হইবে।

শ্রীপুর।

সোনারগাঁ হইতে ৯ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে কালীগঙ্গার তীরে বিদ্যমান ছিল। ডাক্তার ওয়াইজ এই স্থানকে চড়ায় পরিণত দেখেন। তৎকালে উহা "শ্রীপুরেরটেক" নামে অভিহিত হইত। তথায় বাণিজ্যশুল্ক আদায়ের আফিস ছিল। সম্পূর্ণ স্থান পদ্মা-গর্ভে বিলীন হইয়া একটুকু-মাত্র যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাই শ্রীপুরেরটেক নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীপুরের সেই "টেক" কখন বা নদীর জলে, কখন বা চড়ায় বেষ্টিত থাকিয়া আপনার শীর্ণ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম রহিয়াছে। এক্ষণেও এই টেকের চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

১৮২২ খৃঃ অব্দে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট পিটারসন সাহেব ঢাকা জেলার দুর্গ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট করেন তাহা পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে চণ্ডীপুরের নিকট একটী প্রাচীন কেল্লা ছিল, উহা শ্রীপুরের কেল্লা বলিয়া বিবেচিত হইত। মেজর রেণেল এই প্রসিদ্ধ স্থানটী সম্বন্ধে কোন কথাই লিপিবদ্ধ করেন নাই।

শ্রীপুরেই দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চাঁদ ও কেদার রায়ের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। চাঁদ ও কেদার রায়ের

কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াই পদ্মার এই অংশ কীর্ত্তিনাশা নামে অভিহিত হইয়াছে।

শ্রীপুরের রায় রাজগণের রাজপ্রাসাদ, সৈনিকাবাস, বিচারালয়, কারাগার, কোষাগার এবং অন্যান্য যাবতীয় রাজোচিত বন্দোবস্ত বিদ্যমান ছিল। তৎসন্নিহিত আড়াকুল বাড়িয়া নামক স্থানে বিস্তৃত বন্দর এবং কোটীশ্বর পল্লিতে দেবালয় ছিল। এই স্থানগুলি কালীগঙ্গা নদীর তটে সংস্থাপিত ছিল। (১) জনপ্রবাদ যে, ক্রোড় টাকা বেদী মূলে প্রোথিত করিয়া তদুপরি একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়, এজন্য ঐ শিবলিঙ্গের নাম হয় কোটীশ্বর। পরে স্থানের নামও কোটীশ্বর হইয়া দাড়ায়। এই কোটীশ্বর পল্লিতে রায় রাজগণ কর্ত্তৃক দশমহাবিদ্যা এবং স্বর্ণ নির্ম্মিত দশভূজা মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। সাধারণে উহাকে স্বর্ণময়ী বলিত।

সা সুজা বঙ্গদেশ হইতে চির বিদায় গ্রহণকালে এই স্থানে আগমন করিয়াই আরাকান রাজের প্রেরিত নৌবাহিনীতে আরোহণ করিয়াছিলেন।

কার্ভালোর সহিত আরাকান রাজ সেলিম সার জলযুদ্ধে তদীয় রণতরী সমূহ বিধ্বস্ত হইলে কার্ভালো তাহার রণতরী সমূহের সংস্কার সাধন জন্য এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মোগল শাসন সময়ে এই স্থানে একটী থানা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সারজন হারবার্ট সোনারগাঁ, বাকলা, শ্রীপুর, ও চাটিগা প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী ও বহু জনাকীর্ণ নগরী সমূহের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রালফ ফিচ ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে বাকলা হইতে শ্রীপুর হইয়া সোনারগাঁয়ে

---

(১) রেণেল এই স্থানের কালীগঙ্গা নদীকে "শ্রীপুর গঙ্গা" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "শ্রীপুর গঙ্গানদীর পারে, রাজার নাম চাঁদ রায়; তাহারা সকলেই জেলালউদ্দিন আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। ইহার কারণ এই যে, এই স্থানে এত নদী ও দ্বীপ আছে যে তাহারা একস্থান হইতে অন্য স্থানে পলায়ন করিতে পারে সুতরাং আকবরের অশ্বারোহী সৈন্যেরা তাহাদের কিছুই করিতে পারে না। এখানে বিস্তর কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়"।

রালফ্ফিচ ১৫৮৬ খৃঃ অব্দের ২৮শে নবেম্বর শ্রীপুরে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক এই স্থান হইতেই পোতারোহণে পেগুতে প্রস্থান করেন। রেণেলের মানচিত্রে কালীগঙ্গার নামও চিত্র প্রদর্শিত হইলেও ঐ সময়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে কোটীশ্বর ও শ্রীপুর নগরী নদী গর্ভে বিলীন হইয়া যাওয়ায় তাহাদের নাম উহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই।

সমতট।

বরাহ মিহির কৃত কূর্ম্ম বিভাগ গ্রন্থে বঙ্গ, উপবঙ্গ, ও সমতট পৃথক দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। "তবকৎ-ই-নাসিরী" গ্রন্থে সমতটের সনকট বা সাঁকট নাম লিখিত আছে।

ফাহিয়ানের সময়ে সমতট সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল।

মহারাজ সমুদ্র গুপ্তের শাসনাধীনে বঙ্গদেশের সমতট ও ডবাক রাজ্য গঠিত হইয়াছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। সমুদ্র গুপ্তের মৃত্যুর পরে সমতটের সামন্ত রাজগণ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ পর্য্যটক ইৎচিং সমতট-রাজ হো-লো-শে-পো-তোর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইৎচিং এর মতে সমতট পূর্ব্ব ভারতে অবস্থিত। সপ্তম শতাব্দের শেষার্দ্ধে সেঙ্গচি নামক একজন চৈনিক পরিব্রাজক সমতটে আগমন করেন। ঐ সময়ে রাজভট সমতটের সিংহাসনে সমাসীন
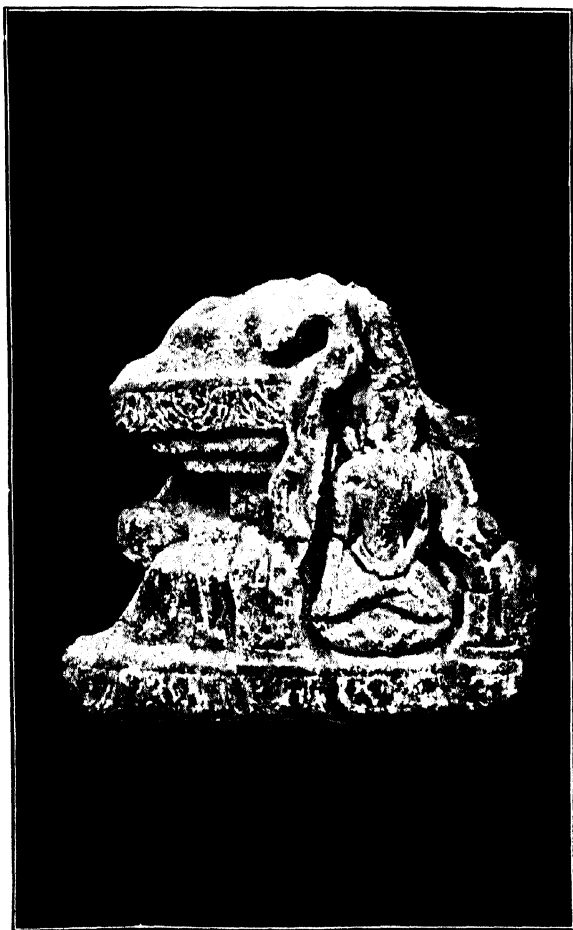
সাভারে প্রাপ্ত ইষ্টকে খোদিত ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি।

ছিলেন। ফার্গুসন সাহেব সমগ্র ঢাকা জেলাকেই সমতট আখ্যা প্রদান করিতে সমুৎসুক। ওয়াটার্সের মতে উহা ঢাকার দক্ষিণে ও ফরিদপুরের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত ছিল। ওয়াটার্সের মতই আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

সাভার।

বংশী নদীর পূর্ব্বতীরে, ধলেশ্বরী ও বংশী নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে, ঢাকা হইতে ১৩ মাইল বায়ুকোণে সংস্থিত। ধলেশ্বরীর প্রবাহ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া সাভারের কিয়দংশ বুভুক্ষু নদীর কুক্ষিগত হইলেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এখনও এই পল্লিটী ধলেশ্বরী ও বংশী নদীর সঙ্গমস্থলে এবং বংশী নদীর পূর্ব্বতটেই অবস্থিত রহিয়াছে।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থান সম্ভার বা সম্ভাগ প্রদেশের রাজধানী ছিল। ধামরাইর উত্তরপশ্চিম কোণৈক দেশে সম্ভাগ নামে যে একটি ক্ষুদ্র পল্লি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা অদ্যাপি সম্ভাগ প্রদেশের অতীত স্মৃতি জাগরূক রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

ধামরাই প্রভৃতি স্থানও যে তৎকালে এই সম্ভার প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ নৃপতিগণের শাসনাধীনে সম্ভার প্রদেশ বিপুল বৈভব ও প্রতাপে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু এই প্রাচীন স্থানের ঐতিহাসিক তথ্য এবম্বিধ জটিল প্রবাদকাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে যে, তাহা হইতে প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির উদ্ঘাটন করা এক্ষণে সহজসাধ্য নহে। পরবর্ত্তী রাজা হরিশ্চন্দ্র এবং কর্ণধার কীর্ত্তিকাহিনীতেই সমুদয় প্রাচীন সত্য আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। আমরা এই স্থানের বর্ত্তমান কালের মোটামোটি একটি নক্সা এবং রাজাসনে প্রাপ্ত বিবিধ কারুকার্য্যখচিত কয়েকখানা ইষ্টকখণ্ডের প্রতিলিপি প্রদান করিলাম।

প্রাচীন সম্ভাগরাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, এই স্থান পরবর্ত্তী কালে সর্ব্বেশ্বর নগরী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। পালবংশীয় রাজন্যবর্গ বহুকাল পর্য্যন্ত এতদঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, পাল-বংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র পাল মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে আগমন করিয়া এই স্থানে স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সর্ব্বেশ্বর নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল।

সর্ব্বেশ্বর নগরের পূর্ব্বাংশে "বলীমেহার" নামক স্থানে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরিখাবেষ্টিত অন্তঃপুরের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। মোসলমান শাসন সময়ে বলীমেহার, "মসজিদপুর" ও "ইমামদীপুর" এই উভয়বিধ নাম ধারণ করে। প্রাচীন রাজধানীর অট্টালিকাসমূহের অধিকাংশ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে; এখনও মৃত্তিকা খনন করিলে নানা বর্ণের প্রস্তর ও বিবিধ আকারের ইষ্টকাদি নয়নগোচর হইয়া থাকে। বলীমেহার এখন ছোট বলীমেহার ও বড় বলীমেহার এই দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে।

রাজান্তঃপুরের উত্তরে কাটাগাঙ্গ নামে একটী পরিখা আছে। বংশী-নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া উহা পূর্ব্বাভিমুখে সাগরদীঘির উত্তর তীর পর্য্যন্ত আসিয়াছে; তথা হইতে উত্তরবাহিনী হইয়া রাজবাটী হইতে ২ মাইল উত্তরে বংশীনদীর সহিত পুনরায় মিলিত হইয়াছে। এই পরিখাটীর পরিসর বর্ত্তমান সময়ে প্রায় ৩০।৩৫ হাত হইবে।

যে স্থানে রাজার গোমহিষাদি ও গোপালকেরা বাস করিত, তাহা "গোপেরবাড়ী" নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থান রাজাসনের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে এবং সাধাপুর গ্রামের উত্তরে অবস্থিত। গোপেরবাড়ীর দক্ষিণে এবং সাধাপুরের সংলগ্ন উত্তর দিকে রাজার মালী বাস করিত বলিয়া ঐ স্থান "মালীবাড়ী" আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে স্থানে রথযাত্রা হইত
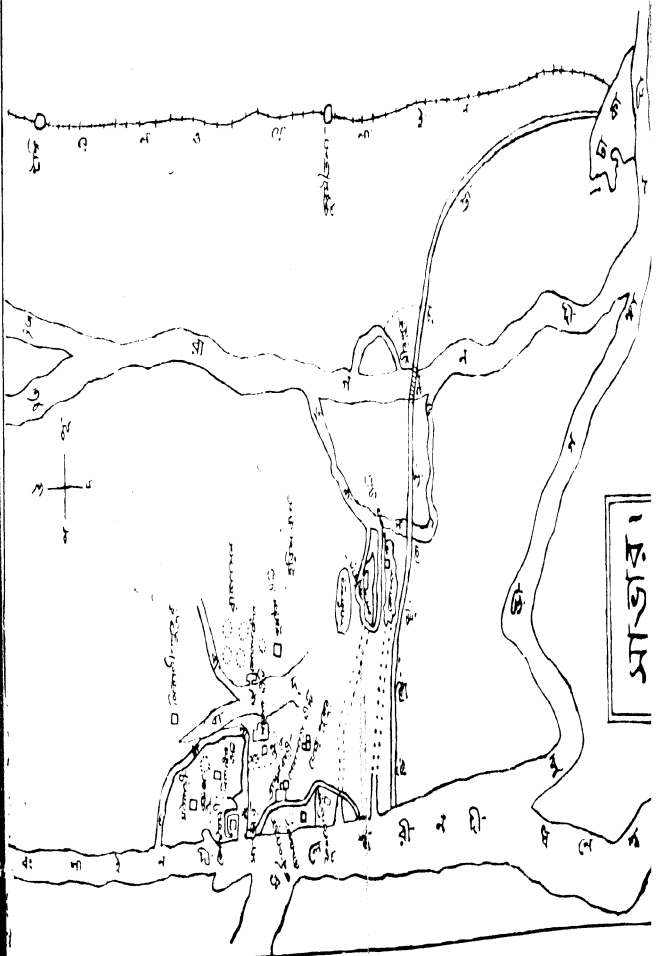
তাহা "রথখোলা" নামে পরিচিত। রাজধানীর প্রায় এক ক্রোশ দূরে এখন যে স্থান "ফুলবাড়ীয়া" বলিয়া পরিচিত, তথায় রাজার অতি বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ফুলবাড়ীয়া একটী গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে।

যে স্থানে রাজা প্রতিদিন স্নানকার্য্য সমাধা করিতেন, তাহা এখনও "রাজাঘাট" নামে অভিহিত হয়। রাজাঘাটের পার্শ্ববর্ত্তী নদী এখন প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। যে একটী ক্ষীণ পয়ঃপ্রণালীর রেখা রাজাঘাটের সন্নিকটে বিদ্যমান আছে, তাহা বর্ত্তমান তুরাগ নদীর একটী উপশাখা মাত্র। রাজাঘাট এখন একটী গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানের মৃত্তিকাভ্যন্তরে ইষ্টকবিনির্ম্মিত সোপানাবলীর ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

রাজধানীর উত্তরসংলগ্ন দুর্গমধ্যে রাজার সৈন্যসামন্ত অবস্থান করিত। বর্ত্তমান সময়ে উহা "কোঠবাড়ী" নামে অভিহিত হইয়া থাকে (১)। উহা আধুনিক সাভারের উত্তরে অবস্থিত। উচ্চ মৃৎস্তূপসমন্বিত গভীরপরিখাবেষ্টিত এই স্থানটীকে দূর হইতে একটী ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট পাহাড়ের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই মৃৎস্তূপটীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪২০ ফিট, প্রস্থ ৩৮৮ ফিট এবং উচ্চতা কিঞ্চিদধিক ২৫ ফিট হইবে। এই স্তূপের মধ্যভাগে ৩।৪ হাত নিম্ন একটী গহ্বর ছিল। বিপক্ষগণ নদীগর্ভ হইতে গোলাবর্ষণ করিলে সৈন্যগণ এই গহ্বরমধ্যে অবস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত। কোঠবাড়ীর দক্ষিণ-

(১) রাঢ় হইতে বাগোড়া সমাগত দ্বিতীয় ভানুদত্তের বংশধর বংশীধর দত্ত কর্ণর্থা সমগ্র সিলিম প্রতাপ পরগণার আধিপত্য লাভ করেন। এই দুর্গটী উক্ত বংশীধর দত্তেরই নিজস্ব দুর্গ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বাংশে "ভাওাইবিল" নামক একটী বিল আছে। এই বিলভূমির মধ্যস্থান উচ্চ মৃৎস্তূপপরিবেষ্টিত।

যে স্থানে সেনানিবাস ছিল, তাহা "সেনাপাড়া" এবং বিস্তৃত জলাশয়টী সেনাপাড়ার পুষ্করিণী বলিয়া বিখ্যাত। সেনানিবাসে সৈন্য-সামন্ত এবং সেনাপতি বাস করিতেন। সেনাপতির বাড়ীর চতুর্দ্দিক পরিখাবেষ্টিত ছিল। এখনও উহার চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। সেনা-পাড়াকে অনেকে এখন "কাতলাপুর" বলিয়া থাকেন। কাতলাপুর সাভারের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের দুই মহিষী ছিল। তাঁহাদের একের নাম কর্ণাবতী এবং অপরের নাম ফুলেশ্বরী। ইহাদের উভয়েরই নিজ নিজ বিলাসভবন ছিল। যে স্থানে কর্ণাবতীর বিলাসভবন ছিল, তাহা কর্ণপাড়া (১) বলিয়া পরিচিত। রাজার বিস্তীর্ণ পুষ্পোদ্যান মধ্যে যে স্থানে ফুলেশ্বরীর বিলাসভবন ছিল, তাহা ফুলবাড়ীয়া বা রাজফুলবাড়ীয়া নামে পরিচিত। কর্ণপাড়া সাভার হইতে প্রায় এক মাইল দূরে এবং ফুলবাড়ীয়া কর্ণপাড়া হইতে প্রায় এক মাইল অন্তর অবস্থিত।

কর্ণপাড়ায় এখনও একটী উচ্চ মৃৎস্তূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই স্থান রাজার "তাম্বুলবাড়ী" বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে আমাদিগের নিকটে উহা একটী বিশাল চৈত্যের ভগ্নাবশেষ বলিয়া অনুমিত হয়। সম্ভারে বৌদ্ধপ্রভাবকালে এই চৈত্য হইতে ভগবান অমিতাভের অমৃতনিঃস্যন্দিনী বাক্যাবলী প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত সন্দেহ নাই। এই স্তূপের তলস্থ ভূমির পরিমাণ একবিঘার ন্যূন নহে। ভিত্তি প্রায় অর্দ্ধ বিঘা পরিমিত জমিতে সংস্থিত। এখনও এই

(১) কেহ কেহ অনুমান করেন, কর্ণধার নামানুসারে এই স্থানের নাম কর্ণপাড়া হইয়াছে।

স্তূপটীর উচ্চতা ১৫।১৬ হাত হইবে। কর্ণপাড়ার দক্ষিণ দিকে রাজ-গুরুর আশ্রম ছিল। এই স্থানের অনতিদূরে একটী জলাশয় বিদ্যমান আছে; উহা "জিয়সপুকুর" বলিয়া পরিচিত। ইহা রাজগুরুর পুকুর বলিয়াও অভিহিত হয়। এই পুকুরের সোপানাবলীর ভগ্নাবশেষ অতি অল্প দিন হইল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এতদঞ্চলবাসী রমণীগণ সন্তান কামনায় এই পুকুরে পূজা দিয়া থাকে।

রাজধানীর অভ্যন্তরে ও বাহিরে ৫০ টী জলাশয় আছে; তাহা লোকে "সাড়েবারগণ্ডা" বলিয়া থাকে। রাজমহিষীদ্বয় যে পুকুর খনন করাইয়াছিলেন তাহা "সতিনীপুকুর" বলিয়া খ্যাত। বিধবা রাজমাতা যে পুকুর খনন করান, তাহার নাম "নিরামিষ পুকুর"। এতদ্ব্যতীত "আমিষপুকুর," "কোদালধোয়া" "দোয়াতধোয়া," "রাজ-দীঘি," "সাগরদীঘি," "সুখসাগর" প্রভৃতি অনেক সুবৃহৎ জলাশয় বিদ্যমান থাকিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের কীর্ত্তিকলাপের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে।

সাগরদীঘির পূর্ব্বতীরে রাজার বাগান ছিল, উহা "রাজবাড়ীর বাগিচা" বলিয়া পরিচিত। এই সাগরদীঘি হইতেই বরাবর দক্ষিণাভি-মুখে একটী পয়ঃপ্রণালী মীরপুর গ্রামে তুরাগ নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। উহা "বিলবাঘিল" নামে অভিহিত হয়।

নিরামিষ দীঘির উত্তরপূর্ব্বে কাটাগাঙ্গের পশ্চিমে প্রায় বিংশতি হস্ত উচ্চ একটী মৃৎস্তূপ বর্ত্তমান আছে। স্তূপের উপরে ইষ্টকবাধান দুইটী কূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানটী "নহবৎখানা" বলিয়া কথিত হয়। এই নহবৎখানার উত্তরপশ্চিমে মঠবাড়ীর পুকুর। ইহার তীরদেশে একটী অভ্রভেদী মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মঠাভ্যন্তরে ভগবান অমিতাভের সুমধুরবাণী প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইত।

"ছাইলা কাসমা" নামক স্থানে লম্বা প্রাচীরাকার উচ্চমঞ্চে চাঁদমারী অর্থাৎ সৈন্যদিগের তীর চালনা করিয়া লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিবার স্থান ছিল। এই স্থানটী রাজধানী হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যবধান। "গুলাইল বাড়ী" নামক স্থানে "গুলালি" সৈন্যগণ অবস্থান করিত। দগ্ধ মৃত্তিকায় প্রস্তুত কতিপয় গুটিকার ভগ্নাবশেষ আমরা এই স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছি।

"চাইরা চৌমাথা" ও "মেরীখোলা" নামক স্থানে দুইটী প্রসিদ্ধ বাজার ছিল। চারিটী বিস্তীর্ণ পথের সঙ্গমস্থলে পূর্ব্বোল্লিখিত বাজারটী সংস্থাপিত ছিল বলিয়া উহা "চাইরা চৌমাথা" বাজার বলিয়া অভিহিত হইত।

অদুনা ও পদুনা নাম্নী হরিশ্চন্দ্রের কন্যাদ্বয় পেটিকা নগরের গোবিন্দচন্দ্রের সহিত পরিণীতা হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। ধর্ম্মানুসারে তিনি বার্দ্ধক্যে বনে গমন করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের ভাগিনেয় দামুরাজা ও তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ রাজ্যশাসনপ্রণালীতে ততদূর অভিজ্ঞ না থাকায় রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। ক্রমশঃই রাজ্যের অবনতি হইতে থাকে। হরিশ্চন্দ্র হইতে অধঃস্তন দ্বাদশ পুরুষ শিবচন্দ্র নীলাচলে পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নানাতীর্থ ভ্রমণ করেন। তিনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী ও পরম ভক্ত ছিলেন। শিবচন্দ্রের পরে রাজবংশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়ে। বিশাল রাজবাটীর অধিকাংশই পতিত ও জঙ্গলময় হইয়া পড়াতে রাজবংশীয়েরা সর্ব্বেশ্বর নগরী পরিত্যাগ করিয়া ফুলবাড়ীয়ার নিকটবর্ত্তী কোণ্ডা, গান্ধারিয়া, চান্দুলিয়া প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে থাকেন। শিবচন্দ্রের পরবর্ত্তী একাদশ পুরুষ তরুরাজ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। তরুরাজের পুত্রচতুষ্টয় গুভরাজ,

যুবরাজ, বুদ্ধিমন্ত ও ভাগ্যবন্ত নামে পরিচিত। শুভরাজ ও যুবরাজ পিতার সহিত হুগলীতে বাস করিতেন। পিতার মৃত্যুর পরে তাঁহারা তথায়ই বাস করিতে থাকেন। তাহাদের বংশধরগণ সেনাবাড়ীর চৌধুরী উপাধি ধারণ করিয়া সেনাবাড়ী নামক স্থানে বাস করিতেছেন।

বুদ্ধিমন্ত ও ভাগ্যবন্ত রায় নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন। ভাগ্যবন্ত রায় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। মোসলমান সংশ্রবদোষে জাতিপাত বিবেচনা করিয়া তিনি সমাধিযোগে তনুত্যাগ করেন। তিনি সাভার ও ফুলবাড়ীয়ার নিকটবর্ত্তী কোণ্ডা নামক গ্রামেই সমাহিত হন। সমাধিস্থ মহাপুরুষ "খন্দকার" এবং সমাধিমন্দির "খন্দকারের দরগা" বলিয়া খ্যাত।

কোণ্ডা গ্রামের ভাগাবন্তপাড়া ভাগ্যবন্তের প্রতিষ্ঠিত। ইহার সংলগ্ন "বুরুজের টেক" সকলের পরিচিত। এইস্থানে সান্ত্রীপ্রহরী নিযুক্ত থাকিত।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজসিংহাসন যে স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহার নাম রাজাসন; কেহ কেহ ইহাকে "বাজাসন" বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকেন। এই বাজাসন, নান্নার এবং সুয়াপুরের বাজাসন বা বজ্রাসন হইতে পৃথক্। প্রাচীনকালে এই স্থানেও একটী বৌদ্ধ বিহার বা চৈত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজাসন হইতে ভবাক রাজ্যে যাতায়াতের নিমিত্ত সাগরদীঘি হইতে তুরাগ ও বুড়ীগঙ্গা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী খাল খনিত হইয়াছিল। ইহার আংশিক চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজাসনে পিলখানার ঘাট বলিয়া একটী স্থান আছে; ইহাতে অনুমিত হয়, এখানে রাজার পিলখানা ছিল। রাজাসন বর্ত্তমানে একটী গ্রামে পরিণত হইয়াছে। সাভার এবং সাভারের উত্তরস্থলে জঙ্গলময় ভূখণ্ডে

রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীর চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, রাজাসন হইতে তাহা প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। ইহাতে অনুমিত হয়, রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীর সীমা নিতান্ত ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট ছিল না।

ফুলবাড়ীয়া হইতে একক্রোশ পূর্ব্বে এবং রাজাসন হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে গান্ধারিয়া গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামের চতুর্দ্দিক পরিখা-বেষ্টিত ছিল। পরিখাটী পূর্ব্ব দিকে দুইটী শাখা দ্বারা তুরাগ নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পশ্চিমদিক হইতে আর একটী পয়ঃপ্রণালী বংশী নদী হইতে বহির্গত হইয়া পরিখার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এই পরিখাবেষ্টিত স্থান মধ্যে একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহা রাবণ রাজার বাড়ী বলিয়া কথিত হয়। ইনি হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক; রাবণ ভূপতি সঙ্গীতকলাভিজ্ঞ ছিলেন। তদীয় প্রাসাদ সঙ্গীতজ্ঞের আশ্রয়স্থল ছিল। তৌর্য্যত্রিকি সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনাস্থল বলিয়া তদীয় সভা দেশবিখ্যাত ছিল। ইহার বহুসংখ্যক ঢালী সৈন্য ছিল। "ঢালিপাড়া" বলিয়া একটী স্থান ইহার সন্নিকটে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

সোনারগাঁও।

ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন প্রবাহ হইতে ২ মাইল দূরে অবস্থিত। অধুনা এই স্থান পানাম নামে পরিচিত। এই স্থানেই পাঠান রাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহারা ইহাকে হাবেলী সোনারগাঁ বলিয়া অভিহিত করিতেন। সোনারগাঁর রাজধানী অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। রাজ-প্রাসাদের সদর দরজায় সুবিস্তৃত পরিখার উপরে একটী চলৎসেতু সর্ব্বদা বিস্তারিত থাকিত; রাত্রিযোগে উঠাইয়া রাখিলে কাহারও পুরী-প্রবেশের উপায় ছিল না। পরিখার উপরিস্থিত একটী প্রাচীন সেতুর সম্মুখভাগে তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাত্রি-কালে এই তোরণদ্বার আবদ্ধ থাকিত; সুতরাং দিবাভাগ ভিন্ন নগরে

প্রবেশ করিবার অথবা তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার অন্য উপায় ছিল না।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দে আফ্রিকা দেশীয় পর্য্যটক ইবন বতুতা "দুর্ভেদ্য, দুরাক্রম্য, সোনারগাঁ" নগরীতে উপস্থিত হইয়া তথাকার বন্দরে যাবা দ্বীপে গমনোদ্যত বাণিজ্যতরণী দেখিতে পান। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, তৎকালে সুবর্ণগ্রাম সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যস্থান ছিল। সুবর্ণ-গ্রামে অনেক সাধু, বিদ্বান ও রাজনৈতিকের আবাসভূমি ছিল। রাজা কংসনারায়ণের পুত্র যদুনারায়ণ হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জেলালুদ্দিন নাম ধারণ করেন। এই সময়ে তিনি মোসলমান ধর্ম্মের প্রকৃত উপদেশ ও রাজ্য সুশাসিত করণের সুযুক্তি লাভার্থ এই স্থান হইতে সেখ জাহিদকে গৌড়ে আনয়ন করেন।

১৫৮৬ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী রাল্‌ফ ফিচ্‌ সুবর্ণগ্রামে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, "শ্রীপুর হইতে সোনারগাঁও সহর ৬ লিগ দূরে অবস্থিত। এই স্থানে সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এখানকার প্রধান রাজার নাম ঈশাখাঁ। তিনি অন্যান্য সমুদয় রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। খৃষ্টানদিগকে তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানকার ঘরগুলিও ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট এবং খড় দ্বারা আবৃত। দরমা দ্বারা চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত। ইহা হইতেই ব্যাঘ্রভল্লুকের উৎপাত হইতে রক্ষা পায়। অধিকাংশ লোকই ধনবান; অধিবাসীরা মাংসাশী নহে, অথবা কোনরূপ জীব হিংসা করে না। চাউল, দুগ্ধ, ফলমূলাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে। কটিদেশে সামান্য একটু বস্ত্র জড়াইয়া রাখে, শরীরের আর সমুদয় স্থান অনাবৃত থাকে। অনেক কার্পাস বস্ত্র এইস্থান হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। এতদ্ভিন্ন ধান্য, চাউল ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে,

সিংহল, পেগু, মালাক্কা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়াও উদ্বৃত্ত হয়।” পিটার হেলিন এই স্থানটী দ্বীপ মধ্যে, গঙ্গার প্রধান প্রবাহের তীরে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মেজর রেণেল তদীয় মেময়ের এ এইস্থান গ্রামে পরিণত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দে ডাঃ বুকানন সুবর্ণগ্রামে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, “সুবর্ণগ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে”। উদ্ধবগঞ্জকেই তিনি রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন কলাগাছিয়ার দক্ষিণে সোনারগাঁও নগরী অবস্থিত ছিল বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। সুবর্ণগ্রামের অবস্থান সম্বন্ধে তিনি যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ কলাগাছিয়ার দক্ষিণে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীপুর নগরী বিদ্যমান ছিল। পদ্মার ভীষণ তরঙ্গাঘাতে ঐ সময়ের কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বেই শ্রীপুর ধ্বংস হইয়া যায়।

পাঠান শাসন সময়ে সোনারগাঁ “হজরৎই জালাল” নামে অভিহিত হইত।

Ibn Batuta : Translation P. 194 and 195.
Montgomery Martin's Eastern India.
Bowrey : Hakluyt's Society Series II. Vol. XII.
Cunnigham's India : Archeological Reports Vol. XV., P. 135.
Murray's Discovery in Asia Vol. II. Ch. 99.
Cosmographie of Peter Heylyn.

হাইড়া।

দেওয়ান মসনদ আলীর বংশ নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িলে, সোনারগাঁর হাইড়ার চৌধুরীদিগের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। এই চৌধুরীবংশ বিশাল

ভূভাগের জমিদার ছিলেন। ইহাদিগকে ৮২০০০৲ টাকা রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। ঈশাখাঁর সময়ে চৌধুরীবংশের জমিদারী আরম্ভ হইয়াই মানোয়ারখাঁর মৃত্যুর পরে ইহাদের প্রবল প্রতাপ দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই বংশীয় কীর্ত্তিমান হরিদাস রায়চৌধুরী ও তদ্বংশধরগণ অসীম প্রতাপে প্রায় এক শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত স্বাধিকার শাসনের পর তাঁহার প্রপৌত্র শিবরাম এবং তৎপুত্র কাশীরাম রায়, প্রকৃতিমণ্ডলী ও অধীনস্থ তালুকদার, জিম্বাদার, মহালদার প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকের উপর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন। ফলে, উভয়ে নবাব সরকারে নীত ও বন্দীকৃত এবং বিচারে সম্‌সের (তরবারি) বা খোরেস্ (খানা) উভয়ের অন্যতর অবলম্বন করিতে হইবে বলিয়া আদিষ্ট হন। কাশীরাম সম্‌সের স্বীকার করিলে তাহার শিরশ্ছেদন হয়। শিবরাম মোসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। ইহার পরে চৌধুরীবংশ ক্ষীণবল হইয়া পড়েন।

হাজিগঞ্জ।

নারায়ণগঞ্জের সন্নিকটে লাক্ষ্যানদীর তীরে অবস্থিত। রেণেলের ১৭ নং মানচিত্রে এই স্থানে একটী দুর্গের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। তাহা কেল্লা বলিয়া লিখিত আছে। হাজিগঞ্জের দুর্গ মীরজুমলা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ষ্টুয়ার্টপ্রমুখ ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় প্রবাদ এই যে সোনাবিবি (চাঁদ রায়ের কন্যা; ঈশাখাঁ ইহার নাম দিয়াছিলেন আলি নেয়ামত বিবি) এই দুর্গে থাকিয়া, সুবর্ণগ্রাম আক্রমণকারী মগদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরিশেষে যুদ্ধে পরাজিত হইবার প্রাক্কালে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া শত্রু-হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।

বর্ত্তমানে ইহা হাকেজমঞ্জিল নামে অভিহিত হইতেছে। ঢাকার

স্বর্গীয় নবাব খাজে আসান উল্লা বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বেহেস্তগত খাজে হাফেজ উল্লার নামানুসারে ইহা হাফেজমঞ্জিল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে দুর্গের প্রাচীর গাত্র সংলগ্ন হইয়া রাজপথ চলিয়াছে।

হাতীবন্দ।

বানার এবং লাক্ষ্যা নদীদ্বয়ের সংযোগস্থলে, একডালার অনতিদূরে অবস্থিত। এইস্থান পূর্ব্বে আন্তোমেলা নামে পরিচিত হইত। টলেমী আন্তিবলের সহিত এই স্থান অভিন্ন মনে করেন। পালবংশীয় ভূপালগণ এই স্থানে খেদা নির্ম্মাণ করিয়া হস্তী ধৃত করিতেন বলিয়া উহা হাতীবন্দ বা হাতীমল্ল বলিয়া কথিত হইত।

Dr. Taylor's Topography of Dacca.

হামছাদী।

সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত এই গ্রামে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা কৃষ্ণদেব সেন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমতঃ নবাব সরকারে বক্সী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া বক্সী নামে সুপরিচিত। কৃষ্ণদেবের কীর্ত্তির মধ্যে হামছাদী গ্রামে কৃষ্ণসাগর, রামসাগর, পিলখানা ও যাত্রাবাড়ীর দুর্গের ভগ্নাবশেষে বর্ত্তমান আছে।

হোসেনপুর।

মেজর রেণেল এই স্থানকে ওসমপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে তিনি এই স্থানে একটী পর্ত্তুগীজ গীর্জ্জার ভগ্নাবশেষ সন্দর্শন করিয়াছিলেন। গ্রামটী ঢাকা হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী উত্তরপূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। এই গ্রামের নিম্ন দিয়া একটী খাল ব্রহ্মপুত্র হইতে প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্বদিকে সিলেট নদীর সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

এই স্থানের গীর্জ্জার বিষয় হাণ্টার সাহেব উল্লেখ করেন নাই। List of Ancient Monuments গ্রন্থেও এই বিষয়ে কিছুই লিখিত হয় নাই।

Pere Barbier ১৭২৩ খৃ: অব্দের ১৫ই জানুয়ারীর একখানা চিঠিতে উসুমপুরের উল্লেখ করিয়াছেন। এই পত্র Lettres edifiantes et Curieuses (Tome XIII. p. 272) সংজ্ঞক পত্রাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এই স্থানে মোগল সম্রাটের অনেক পর্ত্তুগীজ কর্ম্মচারীর আবাসস্থান বলিয়া তাহাতে লিখিত হইয়াছে। Pere Barbier স্বয়ং Bishop Laynez এর সহিত ১৭১৪ খৃ: অব্দে এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

পরিশিষ্ট (ক) ।

প্রশস্তি-পরিচয় ।

আসরফপুরের তাম্রশাসন ।

১ম

(১) স্বস্তি । জয়ত্যবিদ্যাহতি হেতু ভূত সংতীর্ণ সংসার মহাম্বুরাশি অম্বুস্তরা বা f (প্ত) * * *

(২) * * * ভগবা (ং) মুনীন্দ্র । জয়ত্যশেষ ক্ষিতিপাল মূলি (১) মালা মণি দ্যোতিত পাদপীঠ * * *

(৩) (পাদ) প্রণতোত্তমাংগ শ্রীদেবখড়্গো নৃপতি র্জ্জিতারিঃ । টল্যো-স্থানি কাতরলা সং * * *

(৪) (মহা) দেবী শ্রীপ্রভাবত্যা ভূজ্যমাণক পাটকদ্বয় ভস্তদীকা (ভট্টারিকা ?) (শু) ভং (হং) সুকারা ভূজ্য * * *

(৫) কখোদার চোরকে শ্রীমিত্রাবল্যাঃ সামন্ত-বাপ্টি যোকেন ভূজ্যমানক হর্ষ * * *

(৬) (রে) লতলকে শ্রীনেত্রভটেন ভূজ্যমানকহর্ষ পাটক পরানাটন-নাদবর্মি * * *

(৭) ৎপলশতৈ দশ দ্রোণ বাপা শিব হ্রদিকা শোগ্গ বর্গে নর্ত্তকী অর্ধ পাটক * * *

(৮) * * শ্রীমেতে শ্রীশর্বান্তরেণ ভূজ্যমানক মহত্তর শিখরাদিভিঃ কৃষ্যমা * * * (২)

---

(১) মৌলি । (২) কৃষ্যমাণক ।

(৯) (প) া টক বিহার বাস্ত দ্বয়েণ রোল্লবায়িকা উগ্রবোরকে বন্দ্য
জ্ঞানমতিনা * * *

(১০) কপাটক তীসনাদজয় দত্তকটকে দ্রোণিমঠিকায়ো পাটক।
ই * * * (১)

(১১) যু পাটকেযু দশ দ্রোণাধিকেযু সমুপগত বিষয়পতী (২)
কুটুম্বিনশ্চ সমা * * (৩)

(১২) (বি) দিত মস্ত ভবতাং এতে দশ দ্রোণাধিক নব পাটকা
যথা ভূগ্রনাদ্ * * (৪)

(১৩) রাজ রাজ ভট্ট স্বায়ুক্কারার্থং আচার্য্যবন্দ্য সংঘমিত্র পাদৈকারী

(১৪) * * বিহার বিহারিকা চতুষ্টয়মেকগণ্ডীকৃতং তদ্বিষয়পত্যাদি
* * * (৫)

(১৫) (৭) * * ভ বিতব্যমিতি সম্বৎ (৮) ১০+৩ বৈশাখ দি
১০+৩ আয়ুশ্চলং

(১৬) ( ) পুণ্যং বসব গতি দুঃখ ভয়াপহারি ভূমেশ্চ দানমি ( )

(১৭) বুধ্বা ভোগীশ্বরৈঃ সকরুনৈঃ প্রতি পালনীয়ম্॥ দূতকোঽত্র
পরম সো * * (৭)

(১৮) (লি) খিতং জয়কর্ম্মান্তবাসকে পরম সৌগতোপাসক
পুরদাসে (নে) (৮)

বঙ্গানুবাদ।

স্বস্তি। ভগবান মুনীন্দ্র যিনি অবিদ্যার কারণ সমূহ বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার জয়। ১-২

---

(১) ইত্যোতে। (২) পতীন। (৩) সমাজ্ঞাপয়তি। (৪) ভূগ্রনাদ পনীয়। (৫) কুটুম্বিভিঃ। (৬) নির্বিবাদৈ। (৭) সৌগত। (৮) পুর দাসে নেতি।

রাজা দেবখড়্গ, যাহার পাদ-পীঠ অশেষ ক্ষিতিপাল-গণের মৌলিস্থিত মণিরাজি দ্বারা সমুদ্ভাসিত, * * * যিনি অরিকুল জয় করিয়াছেন, তাঁহার জয়।

মহাদেবী প্রভাবতী কর্ত্তৃক ভূজ্যমান তাল্লোদ্যানি কাতরলাস্থিত পাটকদ্বয়; শুভাংমুকা নাম্নী জনৈক মহিলা কর্ত্তৃক ভূজ্যমান অর্দ্ধপাটক।

কেদারচোরকস্থিত শ্রীমিত্রাবলির অধিকারভুক্ত এবং সামন্ত বণ্টিয়োক কর্ত্তৃক ভূজ্যমান সার্দ্ধপাটক; শ্রীনেত্রভট্ট কর্ত্তৃক ভূজ্যমান রেল-তলকস্থিত অর্দ্ধপাটক।

পরানাটন নাদবর্ম্মিস্থিত * * *।
পলশতস্থিতদশ দ্রোণ বাপা পরিমিত ভূমি;
শিব হ্রদিকা শোগগ বর্গ স্থিত অর্দ্ধপাটক;

শ্রীসর্ব্বান্তর কর্ত্তৃক ভূজ্যমান মহত্তর ও শিখর প্রভৃতি কর্ত্তৃক কর্ষিত বিহার বাস্তুদ্বয় সমেত এক পাটক ভূমি।

রল্লবারিকউগ্রবোরকস্থিত বন্দ্যজ্ঞান মতি কর্ত্তৃক ভূজ্যমান পাটকপরি-মান ভূমি।

তীসনাদজয়দত্তকটকস্থিত দ্রোণিমঠিকার পাটক পরিমাণ ভূমি। ৩-১০।

দশ দ্রোণাধিক এই পাটক সমূহান্তর্গত বিষয়পতী ও কুটুম্বগণকে এতদ্বারা আদেশ করা যাইতেছে (১১-১২)।

আপনারা পরিজ্ঞাত হউন যে, এই দশ দ্রোণাধিক নবপাটক ভূমি বর্ত্তমান ভোগকারীগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া রাজরাজ ভট্টের আয়ুষ্কামনার্থে আচার্য্যবন্দ্যাকে দান করা গেল। এইরূপে বিহার বিহারিকা-চতুষ্টয় একগণ্ডীভূক্ত করা হইল। সুতরাং বিষয়পতী * * * গণ বিয়োৎপাদন করিতে পারিবে না ১২-১৫।

সম্বৎ ১০+৩ দি ১০+৩ বৈশাখ। ১৫।

জীবন ক্ষণস্থায়ী * * * ভূমি দান দ্বারা দুঃখ ভয় দূরীভূত হয়, ইহা জানিয়া এবং করুণা পরবশ হইয়া সমুদয় সুখৈশ্বর্য্য উপভোগ-কারিগণ ইহা রক্ষা করিবে। (১৫-১৭)।

পরম সৌগত (সোমত) * * * ইহার সংবাদ বাহক জয় কর্ম্মান্ত বাসক হইতে পরসোগতোপাসক পুরদাস কর্ত্তৃক লিখিত। (১৭-১৮।

(২য়)

(১) জয়স্তি ভিন্নানুশয়ান্ধকারা বৈনেয় পদ্মান্যবোধয়ন্তঃ বচোঙ্শবো মার * *

(২) * * লক্ষ্মী বিক্ষেপ দক্ষা জিন ভাস্করস্তঃ ত্রৈলোক্য খ্যাতকীর্ত্তৌ ভগবতি সুগতে সর্ব্বলোক

(৩) * * তত্ধর্ম্মেশান্তরূপে ভব বিভবভিদাং যোগিনাং যোগগম্য তৎসংঘে চাপ্রমেয়ে বি

(৪) বিধ গুণনিধৌ ভক্তিভাবেন্তগুর্বীং শ্রীমৎখড়্গোদ্যমেন ক্ষিতিরিয়মভিতোনির্জিতাযেন

(৫) (পশ্চাঃ ?)। তজ্জঃ শ্রীজাতখড়্গঃ ক্ষিতিপতিরভবন্তেন সর্ব'রিসংঘো বিধ্বস্তঃশূরভাবা

(৬) তৃণমিব মরুতা দন্তিনেবাশ্ববৃন্দং তস্মা শ্রীদেব খড়্গো নরপতিরভবৎ তৎসুতো রাজরা

(৭) জঃ দত্তং রত্নত্রয়ায় ত্রিভবভয়ভিদা যেনদানং স্বভূমেঃ॥ মিদিকিল্লিকা শালিবর্দ্ধকে

(৮) তলপাটকে শক্রকেন ভুজ্যমানকপাটকাৎ শুবাকবাক্সদ্বয়েন সহ অর্দ্ধপাটক উপা

(৯) সকেন ভুক্তকাধুনা স্বস্তিঘোকেন ভুজ্যমানক বিংশতি দ্রোণবাপা
মৰ্ক টাসীপাটকে

(১০) শুলকাদিভিঃ ভুজ্যমাণক সপ্তা বিংশতির্দ্রোণ বাপা
রাজদাসদুগ্‌র্গ টাভ্যাং কৃষ্যমাণ

(১১) (কো) (কা ?) ত্রয়োদশ দ্রোণ বাপা বুদ্ধ মণ্ডপপ্রাপি
বৃহৎ পরমেশ্বরেণ প্রতিপাদিতক বৎসনাগ

(১২) পাটক নবরোপ্যো শ্রীউদীর্ণ খড়্গেন প্রতিপাদিত শক্রকেন
ভুজ্যমানক পাটকাপ

(১৩) রনাটন (ক ?) নীলে অর্দ্ধপাটক দরপাটকে পি পাটক
দ্বারোদকে অর্দ্ধ পাটক্ত (১) ব্বারমুগ্‌গ

(১৪) কায়াৎ চাটপ্রাপি অর্দ্ধপাটক ইত্যেবং শট্‌সু (২) পাটকেষু দশঃ
দ্রোণাধিকেষু সমুপগ

(১৫) তবিষয়পতিনধিকরণানি কুটুম্বিনশ্চ সমাজ্ঞাপয়তি এতে পাটকা
দশ দ্রোণাধিকা

(১৬) যথাভুজ্জনাদপনীয় শালীবর্দক আচার্য্য সংঘমিত্রস্য বিহারে
প্রতিপাদিতাস্তদ্বিষয়

(১৭) পত্যাদি কুটুম্বিভিনিরাবাধৈর্ভবিতব্যমিতি দূতকোত্র শ্রীযজ্ঞবর্ম্মাঃ।
ইতি কমল

(১৮) দলাম্বু বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতং চ সকল
মিদমুদাহৃতং চবু

(১৯) ধ্য (৩) নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলো— ॥ এতান্তেতাং (৪)
ভাবিনঃ পার্থিবেন্দ্রাং ভু

---

(১) পাটক ব্বারমুগ্‌গুকায়াং। (২) ষট্‌সু। (৩) বুদ্ধা।
(৪) এতানে তান্।

(২০) যো ভূয়ো প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ। সামান্যোয়ং ধর্ম্মসেতু নৃপাণাং কালে কালে
(২১) পালনীয়ঃ ক্রমেণঃ। বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভি সগরাদিভিঃ য
(২২) স্য যস্য যদা ভূমি স্তস্য তস্য তদা ফলম্। জয়কর্ম্মান্তবাসকাৎ
(২৩) লিখিতং পরম সৌগত পুরদাসেনেতিঃ॥ সম্বৎ ১০+৩
(২৪) পৌষ দি ২০+৫

বঙ্গানুবাদ।

দ্বিতীয়

উদগ্রীবোপবিষ্ট বৃষমূর্ত্তি।

শ্রীমদ্দেব খড়্গা।

ভাস্কর-প্রতিম জিনের তেজোময় বাক্যাবলি, যৎকর্ত্তৃক অনুশয়ান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে, বৈনায়িক (বুদ্ধ মতাবলম্বী) দিগের বিবেক বুদ্ধি পদ্মের ন্যায় উন্মেষিত হইয়াছে; এবং যাহা মারের প্রভাব * * * বিহ্বরিত করিতে সমর্থ, তাহা জয়যুক্ত হইয়াছে। (১-২।

সর্ব্বলোকবন্দ্য ত্রৈলোক্যখ্যাতকীর্ত্তি ভগবান সুগত, ও তৎপ্রতিষ্ঠিত শাস্ত্র, ভববিভবভেদকারী, যোগীগণের যোগগম্য, ধর্ম্ম এবং তদীয় অপ্রমেয় বিবিধ গুণ সম্পন্ন সংঘের পরম ভক্তিমান উপাসক, শ্রীমৎ-খড়্গোদ্যম সমগ্র ক্ষিতিতল জয় করিয়াছিলেন (২-৫)।

তাহা হইতে ক্ষিতিপতি শ্রীজাত খড়্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বীয় সৌর্য্যপ্রভাবে ইনি বাত-বিক্ষিপ্তভৃণ এবং করি-তাড়িত অশ্ববৃন্দের ন্যায় অরি-সঙ্ঘ বিধ্বস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (৫-৬)।

তৎপুত্র নরপতি শ্রীদেবখড়্গ। ত্রিভুবনের ভয়-নিরাশনক্ষম রাজ রাজ নামধেয় তাঁহার পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ইনি রত্ন-ত্রয়োদ্দেশ্যে (বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ) স্বভূমি দান করিতেছেন (৬-৭)।

মিদিকিল্লিকাশালিবর্দ্দকান্তর্গত তলপাটকস্থিত, শক্রক কর্ত্তৃক ভূজ্যমান পাটক পরিমাণ ভূমির অন্তর্গত গুবাকবাস্তুদ্বয় সমেত অর্দ্ধপাটক, এবং উপাসক কর্ত্তৃক ভুক্ত, অধুনা স্বস্তিযোগ কর্ত্তৃক ভূজ্যমান বিংশতি দ্রোণবাপ ভূমি ;

মর্কটাসীপাটকান্তর্গত সুলব্ধপ্রভৃতি কর্ত্তৃক ভূজ্যমান সপ্তবিংশতি দ্রোণবাপক ভূমি, রাজ দাস ও দুর্গত্ত কর্ত্তৃক কর্ষিত ত্রয়োদশ দ্রোণবাপক ভূমি, বুদ্ধমণ্ডপ পর্য্যন্ত প্রসারিত বৃহৎ পরমেশ্বরের দত্ত বৎস নাগপাটক ;

নবরোপ্যস্থিত শ্রীউদীর্ণখড়্গ-প্রদত্ত শক্রক কর্ত্তৃক ভূজ্যমান পাটক পরিমাণ ভূমি ;

পরনাটন (নাটক ?) নীলান্তর্গত অর্দ্ধপাটক ;

দরপাটকান্তর্গত পাটক পরিমাণ ভূমি ;

দ্বারোদকস্থিত অর্দ্ধপাটক ;

চাট পর্য্যান্ত বিস্তৃত ব্বার মুগ্‌গকস্থিত অর্দ্ধপাটক ভূমি (৭-১৪)।

বিষয়পতি, কর্ম্মচারীবর্গ এবং কুটুম্বগণের বিদিতার্থে আদেশ প্রচারিত হইল যে, দশ দ্রোণাধিক এই পাটক সমূহ বর্ত্তমান ভোগকারিগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া শালিবর্দ্দকস্থিত আচার্য্য সংঘমিত্রের বিহারে প্রদত্ত হইল। বিষয়পতি ও কুটুম্বগণ কোনও প্রকারে উহার বিঘ্নোৎপাদন করিতে পারিবে না। শ্রীযজ্ঞ বর্ম্মা ইহার সংবাদবাহক (১৫-১৭)।

শ্রী এবং মানবজীবন কমল-দলস্থিত বারিবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল, ইহা বিবেচনা করিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত সমুদয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া

পরকীয় কীর্ত্তি-রাজি কেহই বিলুপ্ত করিবে না! ভবিষ্যৎ রাজন্য বর্গের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র ইহা বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই সাধারণ ধর্ম্ম-সেতু রাজগণের সর্ব্বদাই পালনীয়। সগর হইতে আরম্ভ করিয়া বহু নরপতিই ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন, তবুও যখন যে নরপতি ভূমির অধীশ্বর থাকেন, দানের ফল তিনিই প্রাপ্ত হন (১৭-২২)।

জয়কর্ম্মান্তবাসক হইতে পরম সৌগত পুরদাস কর্ত্তৃক লিখিত ইতি সম্বৎ ১০+৩ (২২-২৩)।

পৌষ দি ২০+৫। (২৪)।

১৮৮৪।৮৫ খৃঃ অব্দে রায়পুরা থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রামে মিঞা বক্সখাঁ নামক জনৈক কৃষক একটী প্রাচীন জলাশয়ের সন্নিকট-বর্ত্তী মৃত্তিকাস্তূপ মধ্যে পিত্তল ও অষ্টধাতু নির্ম্মিত চল্লিশটী চৈত্য সহ উক্ত তাম্রশাসনদ্বয় প্রাপ্ত হয়। মুড়াপাড়ার জমীদার ৺ প্রতাপচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় উহার একখানা এসিয়াটিক সোসাইটীতে অর্পন করেন। অপর ফলকটী লাকরশির চৌধুরী-বংশোদ্ভব শ্রীযুক্ত তারকনাথ রায় মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত হেনরী বিভারিজ মহোদয়কে প্রদান করিয়াছিলেন। চৈত্যগুলির মধ্যে দুইটী মাত্র তারক বাবুর হস্তগত হয়। তন্মধ্যে একটী—তিনি ডাক্তার হোর্ণেলকে এবং অপরটী খান বাহাদুর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আওলাদ হোসেন মহাশয়কে অর্পন করিয়াছিলেন।

প্রথম তাম্রশাসন দ্বারা দশদ্রোণাধিক নবপাটক ভূমি আচার্য্যবন্দ্য সংঘমিত্রের বিহার বিহারিকা চতুষ্টয়ে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ফলকে রাজা শ্রীদেবখড়্গ ও রাণী প্রভাবতীর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত ফলকোল্লিখিত পরনাতননাদবর্ম্মি ও পলশত বিহার আমরা আধুনিক বর্ম্মিয়া ও পলাশ নামক স্থানদ্বয় বলিয়া মনে করি। দেবখড়্গের

ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কের ১৩ই বৈশাখ তারিখে পরমসৌগত পুরোদাস কর্ত্তৃক প্রথম ফলক খানা উৎকীর্ণ হইয়াছে।

দ্বিতীয় তাম্রশাসন দ্বারা দশদ্রোণাবিক ষট্পাটক পরিমাণ ভূমি কুমার রাজরাজভট্টের আয়ুষ্কামনার্থে বুদ্ধ ধর্ম্ম ও সংঘ এই রত্নত্রয়োদ্দেশ্যে সালিবর্দ্ধক বিহারের আচার্য্য সংঘামিত্রকে প্রদান করা হইয়াছে। দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কের ২৫শে পৌষ তারিখে সৌগতোপাসক পুরোদাস কর্ত্তৃক উহা উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই তাম্রশাসনোল্লিখিত তালপাটক এবং দত্তগাও স্থানদ্বয় অধুনা রায়পুরা থানান্তর্গত তালপাড়া এবং দত্তগাও বলিয়া আমরা মনে করি।

উক্ত তাম্রশাসনদ্বয় হইতে খড়্গ বংশীয় নিম্নলিখিত রাজগনের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১। খড়্গোদ্যম
২। জাত খড়্গ (পুত্র)
৩। দেব খড়্গ (পুত্র)
৪। রাজ রাজ (পুত্র)

চৈত্যটি ত্রিস্তর বিশিষ্ট পিরামিডের অনুকরণে নির্ম্মিত এবং ছত্রাচ্ছাদিত ছিল। ইহার শীর্ষদেশের চারিপার্শ্বে চারিটী ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, তন্নিম্নে অপর বুদ্ধ মূর্ত্তি এবং পাদ দেশের প্রত্যেক দিকে তিনটী করিয়া দ্বাদশটী মুদ্রাসন-সংবদ্ধ বুদ্ধ মূর্ত্তি বিরাজিত।

বেলাব-তাম্রশাসন।

বিষ্ণু চক্র সমন্বিত রাজমুদ্রা।

১। ওঁ সিদ্ধি॥ স্বায়ম্ভুব মিহাপত্যং মুনিরত্রি দি (র্দি) বৌকসাং। তস্য চন্দ্রাবনং তেজ স্তেনাঞ্জ।

২। স্রত চন্দ্রমাঃ॥ রৌহিণেয়ো বুধস্তস্মাদস্মাদৈলঃ পুরূরবাঃ স্বয়ং-বৃতঃ কীর্ত্ত্যা

আসরফ পুরে প্রাপ্ত চৈত্য।

৩। চোর্ব্যাচ ভুবাচয়ঃ॥ সোপ্যায়ুং সমস্ত্রীজনমগু সমোরাজ্জস্ততো জজ্ঞি-
বান্ স্মা

৪। পালো নহুষস্ততোজনি মহারাজোযযাতিঃ সুতম্ সোপি প্রাপ যদুং
ততঃক্ষিতি ভু

৫। স্যাং বংশোয় মুজ্জস্ততে বীরশ্রীশ্চ হরিশ্চ যত্র ব শঃ প্রত্যক্ষ মেবৈক্ষত্ত
সোপীহ

৬। গোপীশত কেলিকারঃ কৃষ্ণো মহাভারত সূত্রধারঃ অর্ঘঃ পুমানংশ
কৃতাবতা

৭। রঃ প্রাদুর্ভূবোদ্ধৃত ভূমিভারঃ॥ পুংসামাবরণং ত্রয়ী নচ তয়া হীনা
ন নগ্না ইতি

৮। হ্যান্ (ং) চাদ্ভুত সঙ্গরেষু চ রসাদ্রোমোদ্গমৈ বর্ম্মণঃ বর্ম্মাণোতি
গভীর নাম দধতঃ

৯। শ্লাঘ্যো ভুজো বিভ্রতো ভেজুঃ সিংহপুরং গুহামিব মৃগেন্দ্রাণাং হরে-
র্বান্ধবাঃ॥

১০। অভবদথকদাচিত্তাদবীনাং চমূনাং সমরবিজয়যাত্রাঃ মঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা শম

১১। ন ইব রিপুণাং সোমবদ্বান্ধবানাং কবিরপি চ কবিনাং পণ্ডিতঃ
(প) ণ্ডিতানাম্॥ জা

১২। ত্রবর্ম্মা ততো জাতো গাঙ্গেয়ইব শান্তনোঃ (।) দয়াব্রতং রণক্রীড়া
ত্যাগো যস্যমহো

১৩। ৎসবঃ গৃহ্ণবৈণ্য পৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রিয়ং যো * * *
প্রথম স্থিয়ং পরিভবং

১৪। স্তাং কামরূপশ্রিয়ং নিন্দন্দিব্য ভুজশ্রিয়ং

১৫। সাচ্ছিয়ং বিতত বাস্তাং সার্ব্ব ভৌমশ্রিয়ং॥ বীর শ্রিয়ামজনি
সামলবর্ম্ম দেবঃ

১৬। শ্রীমাঞ্জগৎ প্রথম মঙ্গল নামধেয়ঃ কিম্বর্ণ্ন্নাম্যখিল ভূপগুণোপ
পন্নো দোষৈ

১৭। ম নাগপি পদংনকৃতঃ প্রভুর্ম্মে। তথোদয়ী সূনুরভূত প্রভূত
প্রতাপ বীরেষ্বপিসঙ্গ

১৮। রেষু যশ্চন্দ্রহা (স) প্রতিবিম্বিতং স্বমেকং মুখং সম্মুখমীক্ষতে স্ম ॥
তস্যমালব্য দেব্যা

১৯। সীৎ কন্যা·ত্রৈলোক্যসুন্দরী। জগদ্বিজয়মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভুবঃ ॥
পূর্ব্বে প্যশে

২০। ষ·ভূপাল পুত্রীণামবরোধনে তস্যাসীদগ্রমহিষী সৈব সামল
বর্ম্মণঃ ॥ আসী

২১। ত্তয়োঃ সু (সূ) নুবিহাস্তরং যঃ শ্রীভোজ বর্ম্মোভয় বংশ (দী) পঃ
পাত্রেষু সর্ব্বাসু দশাসু যে

২২। নস্নেহোস্ম লুপ্তশ্চ হতং তমশ্চ ॥ হাধিক (ক) ষ্টমবীর মদ্য
ভুবনং ভূয়োপি কং (কিং) রক্ষসা

২৩। মুৎপাতয়ো মু (প) স্থিতোস্ত কুশলী শঙ্কা স্বলঙ্কাধিপঃ ॥
ইতি যং গুণগাথাভি স্তুষ্টা

২৪। বপূরুষোত্তমঃ মজ্জযন্নিব বাগ্ ব্রহ্মময়ানন্দ মহোদধৌ ॥
সখলু শ্রী বিক্রমপু

২৫। র সমাবাসিত শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারাৎ মা (ম) হারাজাধিরাজ শ্রীসামল
বর্ম্ম দেবপা

২৬। দানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ
শ্রীমদ্ভোজ

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।

২৭। শ্রীপৌণ্ড্র ভুক্ত্যন্তঃপাতি অধঃপত্তন মণ্ডলে কৌশাম্বী অষ্টগচ্ছ খ

২৮। ণ্ডল সং উব্যালিকা গ্রামে গুবাকাদি সমেত সপাদনব দ্রোণাধি

২৯। ক পাটক ভূমৌ সমুপ গতাশেষ রাজরাজন্যক রাজ্ঞী রাণক রা

৩০। জপুত্র রাজামাত্য পুরোহিত পীঠিকাবিত্ত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসান্ধি বি

৩১। গ্রহিক মহাসেনাপতি মহামুদ্রাধিকৃত অন্তরঙ্গ বৃহদুপারিক মহাক্ষপ

৩২। টলিক মহাপ্রতিহার মহাভোগিক মহাব্যূহপতি মহাপীলুপতি

মহাগ

৩৩। ণস্থ দৌস্সাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্ব গোমহিষাজাবিকাদি

৩৪। ব্যাপৃতক গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক বিষয় পত্যাদীন্

অন্যাংশ্চ সক

৩৫। ল রাজ পাদোপ জীবিনোধ্যক্ষ প্রচারোক্তান ইহা কীর্ত্তিতান্

চট্টভট্ট জাতী

৩৬। য়ান্ জনপদান ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হ

ম্মানয়তি

৩৭। বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তভ (ব) তাম্। যথোপরিলিখিতা

ভূমিরিয়ম্ স্ব

৩৮। সীমাবচ্ছিন্না তৃণ পূতি গোচর পর্য্যন্তা সতলা সো দ্দেশা

সাম্রপনসা স

৩৯। গুবাক নালিকেরা সলবণা সজলস্থ (লা) সগর্ত্তোষরা সহ

দশাপরাধা পরি

৪০। হৃত সর্বপীড়া অচাডভড প্রবেশা অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যা সমস্ত

রাজভোগক

৪১। র হিরণ্য প্রত্যায় সহিতা সাবর্ণ সগোত্রায় ভৃগু চ্যবন আপ্নবান ঔ

৪২। র্ব্ব জমদগ্নি প্রবরায় বাজসনেয় চরণায় যজুর্ব্বেদ কণ্ব শাখাধ্যায়ি

৪৩। নে মধ্যদেশ বিনির্গত উত্তর রাঢ়ায়াং সিদ্ধল গ্রামীয় পীতাম্বর দেব

৪৪। শর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় জগন্নাথ দেব শর্ম্মণঃ পৌত্রায় বিশ্বরূপ দেব শর্ম্ম

৪৫। ণঃ পুত্রায় শান্ত্যাগারাধিকৃত শ্রীরাম দেব শর্ম্মণে শ্রীমতা ভোজ

৪৬। বর্ম্মদেবেন পুণ্যে অহনি বিধিবদুক পূর্ব্বকং কৃত্বা ভগবন্তং

বাসুদেব ভ

৪৭। ট্টারক মুদ্দিশ্য মাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য যশোভি বৃদ্ধয়ে

আচন্দ্রার্কং ক্ষি

৪৮। তি সমকালং যাবদ্ভুমি ছিদ্রন্যায়েন শ্রীবিষ্ণু চক্রমুদ্রয়া তাম্রশা

৪৯। সনীকৃত্য প্রদত্তা স্মাভিঃ॥ ভ৭ন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ॥

৫০। স্বদত্তাম্পরদত্তা স্বা যো হরেত বসুন্ধরাম সবিষ্ঠায়াং ক্রিমিভূর্ত্বা

পিতৃভিঃ সহ প চ্যতে॥

(৫১) শ্রীমদ্ভোজ দেব পাদীয় সম্বৎ ৫ শ্রাবণ দিনে ১৯ নি অনুমহাঙ্কনি।

ওঁ সিদ্ধি। স্বর্গবাসী দেবগণের মধ্যে অত্রিমুনি স্বয়ম্ভুর অপত্য ছিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে তেজঃ সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে চন্দ্রমা জন্মগ্রহণ করেন। (১—২)

তাহা (চন্দ্রমা) হইতে রৌহিণেয় বুধ এবং বুধ হইতে ইলার পুত্র পুরূরবা জন্ম গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তি এবং উর্ব্বশী এবং বসুন্ধরা কর্তৃক স্বয়ংবৃত হইয়াছিলেন। (২—৩)।

সেই মনুপ্রতিম (পুরূরবা) আয়ুর জন্মদান করিয়াছিলেন। রাজা আয়ু হইতে ভুপাল নহুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নহুষ হইতে মহারাজ যযাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও যদুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে যে রাজবংশ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহাতে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃষ্ট হইয়াছিলেন। ৩—৫

এই বংশে, পূজ্য-পুরুষ, অংশাবতার, মহাভারতের সূত্রধার গোপী শতকেলীকার শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়া পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিয়াছিলেন। ৫—৭

ত্রয়ী (বেদবিদ্যা) পুরুষের আবরণ। তাহার (বেদবিদ্যার) অভাব ছিল না বলিয়াই অনগ্ন, ত্রয়ী বিদ্যার এবং অদ্ভুত সমর ক্রীড়ার আনন্দহেতু রোমোদ্গম দ্বারা বর্দ্ধিণঃ হরির বান্ধব সমূহ "বর্ম্মন" এই গভীর নাম এবং শ্লাঘ্য বাহুযুগল ধারণ করিয়া সিংহ বিবরতুল্য সিংহপুর নামক স্থানে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। ৭—৯

অনন্তর কোনও সময়ে বজ্রবর্ম্মা যাদবীয় সৈন্যের মঙ্গলময় এবং অপ্রতিহত বিজয়শ্রীর হেতুভূত হইয়াছিলেন। তিনি অরিকুলের শমন, বান্ধবগণের চন্দ্র, কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে পণ্ডিত ছিলেন। ১০—১১

শান্তনু হইতে যেমন গাঙ্গেয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বজ্রবর্ম্মা হইতেও জাত্রবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। দয়াই তাঁহার ব্রত এবং যুদ্ধই তাঁহার ক্রীড়া এবং ত্যাগই তাঁহার মহোৎসব ছিল। (১১—১৩)

তিনি বৈণ্য পৃথুশ্রীকে ধারণ করিয়া কর্ণের (কন্যা) বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া, * * * কামরূপ শ্রীকে পরাভব করিয়া দিব্যের ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্দ্ধনের শ্রীকে বিফল করিয়া, শ্রীকে শ্রোত্রীয়সাৎ করিয়া, সার্ব্বভৌম শ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ১৩—১৫

জগতে প্রথম মঙ্গল নামধারী শ্রীমান সামল বর্ম্ম দেব বীরশ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। কি আর বলিব? (যেমন) সেই অখিলভূপগুণোপন্ন আমার প্রভূতে কিয়ৎ পরিমাণেও দোষ স্পর্শ করে নাই। ১৫—১৭

---

* কেহ কেহ এই শ্লোকের ভিন্নার্থ করিয়া থাকেন:—"বেদ মনুষ্যের বস্ত্র স্বরূপ; যাহারা বেদ মানে না তাহারা নগ্ন অথবা যথেচ্ছাচারী। কৃষ্ণের পরবর্ত্তী যাদবেরা তেমন ছিলেন না; যখন নগ্ন বৌদ্ধমত প্রবল হইয়া ত্রয়ীর নিন্দা চতুর্দ্দিক হইতে প্রচার পূর্ব্বক এতদ্দেশ আক্রমণ করে, তৎকালীন যাদবেরা গম্ভীরভাব গ্রহণে অটল ছিলেন। ত্রয়ীর প্রতি আস্থা জনিত রসে তাঁহাদের এমন তীব্র রোমাঞ্চ ঘটিয়াছিল, তাহা যেন শরীরের বর্ম্ম ভেদ করিয়া বহির্দ্দেশে ফুটিয়া উঠিত। সেই ধর্ম্মমন্দিরে তাঁহারাই শ্লাঘ্যবাহু

সেইরূপ প্রভৃত প্রতাপশালী বীরগণ মধ্যেও উদয়ীসুনু বীরসমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি চন্দ্রহাস নামক খড়্গ ফলকে স্বীয় মুখ প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইতেন। ১৭—১৮

সেই জগদ্বিজয় মল্লের মালব্য দেবী নাম্নী কামদেবের বৈজয়ন্তী রূপিনী, ত্রৈলোক্যসুন্দরী এক কন্যা ছিল। ১৮—১৯।

অশেষ ভূপাল-কন্যাগণ কর্তৃক রাজান্তঃপুর পূর্ণ থাকিলেও তিনিই (মালব্যদেবী) সামল বর্ম্মার অগ্রমহিষী ছিলেন। ১৯—২০

উভয়কুল-প্রদীপ শ্রীভোজবর্ম্মা নামে তাহাদের পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার অবস্থাতেই উপযুক্ত পাত্রে স্নেহের লোপ করিতেন না; অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দিতেন। ২০—২২

হা ধিক। কষ্টের বিষয়, অন্ত ভুবন বীরশূন্য হইয়াছে। তবে কি আবার রাক্ষসগণের উৎপাৎ উপস্থিত? এখন ভুবন অলঙ্কাধিপ অর্থাৎ রাবণ শূন্য বা শত্রুশূন্য। (এই রাজাভোজ) কুশলী হউন। এইরূপে বাগ্‌ব্রহ্মানন্দ মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া গুণগাথা সমূহে পুরুষোত্তম যাহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন:—

শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার (রাজধানী) হইতে মহারাজাধিরাজ শ্রীসামলবর্ম্মদেব পাদানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরম ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ সেই শ্রীমদ্‌ভোজ শ্রীপুণ্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতি অধঃপত্তন মণ্ডলে, কৌশাম্বী অষ্টগচ্ছ খণ্ডল উব্যলিকা গ্রামে, গুবাকাদি সমেত সপাদ নবদ্রোণাধিকপাটক ভূমিতে (এক পাটক সোয়া নয় দ্রোণ পরিমিত) সমুপগত সমুদয় রাজা, রাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, পুরোহিত, পীঠিকাবিত্ত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহাসান্ধি

ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাদের অধিষ্ঠিত সিংহপুর আস্তিকতার স্বাপক্ষে দুর্ভেদ্য দুর্গ স্বরূপ হইয়াছিল। সেই আস্তিকদিগের কুলে এই তাম্রশাসন-কর্ত্তার প্রপিতামহের জন্ম. সুতরাং এই রাজবংশ অন্যান্য নয় বৌদ্ধদিগের ন্যায় নাস্তিক নহে।" ঢাকাপ্রকাশ।

বিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ-বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতিহার, মহাভোগিক, মহাব্যূহপতি, মহাপীলুপতি, মহাগণস্থ, দৌঃসাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌবলব্যাপৃতক, হস্তিব্যাপৃতক, অশ্বব্যাপৃতক, মহিষ ব্যাপৃতক, অজ ব্যাপৃতক, অবিকাদি ব্যাপৃতক, গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক, বিষয়পতি, প্রভৃতি এবং অধ্যক্ষ প্রচারোক্ত কিন্তু অকথিত অন্যান্য রাজপাদোপজীবিদিগকে চট্টভট্ট জাতীয় জনপদবাসীগণকে, ক্ষেত্রকর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণোত্তম গণকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন, এবং আজ্ঞা করিতেছেন,—সকলের অভিমত হউক, স্বসীমাবচ্ছিন্ন, তৃণ পূতি গোচর পর্য্যন্ত সতল, সোদ্দেশ, আম্র, পনস, গুবাক, নারিকেল বৃক্ষ সমেত সলবণা সজলস্থলা, সগর্ত্তোষরা, যাহার (যে ভূমি সম্বন্ধে প্রতীগৃহীতার)। দশটী অপরাধ সহ্য হইবে, সর্ব্বপ্রকার উৎপীড়ন রহিত, চাট, ভাট জাতীয় প্রবেশাধিকার বিরহিত, যাহা হইতে কোনও প্রকার করাদি গৃহীত হইবে না, রাজভোগ্যকর ও হিরণ্য প্রত্যায় সহিত, উপরিলিখিত ভূমি সাবর্ণ্য গোত্রীয়, ভৃগুচ্যবন আপ্নবান, ঔর্ব, জমদগ্ন প্রবর বাজসনের চরণোক্ত যজুর্ব্বেদের কন্বশাখাধ্যায়ী, মধ্যদেশ হইতে বিনির্গত উত্তর রাঢ়ায় অবস্থিত সিদ্ধল গ্রামবাসী পীতাম্বর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, জগন্নাথ দেবশর্ম্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মার পুত্র, শান্ত্যাগারাধিকৃত শ্রীরাম দেব শর্ম্মাকে এই পুণ্য দিনে বিধিবৎ উদক স্পর্শ পূর্ব্বক ভগবান বাসুদেব ভট্টারককে উদ্দেশ্য করিয়া, মাতা পিতা ও স্বীয় পুণ্য ও যশ বৃদ্ধির জন্য, চন্দ্র সূর্য্য ক্ষিতি সমকাল পর্য্যন্ত ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়ানুসারে শ্রীমদ্বিষ্ণুচক্র মুদ্রাদ্বারা তাম্রশাসন করিয়া আমি শ্রীভোজ বর্ম্মদেব প্রদান করিলাম। এতদ্বিষয়ে ধর্ম্মানুশাসনের শ্লোক আছে :—স্বদত্তই হউক বা পরদত্তই হউক যিনি ভূমি হরণ করিবেন তিনি বিষ্ঠায় কৃমি হইয়া পিতৃগণ সহ পচিতে

থাকিবেন। শ্রীমন্তোজ বর্ম্মদেব পাদীয় সংবৎ ৫, শ্রাবণ ১৯ দিনে ৫৮ নি (বদ্ধ)। অঙ্ক। মহাক্ষ (পটলিক) নি [বদ্ধ]।

পরিশিষ্ট (খ)।

১৬৬৩।৬৪ খৃঃ অব্দে ঢাকার অস্থায়ী সুবাদার দায়ূদখাঁর সময়ে ঢাকাতে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল তাহা আমরা ১৮শ অধ্যায়ে লিখিয়াছি। ১৬৮৫ খৃঃ অব্দে সায়েস্তাখাঁর শাসনসময়েও তাহার জের মিটে নাই। এই দুর্ভিক্ষে এ জেলায় বহুলোক অন্নাভাবে স্ত্রী পুত্র বিক্রয় এবং আত্ম বিক্রয় করিয়া উদর পালনের চেষ্টা করিয়াছে। মনুষ্য বিক্রয়ে দলিল সম্পাদন হইত। এতৎসম্পর্কীয় যে একখানা দলিলের অনুলিপি এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল তাহাতে দেখা যায় বিক্রমপুর নিবাসী গঙ্গারাম নামধেয় জনৈক চণ্ডাল স্ত্রী পুত্র কন্যা সমেত অষ্ট মুদ্রায় আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। মনুষ্য বিক্রয়ের যত খানা দলিল এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই খানাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়।

মনুষ্য বিক্রয় দলিলের নকল।

"ও সমস্ত সুপ্রসন্নালঙ্কৃত সতত বিরাজ-মান মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ সুলতান বগদাদশাহ আরঙ্গজেবশাহ দেবপালাভ্যুদায়িনী শুভরঙ্গে

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়ঃ

তন্নির্যুজিতা গাওমণ্ডলা খিপ শ্রীমত খানখানান জনাধিকারে চতুরশি ত্যধিক পঞ্চদশ শত শকাব্দে সুলুতান প্রতাপ জায়গীর দার শ্রীযুক্ত শাহমুরাদবেগ মহাশয়া নামাধিকারে ধামরাই গ্রামান্তর্গত কায়স্থ পাড়া বাস্তব্য শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীনঃ সভায়ামনেক দ্বিজ স্বজ্জ-নাধিষ্ঠিতায়াং তথা কায়স্থপাড়া বাস্তব্য শ্রীরামজীবন মৌলিকস্ত সকাশাদষ্টমুদ্রা গৃহীত্বা বিক্রমপুর নিবাসী চণ্ডাল শ্রীগঙ্গারাম

নামানং স্ত্রীপুত্রকন্যাসমেতং স্বেচ্ছায়া লিখিতং বিত্তং দাতৃ-স্থানে আত্মানং বিক্রীতবানিতি। সন ১০৬৯। ২৭ মাঘস্য

গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীনঃ সদসি। গঙ্গারামস্য দস্তখতং।

অত্র লেখ্য সাক্ষীনঃ।

চন্দ্রশেখর দেবশর্ম্মা। রাঘবানন্দ দাসঃ।

রাধাবল্লভ দেবঃ।

রাজ মাঝি সাং ডভারি।

পরিশিষ্ট (গ)।

দেবালয়াদি।

বীরভদ্রাশ্রম।

ঢাকা সহরের এক্রামপুর নামক মহল্লায় এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত। নিত্যানন্দ প্রভূর পুত্র বীরভদ্রগোস্বামীর নামানুসারে এই আশ্রমের নামকরণ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হইয়া বীরভদ্রগোস্বামী ষোড়শ শতাব্দের শেষার্দ্ধভাগে ঢাকায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। ১৫৭৩ খৃঃ অব্দে বৃন্দাবন দাস যে "নিত্যানন্দ বংশাবলী" রচনা করেন, তাহাতে বীরভদ্রগোস্বামীর ঢাকায় আগমনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। বীরভদ্রগোস্বামীর চেষ্টায় ঢাকার অধিকাংশ নরনারী বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পঞ্চদশ শতাব্দে বঙ্গদেশে যে প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, বীরভদ্রগোস্বামীর উদ্যমে সেই প্রেম-বন্যার বীচি বিক্ষেপ ঢাকা পর্য্যন্তও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

জয়দেবপুরের ইন্দ্রেশ্বর।

জয়দেবপুরের পূর্ব্বনাম পাড়াবাড়ী। ভাওয়ালের রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষ ৺ জয়দেব রায়ের নামানুসারে উহার নাম জয়দেবপুর রাখা

হয়। জয়দেব রায়ের পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী স্বীয় আবাস ভূমির পোয়া মাইল পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া এই শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। ইন্দ্রনারায়ণের নামানুসারে এই শিব ইন্দ্রেশ্বর বলিয়া অভিহিত হয়। এইস্থান শিব বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখনও ঐ শিব ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

জয়দেবপুরের নীলমাধব।

জয়দেবপুরের রাজবংশের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ পুষ্করিণী খনন কালে প্রস্তরময় এই মাধব মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি মহাসমারোহে এই মাধব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যথারীতি উঁহার পূজার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে নীলমাধব জয়দেবপুরের রাজবাটীতে গৃহ দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া জনসাধারণের পূজোপচার গ্রহণ করিতেছেন। এক সময়ে মাধব রূপী বিষ্ণুর পূজা ঢাকা জেলায় অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। ভাওয়ালের নানাস্থানে "মাণিক মাধব" "জটামাধব" "বেণীমাধব" প্রভৃতি মূর্ত্তি পূজিত হইতে দেখা যায়।

কাতলাপুরের আখড়া।

সাভারের সন্নিকটবর্ত্তী কাতলাপুর নামক স্থানে ৺ কানাইলাল নামক বিগ্রহের আখড়া বিদ্যমান আছে। আখড়াটী প্রায় একশত বৎসর যাবৎ আনন্দীরাম মাঝি কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে। কানাইলালের মূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত। ৺ কানাইলাল বিগ্রহ ব্যতীত এইস্থানে আরও দুইটী প্রাচীন মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহার একটী নরসিংহ মূর্ত্তি এবং অপরটী চুতর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি।

কানাইলাল সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্য কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। আনন্দীরাম মাঝি জাতীতে জালিক ছিল। সে নবাব সরকারে নৌকা

বাহিতে। একদা পদ্মানদী অতিক্রম কালে আনন্দীরাম নৌকার ভিতর হইতে শুনিতে পাইল, কে তাহাকে "আনন্দী রাম" "আনন্দী রাম" বলিয়া ডাকিতেছে। আনন্দী রাম বাহির হইতে প্রশ্ন করিল "কে আপনি?" উত্তর হইল, "আমাকে দেখিতে পাইবে না, আমি কানাইলাল, পাষাণ মূর্ত্তিতে নদীগর্ভে পতিত আছি। এখন আমাকে উঠাও, আমি আর নদীগর্ভে থাকিব না"। আনন্দী রাম উঠাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে দৈববাণী হইল "জাল ফেলিলে যখন টান পড়িবে তখনই আমাকে উঠাইবে।" আনন্দী রাম তদনুসারে কার্য্য করিয়া কানাই-লালকে উঠাইয়া নিজ গৃহে লইয়া যায়। পুনরায় দৈববাণী হওয়াতে তাঁহাকে তথা হইতে কাতলাপুরে আনা হইয়াছে। আখড়াটী জনৈক জালিক কর্ত্তৃক পরিচালিত। উহার ৩ খাদা ৫ পাখী দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। মন্দির ইষ্টক নির্ম্মিত।

প্রতিভা—১৩১৯ সন কার্ত্তিক সংখ্যা।

সাভারের মহাপ্রভু ও কোণ্ডার গোবিন্দ জিউ।

সাভার নিবাসী ইন্দ্রনারায়ণ পালের দয়ারাম, রাম মোহন, গোকুল, ও মায়ারাম নামে পুত্রচতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এতন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ দয়ারাম অতি নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। সাভার গ্রামের কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত ষড়ভুজ মহাপ্রভু এবং কোণ্ডা গ্রামের গোবিন্দজিউ বিগ্রহ ইনিই স্থাপনা করেন। গোবিন্দজিউর সেবার জন্য, ধামরাই গ্রামের উত্তর পূর্ব্ব দিকে নলামনামক স্থানে কতক ভূমিও তিনি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন।

লাঙ্গলবন্ধের বিগ্রহাদি।

ব্রহ্মপুত্র নদের যে শাখাটী সোণারগাঁয়ের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া লাক্ষ্যানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই

লৌহিত্য শাখার পশ্চিম তটে উত্তর দক্ষিণে প্রায় এক মাইল ব্যাপিয়া কতকগুলি দেবালয় বিরাজমান রহিয়াছে। এখানকার সমুদয় বিগ্রহের মধ্যে জয়কালীই প্রসিদ্ধ ও পুরাতন। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বারপাড়ার মিত্র বংশের কুলপুরোহিত বারপাড়া নিবাসী মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মৃণ্ময়ী জয়কালী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। প্রবাদ আছে, লৌহিত্য তটে কালী স্থাপনের জন্য মাধব শর্ম্মা কামাখ্যাতে মহামায়া কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন।

পুরাতন মন্দিরটী জীর্ণ হওয়াতে ভক্তেরা সুন্দর একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এযাবৎ অনেকবার জয়কালীর কলেবর সংস্করণ হইয়াছে। এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকের মনে এরূপ সংস্কার যে জয়কালী সমীপে কোন রূপ অভাব মোচনের জন্য মানস সংকল্প করিলে অচিরে সংকল্প-সিদ্ধি হয়। জয়কালীর বাড়ীর সংলগ্ন দক্ষিণে একটী মঠের অভ্যন্তরে শিব স্থাপিত আছেন। শিবের অবস্থানগৃহ পূর্ব্বে ঝিকটী ঘর ছিল; তৎপরে পঞ্চরত্ন মঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। জয়কালী-স্থাপয়িতা মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ভগিনী জয়কালী স্থাপনের সমকালে এই শিব স্থাপন করিয়াছেন। কালীঘাটস্থ কালিকা দেবীর যেমন নকুলেশ্বর ভৈরব, সেইরূপ জয়কালী দেবীর ভৈরব এই শিব বটে।

এই শিবালয়ের দক্ষিণে রক্ষাকালীর মন্দির, মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির এবং পূর্ব্বদিকে ঘাট বিরাজিত। রক্ষাকালী মূর্ত্তিটী শিবসিংহবাহিনী। প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে বারপাড়ার মিত্র বংশের অন্যতম কুলপুরোহিত কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী এই বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন। রক্ষাকালী মূর্ত্তিটী পূর্ব্বে মৃণ্ময়ী ছিল, সম্প্রতি দারুময়ী হইয়াছে।

রক্ষাকালী বাড়ীর দক্ষিণে পাষাণময়ী কালী এক খানা টিনের ঘরে স্থাপিত। ইহার পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে একটী ঘাট আছে; দুপতারা নিবাসী

দয়াময়ী চৌধুরাণী স্নানযাত্রীর সুবিধার জন্য প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল এই ঘাটটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

এই ঘাটের দক্ষিণ দিকে বৃহৎ একটী বটগাছ। এই বট তলারই নাম প্রেমতলা। চৈত্র মাসে বটতলাতে তিন চারি শত বাউল বাউলিনী সমবেত হইয়া নৃত্যগীতে ছয় সাত দিবস অতিবাহিত করিয়া থাকে। এখানেও একটী মৃণ্ময়ী কালী মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

প্রেমতলার নাতিদূরে ক্ষুদ্র একটী ইষ্টক গৃহে গৌরগদাধর যুগল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। চরগঙ্গারাম-নিবাসী গোস্বামীগণকর্ত্তৃক এই যুগল মৃন্মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে অপর একটী কালী বাড়ী। প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে বন্দর-নিবাসী কীর্ত্তিনারায়ণ চৌধুরী এই মৃণ্ময়ী কালী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং এখানে লৌহিত্যজলে একটী ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কীর্ত্তিনারায়ণ চৌধুরীর পৌত্র কালীনারায়ণ চৌধুরী কালীকাদেবীর নব সংস্করণ করিয়াছেন, এবং সুন্দর একটী মন্দির এবং মন্দিরের দক্ষিণ ভাগে একটী পঞ্চরত্ন মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

জয়কালী বাড়ীর উত্তরে বরদেশ্বরী নামে অষ্টভুজা মৃণ্ময়ী কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। ইহার পূর্ব্বদিকে বারপাড়া নিবাসী রামভদ্র মিত্র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুইশত বৎসরের পুরাতন একটী ঘাট ছিল। উহা রাজঘাট নামে পরিচিত ছিল। সেই ঘাটটী জীর্ণবিদীর্ণ হওয়াতে, উহার উপরে অপর একটী নূতন ঘাট প্রস্তুত হইয়াছে। বালিয়াটী-নিবাসী সাহা বাবুগণ এই নূতন ঘাটের নির্ম্মাতা। বরদেশ্বরীর বাড়ীর উত্তরভাগে শ্মশানভূমির উত্তরে খাল, খালের উত্তরে একটী ক্ষুদ্র ইষ্টকগৃহে গৌরনিতাই স্থাপিত। ইহার উত্তরে, বাজারের পূর্ব্বদিকে, একটী বৃহৎ ঘাট বিরাজিত। এই ঘাটটী দেড়শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া সকলে অনুমান করে। ইহা বলরামের ঘাট নামে খ্যাত। সোপানগুলি স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইলে স্থানীয় জমিদার-

কর্ত্তৃক কিছুদিন পূর্ব্বে উহা মেরামত হইয়াছে। ঘাটের দুই পার্শ্বে উদাসীন সন্ন্যাসীদিগের বাসের নিমিত্ত যে দুইটী কোঠা ছিল তাহা ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইলে পুনরায় নির্ম্মিত হয় নাই। ইহার উত্তরে আধুনিক নির্ম্মিত সুন্দর একটী সেতু। এই সেতুর স্থানে পূর্ব্বে একটী পাকা পুল ছিল, উহা ভূমিকম্পে পতিত হইয়াছে। সেতুর উত্তরে ক্ষুদ্র ইষ্টকগৃহে অপর মৃণ্ময়ী কালীমূর্ত্তি মাধব ঠাকুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

এই কালীবাড়ীর উত্তরে অন্নপূর্ণার বাড়ী। ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে মৃণ্ময়ী অন্নপূর্ণা দেবী প্রতিষ্ঠিতা। অন্নপূর্ণার বাড়ীর পূর্ব্বাংশে একটী ঘাট শোভিত। ত্রিশ বৎসর অতীত হইল এই ঘাটটী স্থানীয় কুম্ভকারগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

নাঙ্গলবন্ধ, তাজপুর, গোপালনগর, চরগঙ্গারাম, এই চারি স্থানেই বর্ণিত বিগ্রহ সমুদয় অধিষ্ঠিত। এই চারিটী স্থান নারায়ণগঞ্জ রেল-ষ্টেসনের উত্তর পূর্ব্ব কোণে চারি মাইল দূরে অবস্থিত।

গঙ্গার পূর্ব্বাঞ্চলে দুইটী মহাতীর্থ—একটী চন্দ্রনাথ, অপরটী জয়কালী-পদাশ্রিত লৌহিত্য। অধিকাংশ লোকের এরূপ বিশ্বাস—এখানে স্নান করিলে পাপক্ষয় হয়। অশোকাষ্টমী ব্যতীত,আষাঢ়ী পূর্ণিমাস্নান উপলক্ষে এখানে যে আর একটী ক্ষুদ্র মেলা গঠিত হয়, ইহাতে ২।৩ দুই তিন হাজারের অধিক লোক সমাগম হয়—অধিকাংশই স্ত্রীলোক যাত্রী। চন্দ্র-গ্রহণ,সূর্য্যগ্রহণ,চূড়ামণি,অর্দ্ধোদয় প্রভৃতি যোগ উপলক্ষে এখানে সহস্রাধিক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। সমস্ত যোগ স্নানই লৌহিত্য শাখার পশ্চিম পারের ঘাট সমূহে সম্পাদিত হয়। পূর্ব্ব পারে অতি সুন্দর ঘাট থাকা সত্বেও যাত্রীদের কেহ পূর্ব্বপারে অবগাহন করে না। পুরাণে উক্ত হইয়াছে, "লৌহিত্যাৎ পশ্চিমে ভাগে সদাবহতি জাহ্নবী"। লোকের এরূপ বিশ্বাস

যে পশ্চিম পারেই লৌহিত্য স্নানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, পূর্ব্ব পারের স্নান অপুণ্যজনক।

এতদ্দেশে একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে লৌহিত্য শাখার পূর্ব্ব পারের প্রদেশ সমুদয় পাণ্ডববর্জ্জিত। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পাণ্ডববর্জ্জিত বলিলে সেই সকল প্রদেশে পাণ্ডবেরা যান নাই, অথবা উঁহাদের অধিকার ছিল না, এরূপ বুঝিতে হইবে না; পাণ্ডবদিগের শাসনকালে যে সকল ধর্ম্মানুযায়ী আচারব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। লৌহিত্য শাখার পশ্চিম পারের দেশসমূহে পাণ্ডবীয় ধর্ম্মাচারের যে আংশিক ব্যত্যয় না ঘটিয়াছে এমন নহে, কিন্তু পূর্ব্ব পারের দেশসমুদয় অধিক পরিমাণে পাণ্ডবীয় ধর্ম্মাচারভ্রষ্ট। কাহারই অবিদিত নাই, লৌহিত্য শাখার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী দেশসমূহে বাস করিলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কৌলীন্য বজায় থাকে না। লৌহিত্য শাখার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী দেশ পাণ্ডববর্জ্জিত এই উক্তি বহু শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে—অমূলক বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

আদমপুরার শিববাড়ী।

আদমপুরার মদনমোহন ভৌমিকের পত্নী শ্রীযুক্তা কামিনীসুন্দরী দেবী একদা তদীয় পিত্রালয় সম্মান্দী গ্রামে আগমন করিয়া এক পুকুরপারের বেলবৃক্ষমূলে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন। পরে সংজ্ঞালাভ করিলে প্রত্যাদেশ হয় যে এইস্থানের মৃত্তিকাভ্যন্তরে মহাদেবমূর্ত্তি প্রোথিত আছে। তদনুসারে ঐ স্থান খনিত হওয়ায় তথায় শ্বেতপ্রস্তরময় অনিন্দ্যসুন্দর মহাদেব ও একটী বৃষমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। মহাদেবের এক হস্তে শিঙ্গা, কর্ণে ধুস্তুরপুষ্প, বক্ষে ও কটিদেশে কপালমালা বিরাজিত। মূর্ত্তিটী দণ্ডায়মান অবস্থায় রহিয়াছে। উচ্চতা কিঞ্চিদধিক এক ফুট হইবে।

এই মূর্ত্তি এক্ষণে আদমপুরা গ্রামে পূজিত হইতেছে। বহুদূরদেশান্তর হইতে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত লোক রোগমুক্তি কামনায় এইস্থানে আগমন করিয়া থাকে।

সোনারগাঁয়ের ডরাই-দেবী।

"প্রাচীন সুবর্ণগ্রামে, এক জাতীয় লোক বাস করে, ইহারাই এতদঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী। পুরাকালে ইহাদের বাহুল্য ছিল। এই জাতিকে মোসলমান রাজত্বের সময়েও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুবধরূপ কিরাত ব্যবসায় করিতে হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের উপর আরোপিত "ডঁই" বা "ডেঁারাই" বলিয়া একটী কথা এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। হিন্দু শাসন-সময়ে এই সম্প্রদায়ের উপর রাজাদেশ প্রচারিত হইয়াছিল যে, কিরাতব্যবসায়জনিত পাপ বিমোচনার্থ ইহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ। প্রাকৃত ভাষায় ডণ্ডী বলিয়া একটী শব্দ আছে, উহা হইতে ডঁই বা ডেঁারাই শব্দের উৎপত্তি হওয়া বিচিত্র নহে। ডণ্ডী শব্দের অর্থ প্রায়শ্চিত্তার্হ।

পুরাকালে এই আদিম শূদ্র জাতীয় লোকেরা ডঁরাইদেবীর উপাসনা করিত। সোনারগাঁয় এই দেবীর উপাসনা আজও প্রচলিত আছে। ডরাই-পূজায় অনেক অনার্য্যোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে, ডরাই দেবী অনার্য্য দেবী ছিলেন এবং কালক্রমে মনসার বা বিহৃত দানবমাতা বনদুর্গার মূর্ত্তিভেদে পরিণত হইয়াছেন। যদিও ডরাই-পূজায় কোথাও কোথাও বনদুর্গা বা মনসা আনীত হন, তথাচ বঙ্গদেশপ্রসিদ্ধ মনসা পূজার সহিত তুলনায় ডরাই-পূজা সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রকৃতির। মনসা পূজা শ্রাবণের সংক্রান্তি দিন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, কিন্তু ডরাই দেবীর পূজার

নির্দ্ধারিত কাল নাই। কোথাও কোথাও নব-গর্ভিণীর ভীতি বিনা-শার্থ ডয়াইদেবীর কালক্রমে-সংশোধিত-পাঁচালী গীত হইয়া থাকে। কোনও কোনও স্থানে আবার নপুংসকের গান, ডয়াই পূজার এক প্রধান অঙ্গ রূপে আজও প্রচলিত আছে। পুরাকালে ডয়াই পূজায় কোনও মূর্ত্তির সংশ্রব ছিল না, কেবল পাঁচালীই গীত হইত।

বাঘরার বাসুদেব

বাঘরা অতিপ্রাচীন গ্রাম। এই স্থান বিক্রমপুরের পশ্চিম সীমায় মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঘরার পশ্চিমপ্রান্ত বিধৌত করিয়া "সাতার" নাম্নী একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বিক্রমপুরের পশ্চিমসীমা-রেখারূপে প্রবাহিত হইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে করাল-রূপিণী পদ্মা বিক্রমপুরের অনেকানেক স্থান কুক্ষিগত করিলে, তদীয় স্রোতোবাহিত পলিমাটির সঞ্চয় দ্বারা সাতারকে ক্ষীণ-তোয়া করিয়া ফেলিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে সাতার একটী খালে পরিণত হইয়াছে।

প্রায় ত্রিশত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সরকার, ভট্টাচার্য্য ও আচার্য্য, এবং কায়স্থগণের মধ্যে মাঝি বংশের আধিপত্য ছিল। ইহার কিছুকাল পরে চক্রবর্ত্তী বংশ অন্যস্থান হইতে এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই চক্রবর্ত্তীবংশীয় জনৈক পূর্ব্বপুরুষ বাসুদেব মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। কথিত আছে, এই গ্রামে "চাঁদরায়ের দীঘি" নামে একটী সুবৃহৎ জলাশয় ছিল। ঐ দীঘিতে স্থানীয় ব্রাহ্মণ গোপ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি পৌষসংক্রান্তি দিন মৎস্য ধরিবার জন্য জলে নামে; এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত চক্রবর্ত্তী বংশের একজন প্রস্তরনির্ম্মিত বাসুদেব মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। বাসুদেব প্রাপ্ত হইবার রাত্রিতেই প্রত্যাদেশ হয়, "এই

দীঘির সন্নিকটবর্ত্তী পশ্চিমদিকস্থ পুষ্করিণীতেই আসন ও পূজা পদ্ধতি পাওয়া যাইবে।” বস্তুতঃ তৎপর দিবস “আম্বলি” বংশের জনৈক ব্যক্তি তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ পূজাপদ্ধতি এবং গোপগণের মধ্যে একজন প্রস্তর-নির্ম্মিত আসন প্রাপ্ত হয়। এই তাম্রফলকখানা বহুকাল যাবৎ নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে।

বাসুদেব-প্রতিষ্ঠা লইয়া চক্রবর্ত্তী ও আম্বলি দিগের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল। একপক্ষ বলেন “ঠাকুর দিব না;” অপর পক্ষ বলেন “আসন দিবনা”। গোপগণ আসনের দাবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এতদুপলক্ষে উভয় পক্ষে অনেক মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ মধ্যস্থ হইয়া এই মীমাংসা করিয়া দেন যে, ঠাকুর ঐ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৎসরের মধ্যে ছয়মাস কাল একপক্ষের বাড়ীতে এবং অপর ছয়মাস অপর পক্ষের বাড়ীতে থাকিবেন। ইহাতে বৎসরের পর্ব্বগুলি উভয়ের পালায় সমান ভাগে পড়েনা, সুতরাং উভয় পক্ষের আয়ের তারতম্য হইতে থাকে। এই আয়ের তারতম্য-হেতু অভিনব বিরোধের কারণ উপস্থিত হয়। ফলে উভয় পক্ষকেই রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। এই সময় (১৮৩২ খৃঃ অঃ) মিঃ ওয়াল্‌টার ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি প্রত্যেক পক্ষকেই চারি মাসকাল সেবার অধিকারী করিয়া নিষ্পত্তি করিয়া দেন। এইরূপে চারি মাসকাল এক বাড়ীতে এবং তাহার পরের চারিমাস কাল অন্য বাড়ীতে ঠাকুরকে থাকিতে হয়, যেন ১৬ মাসে বৎসর শেষ হইয়া প্রত্যেক পর্ব্ব যথাক্রমে উভয়ের পালায় পড়ে। এই চারিমাস পালার নাম এক “বত্তর”। আজ পর্য্যন্তও এই ভাবেই উভয় বংশের বংশধরগণের মধ্যে পালানুসারে পূজা চলিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত আম্বলি-বংশের কেহই নাই। সেই বংশের একটী দৌহিত্র সন্তান এখন বাসুদেবের সেবাইত। চক্রবর্ত্তী বংশের মধ্যেও

এখন একমাত্র শ্রীযুক্ত রামকমল চক্রবর্ত্তী মহাশয় আছেন। অন্যান্য হিস্যা দৌহিত্রে পর্য্যবসিত, কতক বা বিক্রীত হইয়া পূর্ব্বকথিত সরকার-বংশে আসিয়াছে।

এই বাসুদেব কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, গরুড়াসনোপরি সংস্থিত। উপরের চালায় দুই ধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং মধ্য-স্থলে ভগবানের দশাবতার খোদিত।

মালধার কালী।

বিক্রমপুরের যশোলঙ্গ গ্রামের সন্নিকটে প্রসিদ্ধ নাদিমশার দীঘির অনতিদূরে মালধা গ্রামে কালীকা দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। প্রায় দেড়শত বৎসর যাবৎ এই দেবী জনসাধারণের পূজোপচার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। দেবী অত্যন্ত জাগ্রৎ। একটু বিশেষত্ব এই যে লোলরসনা এই কালীকাদেবীর মস্তকটী মাত্র একটী ঘটের উপরে স্থাপিত আছে। ঘটোপরি যে একটী নারিকেল ফল আছে তাহারই একদিকে দেবীর মুখমণ্ডল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মুখমণ্ডল কতিপয় বৎসরান্তে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনব ভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে এই স্থানে একটী মেলা জমিয়া থাকে। এই সুরম্য স্থানটীতে আগমন করিলেই মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যায়। বস্তুতঃ এইরূপ স্থান বিক্রমপুরে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কামারখাড়ার ত্রিবিক্রম।

প্রাচীন কাঁচাদিয়া গ্রাম কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইলে ঐ গ্রামবাসী অনেকানেক লোক কামারখাড়া গ্রামে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। স্বর্গীয় গোলোক চন্দ্র সেন মহাশয় কামারখাড়া গ্রামে স্বীয় বাসভবন

নির্ম্মাণ করিবার বহুকাল পরে "রাম ভদ্রের ছাড়া" নামক একটী জঙ্গলাবৃত স্থান ক্রয় করেন। তিনি ১২৯৭ বঙ্গাব্দে ঐ স্থানের "মঘাই দীঘির" সংস্কারসাধনে মনোনিবেশ করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। খননের পূর্ব্বে পুকুরের জল নিষ্কাশিত করা হইলে একটী কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ স্তম্ভ তথায় পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই স্তম্ভটি উত্তোলনের জন্য বহু চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু উহাকে স্থানচ্যুত করা সাধ্যায়ত্ত হয় নাই।

এদিকে "দেবাংশি" পুকুর বলিয়া একটা জনরব উঠিল। মাঠিয়ালগণ এ সকল কথা শুনিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। সুতরাং ঐ বৎসর খননকার্য্য স্থগিত রহিল। উক্ত সেন মহাশয় পরলোকগমন করিলে পিতার অনুষ্ঠিত কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য তৎপরবর্ত্তী বৎসরে তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত কেদারেশ্বর সেন মহাশয় বহুলোক সংগ্রহপূর্ব্বক খননকার্য্য আরম্ভ করেন। খনন করা সত্ত্বেও সুদূরপ্রোথিত সেই সুমার্জ্জিত স্তম্ভটী উত্তোলন করা সম্ভবপর হইল না। পরে ২৫শে ফাল্গুন তারিখে খনন করিবার সময়ে এই অনিন্দ্যসুন্দর ত্রিবিক্রম মূর্ত্তিটী আবিষ্কৃত হয়। চালি সহিত মূর্ত্তি খানা প্রায় ১৩।১৪ ইঞ্চি হইবে। এই গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিটীর মস্তকে কিরীট, এবং বক্ষদেশ বৈজন্তীমালা ও যজ্ঞসূত্রে পরিশোভিত। পার্শ্বদ্বয়ে কমলা ও ভারতী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। প্রস্ফুটিত শতদলোপরি মূর্ত্তিটী অবস্থিত। পাদদেশে অষ্টধাতু নির্ম্মিত গরুড়মূর্ত্তি করজোড়ে দণ্ডায়মান। চালিখানাও অষ্টধাতুবিনির্ম্মিত। কিন্তু অন্যান্য সমুদয় মূর্ত্তিগুলি রজতনির্ম্মিত। ১২৯৮ সনের দোলপূর্ণিমা তিথিতে এই মূর্ত্তিটী স্থাপিত হইয়া পূজিত হইতেছে। এই দেবমূর্ত্তির বিষয়ে অনেক অলৌকিক কিম্বদন্তী শ্রুত হওয়া যায়।

বাথিয়ার শিববাড়ী।

মেঘনাদের শাখা "আকালমেঘনদী" হইতে যে সুপ্রশস্ত পয়ঃপ্রণালী

উত্তরবাহিনী হইয়া প্রবাহিত তাহা বাঘিয়া গ্রামের উত্তর প্রান্ত স্পর্শ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। এই খালের অনতিদূরে বাঘিয়া গ্রামে সারেস্তাখানি ধরণে নির্ম্মিত কেবল মাত্র খিলানের উপরে গ্রথিত একটী সুদৃশ্য মন্দির মধ্যে পাষাণময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে, বাঘিয়া নিবাসী ৺ রূপরাম গুপ্ত মহাশয় বহু অর্থব্যয় করিয়া লস্করদীঘি নামক প্রশস্ত দীর্ঘিকা এবং শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উক্ত শিব-প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘিকা উৎসর্গের উদ্বৃত্ত ও প্রাপ্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া তদীয় পুরোহিত ৺ মুক্তরাম ঘোষাল মহাশয় স্বতন্ত্র একটী প্রকাণ্ড জলাশয় এবং উহার তীরদেশে একটি মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই পুষ্করিণীর সোপানাবলি নির্ম্মাণ করিবার সময়ে যে দুইটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত স্তম্ভ জল মধ্যে প্রোথিত করা হইয়াছিল, তাহা এনখও বিদ্যমান রহিয়াছে।

বাঘিয়ার এই শিব অতি জাগ্রৎ। প্রায় দ্বিশত বৎসর যাবৎ ইনি জনসাধারণের পূজোপচার গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

সুবচনী তলা।

ঢাকা হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে, ধলেশ্বরীর পশ্চিম এবং ইছামতীর দক্ষিণে ও পূর্ব্বতীরে পাঞৈলদিয়া গ্রাম অবস্থিত। বিখ্যাত তালতলার খাল এই গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে ধলেশ্বরীর সহিত সংযোজিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তি হইতে দিবসত্রয় ব্যাপী দুইটী মেলা এইস্থানে জমিয়া থাকে। গ্রামটি দুইভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগে যে মেলাটির অধিবেশন হয়, তাহা স্থাপয়িতার নামানুসারে "লক্ষীঘোষেরমেলা" বলিয়া পরিচিত। পশ্চিম ভাগের মেলাটি সুবচনীর মেলা নামে অভিহিত। এই শেষোক্ত স্থানে একটি অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ চতুর্দ্দিকে স্বীয় শাখা

প্রশাখা সম্প্রসারিত করিয়া বহু শতাব্দী যাবৎ সর্ব্ববিধ্বংসী কালের ধ্বংস-নীতি উপেক্ষা করিয়া সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বৃক্ষটি সর্ব্ব-সাধারণের নিকট "সুবচনী" বলিয়া প্রখ্যাত। ইহার পাদদেশ অসংখ্য হিন্দুনরনারী কর্ত্তৃক তৈল ও সিন্দুরানুলিপ্ত হইয়া লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। বিপন্মুক্তি কামনায় অথবা পুত্রের বিহার অন্তে নববধূর সুবচনী অর্থাৎ প্রিয়বাদিত্ব প্রার্থনা করিয়া মাতা সুবচনীদেবীর পূজা করিয়া থাকেন। সুবচনীদেবীর অর্চ্চনা এইস্থানে সংসাধিত হয় বলিয়া স্থানের নাম "সুবচনীতলা" এবং মেলার নাম "সুবচনীর মেলা" হইয়াছে। মেলার সময়ে "বেঁদের গান" নিম্নশ্রেণীর গৃহস্থগণের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে।

বালুশাইর দুর্গাবাড়ী।

ঈশাখাঁ মসনদআলি মোগলের পতাকামূলে স্বীয় গর্ব্বোন্নত মস্তক লুণ্ঠিত করিলে বাদশাহ আকবর তাঁহার দরবারে ক্রমান্বয়ে দ্বাদশটী আমত্য প্রেরণ করেন। এই দ্বাদশ জন আমত্যের মধ্যে একজনের নাম ছিল মীর্জ্জামহম্মদ খোদানেওয়াজ খাঁ। ইনি পারস্যসম্রাট শাহ তমাস্‌পের জনৈক ওমরাহের পুত্র। সম্রাট হুমায়ুন পারস্যরাজের নিকট হইতে নানা প্রকারে উপকৃত হইয়া যৎকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন, সেই সময়ে মীর্জ্জা মহম্মদ খোদানেওয়াজখাঁও পারস্যসৈন্যের অধিনায়কস্বরূপে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বসময়ের প্রথম ভাগে ইনি কোনও একটী রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরে ঈশাখাঁর দরবারে আমাত্যরূপে প্রেরিত হন। স্বীয় প্রতিভাবলে ইনি ঈশাখাঁর নিতান্ত বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠেন এবং তাঁহার নিকট হইতে মহেশ্বরদী পরগণায় একখণ্ড বৃহৎ ভূমি জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। তথায় স্বীয় বাসোপযোগী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া উক্ত স্থানের নাম "বালুশাইর" প্রদান করেন। ইনি মীর্জ্জা আবদুল করিমখাঁ ও মীর্জ্জা মহম্মদ ফরিদখাঁ নামক দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। আবদুল করিম একজন প্রসিদ্ধ তাপস ছিলেন। আরবী ও পারসী ভাষায় ইনি অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, আবদুল করিম অন্যের মনোগত ভাব বলিয়া দিতে পারিতেন এবং যোগবলে লোকলোচনের অন্তরাল হইতে পারিতেন। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। তাঁহার পবিত্র সমাধিস্থান "দর্গাবাড়ী" নামে প্রসিদ্ধ। এখনও তাঁহার নামে লোকে মানস ও সিন্নিপ্রদান করিয়া থাকে।

খ'জাখিজির।

খাজাখিজির সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহার বিষয়ে মোসলমানগণ মধ্যে মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয়। কোরাণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে মুসা ও জসুয়ার অল্খেদর বা জুলকরনাইন এর বিরুদ্ধে অভিযান প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। প্রাচ্য ভূখণ্ডে গ্রীকবীর অলিকসন্দর জুলকরনাইন নামে পরিচিত; এজন্য অনেকে অলিকসন্দরের সহিত খাজাখিজিরের অভিন্নত্ব প্রতি পাদন করিতে প্রয়াসী। আবার অনেকে ইহাকে ইলিয়াস বা ইলিজা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সমুৎসুক। ইলিয়াস জীবন-নির্ঝর (আব-ই-হায়েৎ) আবিষ্কার করিয়া অমরত্বলাভ করেন। প্রতীচ্য সাহিত্যে খাজাখিজির অপরিচিত নহে। Parnell এর Hermit কবিতা, এবং Voltaire এর Ladig পুস্তিকার 'L' Ermite প্রসঙ্গ খাজাখিজিরের উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। Deutsch বলেন, Talmud এ ইলিজা অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন অমর দেবযোনী বিশেষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি আরবদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, এরূপ লিখিত আছে। আবার

কেহ কেহ ইহাকে জুলকরনাইন বা কৈকোবাদের সহচর, উপদেষ্টা এবং সৈন্যাধ্যক্ষ রূপেও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এসিয়া মাইনরে খিজির ইলিয়াস St. George of Cappadocia নামে পরিচিত।

বর্ত্তমান সময়ে খাজাখিজির ভারতীয় নদনদী এবং সমুদ্র মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক বিপন্ন নাবিকদিগকে রক্ষা করেন বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। চল্লিশ দিন ব্যাপী কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া খাজাখিজিরের দর্শন লালসায় তন্ময় চিত্তে নদীতীরে অবস্থান করিলেই নাকি তাঁহার দর্শন লাভ সুলভ হয়। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের মোসলমানগণ বিপদুদ্ধরণের জন্য, রোগ মুক্তি কামনায়, অথবা সন্তান লাভ মানসে ইহার পূজোপচার প্রদান করিয়া থাকে।

ঢাকায় নবাব মকরমখাঁর সময়ে বাঙ্গলার মোসলমানগণের এই পর্ব্বানুষ্ঠানের প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে এই পর্ব্ব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইত। অদ্যাপি ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে এতদুপলক্ষে ঢাকায় সমারোহ হইয়া থাকে। চতুর্দ্দিক হইতে কদলীবৃক্ষও বংশ সংগৃহীত হইয়া প্রকাণ্ড আলোকযান প্রস্তুত হয়। তাহার উপর নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং কাগজে ও অভ্রে মণ্ডিত তরণী, গৃহও মসজিদ প্রভৃতির প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়া থাকে; তন্মধ্যে অলোকমালা সুশোভিত করিয়া স্রোতোমুখে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। এই উৎসব "বেরা" উৎসব নামেও পরিচিত। পূর্ব্বে তিন শত হস্ত বিস্তৃত আলোকযানও প্রস্তুত হইত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মোসলমানেরও বেরা থাকিত। বুড়িগঙ্গা বক্ষ এইরূপে আলোকমালায় উদ্ভাসিত হইয়া নয়ন মনোরম অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। এতদঞ্চলের মোসলমানগণ ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের প্রদোষে আদ্রক, তণ্ডুল ও কদলী সমন্বিত নৈবেদ্য সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেরা নদী বক্ষে ভাসাইয়া দেয়। মোসল-

মানগণ ব্যতীত জালিক ও নমঃশূদ্রগণ কর্ত্তৃকও এই পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

Vide J. A. S. B. 1894: Quarterly Review 1869:
বাঙ্গলার ইতিহাস—শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

বড় কাটারার শিলালিপি।

বড় কাটারার তোরণ দ্বারে পারস্য ভাষায় লিখিত যে একখণ্ড প্রস্তর ফলক বিদ্যমান ছিল তাহার অস্তিত্ব অধুনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। উক্ত শিলালিপির ইংরাজী অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। সম্ভবতঃ এই প্রাসাদ প্রথমে সম্রাটতনয় শাহ সুজার আবাস ভবন স্বরূপেই নির্ম্মিত হইতে ছিল; কিন্তু পরে উহা মনোমত না হওয়ায় সরাইখানাতে পরিণত হয়। এতৎসংলগ্ন দ্বাবিংশতি পণ্যশালার আয় দ্বারা সমাগত যাত্রীদিগের অভাব বিমোচন এবং এই প্রাসাদের সংস্কার সাধিত হইবে বলিয়া শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। শিলালিপি খানা সাদুদ্দিন মহম্মদ সিরাজী কর্ত্তৃক লিখিত।

"Sultan Sha Shuja was employed in the performance of charitable acts. Therefore Abul Kassem Tubba Hosseinee Ulsummance, in the hopes of the mercy of God, erected this building of auspicious structures, together with twenty-two Dookans, or shops, adjoining, to the end that the profits arising from them be solely appropriated by the agents, overseers, to their repairs and the necessities of the indigent, who on their arrival are to be accommodated with lodgings free of expenses. And this condition is not to be violated, lest on the day of retribution the violator be punished. This inscription was written by Saadoodeen Mahamed Sherazee."

Vide Glimpses of Bengal.

কয়েকটি সংশোধিত কথা।

এই পুস্তকের ৪৬৭ পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক স্থানের পরিচয় প্রদান কালে "চৌরা" নামক স্থানটীকে "টেরা" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। উহা টেরা না হইয়া চৌরা হইবে।

রমণার কালী বাড়ীর মঠটির শীর্ষদেশ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়া গেলে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংস্কৃত হয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ঐ মঠের সংস্কার সাধন জন্য ১১০০৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রায় পঞ্চশত মুদ্রা সাধারণের চাদায় সংগৃহীত হয়; অবশিষ্ট সমুদয় অর্থই ঢাকা জজকোর্টের প্রখ্যাতনামা উকিল, ঢাকার অন্যতম নেতা সর্ব্বজন প্রিয় শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় প্রদান করিয়াছেন। কালীবাড়ীর সম্মুখস্থিত পুষ্করিণীটি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছে। মঠটি লোহাগড়ার জনৈক রাজা নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিয়াও কিম্বদন্তী আছে।

বুনিয়া রাজবংশীয়া রাণী ভবাণীকে কেহ কেহ শিশুপালের অনন্ত বংশীয়া বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহারাজ রাজবল্লভ তালতলার খালের পূর্ব্ব পারে যে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া আনন্দময়ী কালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বুভুক্ষু ধলেশ্বরীনদীর ভীষণ তরঙ্গাঘাতে অধুনা উক্ত মন্দির বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে মহারাজের বৃত্তিভোগী রায়-পুরা নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বীয় বসতবাটীতে সামান্য টিনের ঘরে মায়ের স্থান করিয়া যথারীতি অর্চ্চনাদি করিতেছেন। ঐ স্থানে মাঘীপূর্ণিমায় একটি বাৎসরিক মেলার অধিবেশন হয়।